গোঁসাইবাগান

মোহন লাইব্রেরী
৭৫এ, মির্জাপুর ষ্ট্রীট • কলিকাতা-৯

•

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৬৭

•

প্রকাশক : শ্রীজীবনকুমার বসু
মোহন লাইব্রেরী : ৩৫।এ, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

•

মুদ্রাকর : এস. সাহা
ক্যালকাটা প্রিন্টার্স : ৯ এ্যান্টনি বাগান লেন, কলিকাতা-৯
প্রচ্ছদপট ও টাইটেল : শ্রীবিভূতি সেনগুপ্ত

•

বাঁধাই : বুক বাইণ্ডিং সেণ্টার
৪০, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা-৯

তোমাকে যখনই আমি স্বাগত বললাম এই গোঁসাইবাগানে
তখনই হরেক জংলা খুলে গেল। দেখা দিল এই পঞ্চবটী।
ফুল নামে ছোটো ভাই, আরও ছোটো কোলেরটা কুঁড়ি।
ওই গাছ দিগম্বর। মাথার ওপরে মেঘে
যথারীতি চাঁদের মা বুড়ি।
ঘাসে আগাছায় হাঁটি। ভাঙা সিঁড়ি। পানাভরা পুকুরে পদ্মটি।
এ বাগানে ভোরবেলা স্বচক্ষে দেখেছি
ঘাস থেকে ফুল তুলছে ডানাভাঙা পাথরের পরী।

এখানে আমার সঙ্গে থাকো না দুদিন, কষ্ট, ক'রে।

আশ্চর্য, সত্যিই থাকলে! ফিরে গিয়ে, তোমার সহেলী,
ঠেলেঠুলে পাঠালে তাকেই—
এ বাঁকে তোমাকে পেলে, বাগানের পরের বাঁকেই
তাকে তো পেলাম? না কি অন্য কাউকে?
মনে নেই। ঘাসের শয্যায়
যত যত পাই, তত ঝরি।
তোমরাই আমাকে ফের বাঁচিয়ে তুলেছ এই বাগানের ঘোরে–
সে কথা কী করে আজ অস্বীকার করি!
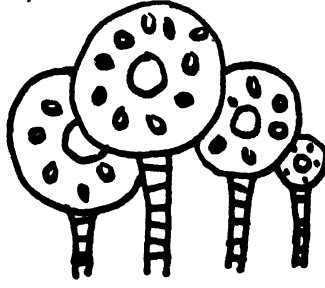
১

সেই ষোলো সতেরো বছর বয়সে, যখন প্রথম কবিতার দিকে ঝুঁকে পড়তে শুরু করেছি, কিছুতেই একটা জিনিস বুঝতাম না তখন, কী করে একটা কবিতা ভালো লাগে। কী কারণে? আর ঠিক পাশের পৃষ্ঠার কবিতাটাই কেন তত ভালো লাগে না। কেন এটা হয়? কী কী উপাদানের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি এটা ঘটাতে থাকে, কী থাকলে একটা কবিতা কবিতা হয়, তা বুঝতাম না তখন।

সত্যি বলতে, এখনও বুঝি না। আগেরই মতো, কেবল অভিভূত হই। কেবল বলতে পারি ভালো লাগে। কিন্তু এখন, যেহেতু প্রায় ৪০ বছর হয়ে গেল কবিতার সঙ্গে সঙ্গে থাকি, তাই দুটো চারটে জিনিস হয়তো একটু স্পষ্ট হয়েছে। আবার কয়েকটি এলাকা চিরধূসর থেকে গিয়েছে। নতুন করে বুঝতে পারার সঙ্গে যোগ হয়েছে নতুন নতুন না-বোঝা। এইসব মিলিয়েই প্রিয় কবিতা। মজার কথা, কেন তাকে প্রিয় বলছি, কেউ জিজ্ঞেস করলে ভালো করে বোঝাতে যেতেই কথা হারিয়ে যায়।

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে যেহেতু যাইনি, তাই বড়োদের কাছে যেভাবে কবিতা পড়তে শেখে সবাই , সে সুযোগ আমার হয়নি। বড়োরা, অর্থাৎ শিক্ষকরা অনেকে, শুনেছি ক্লাসে এত সুন্দর করে কবিতা পড়ান অন্য কলেজ থেকেও ছাত্রছাত্রী এসে হাজির হয় তাঁদের ক্লাসে। অমন পড়ুয়া হতে আমিও চেয়েছি, কিন্তু তা ঘটেনি বাস্তবে। আমারই নানা দোষে। ফলে কবিতা কীভাবে পড়তে হয়, তা আর কারও কাছে শেখা হয়নি। আজ মনে হয়, এই শেখাটা খুব দরকারি ছিল। এই অভাব আজ অনুভব করি। জানার দরকার ছিল দেশ বিদেশের নানা তত্ত্ব। অতীত হয়ে যাওয়া তত্ত্ব। নতুন জন্মানো তত্ত্ব। জানতাম যদি, তাহলে কবিতার জগত হয়তো আরও একটু খুলে যেত আমার কাছে। চিরধূসর এলাকাগুলো স্পষ্টতর হত একটু। কিন্তু শিখিয়ে দেওয়ার উপযুক্ত লোকের কাছে পৌঁছোতে পারিনি বলে, আমাকে নির্ভর করতে হল শুধু অভিজ্ঞতার ওপর। নিজের একান্ত অভিজ্ঞতাগুলোর ওপর।

বাবার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছি হাইওয়ের ধারে। তখন আমার ৮। আমরা একটা রিকশায়

চলেছি। একদিকে ঝোপজঙ্গল, চায়ের দোকান, কামারশালা। অন্যদিকে মাঠ। ঢালু হয়ে আসা দিগন্ত। বাবা বললেন, মাঠের পরে মাঠ, মাঠের শেষে—সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে। সত্যিই তো. একেবারে দিগন্তের ধারে ছোটো ছোটো চালাঘর আর ছোটো হয়ে আসা একটা দুটো লোক, সাইকেল, ওরা যেন আকাশেই মিশবে এরপর। একে কী বলে? চিত্রকল্প কি? তখন তো আর অত জানি না। যাই বলুক, অবাক লেগেছিল ওই আকাশে মেশা ব্যাপারটা। এখন মনে হচ্ছে, তাইতো, আকাশে মেশে কথাটা এসেই এটাকে এমন আশ্চর্য চেহারা দিল। গ্রামটা যে ঢালু হয়ে আসা আকাশটায় মিশে যেতে পারে, আগে তো ভাবিনি। প্রায় রোজই তো দেখছি। যা আমার চেনাজানার মধ্যে রয়েছে, তাকে যখন কোনো কবিতার মধ্যে হঠাৎ দেখতে পাই, তখন, তাকে ভালো লেগে যায়। আপন মনে হয়।

ঘটনার পর ঘটনা, আর তা থেকে অভিজ্ঞতার পর অভিজ্ঞতা জমা হয়ে চলেছে জীবনের মধ্যে। যেন অনেক অভিজ্ঞতার ঘন এক দ্রবণ এই স্মৃতি আর মন। এক এক জনের অভিজ্ঞতা আবার অন্যের থেকে অনেকটাই ভিন্ন। এর মধ্যে, এই অভিজ্ঞতার দ্রবণের মধ্য দিয়ে যখন কবিতার শব্দগুলো সুতোর মতো নেমে যায়, তখন তাদের মধ্যে চেনা কাউকে দেখতে পেলে চূর্ণ চূর্ণ অভিজ্ঞতা নানা দিক থেকে এগিয়ে এসে, ওই শব্দমালাকে আঁকড়ে ধরে, নেমে আসা সুতোকে চারদিক থেকে যেমন ধরে দ্রবণের মধ্যেকার চিনির কণারা। যেভাবে মিছরি জমাট বাঁধে, সেইরকম আর কি।

অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করলে আবার অনেক সময় উলটোদিকে যাওয়ার বিপদও হয়। যেমন দর্পণ কথাটা আমার কাছে কী ছিল? অন্তত অনেকদিন পর্যন্ত? দর্পণ যে স্বচ্ছ ঝকঝকে একটা জিনিসকে বলে, যাতে মুখ দেখা যায়। দর্পণ যে আয়না। তাই বুঝতে আমার দিন কাটল। ছোটোবেলায় বাবা, কিনে আনতেন মলাটহীন একটা সাপ্তাহিক, তার নামটি বানান করে পড়তে শেখা। দর্পণ। দর্পণ মানে কী? পত্রিকা।

তারপর তো দর্পণের আয়না মানে শিখলাম, তা সত্ত্বেও বহুদিন পর্যন্ত দর্পণ বললে আমার সামনে আধময়লা খসখসে নিউজ প্রিন্ট ভেসে উঠত, স্বচ্ছ কাচ আয়নার বদলে। আবার অচেনা জিনিসও চিনে নেওয়া যায় কবিতা থেকে। ঠিক ঠিক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার একটু বাইরে দূরেই যদি হয়, তাও তাকে চেনা যায়। যেমন—

> আমি যত গ্রাম দেখি
> মনে হয়
> মায়ের শৈশব
>
> আমি যত গ্রামে যত মুক্তক পাহাড়শ্রেণি দেখি
> মনে হয়
> প্রিয়ার শৈশব

পাহাড়ের হৃদয়ে যত নীলচে সবুজ ঝরনা দেখি
মনে হয়
দেশ গাঁয়ে ছিল কিন্তু ছেড়ে আসা প্রতিটি মানুষ

ঝরনার পরেই নদী, নদীর শিয়রে
বাঁশের সাঁকোর অভিমান
যেই দেখি, মনে পড়ে, নোয়াখালি, শীর্ণ সেতু
আর সে-নাছোড় ভগবান।

আমি যত গ্রাম দেখি, মনে হয় মায়ের শৈশব? আমার মা কোনোদিন গ্রামে থাকেনি। ছোটোবেলায় থাকেনি। শহরেই বড়ো হয়েছে। পরিণত বয়সে, কলকাতা থেকে দূরে এই রানাঘাটে চলে আসতে হয়েছে বলে গুনগুন অনুযোগও তো করে। তাহলে, ওই লাইনটা পড়ে আমার চোখ ভিজে উঠল কেন? ট্রেনে করে যাওয়ার সময় দূরে দূরে যেসব গ্রাম পুকুর চালাঘর চোখে পড়ে তাই ভেসে উঠল মনে? যেন ওইসব গাঁয়ে কোথাও আমার মা থাকত। যেন আমার মা-ই থাকত, কিছুতেই অলোকরঞ্জনের মা নন।

অলোকরঞ্জনের মাকে তখন জানি না, অলোকদাকেও জানি কেবল বইয়ে ছাপা নাম হিসেবে। কিন্তু মনে হয়, ওইসব গাঁ-ঘরে যেন আমার মায়ের ছোটোবেলা কেটেছে। বাস্তবটা একেবারে উলটো। কিন্তু মনে ওটাই থেকে যাচ্ছে বারবার। মা কথাটা যখনই উচ্চারিত হবে, কবিতায়, বা গানে, নিজের মাকেই যে মনে পড়বে মানুষের। আর আমার তো তখন কোনো বান্ধবী ছিল না, প্রিয়ার শৈশব, বুঝব কী করে? তাহলে কি এই কবির, মানে অলোকরঞ্জনের কোনো পাহাড়ি মেয়ের সঙ্গে প্রণয় ছিল? আজও তো জানি না। কিন্তু তখন যা মনে হল পাহাড়ের গায়ে গায়ে ঘর মন্দির গাছপালা সাদা রাঙা নীল নিশান। ওরই ফাঁক দিয়ে ফাঁক দিয়ে একটি দুটি বালিকা নেমে আসছে, দ্রুত পায়ে ছুটে ছুটে নেমে আসছে, ওরাই কি প্রিয়ার শৈশব?

এক্ষুনি বলছিলাম না, অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কবিতাকে বোঝা, কিন্তু এটা কী হল? আমার মা তো গ্রামে থাকত না, আর পাহাড়ি কোনো মেয়েকেও আমি চিনি না, তাহলে? এই যে ছবিগুলো ফুটে উঠছে এগুলো তো পুরো বাস্তব নয়, অনেকটাই কল্পনা। কল্পনার ভিতর দিয়েও তাহলে যে অভিজ্ঞতা পাওয়া যায়, তাও এসে দাঁড়ায় কবিতার মুখোমুখি। তবে দেশগাঁয়ে ছিল কিন্তু ছেড়ে আসা প্রতিটি মানুষ—এই লাইন কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যেই দেখি। রেলস্টেশনে যারা শুয়ে থাকে, সংসার নিয়ে, যারা বাড়ি বাড়ি কাজ খুঁজে বেড়ায় দিনেরবেলা, ঘাস কাটা, ডাব পেড়ে দেওয়া, কুয়োয় নামা-র কাজ, যারা গোয়াল গুছিয়ে দেয় একবেলা খাবার বিনিময়ে তারা ওই ছেড়ে আসা প্রতিটি মানুষ। তবে, সত্যি বলতে, পাহাড়ের গা বেয়ে যত ঝরনা, সেসব যে পাহাড়ের হৃদয় তা তো ভাবিনি। ঝরনাটি কোথায় কোন চূড়ার কাছে তুষার রূপে ছিল। সেইখান থেকে সে যখন নেমে এল নীচে, জনপদের দিকে, সত্যিই তো

সে ছেড়ে আসছে তার পুরোনো বসত। তারপর? ঝরনার পরেই নদী, নদীর শিয়রে, বাঁশের সাঁকোর অভিমান। এই অভিমান শব্দটি কেন বসিয়েছেন তখনও বুঝিনি, এখনও বুঝতে পারি না। ঝরনা তো নীচে নেমে নদী হল। নদীর শিয়রে সাঁকো। নোয়াখালি কখনও দেখিনি, শীর্ণ সেতু অনেক দেখেছি। যেখানে বড়ো হয়েছি, সেখানে চূর্ণী নদী ছিল। নদী থেকে সেচের জন্য খাল কেটে নিয়ে যেত খেত আর ঝোপজঙ্গলের পাশ দিয়ে। খালের ওপর সাঁকো কি দেখিনি? কী মনে পড়ল কবিতার শেষে? মনে পড়ল আর সে নাছোড় ভগবান। নাছোড় কেন? কারণ অলোকরঞ্জনের কবিতায় বারবারই তো দেখি ঈশ্বর আর ভগবানের এসে পড়া। শঙ্খ ঘোষের গদ্যে যেমন এসে পড়েন রবীন্দ্রনাথ। যেন, অনেক সময়, অনিচ্ছাসত্ত্বেও। বা আরও খুঁটিয়ে দেখলে, আগে থেকে নিজের না-জানা থাকা সত্ত্বেও এসে পড়েন। এখানে ভগবান কেন এসে পড়লেন? এই প্রকৃতি, মা প্রিয়া ঝরনা নদী হয়ে এই দেশমাটির মানুষ, এই সবই তো তুমি সৃষ্টি করেছ ঈশ্বর। এইসব যখন দেখি মাকে মনে পড়ে, প্রেমিকাকে মনে পড়ে, মনে পড়ে শত শত অসামান্য সামান্য-মানুষ—কিন্তু সবশেষে তো তোমাকে মনে পড়ে। বিশ্বাসী যে তার এই মুশকিল।

> বন্ধুরা বিদ্রুপ করে তোমাকে বিশ্বাস করি বলে
> তোমার চেয়েও তারা বিশ্বাসের উপযোগী হলে
> আমি কি তোমার কাছে ভুল করেও আসতাম কখনও।

সে কত বিদ্রুপ ব্যঙ্গ সহ্য করে তারপরও বিশ্বাস রেখেছে। আবার যে-হয়তো ঈশ্বরে বিশ্বাসী নয় তারও হয়তো বিশ্বাস মাটিতে।

নদীর শিয়রে ঝুঁকে পড়া মেঘ / প্রান্তরে দিগন্ত নির্নিমেষ / এ আমারই সাড়ে তিন হাত ভূমি। যদি নির্বাসন দাও, আমি ওষ্ঠে অঙ্গুরী ছোঁয়াবো / আমি বিষ পান করে মরে যাবো। এই সাড়ে তিন হাত ভূমি। এই আমার কবরের জায়গা। এই আমার দেশ। এই দেশেই বাঁচব। এ দেশেই চিতায় বা কবরে শয়ান হব। দেশ ছেড়ে কোথাও যাব না। আর দূরে দূরে গ্রাম দেখতে দেখতে যে মনে পড়ছে মায়ের শৈশব, সেও কিন্তু এক হিসেবে দেশকেই দেখা। দেশকে বিশ্বাস করা।

বিশ্বাস, আরও এক কবি অরুণ মিত্র একবার লিখেছিলেন, আমার বিশ্বাস আমি ন্যস্ত রেখেছিলাম পাথরে, এক অনমনীয় পাথরে। অন্য আরেকজন লিখেছিলেন

> এই দেশকে ছুঁয়েছি পাথরে
> তার হৃদয় জাগাতে পারিনি
> অন্নপূর্ণা সাজাবার দায়ে
> গড়েছি শ্মশান চারিণী।

তিনিই আবার লিখেছিলেন অন্য কবিতা।

> আমার বিশ্বাস আজও কিছু বেঁচে আছে, তাই হব পঁচিশে বৈশাখ কিংবা বাইশে শ্রাবণে আত্মঘাতী।

মা, দেশ, বিশ্বাস, মাটি সব ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলতে থাকে কবিতা। কখনও অলোকরঞ্জন, কখনও সুনীল, কখনও অরুণ মিত্র, কি শঙ্খ ঘোষ। আর এরা সব আমার অল্প বয়সের ভগবান হয়ে আসতেন। আসতেন শক্তি। আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে। সম্পূর্ণ উলটোদিক থেকে মাকে দেখা। জন্মকে দেখা। সে এক আঁধার করা দিক। আর এই মা বলার সূত্রে আরেকজন লিখেছিলেন, মা বলে ডেকেছি তোকে, ভাষা!

> মা বলে ডেকেছি তোকে, ভাষা!
> কীর্তিনাশা জলে
> প্রতিমার মতো তোকে বিসর্জন দেব বলে
> সমারোহে!...চারদিকে বিষের কুয়াশা
> দ্বিখণ্ডিত মাতৃভূমি জ্বলে যেন রাবণের চিতা
> ভুলে গিয়েছি তাকে নিয়ে একদিন লিখতাম কবিতা...

মা তাহলে এখানে ভাষা হয়ে এলেন। গ্রাম হয়ে এসেছিল যেরকম আর কারও কাছে। মায়ের শৈশব। ভাষাকে মা ডেকে মনে পড়ে মাতৃভূমি, যা দ্বিখণ্ডিত, আর জ্বলন্ত। ভূমি. সেই যে এ আমারই সাড়ে তিন হাত ভূমি, সেই যে বিষণ্ণ আলোয় এই বাংলা দেশ...বলেছেন আরেকজন, মা থেকে সেই ভূমি, অর্থাৎ মাটির দিকে এরপর নেমে যান ভাষাকে মা বলে ডাকা কবি!

> ছত্রিশ হাজার লাইন কবিতা না লিখে
> যদি আমি সমস্ত জীবন ধরে
> একটি বীজ মাটিতে পুঁততাম
> একটি গাছ জন্মাতে পারতাম
> যেই গাছ ফুল ফল ছায়া দেয়
> যার ফুলে প্রজাপতি আসে, যার ফলে
> পাখিদের ক্ষুধা মেটে
> ছত্রিশ হাজার লাইন কবিতা না লিখে
> যদি আমি মাটিকে জানতাম

কবিতায় মায়ের শৈশব থেকে পায়ে পায়ে চলে আসে মাটি। মা থেকে চলে আসে দেশ। এসে যায় ভাষা। মাতৃভাষা।

আর এক কবি বলেন, দেশ আমাদের কোনো মাতৃভাষা দেয়নি এখনও। কী সেই কবিতা?

জঙ্গলের মাঝখানে কাটা হাত আর্তনাদ করে
গারো পাহাড়ের পায়ে কাটা হাত আর্তনাদ করে
সিন্ধুর স্রোতের দিকে কাটা হাত আর্তনাদ করে
কে কাকে বোঝাবে কিছু আর
সমুদ্রে গিয়েছ তার ঢেউয়ের মাথার থেকে হাজার হাজার ভাঙা হাড়
আলের ভিতর থেকে হাজার হাজার ভাঙা হাড়
চূড়া বা গম্বুজ থেকে হাজার হাজার ভাঙা হাড়
তোমার চোখের সামনে লাফ দিয়ে আর্তনাদ করে
সমবেত স্বর থেকে সব ধ্বনি মেলানো অকূলে
কণ্ঠহীন সমবেত স্বর
ধড় খুঁজে আর্তনাদ করে
হৃৎপিণ্ড চায় তারা শূন্যের ভিতরে থাবা দিয়ে
ধ্বংসপ্রতিভার নাচে আঙুলের কাছে এসে আঙুলেরা আর্তনাদ করেন
জলের ভিতরে কিংবা হিমবাহ চূড়ার উপরে
কে কাকে বোঝাবে কিছু আর
অর্থহীন শব্দগুলি আর্তনাদ করে আর তুমি তাই স্তব্ধ হয়ে শোনো
দেশ আমাদের আজও কোনো
দেশ আমাদের আজও কোনো
দেশ আমাদের কোনো মাতৃভাষা দেয়নি এখনও।

রক্তলাঞ্ছিত ছিন্নভিন্ন এই দেশের এক ছবি, যেখানে সমুদ্র-ঢেউয়ের মাথায় হাজার হাজার হাড়, যেখানে জঙ্গলের মাঝখানে কাটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, গাড়িবোমা আর আত্মঘাতী হানায় ছড়িয়ে থাকা শরীর, যেখানে সমবেত স্বরে ধড় খুঁজে আর্তনাদ করে, যেখানে এই মর্মান্তিক উপলব্ধিতে পৌঁছোনো যায় দেশ আমাদের কোনো মাতৃভাষা দেয়নি এখনও। আর এই আর্তনাদ হাহাকারের বাইরে যদি দু-দণ্ড চোখ ফেরাতে চাও, তাহলে, তোমার জন্যও কোনো কবিতা নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে সেখানে:

পাখিটির মাতৃভাষা চেয়ে থাকা
ত্রিজগৎ রুষ্ট যখন, ভ্রূকুঞ্চিত
পাতাহীন শিউলি ডালে একলা একা
পাখিটির মাতৃভাষা চেয়ে থাকা

একলা একা শব্দটির চেয়ে একাকী যেন আর কিছু হয় না। শুকনো ডালে একলা পাখির তাকানো যেন আমরা দেখতে পাই 'পাতাহীন শিউলি ডালে একলা একা'য় থাকা পাখিটিকে। যেন বলতে ইচ্ছে করে, চুপ, আওয়াজ কোরো না। এখুনি উড়ে যাবে।

এমন যে আশ্চর্য দেখা, যা অন্য কেউ দেখাতে পারে না, তাকেই দেখাতে পারেন কবি। আর সেই কবিকেই যখন কেউ কিছু দেখিয়ে মোহিত করে ফেলে তখন?

কী মেঘ দেখালে তুমি মেঘের আড়ালে বসে
নিজে তো দেখলে না কিছু মৃদু স্বভাবের দোষে
শিরায় শিরায় দিলে টান
চামর দোলানো মেঘে অতসী জড়িত যূথী
যদি কথা বলে উঠি, যদি গান গেয়ে উঠি
ক্ষমা কোরো স্থির ভগবান!

কে দেখাল সেই মেঘ? কে আবার, ঈশ্বর। ফের সে নাছোড় ভগবান। কী দেখাল? সেই যে 'কী মেঘ!' তাকেই দেখাল। এই মেঘ কিন্তু এক একজনের কাছে এক একরকম হতে পারে। আমার কাছে কী কেবল সেটুকুই বলতে পারি আমি। বাড়িতে এসে পড়াতেন এক মাস্টারমশাই। পাগলাটে মতো একটু। আমার থেকে মাত্র ছ-সাত বছরের বড়ো। বড়োজোর ২৩-২৪ বয়স হবে তাঁর। সেই পাগলাটে স্যার তখন এমএসসি পাশ করে বসে আছেন। টিউশান করে বেড়ান দিগ্‌বিদিকে। আর বাড়ি ভরতি বোন। বাবা নেই। নিশ্চয়ই কষ্টেই চলত সংসার। ওদিকে বাড়ির সামনে পাড়া বেপাড়ার ছেলের গাঁদি লেগে আছে সারাক্ষণ। বোনেরা বিশেষ বেরোয় না। কিন্তু একদম বেরোয় না তা নয়। আর বেরোলে, হয়তো দূর থেকে এককলি গান ভাসিয়ে দিল কোনো হতভাগা : পিন্টু ভট্টাচার্যের সেবারের পুজোর হিট : এই রাত দুপুরে দুষ্টু বাঁশি বাজে। বোনেরা না-শোনার ভান করত। কতজন বোন কে জানে। তিনজন বা চারজন। স্যারের বোনেদের জন্য নিশ্চয়ই স্যারের অনেক চিন্তা থাকত, বলতেন, রাস্তার মাথায় বাড়ি হওয়ায় বাড়ির সামনে সারাক্ষণ হট্টগোল চলে। বোনেদের পড়াশোনা হয় না। রাস্তার মাথা বলতে কী বোঝায়? স্যারেদের বাড়ির সামনে একটা ছোটো মোড়ের মাথা ছিল বটে। পুরোনো একতলা বাড়ি। একটা ছাদ। কালো রং করা দরজা। জানলাগুলো ফাঁটা। রাস্তায় যাওয়ার সময় জানলার ভেতরটা দেখা যেত তাকালে। আর তাকাত প্রায় সবাই। কতক্ষণ আর জানলা বন্ধ করে রাখবে মেয়েগুলো। স্যারের বাড়ির সামনে ছেলের জটলা বারোমাস কেন থাকে সবাই জানত। পাছে, স্যার আমাকেও সন্দেহ করেন, তাই ওদিকটায় আমি যেতাম না। একদিন, রাত আটটা নাগাদ, লোডশেডিং হয়েছে। সমস্ত টাউন অন্ধকার। আমি শর্টকাট করলাম স্যারের বাড়ির সামনে দিয়ে। জানলার দিকে চোখ পড়ে গেল। লণ্ঠন জ্বলছে। জানলার ধাপিতে বইখাতা নিয়ে স্যারের কোনো একজন বোন। ঠিক সেই মুহূর্তে কী কারণে যেন লণ্ঠনের পিছন থেকে চোখ তুলে বাইরের দিকে

তাকাল। নিশ্চয় সে, যে-অন্ধকারটায় আমি হাঁটছি রাস্তার সেই অন্ধকারকে আরও গাঢ় অন্ধকার হিসেবে দেখবে। কারণ তার চোখ তো লণ্ঠনের সামনে। আমাকে সে দেখল না কিন্তু আমি দেখলাম। শ্যামলা রং, বড়ো বড়ো আঁখিপাতা, চোখের তলায় ঘন দিঘির মতো ছায়া। সে অভ্যস্ত হাতে আঁচলটা টানল একবার। ইতিমধ্যে আমি জানলা পার হয়ে গিয়েছি। আর কেমন হয়ে গেল ভেতরটা। রাতে শুয়ে চোখ বন্ধ করলেই, লণ্ঠনের পাশ থেকে ওই তাকানো। কী দেখে ফেললাম। পরদিন সকালে আবার স্যারের বাড়ির সামনে যাওয়ার অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ। কী মেঘ দেখালে তুমি মেঘের আড়ালে বসে।

ঈশ্বর, অন্তত আমার কাছে, কোথাও না কোথাও আছেনই, নিজে তো দেখলেন না নিশ্চয়ই সেই মুহূর্তের অশনিপাত, কিন্তু পাগলামির তোলপাড় শুরু হয়ে গেল কারও বুকে। শিরায় শিরায় দিলে টান। যদি কথা বলে উঠি, যদি গান গেয়ে উঠি, ...যদি কেউ লিখে ফেলে কবিতা, যদি কেউ আঁকে রং তুলি নিয়ে ছবি, যদি কেউ ভাস্কর্য বানায় পাথরে। ওই মেয়েটিকে নিয়ে, ওই সৌন্দর্য নিয়ে, তবে ক্ষমা কোরো স্থির ভগবান। তুমি তো নিজে স্থির থেকে এইসব অঘটন মানুষ-মানুষীর মধ্যে ঘটাও। তারপর তাদের যে কী হয়। স্বাভাবিক জীবন, স্বাভাবিক সম্পর্ক, স্বাভাবিক যাপন তোলপাড় এলোমেলো হয়ে যায় প্রেমে পড়বার পর। শুধু কথা বলা, গান গাওয়া, ছবি আঁকা নয়... জীবন নিয়েই যদি একেবারে উলটোপালটা কিছু করে ফেলি, তুমি ক্ষমা করবে তো স্থির ভগবান?

আজ এত বছরের ওপার থেকে সেই কিশোরীর মুখ ভেসে উঠতেই মনে পড়ল কবি শামসের আনোয়ারের দুটি লাইন :

> লণ্ঠনের পাশে জ্বলে রয়েছে তোমার মুখ
> যেন অপর একটি লণ্ঠন

সেই ঘটনা-মুহূর্তের পর অলোকরঞ্জনই মনে পড়েছিল। আজ এতদিন পর মনে হল যেন আমার জন্যই এই দুটি লাইন জ্বালিয়ে রেখেছেন শামসের আনোয়ার।

মায়ের শৈশব থেকে দেশ গ্রাম, তার থেকে মাটি ও ঈশ্বর। আবার, ঈশ্বর থেকে প্রেম আর তার মাঝখানে মাঝখানে বিশ্বাস, ভাষা, মাতৃভাষা। এইভাবে এক লেখা থেকে কত দূরবর্তী আরেক লেখায় ছুটে যায় আমার কবিতা পড়বার স্মৃতি, এক কবির থেকে অন্য কবির কাছে গিয়ে পড়ে কবিতার রাস্তা হাঁটতে হাঁটতে, না জেনে, পথ ভুল করেই যেন বা। বাগানের একটা গাছের পাশ থেকে আর একটা গাছের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন, রাস্তার ছোটো ছোটো গর্তে জমানো রয়েছে আমাদের চোখের জল। আমাদের এই বাংলা ভাষার কবিতাও তেমনি পথে পথে, বাগানের গাছের পাতায়, ঝোপজংলার ঘাসে আগাছায় যেন জমানো রয়েছে উজ্জ্বল অশ্রুর মতো। এবার থেকে তাকে একটু একটু খুঁজতে শুরু করি?
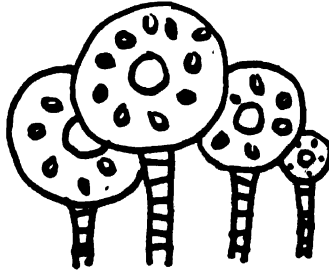
২

সেই একেবারে শুরুর বয়সে, লেখাপত্র নিয়ে যখন প্রথম নাড়াচাড়া করছি, তখন একটা কথা শুনতাম, যা এখন, এই পঞ্চাশ বছর বয়স পার করেও শুনি। তা হল, আধুনিক কবিতা দুর্বোধ্য, তা নাকি, বোঝা যায় না ঠিক মতো পিছন দিকে তাকালে দেখব, এই অভিযোগ অনেক পুরোনো। সোনার তরী লিখেও রবীন্দ্রনাথকে শুনতে হয়েছিল, এর অর্থ কী? কবিতার বোধ্য-দুর্বোধ্য ব্যাপারটা নিয়ে তখনও কথা হয়েছিল। এমনকি খানিকটা রাগারাগিও হয়েছিল। কথাটা রবীন্দ্রনাথ ও সোনার তরী বলে অনেক সহজে আজ আমরা এটা সরিয়ে রাখতে পারি মীমাংসা তো সময়ের কাছে হয়েই গিয়েছে ধরে নিয়ে। কিন্তু তখনই ভাবনা হয় যখন দেখি, বিশেষ একজন কবিকে সময় তার হৃদয়ে গ্রহণ করে নিল হয়তো, তিনি তাঁর জীবৎকাল পার হয়ে এলেনও. কিন্তু পরবর্তী যে-কবিতা লেখা হয়ে চলেছে, তার সম্পর্কেও একই অভিযোগ জারি থেকে যাচ্ছে বছরের পর বছর। একই অভিযোগ কী করে চলমান থেকে যায় লোক পালটে পালটে?

তার মানে পাঠকের হৃদয় সত্যিই কোনো কোনো কুয়াশার মুখোমুখি দাঁড়ায় নিশ্চয়, কবিতা পড়তে গিয়ে? কোথাও কোথাও তার মস্ত ধাঁধা লাগে? এ বিষয়ে কবিদের মত কেমন হতে পারে? দুই ভিন্ন যুগের দুই ভিন্ন প্রকৃতির কবির উদাহরণ দিই যদি! যে-দুর্বোধ্যতার জন্ম পাঠকের আলস্যে তাকে আমল দিতে চাননি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। আর নিজের কবিতার বই উৎসর্গ করেছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায় : 'আধুনিক কবিতার দুর্বোধ্য পাঠকের হাতে। এই দুটি উদাহরণই আমাদের সবার খুব চেনাজানা। তবে এই দুটি ক্ষেত্রেই আছে এক ধরনের প্রত্যাখ্যান। অন্তত আংশিক প্রত্যাখ্যান। যে-প্রত্যাখ্যানের সূচনা অভিমান থেকে। সে-অভিমান হল এই যে, আমি যে আমার সারাজীবনটা ঢেলে দিচ্ছি কবিতায়, ঢেলে দিচ্ছি আমার সব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, পড়বার আগে তুমি কেন আরেকটু প্রস্তুত হয়ে আসবে না? আমি আমার পক্ষে প্রয়োজনীয় যে-শব্দ ব্যবহার করব, বা যে-রেফারেন্স—তা কেন জানা

থাকবে না তোমারও? যদি জানা না-থাকে তাহলে কেন তুমি দোষ দেবে আমাকে? আর পাঠক বলবে, তুমি কবি, তুমি কেন আমার হৃদয়কে জিতে নেবে না? তুমি কবি, আমাকে সম্পূর্ণভাবে কেড়ে নেবে তুমি, অযথা, অর্ধেক আহত করে চলে যাবে কেন? এই ভাবে দুয়ের মধ্যে ফাটল তৈরি হয়। দুজনে দুদিকে সরে যান। মধ্যে পড়ে থাকে একাকিত্ব। কবিও একাকী হয়ে পড়েন। পাঠকও।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যখন লেখেন, 'সে-পাড়া জুড়োনো বুলবুলি নও তুমি / বর্গীর ধান খায় যে উনতিরিশে'—তখন ১৯২৯ সালে বিশ্বব্যাপী যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছিল তারই উল্লেখ রাখেন কবিতায়। অথবা, ধরা যাক আরও একটি খুব জানাশোনা উদাহরণ যা আছে তাঁরই বন্ধু বিষ্ণু দের কবিতায় : 'শ্রাবণসন্ধ্যার সেই মাতিস আকাশ। আকাশের আগে মাতিস কথাটা দেখে নিশ্চয়ই প্রথম পড়ার সময় ধাক্কা লাগতে পারে নতুন পাঠকের। কিন্তু একটু খুঁজলে তিনিও জেনে যাবেন যে-চিত্রকর মাতিস-এর উল্লেখ রয়েছে এখানে, তাঁর ছবির বর্ণ নিয়েছে শ্রাবণসন্ধ্যার আকাশ। বিশেষ ধরনের একটি সন্ধারং বোঝাতে গিয়ে মাতিস-এর সাহায্য নিলেন বিষ্ণু দে। আর পাঠক যেই মাতিস-এর ছবির কথা জানতে পেরে যায় তার কাছে আর দুর্বোধ্য থাকে না ওই আকাশ। বা, এই বিষ্ণু দে-ই যখন লেখেন 'কোয়ার্টেট যেন কোনও অতন্দ্রিত / অপরাজেয় গ্রোস ফুগের গান' তখন প্রথমটা অসুবিধা হয় ঠিকই। কিন্তু যখন জানা যায় কোয়ার্টেট এবং গ্রোস ফুগে পাশ্চাত্য সংগীতের দুটি বিশেষ ফর্ম, অর্কেস্ট্রায় এবং বৃন্দগান-এ এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, তখন তা আর দুর্বোধ্য থাকে না বরং সাতমাত্রার ছন্দে এই শব্দদুটি প্রযুক্ত হয়ে কেমন আশ্চর্য সামর্থ্য এনেছে কবিতায় তা জেনে আমরা মুগ্ধ হই।

অবশ্য এসব কিছু নতুন কথা নয়। সুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে-র কবিতা নিয়ে এমন আলাপ আলোচনার বয়সও আজ পঞ্চাশ পেরোল। যদি অচেনা বা অপ্রচিলিত শব্দ থাকে কবিতায়, বা না-জানা কোনো রেফারেন্স, তাহলে সেই শব্দের অর্থ বা রেফারেন্স-এর সূত্রটি জানতে পারলেই কবিতাটির সাময়িক দুর্বোধ্যতা কেটে যায়। কিন্তু আর এক ধরনের কবিতা আছে, যাকে ভেদ করা এত সহজসাধ্য নয়।

যেমন... 'পচা ধানের গন্ধ, শ্যাওলার গন্ধ, ডুবো জলে তেচোকো মাছের আঁশগন্ধ সব আমার অন্ধকার অনুভবের ঘরে সারি-সারি তোর ভাঁড়ারের নুন-মশলার পাত্র হল, মা। আমি যখন অনঙ্গ অন্ধকারের হাত দেখি না, পা দেখি না, তখন তোর জরায় ভর করে এ আমায় কোথায় নিয়ে এলি। আমি কখনও অনঙ্গ অন্ধকারের হাত দেখি না, পা দেখি না।

কোমল বাতাস এলে ভাবি, কাছেই সমুদ্র। তুই তোর জরার হাতে কঠিন বাঁধন দিস। অর্থ হয়, আমার যা কিছু আছে তার অন্ধকার নিয়ে নাইতে নামলে সমুদ্র সরে যাবে শীতল সরে যাবে মৃত্যু সরে যাবে।...

হ্যাঁ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়। এঁর আরও একটি কবিতাখণ্ড নিয়ে দেখা যাক :

...পুরোনো গলির মধ্যে মজ্জমান মাতালের হাসি
আত্মীয় বর্জিত ন্যাকড়া চোরা ছায়া কিংবা পাতকুয়ো
সাহসী বর্ষার তৈরি চটঢাকা জানালাতে ঝুল
মনে পড়ে মাকে কিংবা বাবাকে বকুল-
তলার কোন মাটি মাটি পাখিকে হারিয়ে
মা বাবা দুজনে গেছে কোন ভোরে হাটে
নেচে নেচে দুঃখ আসে তার সঙ্গে বিয়ে
জন্মের অনেক আগে ভালো বাটনা বাটে
বিচিত্র রঙের মশলা কুটনো রাখি রাশি
ব্যঞ্জনে লবণ দেয় খণ্ড খণ্ড বিদ্রুপের হাসি
সে এক মৃত্যুর হাত কানাকলসি বাজিয়ে বেড়ায়
গৃহস্থের ভাঙা দোরে ঘুরঘুরে পোকার মতো আসি
তরুণী বধূর গর্ভে, হাতে দিগ্বিজয়ী রেখাপাত...

এই যে লাইনগুলো আসছে, এর মধ্যে কোনো পরম্পরা ধরা যায় না যেন। আগের লেখাটি হল, শক্তির বিখ্যাত জরাসন্ধ, কিন্তু এ লেখাটি তেমন পরিচিত নয়। স্রোতের মতো· এসে পড়ছে কবিতার শব্দ চিত্র উপমাগুলো। যেন প্রত্যেকটিই আকস্মিক। প্রথম লেখাটিতে যে রয়েছে পচা ধানের গন্ধ, শ্যাওলার গন্ধ বা ডুবো জলে তেচোকো মাছের আঁশগন্ধ যারা মা-র ভাড়াঁর ঘরে রাখা সারি সারি নুনমশলার পাত্রে রূপান্তরিত হল, অথবা, অথবা রয়েছে যে আমার যা কিছু আছে তার অন্ধকার নিয়ে নাইতে নামলে সমুদ্র সরে যাবে শীতল সরে যাবে মৃত্যু সরে যাবে—এইসব লাইনে বিশেষ কোনো শব্দের অর্থ জানতে পারলে কবিতাটি ধরা দেবে সে সুযোগ নেই। কারণ তেমন কোনো শব্দ অথবা রেফারেন্স ব্যবহার করা হচ্ছে না এখানে। এখানে তৈরি হচ্ছে একটি আবহাওয়া। এই পুরো আবহাওয়াটাই রহস্যমণ্ডিত। কুয়াশাচ্ছন্ন। এই রহস্যকুয়াশার মধ্যেই কবিতাটির আত্মা বিচরণশীল। 'জন্মের অনেক আগে ভালো বাটনা বাটে' অথবা 'সে এক মৃত্যুর হাত কানা কলসী বাজিয়ে বেড়ায়' বলে কয়ে এর কী অর্থ করবেন আপনি? আবার সে এক মৃত্যুর হাত লাইনটিতে অব্যর্থভাবে শক্তির চরিত্র লক্ষণ উপস্থিত। যেমন এর পরেই 'গৃহস্থের ভাঙা দোরে ঘুরঘুরে পোকার মতো আসি / তরুণী বধূব গর্ভে, হাতে দিগ্বিজয়ী রেখাপাত', এখানে একদিকে যদি শক্তির সেই অবধারিত শরক্ষেপ অন্যদিকে তরুণী বধূর গর্ভে লাইনটিতে অমোঘ সৌন্দর্যের রচনা।

এসব ক্ষেত্রে স্পষ্ট একলক্ষ্য কোনো অর্থভেদ করার আশা ভুল। পুরো আবহটিই কবি ঢেলে দিচ্ছেন নিজেকে উজাড় করে, পুরো আবহটিকেই পান করতে হবে পাঠককে।

পাঠক যদি এমন কবিতার সামনে পড়ে তার অর্থ ভেবে প্রাথমিকভাবে অসহায় বোধ করেন তাহলে বলতেই হবে এক্ষেত্রে কবিও কিন্তু অসহায়। কেন না কবিতার মধ্যে যে রহস্যআবহ তৈরি হয়, সেই রহস্য আসলে তাঁর চেতনার মধ্যগত রহস্য। তাকে অবিকল

ভাষায় ঢেলে না-দিয়ে তাঁর উপায় ছিল না। শক্তি ছিলেন সেই শ্রেণির কবি, তীব্র প্রেরণা দ্বারা এক ধরনের আচ্ছন্ন অবস্থায় পৌঁছোতেন কবিতা রচনাকালে। অন্তত তাঁর প্রথম যুগের অজস্র কবিতায় তার চিহ্ন পাওয়া যায়। আমি প্রথম দিকের দুটি রচনার আশ্রয় নিয়েছি এখানে। যখন কবি ঢেলে দিতে থাকেন তার চেতনার ধারাকে অনেক সময়, রচনাকালেও, তাকে কোনোভাবে বাধা দেওয়া বা সংশোধন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ তিনি যে সেই স্রোতটির দ্বারা গ্রস্ত, তাড়িত, নিরুপায়। হয়তো এজন্যই একবার তিনি লিখেছিলেন এই ধরনের একটা কথা, 'সোনার মাছি খুন করেছি'-র ভূমিকায় সম্ভবত, যে, কবিতায় পরিমার্জনা তিনি পারতপক্ষে স্বীকার করতে চান না। বরং চিত্র ও সংগীতময় পঙ্‌ক্তি যেমনভাবে আসে সেইভাবেই তাদের কাগজের ওপর বসিয়ে নিশ্চিন্ত।

এ অবস্থা কেন হয়? অনুমান করি, কবিতা রচনা কালে অনেক সময় কোনো কোনো কবি একটি বিশেষ নিবিষ্ট অবস্থায় পৌঁছে যান। ফলে, তখন, অবচেতনার জাগরণ হয়।

একজন কবি কবিতা লেখেন প্রধানত তাঁর জীবনযাপন থেকে। এই জীবন কেবল ব্যক্তিগত জীবন নয়, চারপাশের সমাজ সংসার ঘটনা দুর্ঘটনা কেবলই মিলেমিশে তাঁর অভিজ্ঞতা গঠন করে চলেছে, যেভাবে ভূত্বক গঠিত হয়, সেইভাবে। এই জীবনকে ধরতে পারি ২৪ ঘণ্টার যাপিত সময়টি দিয়ে ভাগ করে। একটির পর একটি ২৪ ঘণ্টার দিন যুক্ত হয়েই তো তৈরি হয় জীবন। এই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অন্তত ১৭/১৮ ঘণ্টা আমরা প্রত্যেকেই সচেতনভাবে নানা কাজকর্ম করি। অফিস যাওয়া, মানুষের সঙ্গে মেলামেশা, বইপড়া, নারী বা পুরুষের নারী বা পুরুষ সংসর্গ, আরও বহুবিধ দরকারি অদরকারি ক্রিয়া আমরা সম্পন্ন করি সচেতন অবস্থায় থেকে। রাতে, ঘুমোতে যাই। ঘুমোলে স্বপ্ন দেখি। সেই স্বপ্নে কিন্তু নানারকম আশ্চর্য ও উদ্ভট জিনিস ঘটতে দেখি প্রতিদিনই। সকালে উঠে তাদের মনে করতে পারি না অনেক সময়, কিন্তু অভিজ্ঞতাটি আমাদের চেতনার মধ্যে কোথাও থেকেই যায়। স্বপ্নের মধ্যে উদ্ভট অসম্ভব যে ক্রিয়াগুলো ঘটতে দেখি তার কোনো বাইরের থেকে পাওয়া স্পষ্ট যুক্তি নেই। উলটোদিকে, সচেতন অবস্থায়, ১৭/১৮ ঘণ্টার জাগ্রত সময়টিতে যা যা করি যুক্তিতে তার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। স্বপ্নের ভেতরকার কাজগুলির কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা আমরা সাধারণভাবে বেশিরভাগ সময়ই পাই না। অর্থাৎ, আমরা চাই বা না-চাই, ২৪ ঘণ্টার একটা অংশ আমরা গভীর অবচেতনের সঙ্গে কথা বলে কাটাই। অবচেতনার সঙ্গ পাই, প্রত্যেকদিন, কিছু সময়ের জন্য হলেও। সেটি আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে থেকেও যায়।

এইবার, কবি যখন কবিতা লেখেন তখন তো জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে তিনি তার পুরো অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারটি ব্যবহার করেন। ব্যবহার করেন বললে, যেমন একটা সচেতন প্রয়োগের কথা ধারণায় আসে ব্যাপারটা সবসময় ঠিক সেরকম হয় না। রচনাকালে অনেকক্ষেত্রে তেমন সচেতনতার বদলে একটি অতি-নিবিষ্টতার মধ্যে তিনি চলে যেতে পারেন। তখন স্বপ্নের স্রোতের মতো অবচেতন জেগে ওঠে কোথাও কোথাও। বিশেষভাবে

শক্তির সম্পর্কে এ কথা আরও সত্য কারণ সেই তথ্যটি সকলেরই জানা, যে মদ্য তাঁকে পদ্যের কাছে দ্রুত নিয়ে যেতে পারত। নেশা দ্বারা একটি আচ্ছন্নতার অভিজ্ঞতা শক্তি নিয়মিতই গ্রহণ করতেন। প্রথম জীবনে, তাঁর কবিতায় তাই দেখা দিয়েছিল অবচেতনার শক্তিশালী উদ্ভাসন।

স্বপ্নের একটা সুবিধে হল, স্বপ্নের দ্বিতীয় দর্শক নেই। আমার স্বপ্ন আমিই দেখব। মানে বোঝানোর দায় নেই। কবিতার দ্বিতীয় দর্শক আছে। পাঠক। যে কিছু বিমূঢ় বোধ করতে পারে স্বপ্নচালিত রচনার সামনে দাঁড়িয়ে। তারপর সে বোঝে, কবি তাঁর সমস্ত চেতনাকে উজাড় করে দিয়েছেন। আমিই কি আমার নিজের মন সম্পূর্ণ জানি? জানলে, স্বপ্ন দেখে ভোরে ঘুম ভাঙলে এত অবাক হই কেন? আমিও তো আমার চেতনাকে জানি না পুরোটা। আর কবি, বিশেষত শক্তির মতো কোনো কোনো কবি, কেবল নিজের সচেতন অংশটুকুই নয়, চেতনার না-জানা অংশটুকুও মুক্ত করে দেন নিজেব কবিতায়। তখন তাকে কি দুর্বোধ্য বলে উপেক্ষা করতে পারি?
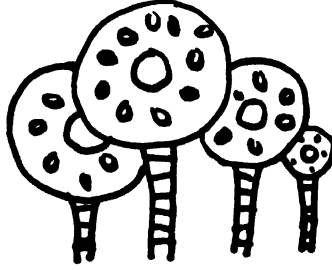
৩

সকল ভাষাই কবিতার ভাষা। সব ধরনের ভাষাই কবিতায় ব্যবহার করা হয়। কবিতায় ভাষা ব্যবহারের কোনো ছুতমার্গও অনেকদিনই নেই। তবে এইটুকু শুধু দেখার যে, কবিতাটি উত্তীর্ণ হল কি না এবং উত্তীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে কখনোই প্রায় সকল পাঠক একমত হন না।

কবিরা অনেক সময়ই অনেক কিছু লুকিয়ে রাখেন তাঁদের কবিতার ভাষার মধ্যে। এই লুকিয়ে রাখা জিনিসগুলি পরে পাঠক খুঁজে নেবেন—এমন বিশ্বাসে। জানকী যেভাবে তাঁর গহনাগুলি অরণ্যপথে ফেলতে ফেলতে গিয়েছিলেন, সে ভাবে। ধরা যাক শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'যেতে পারি, কিন্তু কেন যাব?'—কবিতাটির কথাই। কবিতাটি শুরু হচ্ছে এইভাবে :

> ভাবছি, ঘুরে দাঁড়ানোই ভালো।
>
> এত কালো মেখেছি দু'হাতে
> এতকাল ধরে
> কখনও তোমার করে তোমাকে ভাবিনি।

কবিতাটি যেন মাঝখান থেকে শুরু হয়। যেন, কবিতাটি শুরু হওয়ার আগেও অনেক কিছু আছে এতক্ষণ বা এতদিন, বুঝি এত কিছু সহ্য করার পর, একজন ভাবল—'ভাবছি, ঘুরে দাঁড়ানোই ভালো'। এই 'ভাবছি-'র পরে কমা, যেন ছুটতে ছুটতে অনেকটা এসে একজন পা মাটিতে রেখে দাঁড়াল, দম নিল, ঘুরে দাঁড়াবার কথা ভাবল। পরে আবার আছেও সে কথা। এতকাল ধরে এত কালো দু-হাতে মাখার কথা। কিন্তু, প্রথম লাইনেই মনে হয়, কবিতাটি যেন মাঝখান থেকে শুরু করা। আগের অংশ না-বলা রইল। এমন লিখেছিলেন ভাস্কর চক্রবর্তীও।

'এবং বীণাদির কথা আর নাই বা লিখলাম।' কবিতা শুরু হচ্ছে এই ভাবে। পুরো কবিতাটিতে আর কোথাও বীণাদির কথা এল না। কবিতাটি যেন শুরু হল মাঝখান থেকে। এই 'এবং' কথাটি শুরুতে থাকায় বোঝা যায়, পূর্বে যেন কয়েক পরিচ্ছেদ পাব করে তবে শুরু হল এই কবিতা। এই যে কথা লুকিয়ে রাখা, এই লুকিয়ে রাখা কিন্তু একটি বড়ো সৌন্দর্য কবিতার ভাষার ক্ষেত্রে। শঙ্খ ঘোষের একটি কবিতা দেখা যাক।

ঘর, বাড়ি, আঙিনা।
সমস্ত সন্তর্পণে ছেড়ে দিয়ে মামিমা
ভেজা পায়ে চলে গেল খালের ওপারে সাঁকো পেরিয়ে

ছড়ানো পালক, কেউ জানে না!

কবিতার নাম 'রাঙা মামিমার গৃহত্যাগ'। চলে যাওয়ার লাইনটি দীর্ঘতম। 'ভেজা পায়ে' শব্দদুটির মধ্যে রয়ে গেল চলে যাওয়ার বেদনা ও কারণ। হয়তো, কোনো সামাজিক কলঙ্ক। কোনো গোপনতাকে আরও গোপন করা। একটি ছোটো গল্প কবিতাটির মধ্যে লুকিয়ে আছে। শেষ লাইনের আগে আছে একটি অমোঘ স্পেস-এর ব্যবহার। আমাদের জীবনেও. আমরা চারপাশে প্রতিবেশীর, আত্মীয়ের, বন্ধুর জীবনে এমন ঘটনা কখনো-কখনো ঘটতে দেখি, যার কোনো কারণ আমরা শেষ পর্যন্ত জানতে পারি না। কোনো মানুষ হারিয়ে যায়। আমরা জানতে পারি না, কেন সে হারিয়ে গেল। একটি অমোঘ স্পেস বা শূন্যস্থান তার চলে যাওয়ার কারণটি ঢেকে অবস্থান করে। সে ছিল। আজ তাকে দেখি না। মধ্যে আর কিছু নেই। শূন্যতা শুধু। কেউ জানে না, সেই শূন্যতার মধ্যে কী কারণ চাপা পড়ে রইল।

ছোট্ট এই কবিতার মধ্যে শুধু সংসারের টান-বাঁধন ছিঁড়ে বধূটির চলে যাওয়ার কথা বর্ণনা করা লাইনটিই সবচেয়ে লম্বা। গোপন এই চলে যাওয়া স্বাভাবিক ভাবেই লুকোনো অনেক প্রস্তুতি ও যন্ত্রণার শ্রম বহন করে! যেতে যেতেও কত পিছুটান যে টেনে রাখছে! কবিতার ছন্দে তাও ধরা পড়ছে। ভেজা পায়ে / চলে গেল / খালের ও / পারে সাঁকো / পেরিয়ে—চারমাত্রার ছোটো ছোটো পর্বে পর্বে ধাক্কা খেতে খেতে লাইনটি চলেছে, আবার ধাক্কাগুলি এত উচ্চকিত নয় যে, সকলের কাছে জানাজানি হয়ে গতিরুদ্ধ করে দেবে। চলে যাওয়াটি যেমন সন্তর্পণে, সাবধানে ঘটছে, কাউকে জানতে না-দিয়ে—ছন্দের পর্বে পর্বে ধাক্কাগুলিও তেমনই গোপনভাবে উপস্থিত আছে। নানা ধাক্কা সহ্য করে নিয়ে জীবন যেমন তার অবধারিত পথে চলে যায়, এ যাওয়াও তেমনই।

ছোট্ট একটি বাক্যে কবিতাটি শুরু। 'ঘর, বাড়ি, আঙিনা'—এই বাক্যটির মধ্যে ভরা সংসারের কথা বলা রইল। 'আঙিনা' কথাটির মধ্যে রইল প্রতিবেশীরাও। তার পরের দুটি লাইন ক্রমদীর্ঘতর হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। দীর্ঘতম লাইনটির পর বুকভরা এক দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে দেওয়ার শূন্যতা যেন। তারপর চলে যাওয়ার ছড়িয়ে থাকা চিহ্নগুলি। আর, না-জানা। সেই না-জানা।

না-জানা, না-বলা দিয়েও তৈরি হয় কবিতার ভাষা, অনেক সময়। কবিতায় ব্যবহৃত স্পেসও কিন্তু কবিতার একটি ভাষা। কখনো-কখনো কবি শূন্যতাকে দিয়ে কথা বলান। কখনো-কখনো কবি লুকিয়ে রাখেন ছোট্ট ছোট্ট জিনিস। যেভাবে ম্যাজিশিয়ান হাতের আস্তিনে লুকিয়ে রাখেন তাস। যেমন বিষ্ণু দে লিখছেন : 'বেগার্ত নদীর বাঁক, নর্তকের পেশিবহুলতা।' একটি উদ্দাম নদীর বর্ণনা। যে-নদী নিজের বেগে আর্ত, নদী আপন বেগে পাগলপারা-ও অন্য কে যেন বলেছিল। সে তো আবার সবই বলে দিয়ে গিয়েছে। ওটুকু ধরে আর কী হবে! আবার বিষ্ণু দে-র মতো তাঁর কাছ থেকে অবিরল ভাবে নিয়ে সেই নেওয়াটাকে নবরূপে ফিরিয়েই বা দিয়েছে কে? এইখানে প্রসঙ্গের একটু বাইরে গিয়েও না বলে পারছি না, বিষ্ণু দে-র একটি সনেট আছে যার নাম : 'রবীন্দ্রনাথের কোন লেখা অভিভূত করেছিল?' হ্যাঁ, এইটা নাম। বইটা সামনে নেই কিন্তু যত দূর মনে পড়ছে, কবিতাটির শিরোনামে জিজ্ঞাসার চিহ্ন আছে, ঠিক যেমন শক্তির 'যেতে পারি, কিন্তু কেন যাব?'-র শিরোনামে আছে। বিষ্ণু দে-র এ লেখা কীভাবে শুরু হচ্ছে? এর প্রথম আট মাত্রা হল: 'এ প্রশ্নের কী উত্তর?'

ঠিক। এ প্রশ্নের কোনো উত্তর বিষ্ণু দে-র কাছে ছিল না। মানতেই হবে আমার কাছেও নেই। রবীন্দ্রনাথ সবটুকু নিয়ে এত বিরাট, যে আমাদের হাতের সাধারণ মাপকাঠি দিয়ে তার কোনটুকু অভিভূত করে বা কোনটা করে না, তা মাপতে যাই না। যা হোক, বিষ্ণু দে তো লিখলেন 'বেগার্ত নদীর বাঁক', তারপরে যোগ করলেন 'নর্তকের পেশিবহুলতা'। এখানে নদী পুরুষ। বেগে আর্ত তার ওই বাঁক, যেন পুরুষ নাচিয়ের শরীর। 'পেশিবহুল' কথাটা অনায়াসে ব্যবহার করলেন অথচ মোটেই খারাপ শোনাল না কেন, এটা আমি ভেবে পেতাম না। দেখি, ঘুরছি ফিরছি আর থেকে থেকে মাথায় ঘুরছে—'বেগার্ত নদীর বাঁক, নর্তকের পেশিবহুলতা।' পরে, একসময় মনে হল, খটমট ওই 'পেশিবহুল' শব্দটা কিছুতেই ব্যায়ামবীরের গুলি ফোলানো শারীরিক আস্ফালন মনে করাচ্ছে না, বরং একরকম লাবণ্য আনছে। নর্তকের শরীরে তো একটা লাবণ্যই আছে, তাঁর পেশি তো নাচের বিভঙ্গে ঢেউ খেলায়, যেমন ঢেউ খেলাচ্ছে বেগার্ত ওই নদীর বাঁক। ওমুক শ্রী তমুক শ্রী হওয়া পালোয়ান-দেহের কাঠখোট্টা ভাব তো তার নয়। এই লাবণ্য কবিতার লাইনে কী করে এল 'পেশিবহুল'-এর মতো শব্দের প্রয়োগ সত্ত্বেও? একটা সহজ উত্তর হল 'নর্তকের' কথাটা তো রয়েইছে।

রয়েছে, কিন্তু পেশিবহুলের কঠোরতাও তো আছে। এই কঠোরতাকে লাবণ্যে রূপান্তরিত করা হল একটি 'তা' যোগ করে। 'পেশিবহুলতা'। ফলে, নিজেদের অজান্তে, লক্ষ না-করেই আমরা লাইনের মধ্যে 'লতা' কথাটি উচ্চারণ করলাম। যতবার লাইনটি বলব, অজান্তে 'লতা' কথাটি বলব। 'লতা' শব্দটিকে এখানে লুকিয়ে রেখেছেন কবি, অথচ আমাদের দিয়ে বলিয়েও নিচ্ছেন। নর্তকের নৃত্যপর শরীরে লতার ভঙ্গিমাও থাকে। কঠোরতা আর কোমলতা, রমণীয়তা আর পৌরুষ, একই মুঠোয় ধরা পড়ল এখানে! পাঠকের এই বিস্ময়

অবশ্য বেশিক্ষণ বিস্ময় থাকে না, যখন মনে পড়ে শিল্প আর প্রকৃতি এই দুয়ের মধ্যেই অর্ধনারীশ্বরের প্রতীক বারবার খুঁজে এনেছেন বিষ্ণু দে। এ যেন তাঁর ধারাবাহিক চিন্তা-কাজেরই একটুকরো প্রতিফলন।

কবিতার ভাষা নিয়ে বলতে গিয়ে আরও একটি কবিতার কথা মনে পড়ছে। আমাদের রোববারের 'নবান্ন' সংখ্যা বেরবে। অনিন্দ্য বিপুলদার সঙ্গে আলোচনা করবে 'নবান্ন' সংখ্যায় কী কী থাকবে। অনিন্দ্যর কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ আমার মনে এল শক্তির একটা কবিতা।

হলুদ শস্যের মধ্যে হাত পেতে রয়েছে দাঁড়িয়ে
একা লোকটি, হাত পেতে দাঁড়িয়ে রয়েছে
হলুদ শস্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে
সারাদিন।
অন্নপূর্ণা, অন্ন দাও—বলে সেই
যোজনবিস্তৃত
মাঠে একা দাঁড়িয়ে রয়েছে—
পূর্ণ হয়ে যায় তাব শূন্য করতল

নবান্ন প্রসঙ্গে এই কবিতাটি আমার মনে আসায় আমি অবাক। এতদিন তো এই কবিতাটি থেকে আমার মনে আসত ভ্যান গখের ছবি। সেই শস্যবীজ ছড়ানো চাষির ছবি। এক হাত দিয়ে বুক-পেটের সামনে আঁকড়ে ধরা বীজপাত্র, অন্য হাতের মুঠোয় ভরা বীজ, ছড়ানোর জন্য বিস্তীর্ণ প্রান্তর, মুঠো একটু বাঁকানো, পূর্ণ সূর্যালোকে জ্বলছে চরাচর।

সেই মাঠে মাঠে শস্যবীজ মুঠো করে ছড়িয়ে দেওয়ার ছবিটি কেন মনে আসত আমার? 'একা লোকটি—' এই শব্দটির জন্য নিশ্চয়। জ্বলজ্বলে হরিদ্রা আভার সেই ছবি নবান্নে পৌঁছোল কী করে? যদিও তার দু-হাত ছড়ানো নয়, তবুও বীজ-ছড়ানো একটি হাতের প্রসারণ আর ভ্যান গখের বিখ্যাত উজ্জ্বল হলুদের মাঠময় বিস্তার-ই হয়তো আমার মনে কবিতাটির সঙ্গে ছবিটিকে মিলিয়ে দিয়ে থাকবে। কবিতা থেকে ছবিতে মন কখন কোন ভাবে যায়, নিজে জানতে পারি না। নবান্ন কথাটি থেকে ওই কবিতা মনে পড়তে আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠে রোববারের দফতর থেকে তিনতলায় ফিরছি পুরো কবিতাটি উচ্চারণ করতে করতে—'অন্নপূর্ণা, অন্ন দাও' কথাটি মন্ত্রের মতো বেজে উঠতে লাগল আমার মনে মনে, নিঃশব্দ আবৃত্তিতে। কী আশ্চর্য! এই তো সেই সূত্র! 'অন্নপূর্ণা, অন্ন দাও'—এই মন্ত্রটির প্রয়োগ মুহূর্তে কবিতাটিকে ভ্যান গখের ছবির নিসর্গ থেকে এদেশের নবান্নে নিয়ে এসেছে। এই হল কবিতার ভাষা। ধান দোলানো হলুদ মাঠে একাকী লোক—আর ভ্যান গখের ছবির চাষি একাকার হয়ে রইল। 'দাঁড়িয়ে রয়েছে'—এই কথাটি পরপর তিন লাইনে ব্যবহৃত হয়েছে। তাতে লোকটির দীর্ঘক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকাটা প্রকাশিত হচ্ছে। এই তিন লাইনের পরেই কবিতার ক্ষুদ্রতম লাইনটি আসে যাতে মাত্র একটি শব্দ : 'সারাদিন'।

'সারাদিন' বলতে কারও হয়তো দিনের শেষবেলা মনে হতে পারে। অর্থাৎ সারাদিন

পার হয়েছে, শস্যেও হলুদ আলো, যেন অপরাহ্ণ এসে পড়ল। কিন্তু আমার 'সারাদিন' শব্দটি থেকে দ্বিপ্রহরের মধ্যবিন্দু মনে আসে। দুপুরের একেবারে মাঝখানে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটি। চারিদিকে রোদ্দুরের আভায় যেন রাশিদ খানের কণ্ঠের শুদ্ধ সারঙ-এর বিস্তার পূর্ণ তেজে ছড়িয়ে পড়ছে। একেবারে সারঙের সময় বলেই আমার মনে হয় এই কবিতার সময়টিকে। তার মধ্যে যে একা লোকটি, সে তো চাষি বটেই। সে তো কৃষক। কিন্তু সে কি শেষ পর্যন্ত এক কবিই নয়? কবিই তো, ওই একা লোকটি। বীজ ছড়ানোর কাল আর হলুদ শস্যের মাঠময় জেগে ওঠবার কাল যে আলাদা, অথচ দুটি সময়কেই, দুই ছবিকেই একাকার করে মনে আরও একটা ছবি টেনে আনল সেই যে একা মাঠের লোকটি, সে কবি ছাড়া আর কে? চুপিচুপি বলে রাখছি, এই লোকটিই কিন্তু 'সোনার তরী' কবিতায় অন্য চেহারায় অন্য গল্প নিয়ে দেখা দিয়েছিল। এই কবিই নাকি চাষি। সেখানে সে বলেছিল, 'যাহা ছিল নিয়ে গেল'—এখানে বলছে, 'পূর্ণ হয়ে যায় তার শূন্য করতল'। যাঃ। তাই হয় নাকি? সেখানে তো নদী ছিল, নৌকো ছিল, এখানে তো সে সব নেই। তাহলে? তা আমি জানি না। কেউ তর্ক করতে এলে আমি পালাব। কিন্তু আমার কাছে ভ্যান গখের ছবির চাষি, সোনার তরী যাকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যায়নি, সেই লোকটি, হলুদ শস্যের মধ্যে হাত পেতে দাঁড়ানো শক্তির কবিতার নিঃসঙ্গ মানুষ, শুদ্ধ সারঙ রাগ যিনি তৈরি করেছিলেন, সেই প্রাচীন সংগীতজ্ঞ, যাঁর নাম আমার অজানা—সবাই, সকলেই এক। এই কবিতার শেষে এসে মাঠ যখন যোজনবিস্তৃত মাঠ হল, তার মধ্যে যেন আবহমান সময় ও দেশ ধরা পড়ল। ওই মাঠ তখন চিরকালের মাঠ। অবশ্য সবারই যে এইটুকু এক কবিতা পড়ে এমন সব মনে হবে, তার মানে নেই। এক এক জনের মন কবিতায় এক এক রকম ভাবে চলে। আমার মন যেমনটা চলে, তেমনটাই বলি।

৩

ওই যে একাকী মানুষ যে মাঠে করতল পেতে দাঁড়িয়েছে, যে সম্ভব করেছে সুর, ছবি, ভাষার নতুন সৃষ্টি, সে তো আসলে শিল্পী। সেই শিল্পীর ভিতরঘরে যখন আঘাত আসে, কীভাবে তার মুখোমুখি হন শিল্পী? অলোকরঞ্জনের একটি কবিতায় তার একরকমের বিবরণ ধরা আছে।

> ফিরে এসে দেখি দেওয়ালে ফাটল, ফুটো
> আমি জানি কোন ছিঁচকে চোরের দল
> চুরমার করে দিতে এসেছিল, পারেনি।
>
> এই অবকাশে ঝোপের আড়াল থেকে
> দু-ডজন ফেউ 'পরাভববাদী' ডেকে
> আমাকে আমার অকৃতার্থতা জানালো।

সঙ্গে সঙ্গে ফুটো ও ফাটলগুলি
নানা নকশায় প্রসারিত করে তুলিঃ

সারা ঘর শুধু জানালা জানালা জানালা...

'ফিরে এসে দেখি...'—হয়তো কোথাও গিয়েছিলেন শিল্পী নিজের অন্দর অরক্ষিত রেখে। সেই সুযোগে কারা এসে যেন চুরমার করে দিতে চেষ্টা করেছিল তাঁর ভিতর-দেওয়াল। অন্যায় আঘাত করেছিল। সেই আঘাতদাগ লেগে আছে। ফাটল দেখা দিয়েছে যদিও, তারা ভেঙে ফেলতে পারেনি।

আমাদের যে-কোনো ব্যক্তিগত আঘাত আর ব্যক্তিগত নয়—সেই আঘাতের খবর দ্রুত সমাজের মধ্যে, পড়শিদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তারা আমাদের দুয়ো দেওয়ার জন্য, আমাদের আঘাত নিয়ে হাসবার জন্য তৈরি। তারা আমার আঘাত পাওয়া নিয়ে আনন্দ করে আমাকেই আমার ব্যর্থতার হিসাব জানাবে।

তখন শিল্পীর কাজ কী?

ওই মূল আঘাতে যেসব ফাটল ধরেছে, আর সকলের বিদ্রুপ থেকে যে চিড় ধরেছে, সেইসব চোট আঘাতগুলিকেই শিল্পী তাঁর বিষয় করে তুলবেন। ফুটো ও ফাটল, তাতে যন্ত্রণা লেগে আছে। তবু সেইসব আঘাতগুলিকেই ব্রাশে-তুলিতে-ছেনিতে-বাটালিতে আরও বড়ো করে আরও প্রসারিত করে দেওয়া নানা কারুকাজ, নানা নকশা বেরিয়ে এল ওই সব ফাটল থেকে। তার ফলে দেওয়ালে যে ফাটল-ফুটো তৈরি হয়েছিল, তারা রূপান্তরিত হল জানালায়। 'সারা ঘর শুধু জানালা জানালা জানালা...'।

তিন লাইনের তিনটি স্তবক কবিতায়। প্রথম তিনটি লাইনের মধ্যে কোনো মিল দেওয়া হয়নি। প্রথম তিনটি লাইনে প্রধানত শিল্পীর ভিতরঘরে আঘাত আবিষ্কার করার বিমূঢ়তা। কেবল ক্ষতির পরিমাণ দেখা। সবটাই ছেঁড়াফাটার কথা। বিচ্ছিন্নতার কথা, বিশ্বাস থেকে ছিন্ন হওয়ার কথা। তাই যেন মিল স্বাভাবিক ভাবেই আসেনি। কারণ কিছুই তো মিলছে না এখানে, সব ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় স্তবকে 'দু'ডজন ফেউ'-এর কাছ থেকে অপমান বা সমাজের দেওয়া অপবাদ সহ্য করছেন শিল্পী। সহ্য করছেন মানে, এই তো এক্ষুনি শান্তভাবে, যেন একটু দূর থেকেই তার বিবরণ দিলেন। সহ্য করছেন মানে, নিজেকে ইতিমধ্যেই কিছুদূর গুছিয়ে তুলতে পেরেছেন। প্রথম স্তবকে যে অপ্রত্যাশিত আঘাত আবিষ্কারের অবস্থা, তা যেন সরে গিয়েছে একটু। সংগতি ও আস্থা একটু যেন ফিরে পাচ্ছে মন। ফলে, মিল এসেছে দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম দুটি লাইনে। তিন নম্বর লাইনটি এখনও মিল ছাড়া।

তৃতীয় স্তবকে এসে নিজেকে পুরোপুরি ফিরে পাচ্ছেন শিল্পী। প্রথম স্তবকের শেষে 'চুরমার করে দিতে এসেছিল, পারেনি'—এই লাইনের শেষে 'পারেনি'র 'ই' ধ্বনির মধ্যেই প্রতিরোধ দাঁড় করানো ছিল। এখন এই তৃতীয় স্তবকে নিজের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন

শিল্পী। ফুটো ও ফাটলগুলি যদিও যন্ত্রণাময়, তবুও তার মধ্যে তুলি ডুবিয়ে ফাটলকে নানা নকশায় আরও বেশি ফাটিয়ে শিল্পে প্রসারিত করছেন। তারপর কী? তারপর সারা ঘর শুধু জানালা। জানালা, যা দিয়ে দেখা যায়, নিজের আঘাতের বাইরেও অন্যকে, দূরকে দেখা যায়। দেখবার একটি পথ হল জানালা। আঘাতের মধ্য দিয়েই অনেক সময় জানলা প্রস্তুত হয়। বা একসময়ের আঘাত পরবর্তীকালে জানলা হয়ে ওঠে। আর শিল্পী বা কবি তো দ্রষ্টা। জানালাই এখানে যেন চোখ।

শেষ লাইনটিতে সব আঘাত জয় করার পর শিল্পীর সেই যাত্রা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে। তাই, শেষ লাইনটিকে বোধহয় অন্তিম স্তবক থেকে আলাদা রাখা হল। যদিও তিন লাইনের তিনটি স্তবকেই এই কবিতা ধৃত, তবুও শেষ লাইনের গতি অকস্মাৎ বেড়ে যায় যেন এই জয়ের আনন্দেই—তাই তাকে আলাদা করে রাখা—ছ-মাত্রার এই কবিতা একেবারে শেষে পৌঁছে চলল যেন তিন মাত্রার দ্রুত পদক্ষেপে।

প্রথম তিন লাইনে কোনো মিল নেই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকে মিল পড়েছে এইভাবেঃ থেকে / ডেকে / জানালো—এবং—তুলি / ফাটলগুলি / জানালা। দ্বিতীয় স্তবকের শেষ লাইনটি 'ও' ধ্বনিতে পৌঁছেছে। 'অকৃতার্থতা জানালো'। আমার না-পারার কথা বলে, অপবাদ দিয়ে আমাকে বিদ্রুপ করছে দু-ডজন ফেউ। সেই দুঃখে ও অপমানে মন বন্ধ হয়ে আছে। মন আঘাত পেলে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় অসাড় ও বন্ধ হয়ে থাকে। এখন, অর্থাৎ দ্বিতীয় স্তবকের শেষেও মন কাজের দিকে খোলেনি। কারণ, অপবাদ জানানো হচ্ছে। 'জানালো'-র 'ও' ধ্বনিতে সেই গোল, বন্ধ করা ভাব ফুটেছে।

আর নানা নকশায় যখন শিল্পের দিকে প্রসারিত করলাম আঘাতে প্রাপ্ত ফাটলগুলি, তখন সারা ঘরে শুধু জানালা, কারণ জানালা যেমন খোলা—'আ' ধ্বনিটিও তেমনি খোলা, মুক্ত। শিল্পীর উত্তর তো কলহ নয়, বরং শিল্পের মধ্য দিয়ে সেই উত্তর যখন উচ্চতর মাত্রায় উত্তীর্ণ হয় তখন 'আ' ধ্বনিতে খুলে গেল জানালা। 'আ' বললেই যেন সুর লেগে যায়। সত্যিই, শেষ লাইনটিতে পৌঁছে যখন 'জানালা' শব্দটি তিনবার আসে, মনে হয় ঘরের সব জানালা খুলে যাচ্ছে। মনে হয়, দিকে দিকে সকাল হচ্ছে যেন। তানপুরা হাতে পরভিন সুলতানা তাঁর 'ভবানী দয়ানী' ধরেছেন ভোরবেলার কোন প্রান্তে বসে। আকাশ থেকে ভৈরবীতে খুলে যাচ্ছে আলো। পরপর তিনবার দ্রুত জানালা যখন আসে, তখন তৃতীয় 'জানালা' টির 'আ' ধ্বনি আসা মাত্র যেন দিকদিকন্তে ছড়িয়ে যায় : প ধা সা ঋ সা... এই 'সা' যেন ছড়িয়ে যায় গাছের মাথায় মাথায়।

'জানালো'র সঙ্গে 'জানালা'র এই গোপন কিন্তু আশ্চর্য মিল একটি জানালাই খুলে দিল। আরও মজার কথা, কবিতার মধ্যে এই মিলটি প্রথম বা দ্বিতীয় পাঠেও হয়তো চোখে পড়ে না। নিজেকে লুকিয়ে রাখে। কিন্তু কবিতার ভাষা অনেক সময় এভাবেও, খুব গোপনে থেকেও, কবিতার মধ্যে ঠিক তার কাজটুকু করে যায়।
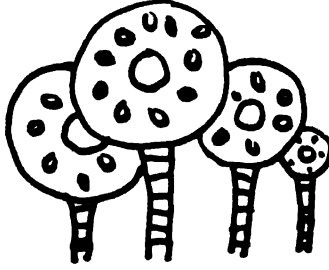
৪

যে জীবন চোখের সামনে দিয়ে প্রতিদিন চলে যাচ্ছে, কিন্তু তুচ্ছ হাজার কাজের চাপে সেদিকে তাকাচ্ছি না, সেই জীবনকে, যত্ন করে কবিতার মধ্যে তুলে রাখছেন কবি। বলছেন, যদি অবসর পাও খুলে দেখ, তোমারই দেখা অভিজ্ঞতা, দেখতে পাবে আমার কাছে। তফাত এই যে, তুমি ভুলে গিয়েছিলে, আর আমি মনে রেখেছি। বলছেন, আমি বিশ্বাস করি, তুমিই পারো।

কাকে বিশ্বাস করছেন তিনি! এই যে, এই চরিত্রটিকে।

আমি বিশ্বাস করি, তুমি পারো।

তোমার পরনে সস্তা সিন্থেটিক শাড়ি
হাতে প্লাস্টিকের গোলাপি প্যাকেট
আর মাত্র শাঁখা পলা। ক্ষয়ে যাওয়া হাওয়াই দু'পায়ে।
তুমি খুব সেফটিপিন ভালোবাসো মনে হয়।
মনে হয়, আর কিছু ভালোবাসার কথা
মনেই হয়নি তোমার কখনও।

বোঝা যায়, তুমি বিজ্ঞান জানো না, কাব্য নয়।
গান কিংবা আলপনায় সামান্যও গুণপনা নেই
(যাদের ওসব থাকে তারাও একটু উজ্জ্বল হয়)
তোমার জলুস নেই, মুখের চামড়া খসখসে
এমনকী, টিকিট কাটছ, খুচরো পয়সা মেলাতে পারছ না,

কন্ডাক্টর মুখ করল। তোমার দু'চোখে ভয়।
ফাটা ঠোঁটে অর্থহীন হাসি।

সবাই হেনস্থা করছে। বাস থেকে নামলে কোনও মতে।
আচ্ছা বলো, এবার কী করবে তুমি...বাড়ি যাবে...বর ঘরে নেই
ছেলেমেয়েরাও নেই, রান্না করবে ভালোমন্দ কিছু?
তাও বুঝি পারো না তুমি? তেল নেই, গোটা দুই আলু পড়ে আছে
ওসব বললে কি হয়। যারা পারে, অন্নপূর্ণা, চালেডালেও অমৃত বানান

রাত বাড়লে একে একে ঘরে ফিরল তোমার সংসার
খাওয়া ও বিছানা হল। রতি হল। কিছুই পারলে না।
তারপর মধ্য রাত্রে, চুপিচুপি ছুঁয়ে দিলে স্বামী আর সন্তানের মুখ
আর ওরা স্বপ্নে স্বপ্নে নীল হয়ে গেল।

আমি বলেছিলাম, তুমি পারো।
শুধু কেউ বিশ্বাস করল না।

এই কবিতার নাম 'স্বপ্নরূপেণ'। লিখেছেন মন্দাক্রান্তা সেন। এই লেখায় খুবই নিম্নবিত্ত সংসারের একটি বউয়ের কথা বলা আছে, যে, অনুমান করা যায়, কোথাও কোনো ছোটোখাটো কাজও করে। সংসারে সবাই যাকে ব্যর্থ বলে, এমন পুরুষদের কথা আমরা গল্প উপন্যাসে পড়েছি অনেক। কিন্তু সংসার যাকে ব্যর্থ অপদার্থ বলছে, এমন মহিলারা আছেন কতই, কবিতায় তাঁদের দেখা যায় কম।

এই লেখা পড়তে পড়তে মনে হয়, এই মহিলা আমার চেনা। পাঠক, আপনিও কি দ্যাখেননি এঁকে? যদি পিছনের দিকে তাকিয়ে নিজের জীবনটা মনে করি, তবে দেখব, সারা জীবনে বারবার এঁকে দেখেছি। বাসে তো দেখেইছি। কী আশ্চর্য সত্য এই ছবি যে, হাতে প্লাস্টিকের একটা গোলাপি প্যাকেট। গোলাপিটা কখনও নীল হয়েছে, কখনও বা সাদা, কখনও বা কোনো বস্ত্রালয়ের নাম লেখা হয়েছে সে প্যাকেট। তা ছাড়া, কবির দৃষ্টিই নেই আমাদের তাই চোখ এড়িয়ে গিয়েছে, নইলে পায়ের হাওয়াই চটিতে লাগানো সেফটিপিন কেন খেয়াল করলাম না আমরা। যখন আমরা ছোটো ছিলাম, ছিলাম কিশোরবয়সি, তখন আমার মায়ের কাছেও এমন কাউকে আসতে কি দেখিনি? বন্ধুর বাড়ির বারান্দায় ক্যারম খেলছি, তখন দেখিনি কি, এমনই এক মহিলা এসে দাঁড়ালেন উঠোনে আর বন্ধুর মায়ের মুখ বিরক্তিতে ভরে উঠল? এ হল সেই জাতের একটি কবিতা, যা নিজের কথা আপন মনে বলে চলে যায়, কিন্তু কখন, যেন কিচ্ছু না জানিয়ে ঢুকে পড়ে পাঠকদের ফেলে আসা জীবনের মধ্যে। যার যার জীবন হাতড়ে তুলে আনতে থাকে আপাত তুচ্ছ, ভুলে যাওয়া ছবিদের। চরিত্রদের। স্মৃতির মধ্যে পরিত্যক্ত জিনিসপত্র রাখার যে ঘর আছে, একবার

পড়লেই, এ কবিতা ঢুকে পড়বে সেই ঘরে, সব এলোমেলো করবে। আপনি, যিনি এখন এই কবিতাটি পড়লেন, তিনিও কবিতার মহিলাকে দেখতে পাচ্ছেন নিজের জীবনের দিকে তাকিয়ে। অথচ এ কথাও ঠিক যে, যে মহিলাদের আমি দেখেছি বাসে, রাস্তায় অথবা মায়ের কাছে আসতে, বন্ধুর মায়ের কাছে হয়তো বা—তাঁরা—আর যে মহিলাদের আপনার মনে পড়ছে পাঠক, আর যে মেয়েটিকে দেখেছেন মন্দাক্রান্তা সেন, তারা সকলেই নিশ্চিত আলাদা। এখানেই কবিতাটি বড়ো হয়ে উঠছে, ছড়িয়ে যাচ্ছে আমাদের পুরো নিম্নবিত্ত বাঙালি জীবনের মধ্যে। ধরছে পুরো সমাজকে। প্ল্যাস্টিকের গোলাপি প্যাকেট ছাড়া মহিলার হাতে আর কী আছে। 'আর মাত্র শাঁখা পলা'। এখানে 'মাত্র' শব্দটি লক্ষণীয়। যখন এই 'মাত্র' শব্দটি এল, তখন কবিতা ঠিক সাড়ে তিন লাইন এগিয়েছে। 'শাঁখাপলা'র আগে 'মাত্র' শব্দটি দিয়ে এখানেই মহিলার সাংসারিক অবস্থাটি প্রতিষ্ঠা করে দেওয়া হল। যদিও এ কথা ঠিক, শব্দের সংকেতধর্মী ব্যবহারকে এই বিশেষ লেখাটি তত গুরুত্ব দেয়নি, বরং সোজাসুজি হাত রেখেছে আমাদের জীবনযাত্রার হৃৎপিণ্ডে। যেমন মাত্র শাঁখা পলা ছাড়া এই মহিলার কোনো আভরণ নেই, এই কবিতাও তেমনি সমস্ত আভরণ সরিয়ে রেখেছে। একপাত্র জলের মতন কবিতাটি আমাদের সামনে রাখা হয়েছে, যার ওপর দিয়ে তাকালে পাত্রের তলদেশ স্বচ্ছ দেখা যায়।

একটি অসামান্য আশ্চর্যের উল্লেখ এ কবিতায় আছে, সে কথা বলার আগে, অন্য একটি প্রসঙ্গ ছুঁয়ে আসি। 'কন্ডাক্টর মুখ করল। তোমার দু'চোখে ভয়। ফাটা ঠোঁটে অর্থহীন হাসি।' যেহেতু খুচরো মেলাতে দেরি করছে মহিলাটি, কন্ডাক্টর রাগ করছে, এবং মহিলা ভাবছে 'সত্যি সত্যিই টিকিটের পুরো পয়সাটা তার কাছে আছে তো! কম নেই তো!' তাই দু-চোখে ভয়। তাই অর্থহীন হাসি। হাসি, কারণ বাসভর্তি লোকের সামনে অপদস্থ হওয়াটাকে সামলাতে হচ্ছে তো! এই কবিতাটি রয়েছে 'বলো অন্যভাবে' নামক বইতে, তখনও উপন্যাস লেখায় তেমনভাবে হাত দেননি মন্দাক্রান্তা সেন। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে বোঝা যায়, ঔপন্যাসিকের যোগ্য শক্তিশালী পর্যবেক্ষণ তাঁর রয়েছে।

যে-কথা আগে বললাম, এই মহিলাটিকে বিভিন্ন জায়গায় আমরা সকলেই দেখেছি সমাজে, কিন্তু কেউ কখনও কি এত তীক্ষ্ণ মমতার সঙ্গে তার ভিতর-জীবনটি দেখেছি? রান্নার উপকরণ কিছুই প্রায় নেই বাড়িতে। কন্ডাক্টরের মুখ করার কথা আছে কবিতায়। বাড়ির লোকের গঞ্জনাটি স্পষ্টভাবে নেই। কিন্তু 'ওসব বললে কি হয়' এই কথাটির মধ্যে সে ইঙ্গিতও রইল।

যে আশ্চর্যটির কথা বিশেষভাবে বলতে চাই সেই জায়গাটিতে আসি। 'খাওয়া ও বিছানা হল।' বোঝা যায়, খাবার বেড়ে দেওয়ার দায়িত্ব শুধু নয়, বিছানা করার দায়িত্বও এই মহিলারই। অত্যন্ত কুশলী হাতে, পুরো প্রসঙ্গটি সামলানো হয়েছে। এরপরই—'রতি হল। কিছুই পারলে না।'

এই পুরো লাইনটি আমাদের স্তম্ভিত করে দেয়। এরকম কোনো মহিলার সমস্ত

উপস্থিতিটাই এমন আকর্ষণহীন মলিন ছায়ায় ঘেরা, যে, এঁরও জীবনে যে শরীরসঙ্গ থাকতে পারে, তা আমরা দূরভাবেও কল্পনা করি না। মনের কোনো কোণেই তা উঁকি দেয় না। অথচ মানুষের সম্পূর্ণ জীবনযাত্রার মধ্যে এই বস্তুটি তো অচ্ছেদ্য। 'খাওয়া ও বিছানা হল'-র পর একটি স্বাভাবিক দাঁড়ি। বলা যায় যেন অত্যন্ত স্বাভাবিক দাঁড়ি। তারপর দুটি অমোঘ শব্দ : 'রতি হল'। আবার দাঁড়ি। তারপর আরও অমোঘ—'কিছুই পারলে না।' তুলনাহীন এই প্রিসিশন। এমন দুশ্চিন্তাময়, অপমানমুখী, পরিশ্রম ও ক্লান্তি ভরা দিনের শেষে কি শরীর সাড়া দিতে পারে কারও? তাই সে ওটাও পারল না। এই লাইনে 'কিছুই' কথাটি দেখুন। ওই একটি কথার মধ্যে পুরুষ কী কী প্রত্যাশা করে, না পেলে ক্ষুব্ধ হয় তারও ইঙ্গিত দিয়ে দেওয়া হল।

কিন্তু এতসব না-পারা সত্ত্বেও, থেমে রইল না চরিত্রটি। এর ঠিক পরেই সকল রকম না-পারার সীমা পার হয়ে তার বাইরে পা ফেলল সে। 'মধ্য রাত্রে চুপিচুপি ছুঁয়ে দিল স্বামী আর সন্তানের মুখ। আর ওরা স্বপ্নে স্বপ্নে নীল হয়ে গেল।' তীব্র অভাব, প্রাত্যহিক অপমান, ধন্যবাদহীন পরিশ্রম ও ক্লান্তি এই মহিলার ভিতরকার একটি বিশেষ উপাদানকে খুন করতে পারেনি। তা হল ভালোবাসা। এই নিষ্কলুষ স্নেহ, যা দিয়ে সে স্বামী ও সন্তানকে ছুঁয়ে আছে। সেই স্নেহ সে বাঁচিয়ে রেখেছে নিজেরই ভিতরকার কোনো শক্তি দিয়ে। এই স্নেহ এই মমতাধারা, এমনকি, তার স্বামী ও সন্তানের কাছেও গোপন। সে একে প্রকাশ করতে চায় না তাদের কাছেও। তাই 'চুপিচুপি' কথাটি আসে। কেন-না, স্বামী সন্তান এই স্নেহটিকে বুঝতে পারবে না। দিনে রাতে তাদের কয়েকটি প্রাপ্য দাবি পূরণ হলেই হল। জগতে সবাই তার দোষ ধরে। সেও যদি প্রত্যুত্তরে তার মনকে বদলে দিত জগতের প্রতি বিদ্বেষে, তবে তা অস্বাভাবিক হত না। কিন্তু এই যে সংসার, শতকষ্ট সহ্য করেও এই সংসারকে সে বাঁচিয়ে রেখেছে। সব অনাদর সয়েও। কোনো কোনো কবি যেমন নিজের সম্পর্কে অনাদর ও নিন্দার কথা ক্রমাগত জানতে জানতেও সারাদিন পর রাত্রির কোনো নিঃশব্দ প্রহরে আবার লেখার কাছে ফিরে আসেন, সে লেখা ছাপা হওয়ার পরে আবার নিন্দা পাবে জেনেই। আসলে, লেখার মুহূর্তে রচনাকালীন আনন্দ তাঁকে আলো করে দেয়। এই মহিলাও যখন তাঁর স্বামী ও সন্তানের নিদ্রিত কপালে হাত রাখছেন, তখন 'ভালবাসা'—এই বিশেষ শব্দটি রাত্রির অজস্র নক্ষত্র হয়ে ফুটে উঠছে অভাবী সংসারের ছাদের উপরকার আকাশে। যা দেবী সর্বভূতেষু স্বপ্নরূপেণ সংস্থিতা। কবিতাটির অনবদ্য নামকরণ থেকে এই মন্ত্র আমাদের মনে পড়ে। এই নারীও তখন আলোয় রূপান্তরিতা হন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন তাঁর 'জীবন-শেষের' কবিতায় লেখায় : 'অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে...' কবিতার এই নারী সব ছলনা অনায়াসে সহ্য করে, তাই পুরো কবিতাটিতে কোথাও আমার এই নারীকে চঞ্চল অশান্ত বা ক্ষুব্ধ হতে দেখি না। ক্ষুব্ধ হতে গেলে সে হয়তো নিজেকে ও নিজের সংসারকে আরও ক্ষয়ের পথে নিয়ে যেত। সহ্য করাও এক বড়ো ধরনের শৌর্য। তারই জন্য হয়তো, সারাদিনের কষ্টের পর রাত্রির বিরল মুহূর্তে শান্তির অক্ষয় অধিকার

অর্জন করে নেয়। এইখানেই মানুষ হিসেবে সে জয়ী। পরিবেশ, পরিস্থিতি তার ভালোবাসাকে মেরে ফেলতে পারল না। এখানেই এ কবিতা বড়ো জায়গায় পৌঁছোয়। ভালোবাসাকে সকলে দেখতে পায় না। শুধু কবি দেখতে পান। বলেও যান সে কথা। পৃথিবী বিশ্বাস করতে চায় না, এই যা।

নারী জীবনের আরেক রকম একাকী মুহূর্তকে ধরেছে এই লেখকের আর একটি কবিতা। তার নাম 'কলহান্তরিতা'—

রান্নাবান্না সারা হল। এখন অনন্ত অবসর।
ও অফিসে চলে গেছে। পড়ে আছে ফাঁকা ফাঁকা ঘর।
পড়ে আছে ছাড়া জামা। দু'পাটি ঘরোয়া নীল চটি।
স্নানঘরে পড়ে আছে জবাকুসুমের আবহটি
আরো কী কী পড়ে আছে? চতুর্দিকে খান খান রাগ...
ঝগড়া হল বেরনোর ঠিক আগে, যেন তারই দাগ
যেন, দম্ভ ভরে তোলা সেই ছিন্ন জয়ের পতাকা
ছড়িয়ে রয়েছে এই ঘরজুড়ে।

...ঘরখানি ফাঁকা...

এ কবিতা আরেকজন গৃহবধূর কবিতা। কবিতাটি শুরু হল মেয়েটির প্রতিদিনকার রান্নাবান্না শেষ হওয়ার পর। এই মুহূর্ত, অর্থাৎ সকাল শেষ হয়ে আসা আসন্ন দুপুর থেকে মধ্য বিকেল বা সন্ধ্যা অবধি টানা অবসর। এ সময় কী করবে মেয়েটি। সে তাকিয়ে দেখছে চারিদিকে। স্বামী অফিসে চলে গিয়েছে। পড়ে আছে ফাঁকা ফাঁকা ঘর। আজ কি একটু বেশি ফাঁকা লাগছে? পড়ে আছে স্বামীর ছাড়া জামা। দু-পাটি চটি। নীল রঙের হাওয়াই চপ্পল হয়তো। এখানে ঘরোয়া কথাটি গুরুত্বপূর্ণ। বাড়ির ভেতরে পরে ঘুরে বেড়ানোর চটি। সে তো ঠিকই—কিন্তু 'ঘরোযা' কথাটির মধ্যে 'ঘর' জিনিসটা একটু বলা হল। ঘর মানে, যেখানে দুজনে একসঙ্গে থাকে। ঘর সম্পর্কিত এই কবিতা। সেই সঙ্গে ঘরের মানুষ সম্পর্কিত। ওই যে এখুনি দেখলাম, 'পড়ে আছে ফাঁকা ফাঁকা ঘর।' ফাঁকা ফাঁকা লাগছে কেন? কারণ যে ঘরের মানুষ, সে তো বেরিয়ে গিয়েছে। সেই জন্য? এরপরই তুলনাহীন একটি ডিটেল : 'স্নান ঘরে পড়ে আছে জবাকুসুমের আবহটি।' যুবকটির কাছে যখন যায় মেয়েটি, কাছাকাছি হয়, তখন তো সে এই স্নানগন্ধ অনেক সময়ই পায়। শরীর সমীপবর্তী হলেই তো এই গন্ধ আসে। স্বামী বেরিয়ে যাওয়ার পর, গৃহস্থালির কোনো কাজে স্নানঘরে ঢোকা মাত্র সে এই গন্ধ পেল। ধাক্কা লাগল তার। আবার মনে পড়ল কোনো ঘনিষ্ঠতার মুহূর্ত। এই গন্ধ তো তার নিজস্ব পুরুষের গন্ধ। কেন আজ প্রতি পদক্ষেপে পুরুষটিকে এত মনে পড়ছে তার? পুরুষটি বেরিয়ে যাওয়ার পর যা যা পড়ে আছে, তার তালিকাটিতে চোখ রেখে এগিয়ে গেলেই বোঝা যাবে কেন! ফাঁকা ফাঁকা ঘর, ছাড়া জামা, চটি এবং

জবাকুসুমের গন্ধ—এইসব পার হয়ে দেখা যায় বাড়িতে পড়ে আছে চতুর্দিকে খান খান রাগ। যেদিকে তাকাচ্ছে মেয়েটি, সেদিকেই ক্রোধের ভাঙা টুকরো দেখতে পাচ্ছে। রাগ-এর আগে খান খান বসানো হয়েছে কারণ রাগ মানেই কিছু ভাঙা। রাগ ভাঙে অন্যকে। নিজেকেও ভাঙে, কারণ ভাঙাই তার কাজ। কেন রাগের টুকরো চারদিকে? কারণ, বেরোবার আগে ঝগড়া হল যে! কোন বাড়িতে না ঝগড়া হয় এই সময়টায়। সকালে অফিসে বেরোনোর আগের ওই প্রবল তাড়াহুড়োর সময়টায় ঝগড়া হবেই স্বামী-স্ত্রীতে। এক-একদিন ঝোঁকের মাথায় রাগারাগির টান রেখেই বেরিয়ে যেতে হয়। বাড়িতে থেকে যায় মেয়েটি। সেই একা বাড়ির মেয়েটির কথা বলছে এ কবিতা। এতক্ষণ রান্নার কাজে সে ব্যস্ত হয়েই ছিল, হাতের কাজ সারা হতেই তার চোখে পড়তে লাগল সব। তখন সে যেদিকে তাকাচ্ছে, পুরুষটির অনুষঙ্গ ছুটে এসে হৃৎপিণ্ড খামচে ধরছে তার। কাচের বাসনের মতো ভাঙা ভাঙা রাগ যে পড়ে থাকতে দেখছে জামা, চটি, জবাকুসুমের গন্ধের সঙ্গে এই ঘরে। এই তাদের একসঙ্গে থাকার ঘরে। যে ঘরখানি, এই মুহূর্তে, ফাঁকা।

'ফাঁকা ঘরখানি' কথাটি লাইনের স্বাভাবিক গতি থেকে ভেঙে নীচে এনে রাখা হয়েছে। 'ফাঁকা ঘরখানি' শব্দ দুটি একা হয়ে পড়েছে, কবিতাটি থেকে ঈষৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে। এই একাকিত্ব, ঘরটির একাকিত্ব শুধু নয়। মেয়েটির একাকিত্ব। যদিও তা সাময়িক। কারণ পুরুষটিকে অত বেশি মনে পড়ার মধ্যে একটি মিলন আসন্ন হয়ে রয়েছে। তা ছাড়া এও লক্ষণীয় যে, 'ঘরখানি ফাঁকা' কথাটি শেষে ফিরে আসায় গানের অতুলনীয়তা এল। বোঝা গেল, এই কবিতার রচনা পদ্ধতির মধ্যে সংগীত প্রকরণকে ব্যবহার করা হয়েছে। ঘরখানি ফাঁকা-য় পৌঁছে কি সম এল? না, ভুল বললাম। বরং তাল ছাড়া সুরের বিস্তার। অথচ বিস্তারের মতো অত জায়গা নিয়েও নয়। বলা যায়, কবিতাটি যেন বড়ো গানের আগে কিছুক্ষণের একটি আওচার। আওচার সম্পূর্ণ হল সা-য়ে এসে। 'ঘরখানি ফাঁকা' কথাটির ওই ফিরে আসা যেন সমাপ্তির সেই সা-য়ে এসে পৌঁছোনো। তাহলে বড়ো গানটি কোথায়? আমি আশ্রয় নেব শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের। শক্তি বলেছেন : যে-কোনো লেখকের পদ্যই বস্তুত দীর্ঘকাব্য। তিনি লেখেন টুকরো টুকরো করে এই মাত্র। সুতরাং, বড়ো গানটি নিশ্চয়ই ছড়িয়ে আছে এই কবির সারাজীবনের কবিতার ভেতরে ভেতরে।

যে দুটি কবিতার প্রসঙ্গে কথা বললাম, দুটি রচনাতেই নারীর একাকী মুহূর্তের অভিজ্ঞতার কথা ফুটেছে। মানুষ যখন সবার সঙ্গে থাকে, সে এক রকম। যখন সে একা, তখন সে অন্যের সঙ্গে যা ছিল, তা নয়। এই সত্যকে মানবজীবন নানাভাবে জানে। কিন্তু তা প্রকাশ করতে চায় না। সমাজের নানা চাপিয়ে দেওয়া কারণে নারীজীবনও তার একাকিত্বের কথা সর্বসমক্ষে বলতে চায় না। কিন্তু নারী-কবিরা দেশে দেশে ভাষায় ভাষায় তাঁদের একাকী কণ্ঠস্বর তুলে আনতে শুরু করেছেন। এবারে যে কবিতাটির কথা বলছি, তাতেও আছে নারীর একাকী মুহূর্তের কথা।

৩.
তার বড়ো মনঃপূত যুবকের সফেদ করোটি
পান পাত্রে আধাআধি যৌনতা ও স্নেহ
আর হিংস্র প্রদীপের ভেঙে ভেঙে যেতে থাকা ছায়া

বালিকা বয়স থেকে কৌতূহলী, চরম বেহায়া
প্রেম তার মেধাবী সন্দেহ
সৃষ্টি বলতে স্থিতি বলতে লয় বলতে...শুধু আত্মরতি

৪.
অর্থাৎ, এ সবই তার প্রিয়
যে স্তন দক্ষিণাবর্ত, যে নাভি ক্রমশ প্রস্ফুটিত
অপরাজিতার ন্যায় বিন্যাস বিশিষ্ট একটি যোনি

যে কোনও লিঙ্গের চেয়ে সুঠাম তর্জনী
যা চোখে আঙুল দিয়ে আরতির অর্থ খুঁজে দিত
...চোখ অর্থে নয়ন, তৃতীয়

৫.
স্বপাক স্বমাংসে ভোগ, অন্যথায় দেবীও উপোসী
অন্ধকার চাঁদ, তার জমাট জ্যোৎস্নায় ভেজা জিভে
যথেচ্ছ কামড়, কালশিটে

শ্মশানের ঠিক নিচে, মূল গর্ভপীঠে
চূড়ান্ত লাফের পর শেষ যজ্ঞকাঠ গেলে নিভে
স্বরূপ চিবিয়ে খায় দাঁতে নখে সে এক রূপসী

আসলে এটি একখানি কবিতা নয়, একটি কবিতাগুচ্ছের তিনটি টুকরো এখানে নিলাম। পূর্বে যে দুটি কবিতা দেখছিলাম, তার একটিতে আছে সমাজের দিকে তাকানো। অন্যটিতে আছে নিজের গৃহস্থজীবনের দিকে তাকানো। দুটি-ই, এক অর্থে, স্পষ্ট ও সচেতন জগতের কথা। কিন্তু এইমাত্র যে কবিতাখণ্ডগুলি গ্রহণ করলাম, কবি সেখানে নেমে গিয়েছেন নিজের ভেতরকার অন্ধকারে। অবচেতনার ছায়াময় প্রদেশ জেগে উঠেছে কোথাও কোথাও। আর তা থেকেই উঠে আসছে আশ্চর্য শিউরে ওঠা সত্য। নিজের এত দূর মুখোমুখি দাঁড়ানোর সাহস পায় না মানুষ।

এই কবিতাগুচ্ছের নাম, 'কালী'। কালী শব্দে অন্ধকার, অমাবস্যা মনে আসে। মনে আসে শক্তি। মহামায়া। ঘোর কৃষ্ণনীল নগ্নিকাও মনে আসে, যাঁর লজ্জা নেই। এই কবিতা

টুকরোগুলিতে তাই তন্ত্রসাধনারও কিছু অনুষঙ্গ পলকে আসা যাওয়া করছে। করোটি আছে, আছে পানপাত্র, প্রদীপের ভাঙা ভাঙা ছায়া। সেখানে হিংস্র কথাটি আছে। কিন্তু পানপাত্রে মদের বদলে রয়েছে তরল যৌনতা ও স্নেহ। যৌনতার সঙ্গে স্নেহ-র এই মিশ্রণটি কবিতায় একটি আশ্চর্য। যেহেতু কালী কথাটির মধ্যে মাতৃরূপেরও একটি অনুষঙ্গও আসে—তাই স্নেহ শব্দটি বড়ো সুপ্রযুক্ত। এই কালী কবিতাটির ঠিক আগের লেখার নাম ডাকিনী, যেখানে যুবক পিতার সঙ্গে ডাকিনীর স্নানদৃশ্য দেখা যায়। তা ছাড়া মানুষের যৌনক্রিয়াশীলতার মধ্যে কোথাও কখনও স্নেহও কি এসে পড়ে না, কেন-না, মানুষের অনেক ধরনের বৃত্তি প্রকাশ পেতে থাকে ওই সর্বাত্মক ক্রিয়াটির মধ্য দিয়ে। কবিতাটিতে লজ্জাহীনা রূপের কথাও আছে। নিজের মধ্যেই এই সমস্ত কিছুরই প্রক্ষেপণ। কিন্তু কবিতার শেষ লাইনটিতে এসে যে-স্বীকারোক্তি ঘটে, তা প্রাথমিকভাবে অভাবনীয় মনে হয়, পরে বুঝি এইটেই স্বাভাবিক। এই আত্ম-উন্মোচনের লাইনটি যেন নাচের দ্রিমিকি দ্রিমি তালে ক্রমে গতিবৃদ্ধি করতে করতে শিখরের দিকে উঠে যায়। শেষে আমাদের আছড়ে ফেলে 'আত্মরতি' শব্দের পাথরে।

পরবর্তী খণ্ডটিতে এই আত্মরতিরই বিস্তার। স্নানঘরে নিজ শরীর পর্যবেক্ষণের কথা এই কবির পূর্ব রচনাতেও অনুপমভাবে উপস্থিত ছিল। কিন্তু এখানে স্নানঘর নেই। বুঝিবা শ্মশানভূমি আছে। আছে, 'যে স্তন দক্ষিণাবর্ত।' শাঁখ সম্পর্কে দক্ষিণাবর্ত কথাটি আমরা জানি, যার চক্রটি দক্ষিণ মুখে ঘুরেছে। জীবনানন্দের 'করুণ শঙ্খের মতো স্তন', অতি পরিচিত। শাঁখের সঙ্গে স্তনকে আনলেই জীবনানন্দ এসে দাঁড়িয়ে পড়বেন মাঝখানে—সে বিপদ ছিল। কিন্তু, এখানে, কীভাবে জীবনানন্দের একটুও অনুষঙ্গ না-এনে শাঁখ ও স্তনকে একত্র করা হল। একদিকে যেমন অপরাজিতার রঙের সঙ্গে কী অসাধারণ মিলে গেল কালীর গাত্রবর্ণ আর একদিকে তেমনই ফুলের কেন্দ্রের সঙ্গে মিলে গেল গর্ভপথ।

এরপরের লাইনটিতেই আবার সেই আত্ম-উন্মোচন। এ সেই অন্তর্জীবন কথা, যা মানুষ বাইরে আনে না। পরক্ষণেই আছে, একটি অভাবনীয় প্রয়োগ। চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর ইডিয়ম আমরা জানি। কোন সত্য, যা মানুষ দেখছে না, বা দেখতে চাইছে না—তাকে দেখতে বাধ্য করাকেই তো বলে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো। একবার ভাবুন, চোখে আঙুল দিয়ে ওই দেখানোর প্রয়োগ কোথায় আর কীভাবে করা হল। এর কি কোনো পূর্ব তুলনা কোনোখানে আছে? নেই। সঙ্গে নিয়ে আসা হল 'আরতি'-র মতো শব্দকেও। (আমাদের সহকর্মী গীতিষা প্রুফ পড়তে পড়তে বলল, 'দেখুন কেবল ত-এ ম-এ টুকু ড্রপ করে দিয়েই 'আরতি' নিয়ে এলেন উনি।' ঠিকই। এগুলোই শব্দকে অনেক ভিতরদিক থেকে জানার প্রমাণ।) আরতি আসা মাত্র স্পষ্ট হল যে এ আসলে এক পূর্জাচনা। কালীর সঙ্গে পূজা এসে গেল। নিজ শরীরে অর্চনা। এল, চোখ অর্থে নয়ন, তৃতীয়। তৃতীয় নয়নের অনুষঙ্গে অনুরূপ কল্পনা পূর্বেও মন্দাক্রান্তা সেনের কবিতায় এসেছে : 'যেই তুই তার কপালে লাগালি শ্রীযোনি / তৃতীয় নয়নে আলো জ্বলে ওঠে তখনি। ছদ্মপুরাণ-এর এই কবিতায় তিনি শ্রীযোনি শব্দটি ব্যবহার করে একই সঙ্গে সৃজনী উচ্চারণটিও আমাদের কানে পৌঁছে দেন কেন-না, সে তো সৃজন করে, জন্ম দেয় তো, জন্মদ্বার। আবার নয়নও। কেন-না, কবিসত্তার কথাও সেখানে আসে কারণ ওই যে তৃতীয় নয়ন—জগৎ তো চিরকাল কবিকে বলেছে

দ্রষ্টা। ঠিকই, কিন্তু ওই কবিতা লেখার সময়েও, এত শান্ত, কঠিন, উদাসীন অথচ নির্মম আসক্তির উচ্চারণে পৌঁছোননি তিনি। নির্মমতাটিকে, নিজের প্রতি এই নির্মমতাটিকে দেখা যাবে পরবর্তী খণ্ড কবিতাটিতে।

এখানে শ্মশান পূর্ণভাবে উপস্থিত। দক্ষিণাকালী যিনি শিবের বুকে ডান পা রেখেছেন, তিনি কল্যাণময়ী। শ্মশানকালী বামা, তিনি সংহারিণী। তাঁকে গৃহস্থের ঘরে আনতে নেই। এই রূপটিই বুঝিবা জ্বলে উঠল এখানে। 'স্বপাক স্বমাংসে ভোগ।' প্রেমের তীব্র আনন্দ ও বিষাদ, অন্ধকার ও আলোময় জীবনতৃষ্ণার পাশাপাশি, আত্মধ্বংসের বাসনাও রয়ে গিয়েছে মন্দাক্রান্তা সেনের কবিতায়। আত্মপীড়নের কথা তাঁর পূর্বরচনাতেও ছিল। নইলে আরও একটা সন্ধ্যা কাটাতাম আত্মনিষ্পেষণে। আগেও লিখেছেন। তবে আত্মধ্বংসের ছায়া নিয়ে যে-বইতে কালী শীর্ষক কবিতাখণ্ডগুলি রয়েছে, তার নাম 'আত্মহত্যা রেখেছি মুলতুবি।' আত্মহত্যা-চিন্তায় আশ্রিত কৃষ্ণপক্ষ নামে একটি কবিতা-সিরিজ রয়েছে সেখানে। আর কালী কবিতাগুচ্ছের এই পঞ্চম অংশটিতে ভয়াল কালিকা যেন নিজেকেই ভক্ষণ করছেন পরিণামে পৌঁছে। এ কবিতায় উঠে এল অবচেতনের অন্ধকার। মিলনের পর স্ত্রী মাকড়সা যেমন পুরুষটিকে খেয়ে ফেলে, এখানেও চূড়ান্ত লাফের পর শেষ যজ্ঞকাঠ নিভে গেল, অর্থাৎ মিলনের শেষে, নিজেকেই গ্রাস করছে সেই নারী। এও এক আত্মধ্বংস। দৃঢ় একটি শৃঙ্খলা মেনে চলেছে এই কবিতাগুচ্ছটি। তিনটি লাইন, মধ্যে স্পেস—আবার তিনটি লাইন। প্রথম স্তবকের ক খ গ-এ মিল নেই, গ খ ক দ্বিতীয় স্তবকে মিল আছে। এক স্তবকের শেষ লাইন মিলছে পরবর্তী স্তবকের প্রথম লাইনে। আর, কবিতার শেষ লাইন মিলছে কবিতার প্রথম লাইনের সঙ্গে। কাছে আসা, দূরে যাওয়া। কাছে আসা, দূরে যাওয়া—এইভাবে চলেছে এই অসামান্য যাতায়াত। কবিতার মধ্যে যে মিল আছে, প্রথম পাঠে তা ধরাই যায় না। নিশ্বাস নেওয়ার সময় যেমন আমরা বুঝতে পারি না নিশ্বাস নিচ্ছি কি না, এইসব মিলও তেমনই স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিকতায় এসেছে। প্রথম স্তবকের প্রস্তাবনাটি দ্বিতীয় স্তবকে এসে পূর্ণ হচ্ছে। সনেট লেখার সিদ্ধি নিরঙ্কুশভাবে হাতে এলে হয়তো ষটকটিকে দিয়ে এভাবে যথাইচ্ছা কাজ করাতে পারে কেউ। মুদ্রা নামাঙ্কিত দশটি সনেটের সঙ্গে সঙ্গে পাপ, দেশ, অসৈরণ, ঋতু, পঞ্চম আড়াল বা নগ্ন সরস্বতীর মতো লেখায় সেই সিদ্ধির প্রমাণ রয়েছে। সনেট লিখে উঠেই সেখানে তিনি ছেড়ে দিলেন না তাকে। আরও একটু এগিয়ে নিতে চাইলেন। এই ষটক-নিরীক্ষা তারই চিহ্ন।

সমাজজীবন, ব্যক্তিজীবন, এবং বাসনাতপ্ত অন্ধকার অন্তর্জীবন—এই তিনটি স্তরেই তিনটি সপ্তকের মতো চলাচল করেছে এই কবির রচনা। সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের রূপ অনেক কবির লেখাতেই যথাযোগ্যভাবে পাই আমরা, কিন্তু নিজের মনের পাতালে নেমে গিয়ে সত্য খুঁড়ে আনবার ভরসা সাধারণত দেখা যায় না। কারণ ভয় তো আছেই, যদি হারিয়ে যাই নিজেরই গহনে, পথ খুঁজে যদি উঠে আসতে না পারি? তা ছাড়া, নিজের অতখানি অতলে চোখও কি যেতে চায়?
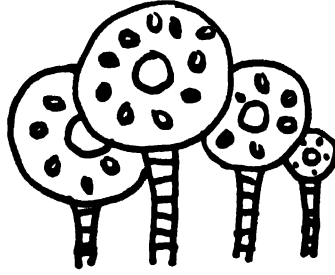
৫

এই কবিতা আমার কবিতা। কারণ, এই কবিতায় লেখা আছে আমারই জীবন। কেবল এই কবিতাটি লিখে গিয়েছেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

আমার চারদিকে

আমার চারদিকে কবিরা দাঁড়িয়ে আছেন
তাঁদের মুখে
ঊষা তাঁর প্রসন্ন আবির ছড়িয়ে দিচ্ছেন

কবিদের কণ্ঠে গান জেগে উঠছে
যেন মন্ত্র।

একটু পরে আকাশে গ্রহণ লাগবে
কবিদের মুখগুলো তখন মনে হবে
অন্ধকার মুখোশের মতো

কিন্তু তাদের বুকের ভিতর
তখনও দ্বিপ্রহর মাদলের মতো
বাজতে থাকবে

আমার চারদিকে কবিরা দাঁড়িয়ে আছেন
তাঁদের গান, তাঁদের কবিতার মন্ত্র নিয়ে..

অল্প বয়স থেকেই কবিদের আশ্রয়ে কেটেছে আমার জীবন। তাদের কারও সঙ্গে যে সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল, তা নয়। লেখা পড়েই আশ্রয় সন্ধান। আজও তাই।

এই এখন, এই যে গোঁসাইবাগান লিখছি, আমার চারদিকে কবিরা দাঁড়িয়ে আছেন বলেই তো! অল্প বয়সে আমার বেঁচে থাকা ছিল কবিতায় আশ্রিত। আজও তাই কবিদের মুখ আমার কাছে বরাভয়ের আশ্বাস নিয়ে আসে।

কবিদের মুখ বলতে, কবিদের শব্দ। কেন-না, মুখোমুখি আর কজনকে চিনতাম। ধরুন জীবনানন্দ, দেখার সুযোগ নেই, আমার জন্মের ১৮ দিন আগে মারা গিয়েছিলেন। বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে এখনও মনে মনে কথা বলি। কবিতা সম্পর্কিত তাঁর কোনো গদ্য পড়তে পড়তে বাসে চলাফেরা ছিল আমার প্রতিদিনের অভ্যেস! নানা প্রশ্ন মনে জাগে, মনে হয় কী করে এটা বুঝলেন? ইস, আরও কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করে নিতে পারতাম যদি? এই যে, কী করে এটা বুঝলেন লেখক, এই কথাটা সবচেয়ে বেশি মনে হয় যাঁর সম্পর্কে, তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁকেও তো দেখার সুযোগ হয়নি। তাতে কী? কবিকে দেখার সেরা উপায় তো তাঁদের লিখিত শব্দগুচ্ছ, যা তাঁরা আমাদের জন্য রেখে যান।

এক্ষুনি যে বরভয়ের কথা বলছিলাম, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই কবিতাটিতে যেন রয়েছে সেই বরাভয়ের মুদ্রা। এইসব মুহূর্তে কবিদের মনে হয় যেন দেবতার মতো। তাঁদের কবিতা মন্ত্রের মতো যেন পরিশুদ্ধ করছে আমাদের। কিন্তু সেখানেই তো শেষ নয়। অবিরল শুদ্ধতার সঙ্গে, প্রসন্নতার সঙ্গে তো থাকতে পারে না জীবন। আকাশে গ্রহণ লাগে। জীবন তার নানা কুশ্রীতা, হীনতা নিয়ে ঘিরে ধরে আমাবও জীবনকে, তখনও কি কবিদের সেইসব আশ্চর্য কবিতা থেকে সমান সাড়া পাই আমি?

যখন মনে অন্ধকার নেমে আসে, ভালোবাসা যখন আহত হয়, বিশ্বাস যখন ফেটে যায়, তখন তা থেকে বেরিয়ে আসে বিদ্বেষ। যাকে একদিন ভালোবাসতাম, যাকে সারাদিনে একবার না দেখলে মরে যাব মনে হত, তার সম্পর্কে তখন ঘৃণা জন্মায়। ভালোবাসার উলটো পিঠ ঘৃণা। সেই হল গ্রহণ লাগার সময়। তখন কেবল দ্বেষ। তখন কবিতাও যেন সান্ত্বনা দেয় না। কালো হয়ে থাকে মন।

কবিদের মুখও তখন যেন মুখোশ। কবিদের মুখ মানে? কবিদের শব্দই তো তাঁদের মুখ। এমন অন্ধ গর্তে পড়ে যাই সময় সময়। বাতাস থেকে শুধু ছাই ঝরছে মনে হয়। কোনো প্রতিবেশীর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না। যন্ত্রের মতো হাঁটাচলা করি। যন্ত্রের মতো অফিস যাই। বাড়ি আসি। তখন কেমন হয়? সব চিন্তা, প্রার্থনার সকল সময় তখন শূন্য মনে হয়।

তবু আমার মন কালো হয়ে গিয়েছে বলেই তো আর কবিতাগুলো মলিন হয়ে যেতে পারে না। তাদের মধ্যে দ্বিপ্রহরের রৌদ্রালোক তেমনই জ্বলতে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে একদিন সেই অন্ধকার গুহা থেকে হয়তো বেরিয়ে আসার শক্তি পাই আমি। আলো পড়ে মনে । আবার লোক চলাচল শুরু হয় আমার মধ্যে। সেই গুহার বাইরে এসে দেখি,

কবিরা ঠিকই দাঁড়িয়ে আছেন এই চরাচরের চারিদিকে। তাদের গান, কবিতা নিয়ে। আমি অন্ধকারে ছিলাম বলেই তো আর জগতের জ্যোতির্ময় কবিতা সমুদয় নষ্ট হয়ে যায়নি।

অন্যপক্ষে, আমার মতো পাঠকের শুধু নয়, কখনও কবির নিজের জীবনে নামতে পারে অন্ধকারের আচ্ছাদন। যখন সেই আঁধার-প্রভাবে তাঁর মুখকে দূর থেকে মনে হয় মুখোশ। সবাই দূরে সরে যায় তখন সেই কবির থেকে। সেই অন্ধকার সময় যখন পার হচ্ছেন কবি, তখন তারও ভেতরে কোথাও জ্বলতে থাকে মধ্যাহ্ন। সূর্যালোক বাজতে থাকে মাদলের মতো। সেই মাদলের ধ্বনিই তখন আলো।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতে আশা আগুনের মতো জ্বলেছে সারাজীবন। এই কবিতা তার একটি প্রমাণ। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে সমস্ত দেশের হেঁটে চলা ধরা আছে এই কবির রচনায়। সেখানে নিজের ওপর এসে পড়া একটি অন্ধকার মুহূর্তের বিবরণও কীভাবে দেয় তাঁর লেখা, একটু দেখা যাক।

আমার

কবিতা
তুমি কেমন আছো?

যেমন থাকে ভালোবাসার মানুষ
অপমানে।

এ লেখার মধ্যে আছে কবিতার অপমানে থাকার কাহিনি। যদিও সে কাহিনি বিশদভাবে বলা হয়নি। অপমানটুকু বলা আছে। বিষণ্নতার দীর্ঘশ্বাস যেমন, একাকী, কাউকে কিছু না জানিয়ে মিশে যায় হাওয়ায়। এ কবিতাও যেন কাউকে কিছু জানানোর জন্য লেখা নয়। একাকী নিষ্ক্রান্ত হয়ে বাতাসে মেশার জন্য লেখা। একটি প্রশ্ন, ও একটি উত্তর দুটি স্তবকে ভাগ হয়ে আছে। লক্ষ করার মতো একটি আশ্চর্য এ কবিতায় রয়েছে। তা হল, কবিতার নামটি। 'আমার'। একটু অদ্ভুত লাগে প্রথমে নামটি শুনে। কিন্তু তারপর ভাবলেই একটি চাবি খুলে যায়।

শিরোনাম হিসেবে 'আমার' শব্দটি পড়ার পরই আমি কোন শব্দটি পড়ছি? শিরোনাম হিসেবে 'আমার' শব্দটির পরই, লেখার প্রথম লাইন হিসেবেও আমরা পাচ্ছি একটি শব্দ: কবিতা। আমাকে পরপর দুটি শব্দ পড়তে হল তাহলে, 'আমার কবিতা'।

কবিতাকে প্রশ্ন করছেন কবি, 'তুমি কেমন আছো'। উত্তরে জানতে পারছেন তার অপমানে থাকার কথা। অর্থাৎ, 'আমার কবিতা তুমি কেমন আছো?' অপূর্ব এই কারুকর্মটি। কবিতা সবসময় নিজেকে প্রকাশই করে না। কখনও গোপনও করে। সব কথা খুলে না

বলাও কবিতার একরকম ধর্ম। এখানে আপাত সরল, দীর্ঘশ্বাসময় স্বগতোক্তির মতো এই কবিতাও আড়াল অবলম্বন করল।

কেন দরকার হল এই আড়াল?

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় একাকী মানুষও সমগ্র মানুষের পরিচয় নিয়ে আসে। রাস্তার একটা ন্যাংটো ছেলে যখন তাঁর কবিতায় আকাশ দেখে তখন সমস্ত পথবাসী শিশু এসে যায় আমার মনে। এবং পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত এমন কোনো সত্যিকার কবি জন্মাননি, যাঁকে অপমানিত হতে হয়নি। ক্ষুধার্ত আন্দোলনের শক্তিশালী কবি শৈলেশ্বর ঘোষ জানিয়েছিলেন একবার এরকম একটি কথা যে, 'কবি' শব্দটিই বিদ্রোহবাচক। জানিয়েছিলেন কবি মানে, যে বেঁকে বসে। কবি, তিনি যতই শান্ত মুখচোরা একাকী হোন না কেন, তিনি কোনো-না-কোনো ভাবে সমাজে প্রচলিত নিয়মগুলোর বিরোধিতা করে চলেন। নইলে তিনি সত্য থাকতে পারেন না। এই বিরোধিতা যে তিনি সবসময়ে খুব জেনেশুনে, আঁটঘাট বেঁধে, পরিণাম সম্পর্কে নিঃসন্দেহ থেকে করেন, তা কখনোই নয়। তাঁর সত্য দৃষ্টি দ্বারা তিনি যা ঠিক মনে করেন, তাই করে থাকেন তাঁর লেখায় আর জীবনে। আর তাঁকে অপমানিত হতেই হয়। কখনও পদে পদে, কখনও বা সাময়িক কিছু বিরতির পর পর।

এই ছোটো কবিতার প্রথম লাইনে, 'আমার কবিতা' বলা হলে অর্থাৎ 'আমার' শব্দটিকে নামিয়ে কবিতার body-র অন্তর্ভুক্ত করা হলে, তাতে কেবল বিশেষ, একজন কবির নিজের কবিতার অপমান ঘটে যাওয়ার উল্লেখটুকু থাকত। অন্যপক্ষে, এখানে 'কবিতা' শব্দটি সম্বোধন হিসেবে আসায়, এক মুহূর্তে সমস্ত কবিতার প্রতি চলে গেল এই ডাক, এই প্রশ্ন। আবহমান কাল ধরে যত কবিতা অপমানিত হয়েছে, তাদের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল এই লেখা। কিটস থেকে জীবনানন্দ—নিষ্ঠুর সমালোচনায় আহত যাঁদের কবিতা—ফ্ল্যর দ্য মল নামক নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়া বইয়ের কবি শার্ল বোদলেয়র থেকে আজকের দিনের কবি মলয় রায়চৌধুরি, 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' নামক একদা-অশ্লীল-কিন্তু -আজ-স্মরণীয় কবিতাটির লেখার জন্য যাকে আদালতের কাঠগড়ায় আসামি হিসেবে দাঁড়াতে হয়েছিল মাত্র বছর চল্লিশ আগে, তাঁদের সঙ্গে নিয়েই সকলের সব অপমানিত কবিতাকে ছুঁয়ে দেয়, এই আপাত সামান্য, কবিতা নামের সম্বোধনটি। আজ, ২০০৮-এর গ্রীষ্মে এই কবিতা পড়ার সময় সমস্ত অপমানিত কবিকে মনে পড়ে আমার। আরেক দিকে, নাম হিসেবে 'আমার' শব্দটি ব্যবহার করায় একদিকে যেমন 'আমার কবিতা' অর্থাৎ নিজের কথা বলে নেওয়াটাও হয়ে যায়, অন্যপক্ষে জগতের সমস্ত অপমানিত কবিতা হয়ে ওঠে আমার কবিতা। জগতের সমস্ত নিপীড়িত মানুষ, যেমন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় আমার ভাই, আমার বন্ধু, আমার সন্তান, ঠিক তেমনই। মনে রাখতে হবে, কবিতাটির নামকরণ করার সময়, 'আমার' কথাটি যে মুদ্রণকালে কবিতার তুলনায় বড়ো অক্ষরে, বোল্ড-এ, অপেক্ষাকৃত সাহসী বা জোরালো টাইপে ছাপা হবে, সে কথা নিশ্চয় জানতেন কবি। এই 'আমার' এক মুহূর্তে সকলের হয়ে গেল। মঙ্গলাচরণ যেমন লিখেছিলেন, 'এক নামে যেই ডাকলে অনেক হলাম যে একজনা।

কানাইলালের মা আমার, ক্ষুদিরামের মা / জননী যন্ত্রণা আমার জননী যন্ত্রণা।' কানাইলাল বা ক্ষুদিরামের মা যেমন অনায়াসে আমার মা হয়ে যেতে পারেন, তেমনই। অথবা মৃদুল দাশগুপ্ত যেমন দেখেছিলেন : 'একটি মশাল ঘুরতে ঘুরতে জ্বালিয়ে দিচ্ছে সহস্রকে / চৈত্র আসে রক্তদ্রোণের, পলাশ শিমুল আর অশোকের।' একটি মশাল সহস্র মশালকে জ্বালায়। মশালটি আর একা থাকে না।

বোঝা যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই কবিতা একটি একাকী বিষণ্ণতার, দীর্ঘশ্বাসের মুহূর্ত নিয়ে লেখা। হয়তো অতি সংক্ষিপ্ত এই কবিতা মাত্র পরবর্তী মুহূর্তেই সম্পূর্ণ হল। তবু, তারই মধ্যে কেবল, 'আমার' শব্দটিকে নাম হিসেবে ব্যবহার করে, এবং কবিতা কথাটি প্রথম লাইনে রেখে—ব্যক্তিগত এই কবিতাকে সমগ্রের সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন এই কবি।

ছোটো কবিতায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সিদ্ধি বিস্ময়কর। একেকটি বিশেষ সময়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি ছোট্ট ছোট্ট কবিতার মধ্যে ধরেছেন সেই সময়ের অগ্নিপিণ্ডকে। যেমন, এই লেখা :

জেলখানার কবিতা

একজন কিশোর ছিল একেবারে একা
আরও একজন ক্রমে বন্ধু হল তার
দুয়ে মিলে একদিন গেল কারাগারে
গিয়ে দ্যাখে তারাই তো কয়েক হাজার।

যে-বইতে এই কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল, তার নাম 'ওরা যতই চক্ষু রাঙায়'। বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র ষোলো। দাম তিরিশ পয়সা। নরম মলাট। এই পুস্তিকা প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালের জানুয়ারি মাসে। সমস্ত বাংলায় তখন জেগে উঠছে তরুণদের হাতে হাতে নকশালবাড়ির আগুন। জেলে যাচ্ছে অজস্র কিশোর-তরুণ।

এই বইয়ের ভূমিকা থেকে দুটি লাইন বলি :

'এই পুস্তিকায় প্রকাশিত একটি মাত্র কবিতা
আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দি অবস্থায় লেখা।
ওই কবিতাটির প্রকাশকাল ৫ জানুয়ারি ১৯৪৪।

এই অসামান্য কবিতাটির পাশে আরও একটি তুলনায় কম পরিচিত কবিতা রাখা যায় :

সমস্ত রাত বুকফাটা চিৎকার
সমস্ত রাত মাইকে হিন্দি রেকর্ড
সমস্ত রাত রাংতায় মোড়া খড়্গ
নিজেকে ব্যঙ্গ করে।

কবিতাটি ১ নভেম্বর ১৯৪৪-তে লেখা। ১ নভেম্বর বলতে অনুমান হয় যে, কাছাকাছি সময়ে কালীপুজো। সমস্ত দেশে সশস্ত্র বিপ্লবের ডাক দিতে চলেছে তারুণ্য। অন্য আরেকরকম যুবসমাজ রাতভর মাইক বাজিয়ে কালীপুজোর উৎসব নিয়ে ব্যস্ত। সেখানে মূর্তির হাতে খেলনা খড়্গ রাংতায় ঢাকা। ওই অন্য আরেকরকম যুবকসমাজ যেমন রাংতার মতো সস্তা চকচকে আমোদে ব্যস্ত। দূরে কোথাও তখন শপথ নিচ্ছে কারা। তৎকালীন সমাজস্রোতের ওঠাপড়া মনে রাখলে এই কবিতা একটি ইতিহাসকে নিজের মধ্যে টেনে আনছে, বোঝা যায়।

পরের যে-কবিতাটির কথা বলব, সেটি আছে এই কবিরই 'পৃথিবী ঘুরছে' নামক বইতে। সেই বইও ষোলো পৃষ্ঠার বেশি নয়। দাম এক টাকা। নরম কাগজের মলাট। সেই বইয়ের প্রথমে, শিরোনামহীনভাবে মুদ্রিত ছিল এই চার লাইনের কবিতা :

চোখ রাঙালে না হয় গ্যালিলিও
লিখে দিলেন, 'পৃথিবী ঘুরছে না।'
পৃথিবী তবু ঘুরছে, ঘুরবেও
যতই তাকে চোখ রাঙাও না।

এ কথা এখন সকলেরই জানা যে, বিজ্ঞানী গ্যালিলিও বলেছিলেন, পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। তাতে চার্চ প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে এই মতবাদ প্রত্যাহার করতে চাপ দেয়। অত্যাচারের ভয় দেখায়। ব্রেশটের 'গ্যালিলিও গালিলেই' নাটকে গ্যালিলিওর মুখে এই স্বীকারোক্তি আছে : 'ওরা যে আমাকে অত্যাচারের যন্ত্রগুলো দেখাল। এই বয়সে আমি আর শারীরিক অত্যাচার সহ্য করতে পারব না।'

তাই ভীত কোণঠাসা গ্যালিলিও প্রকাশ্যে তাঁর মত প্রত্যাহার করে নেন। বলেন, চার্চই ঠিক। তিনি ভুল। যদিও গোপনে গোপনে তিনি নিজের আসল মতবাদটি প্রমাণ সহ 'ডিসকোর্সি' নামক একটি পাণ্ডুলিপির মধ্যে রেখে যান, যা তিনি তাঁর ছাত্র আন্দ্রেয়ার হাতে দিয়ে যেতে পারেন। এখানে বাহুল্য হবে না বলা যে, গ্যালিলিওর এই মত স্বীকার করে নিতে চার্চের ৩৮৮ বছর সময় লেগেছিল। এই সেদিন মাত্র, ১৯৪৪ সালে, চার্চ এ কথা মেনে নেয়। তবু পৃথিবী তো ঘুরেছেই, তাই না? বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই 'পৃথিবী ঘুরছে' নামক পুস্তিকা প্রকাশিত হয় ৭ নভেম্বর ১৯৪৪। মনে রাখতে হবে, তার আগে সে বছর ২৫ জুন মধ্যরাত্রে সারা দেশে ঘোষিত হয়ে গিয়েছে জরুরি অবস্থা। তারই পরিপ্রেক্ষিতে

যদি দেখি, তবে ছোটো এই চার লাইনের লেখার শক্তি বোঝা যায়। ১৯৪৪ সালে যখন ছোট্ট এই বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তখন ভূমিকায় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'কবি সরোজ দত্ত ও আশু মজুমদারকে উৎসর্গ করে নিহত কবিদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি, এবং যে-পুলিশি সন্ত্রাসের তাঁরা বলি হয়েছেন, তার বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ধিক্কার জানাচ্ছি।'

গ্যালিলিওকে বন্দি করে, তাঁর মত প্রত্যাহার করিয়ে যেমন পৃথিবীর সূর্য প্রদক্ষিণ আটকানো যায় না, তেমনই বিদ্রোহীকে গুলি করে খুন করলেও তার মতবাদকে খুন করা যায় না।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ সমকালে দেখা দিত। তা হল, তাঁর কবিতা অনেক সময়ই স্লোগানধর্মী।

মানুষের ওপর শাসকের অত্যাচার ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে তাঁর কবিতা কথা বলেছে বলে কখনও তাকে প্রত্যক্ষ হতে হয়েছে। এই প্রত্যক্ষতা হল অত্যাচারীর মুখোমুখি মাথা তুলে দাঁড়ানো। কিন্তু তাঁর কবিতায়, বিশেষত ছোট্ট কবিতাগুলোতে বোঝা যায়, শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংযম ও সংকেত, দুই-ই তাঁর অধিকারে ছিল।

যেমন এই কবিতা—

জাতক

পেটের আগুন খিদে
হাঁটতে শিখেছে
গলার রক্ত খিদে
পৃথিবী দেখছে

হাত দুটি তার খিদে
কেবল বলে : দে।
পা দুটি তার খিদে
পৃথিবী গিলছে।

কবিতাটি শুরু হল, নবজাতক হাঁটতে শিখছে। কান্নাচেরা গলা। তাই গলার রক্ত ওই চিৎকার। কারণ কী? খিদে। চারপাশ নতুন ও ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখছে। কবিতাটির গতির সঙ্গে মুহূর্তে মুহূর্তে যেন বড়ো হচ্ছে শিশু। হাতদুটো বাড়িয়ে বলছে : দে? বাড়ানো হাত দুটিই যেন খিদে। শেষ দুটি লাইনে এসে পড়ল পুরাণের সেই বামন অবতারের ধারণা। ক্ষুদ্র বামন পা ফেলছে। এবার সে পা রাখবে কোথায়। এক মুহূর্তে সেই নবজাতক যেন অতিকায় দানবে রূপান্তরিত। তার পায়ের তলায় সারা পৃথিবী ঢেকে গেল। এবার সেই

ক্ষুধা পৃথিবী গ্রাস করছে। এই সময়ে চকিতে শিশুকৃষ্ণের মুখের ভিতর ব্রহ্মাণ্ড—এই কল্পনাও উঁকি দিয়ে যায়। আবার সহস্র ক্ষুধার্ত মানুষের পদক্ষেপ একদিন সমস্ত পৃথিবী অধিকার করে নেবে—এই সংকেতও পাওয়া যায়। কবিতাটি শেষ লাইনে এসে যেন বিস্ফোরিত হয়। একরত্তি ভিখারি শিশুকে নিয়ে অবিস্মরণীয় কিছু কবিতা রয়েছে এই কবির এটি তেমনই একটি লেখা। এই ছোট্ট কবিতাটির গঠনের মধ্যে একদিকে রয়েছে সহজ লোকায়ত ছড়া ও লোকগানের মর্ম। গানের চরিত্র থেকে পাওয়া ধ্রুবপদের মতো 'খিদে' চিহ্নিত লাইনগুলো প্রায় স্লোগানের মতো ব্যবহৃত। চার লাইনের দুটি স্তবকে কবিতাটি সম্পূর্ণ। কবিতাটি চলেছে মূলত দুলাইনের একক অবলম্বন করে। দুটি করে একক নিয়ে একটি স্তবক। প্রতি দু-লাইনের প্রথমটি আসছে খিদে শব্দটিকে লাইনের প্রান্তে নিয়ে। স্লোগানে যেমন একটি লাইন বারবার ব্যবহার হয়, দ্বিতীয় লাইনটি হয় কিছুটা আলাদা বা নতুন। তাই স্লোগানের উত্তেজনা বাড়ে। এই কবিতাটিতে গতির ক্রমবৃদ্ধি ও চূড়াস্পর্শ ঘটেছে। কত সূক্ষ্ম এই কারুকৃতি, অথচ কতটাই লুকোনো। কত স্বাভাবিক এর চলন। অর্থাৎ, স্লোগানের ফর্মটিকেও লুকিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে লোকগান যেমন আমরা শুনি, মুখে মুখে বলা ছড়াও তো শুনি কত। এই কবি নিশ্চয়ই শুনেছেন। আবার রাস্তায়, মিছিলে স্লোগানও আমাদের কানে এসে বাজে। এইসব আসে অত্যন্ত স্বাভাবিক গতির মধ্য দিয়ে। তাই, তেমনই স্বাভাবিকতা রেখে, এইসব কিছুর মধ্য থেকে কবি তুলে নিয়েছেন তাঁর কবিতার গঠন। যে-গঠন তাঁর বিষয়ের সঙ্গে সহজভাবে মিলেমিশে থাকে। যেমন এই কবি চেয়েছিলেন বৈষম্যহীন পৃথিবীতে মানুষ মানুষের সঙ্গে সহজে মিলে মিশে থাকুক, তেমনই।
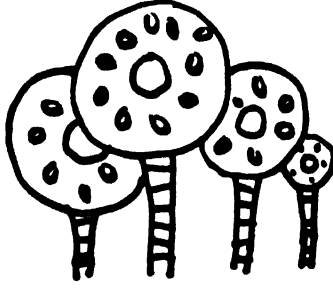
৬

আজ এমন একজন কবির কথা বলব, যাঁর কবিতা আমার কাছে রোদ্দুরের সমার্থক। যাঁর কবিতা পড়লেই আমার চোখের সামনে আলো ঝলমল গাছগাছালিময় দিন ভেসে ওঠে। এমন বলতে চাইছি না যে, নিসর্গচিত্রের রেখাঙ্কনের দিকেই তাঁর ঝোঁক। অথবা তিনি প্রধানত প্রকৃতি পর্যায়ের কবি। বলতে চাইছি, তাঁর কবিতার ভিতরের যে মূল শক্তি, যে স্পিরিট, তা এক দিগ্‌বিদিকব্যাপী রৌদ্রালোক। সমস্ত বিষাদকে স্বীকার করেও তাকে দূর করার কী এক মন্ত্র তিনি কবিতায় কবিতায় ছড়িয়ে দিতে পারেন। এই একটি কবিতা তবে দেখা যাক :

পায়রা পিছলে যাবে
এমনি হয়েছে আকাশ
রোদ এমন
যে কাগজে ছাপানো যায়
যত ছোট বড় করেই তাকাও
আর ধরে রাখো নিজেকে
মনে হবে
এই ছড়িয়ে গেল এই কেঁপে উঠল বুক।

এমন এমন লোক এখন বাইরে
এমন সব মাতোয়ারা গেছে ভেতরে
ওড়িশীপাক দিয়ে মেয়েরা এমনভাবে হাঁটছে
এমনভাবে সিঁদুর রাখছে কপালে
যে বুঝতে পারবে না
কেউ কিছুই বুঝতে পারবে না।

এমন কি বুঝতে পারবে না
আমাদের আর স্থায়ী চাকরি নেই।

প্রথম দুটি লাইনে আকাশের যে বর্ণনা রয়েছে, এমন এমনভাবে আকাশকে বলতে পারা যায়, কেউ কখনও ভেবেছে কি? এই হল কবিতায় অভাবনীয়কে ডেকে আনা। এক মুহূর্তে দিনটি তার সবটুকু নিয়ে ফুটে উঠল। 'রোদ'-ই বা কেমন? না, কাগজে ছাপানো যায়। এত স্বচ্ছ। এও আরেক আশ্চর্যের আবির্ভাব। অথচ 'দিন' শব্দটি পুরো কবিতার কোথাও নেই। কোথাও না। অ্যাবসেন্ট। আবসাঁ। মালার্মের সেই 'আবসাঁ'। কিছুটা দূরে গিয়ে মনে পড়তে পারে 'রৌদ্রময় অনুপস্থিত।' দিনটির দিকে তাকালে মনে হয় উৎসবের সূচনা হয়েছে কোথাও। অথচ উৎসবের হইহই বা ভিড়কে দেখা যাচ্ছে না। আবার, খুব কিছু নির্জন বা শুনশানও নয়। কারণ, 'এমন এমন লোক এখন বাইরে, মেয়েদের হাঁটা যেন নাচের ছন্দ, এমনভাবে সিঁদুর রাখছে কপালে'—যেন চারিদিক কেমন মাঙ্গলিক হয়ে আছে। ওড়িশিপাকের নাচের সঙ্গে সিঁদুরপরা মুখ সব। আর তার ঠিক আগে একটি লাইন আছে, এমন সব মাতোয়ারা গেছে ভেতরে—এই হল, এ-কবির নিজস্ব সিগনেচার। শক্তির যেমন ছিল নিজস্ব সিলমোহর : চুম্বনের মধ্যে পেয়ে তড়িৎতাড়িত আশুতোষ / সংস্পর্শ...এইখানে 'আশুতোষ' শব্দটি যে আসতে পারে, সে কথা শক্তিই শুধু ভাবতে পারেন। তেমনই, আমাদের এই কবি, স্বদেশ সেন—এতক্ষণে নাম বলবার অবকাশ পেলাম—তিনি ছাড়া 'মাতোয়ারা' শব্দটির এমন ব্যবহার আমাদের ধারণার বাইরে। শব্দের এমন ধারণাতীত প্রয়োগের ঐশ্বর্যে ভরে আছে তাঁর কবিতার পর কবিতা। এখানে 'মাতোয়ারা' কথাটি এমন জায়গায় রাখা হয়েছে যে, শব্দটি নানা স্তরে তার অর্থের চকিত বিদ্যুৎ প্রেরণ করছে। এইরকম জায়গায় বসানোর ফলে মাতোযারা শব্দটির যে বাচ্যার্থ, তা টলমল করে উঠল। এইখানেই এই কবির ক্ষমতা বোঝা যায় যে, অর্থের যে নির্বাচিত সীমা সম্বল করে শব্দ নিরন্তর ব্যবহৃত হয়ে চলেছে, সেই সীমা থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া। 'গ্রন্থি' পত্রিকার সাক্ষাৎকারে স্বদেশ সেন জানিয়েছিলেন 'শব্দ এবং শব্দকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে সাজানো অর্থাৎ বাক্যের গঠনই কবিতার মূল চ্যালেঞ্জ।' 'এমন এমন সব মাতোয়ারা গেছে ভেতরে'—কার ভেতরে? শেষ পর্যন্ত আমার ভেতরে কি? নাকি তারা বাইরে থেকে গেছে ঘরের ভেতরে? 'মাতোয়ারা' কে? তারা কি এই অপূর্ব স্বাধীন নীল দিনটির গন্ধবাতাস? নাকি কোনো মেয়ে? নাকি কয়েকেজন মেয়ের একটি গুচ্ছ? নাকি, সদ্য জেগে উঠতে থাকা নেশার উদ্দীপনা? কী গেছে ভেতরে ? কারা গেছে? একসঙ্গে এই সবকটি অর্থস্তর ছুঁয়ে আসে লাইনটি।

এক্ষুনি আমি দিনটিকে নীল বলে উল্লেখ করেছি। কবিতাটির কোথাও কিন্তু 'নীল' শব্দটির উল্লেখ নেই। কিন্তু আমি মনে মনে দিনটির সঙ্গে নীল রং দেখলাম যে। আমার মনের মধ্যে পায়রা পিছলে যাওয়া যে আকাশ, সেই আকাশ যে আশ্চর্যরকম নীল। এমন

আকাশের জুড়ি আগেও পেয়েছি তাঁর কবিতায়। এমন পায়রার। 'উড়েছে পায়রাপাখি এক ডাকে নীলের ওপরে।' সেইরকম আশ্চর্য উৎসব উৎসব গন্ধ ভরা দিনটিতে কেউ একটা কথা কিন্তু বুঝতে পারবে না।

কী? কী সেই কথা? 'আমাদের আর স্থায়ী চাকরি নেই।'

বাস্তবের রূঢ় কঠিন সমস্যাজগতে আমাদের দাঁড় করিয়ে দিলেন কবি। এত যে আনন্দ চারিদিকে, কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ল। শেষ লাইনে 'আর' শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ সদ্য জানা গেছে আমাদের চাকরিটি আর স্থায়ী রইল না। যে কোনো সময় পুরোটাই 'না' হয়ে যেতে পারে। অথচ সমস্ত প্রকৃতি আনন্দে ঝলমল করছে। আমরা কিন্তু জানলাম আমাদের ভবিষ্যৎ আর নিরাপদ নয়। এই অপরূপ দিনটির বিপক্ষে এই তথ্যটি এসে দাঁড়ালেও আমাদের বিষণ্ণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তোলা যাবে না। আমাদের যে এত কষ্ট, আমাদের দেখে কেউ বুঝতে পারবে কেন। এই যে, সামনের এই দিনটির দিকে তাকিয়ে দেখছ না!

এইখানেই স্বদেশ সেনের কবিতা, আমার কাছে এক রৌদ্রালোক। এই পোড়াদেশের রাস্তাঘাট ঘরবসত গাছপালা গাঁ-গঞ্জের মধ্যে দিয়ে আশাভরসার এক অনায়াস সূর্য তিনি বহন করে নিয়ে চলেন সঙ্গে করে। রাস্তার ধারে ধারে রেখে যাওয়া নিরন্ন বা আধপেটা ঘর দাওয়া উঠোন সবই তাঁর জানা। কিন্তু স্বদেশ সেনের কবিতার যাতায়াতের পথে কোথাও বিদ্বেষ প্রতিহিংসা নেই।

আবার মেনে নেওয়াও নেই। এ এক নতুন কবি। দেখবেন কেমন?

একটা লোকের মাথায় ঝড় বলতে ঝোড়ো মাথা
আর একজন তার একমাথা বৃষ্টি
নাম ঝড়জল, নাম শাখাপ্রশাখা।
দু লোক তাবৎ দেশ ঘুরে বেড়ায়
ইচ্ছার কল্পনা আর কল্পনার দুঃখ নিয়ে
দেশের রোদে হাঁটে
দেশের ছায়াপাতায় যায়
যে চিনতে চায়
তারই চেনা হয়ে থাকে
খিদে পেলে যা পায় তাই
ঘুমে একপাশ মনে রেখে আর একপাশে
হাঁপিয়ে গেলে বড়ো বড়ো শ্বাস দিয়ে নামায়
কত দিনের তল্পিতল্পা শুধু ঘাড়ে
ঘাড় ছিল তাই।

একদিন ঝড়কে বলি সেই মাথা কোথায়
বৃষ্টি পড়াকে বলি কোথায় বৃষ্টি মাথার গাছ?

এই যে দুটি মানুষ ফুটে উঠল মাঠঘাটগাছপালা থেকে, এরা কি শ্রমিক মানুষ? কত কতদিন ধরে নিরন্তর কাজ এদের ঘাড়ে? কত দিনের বহন? কত হাঁপিয়ে যাওয়ার কথাও তো এ কবিতায়। তবু তাঁরা দেশের রোদে হাঁটে, দেশের ছায়াপাতায় যায়। কিন্তু কোথাও কি মনে হয়, আহা এদের বড্ড কষ্ট! আহা এরা বড়ো হাঁপিয়ে গেছে গো! না, মনে হয় না। কারণ চিরকাল যেসব মানুষ নদীর ধারে ধারে গড়ে তুলেছে সভ্যতা, পরিশ্রমে পরিশ্রমে তৈরি করেছে ফসল, কাঁধ দিয়ে ঠেলে তুলেছে ঊষর মাঠে নগর, এরা সেই মানুষ। এরা লোকায়ত জীবনের মধ্য থেকে এসে এই গাছপালা প্রকৃতির মধ্যেও কেমন যেন একটা চিরস্থায়ী রূপ পায়। স্বদেশ সেনের কবিতায় ভালোবাসা এমন একটা জোরালো ও সর্বব্যাপী চেহারা নিয়ে উপস্থিত যে করুণা, তার ছায়া ফেলবার সাহস পায় না সেখানে। এই শ্রমশীল মানুষদুটির সঙ্গে ঝড়কে বৃষ্টিকে গাছকে যুক্ত করে তিনি প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে মিলিয়ে দিয়েছেন। প্রতিদিনের নশ্বর চেহারা থেকে তাদের অবিনশ্বর করে দিয়েছেন।

এই কবিকে দেখিনি কখনও। আলাপ-পরিচয় হয়নি। 'কৌরব' প্রকাশিত তাঁর কবিতা সমগ্র 'স্বদেশ সেনের স্বদেশ' বইটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপি থেকে জানা যায় তিনি জামসেদপুরের শিল্পাঞ্চলেই বসবাস করেছেন জীবনের বেশিরভাগ সময়। শ্রমিক মানুষ তিনি দেখেছেন নিশ্চয়, কিন্তু কী গভীর সম্মানের সঙ্গে যে দেখেছেন মানুষের পরিশ্রমের রূপ। একসময় বেকার যুবকদের জীবনের অব্যবহৃত পরিত্যক্ত অগ্নি তাঁর কবিতায় এসেছে।

আমাকে একটা কাজ দাও, যে কোনও, যেমন তেমন
একটা কাজ
মাইরি-মেরী করে বলছি একটা কাজ দাও
এই নিত্যি দিনের বানভাসি আর ভাল্লাগছে না
বেসিমার চুল্লীতে আমি দু'হাতে করে লোহার ক্লাথ ছেঁকে নেবে
আমি ঝুড়িতে চন্দন নেওয়ার মতো করে টানবো স্লাগ
আমাকে ন'শো পাউন্ডের একটা বৈদ্যুতিক হাতুড়ি করে নিও
যা দিয়ে জ্বলন্ত ইনগটগুলো ছু বলতে উরুর নিচে পেড়ে ফেলা যায়
তা নইলে কী করব বুকের এই ন'লক্ষ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ নিয়ে
শেষে কি জ্বালাবো তোমাদের সাজানো বাগান, টেবিল, মেহগিনি, ফুলবাড়ি
আমি কি শেষ পর্যন্ত জ্বলতে জ্বলতে দু'চোখের
চামড়া খুইয়ে তোমাদের অন্দরে ঢুকে পড়ব?

মনে রাখতে হবে ৬৯ সালে লেখা এই কবিতাকে সত্য প্রমাণিত করে দেশে তখন জ্বলে

উঠল যুবকদের আন্দোলন, যার নাম নকশালবাড়ি। রিলকে তার ডুইনো দুর্গে এক রকমের দৈববাণী শুনেছিলেন, সোফোক্লেসের অয়দিপাউস শুনেছিল অন্য এক দৈবাদেশ—আর এ হল সম্পূর্ণ আলাদা এক ভবিষ্যৎবাণী, অধিকাংশ মানুষের কাছে অশ্রুত থাকলেও যা বলে যায়, তারুণ্য বিপ্লবের ডাক দিচ্ছে।

'আমাকে ন'শো পাউন্ডের একটা বৈদ্যুতিক হাতুড়ি করে নিও' এই লাইনটি ভাবুন। অথবা, 'নইলে কী করব বুকের এই ন'লক্ষ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ নিয়ে?' এইসব লাইনের মধ্যে তারুণ্যের অগ্নিস্রোত কীভাবে ধরা পড়েছে। ইস্পাত কারখানার কাজের নানা অনুপুঙ্খকে সম্পূর্ণ নিজের শক্তিতে ও অর্থে ব্যবহার করা হল এখানে। কাজ না-পাওয়াদের নিয়ে লেখা সেদিনের এই কবিতার পর আজ, এই কাজ আর মানুষের শ্রম নিয়ে কী লেখেন তিনি?

> সকালবেলার কাজে যাচ্ছে পেশীবহুল মানুষ
> নতুন কারখানায় হয়তো নতুন কাজ
> হয়তো আমাবাগানে এবারের আম তুলতে
> না কি অনর্গল হন্টনে অথবা দেশব্রতে যাবে?
> যাচ্ছ যাও।

মানুষের কাজ, কিংবা কাজ করা মানুষকে দেখা, স্বদেশ সেনের কবিতায় যেন ঈশ্বরের মতো প্রধান। অথচ ঈশ্বর বললে যে দূরত্ব তৈরি হয়, সে দূরত্বটুকু নেই। কোথাও মহান করাও নেই। তার মহত্ব আপনি ফুটে বেরোয়। এত কাছাকাছি আর আপন। এক্ষুনি যে কবিতার শুরুটা বললাম, তার শেষে কিন্তু প্রেমের উদ্ভাস।

> হেঁটোয় কিংবা ওপরে কাঁটা
> কাদানো মাটি কিংবা ভাঙা দেঁওয়ালে দাঁড়িয়েও
> এবার একবার হাসব
> ফুটকাটা মুখের ওপরে আদর রাখবো
> কেউ আমাকে ঠেকাতে পারবে এই ভোরবেলায়?

. এই যে, 'কেউ আমাকে ঠেকাতে পারবে এই ভোরবেলায়?' কিংবা 'আমি আদর রাখবোই'—এই জোরটাতেই রৌদ্রালোক দেখতে পাই আমি। বিশ্বাসের জোর। সেই জন্যই তিনি লিখেছিলেন একবার :

> সাদামাটা কথার জোরই আমার জোর
> আমার বিষয় বলতে তোমার বিষয়

মাত্রাহীন অসীম আবার কিসের বিষয়
আমার বিষয় টাট্টুর বাজারে টাট্টু।
তোমার পুঁজি ভাঙা
আর দেনা শোধের কষ্টই এক বিষয়।

এই যে 'আমার বিষয় বলতে তোমার বিষয়', এইখানেই তিনি বড়ো কবি। তিনি সারাক্ষণ দেখতে পাচ্ছেন কী কষ্টে বেঁচে থাকাকে ধরছে ঘরে ঘরে মানুষ। তিনি জানেন, পুঁজিভাঙা কী। কাকে বলে দেনা শোধের কষ্ট। আর কী আশ্চর্য, এর পাশে পাশেই এসে পড়ে আমার বিষয় টাট্টুর বাজারে টাট্টু। একেবারে স্বদেশ সেনের সেই নিজস্ব সিগনেচার। যেন বেপরোয়া একটা চাপড়। একটা উল্লাস। একটা কাঁধ ঝাঁকুনিতে সব দুশ্চিন্তাকে ফেলে দেওয়া। যদিও তিনি জানেন, শুকনো জলের শুকিয়ে আসাই এক বিষয়।

তিনি মানুষের আরও এক প্রধান বিষয় জানেন। তাই বলতে পারেন খাদ্য দিবস নামের এই কবিতায়

গোগ্রাসে খাও
বাড়াবাড়ির খাওয়া
লজ্জা কোরো না
আগে এক, পরে আবার
ডিনার কিংবা ডালভাত
আমিষ কি নিরামিষ
সব ডাঁই অস্পষ্ট করে দাও
খাও
খাওয়া কখনও শেষ হয় না
কোনও দিন কোনওভাবে শেষ হবে না তার
এখনকার পেটে এখন
খাও
সেই যা মানুষে খায়
সাপটানো খাওয়া—
যা কিছু কঠিন, ঠাসা আর ছলকানো
লম্বা ঠাসা, গোল আর ঝরঝরে
যদি রক্তে যায়
যদি ভাঙে
খাও
খাওয়া ছাড়া আর আমাদের কী আছে ভাই?

শেষের এই লাইনটি এবং সেখানে এই 'ভাই' বলে ডাকটুকু বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। এই নিরন্ন দেশের মানুষের কথা জ্বলজ্বল করতে থাকে ভালোবাসায়। কোথাও তা স্লোগানমুখর নয়। আবার অতিরিক্ত শিল্প কৌশল এসে কোথাও বিষয়ের প্রাণবস্তুকে পাথরচাপা দেয়নি। অথচ কী নিপুণভাবে ওরই মধ্যে গুঁজে দেওয়া একটি দুটি লাইন—যদি রক্তে যায় / যদি ভাঙে। খাদ্য তো ভেতরে গিয়ে ভাঙে, পুষ্টিতে রূপান্তর পায়। ঠিকই। তবু এই সমস্ত কবিতাটির মধ্যে দিয়ে অন্য দিকেও আলো ছুটে যায়। 'যদি ভাঙে' এই কথাটায়। গোপনে, ইস্তাহার পাচার করার মতো জামার ভেতরে পেটের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া বুলেটিনের বান্ডিল যেন। যদি ভাঙে। কাদের কথা এ কবিতা বলছে? তাদেরই জন্য বলা যদি ভাঙে। ভাঙবে তো একদিন বটেই। পুরোনো ব্যবস্থার ইমারত। ভাঙবে। সেই বিশ্বাস। সেই রৌদ্রালোক। যে বিশ্বাস বলতে পারে, 'তুমি ভাই, তুমি আগায়ে এসো / বন্ধনরূপকে একটা মার দাও।'

স্বদেশ সেনের কবিতায় দুঃখে কেউ ভেঙে পড়ে না। সেখানে হতাশ হয়ে শয্যা নেয়নি কোনো অবসাদ। কারণ, বেঁচে থাকার জন্য বড়ো অল্প চাহিদা যে তাঁর। আবারও বলি, এ কবি আমার অপরিচিত, তাঁর জীবন যাপন জানি না। কিন্তু তাঁর কবিতা যে জীবন কাটায়, তাতে অল্পেই তার মন ভরে ওঠে। অল্পেই চলে যায় স্বদেশ সেনের কবিতার সংসার।

বাংলাদেশের আনন্দ নিয়ে আছি
পাই পাতার বড়া আর কি চাই
পাঠ্য বইয়ে সুরভি গাই থাকলেই হল
তালগাছে লতানো জংলাবাংলা

শিশুদের পাঠ্য বইতে গাভির ছবি, সেই কত আনন্দ। তালগাছের দীর্ঘতা জড়িয়ে উঠে গেছে লতাগাছ। সেই হল জংলাবাংলা। কী সুন্দর! তার সঙ্গে 'আমি দেখি পুকুরপাড়ে ঘটি হাতের রহস্য।' কে একজন চান করছে। খোলা হাত আর ঘটি। নাকি আগের কালের ঘটি হাতা ব্লাউজ পরেছে সে? এই দেখাটা ভারি সুন্দর। 'ভাতে ডাল কলাই লেগে আছে। কড়াই ধরে হাত উঠছে, নোড়া লাগছে শিলে।'

ঘর উঠোন পুকুরের নিতান্ত আটপৌরে ছবি তবু এই দেখা যেন এক মাঙ্গলিক মন্ত্র।

জননী পেপে
পেকে আছে অকূল ভ'রে
দূরে

যেন এক আশীর্বাদ। এই আমাদের সাধারণ জীবনযাপনকে, এই অভাব-অভিযোগের ঘর গেরস্থালিকে, এই হাড়ভাঙা মাথার ঘাম পায়ে ফেলা-কে, এই দেশ-প্রকৃতিকে যেন আশীর্বাদ

করে চলেছেন এক কবি তার কবিতায়। বলছেন—

যখন তেতোর ডালও আপন হয়ে গেল
তখন কে তোমাকে রোদে সেঁকে হাওয়ায় মেলে দিল

তোমার তো খাওয়া হয়নি খাবার থালা।

সত্যি তো। সবার খাওয়া হয়ে গেল কিন্তু খাবার থালা তো খায়নি এখনও। এ কথা কে বলতে পারে! কার নজর এত সবার ওপরে! এই দৃষ্টি প্রায় ঈশ্বরের মতো। মায়েদের কথা মনে পড়ে। সবার খাওয়ার জোগাড় করে তাঁদের জন্যে কী থাকে? অভাবী সংসারে? ফলন্ত গাছের পেঁপে দেখে কে ভাবতে পারে জননী? কে বলতে পারে

বেলতোড়ায় আটকে আছে
খোকন একটি বাতাবী ফল

বাতাবি ফলকে এই খোকন বলা? কেউ আগে ভেবেছে কখনও? এই আদিগন্ত স্নেহ? 'একটা মাদারি গাছ বলেছিল লাগেনি তো খোকা।' সন্তান সন্ততির অবিরল চলে আসবার প্রবাহে তিনি দেখতে পান শুধু মানুষকে নয়, উদ্ভিদজগতকেও। এই দেশের ছায়াপাতায় যাওয়া গাছপাতাকে ছোঁয়া যেন হাত বুলিয়ে দেওয়া ছেলের মাথায়।

এই হল সেই দেখা যাকে বলা যায় :

কেউ আছে যার দেখে ফেলাই জয়!

এই দৃষ্টি কবির দৃষ্টি। যিনি বলতে পারেন, 'যদি ছবির মতো ধান গোলায় না-হয় তবে আমাকে এই মাটির উপর জমতে দিও।' গোলা যদি না পাওয়া যায়, তবে মাটিতে স্তূপ করা ধানের মতো জমা হব আমি। এই স্বপ্ন, এই বাসনা কি আর কোনো কবি জানিয়েছেন? সেইজন্যই এই কবি বলতে পারেন : 'পৃথিবীতে তুমি কখনও বোলো না জায়গা নেই।' বলতে পারেন এমন ময়নাকে ভাবো সারি দিয়ে যার সমস্ত গাছপাকা / ওই আবুলি মন্দির ওই রাভা ঠাকুর, শ্রীমধুসূদন / ওই ভূমিতল ওই ঊর্ধ্বগমন ওই ছুটন্ত ই-মেল।

এই লাইনগুলির সঙ্গে ছুটন্ত ই-মেল-কে ভাবা যায় না। কিন্তু জগৎ ছুটছে, বার্তা ছুটছে, প্রাণ তীব্রবেগে চলমান, আর ভূমিতল বুক পেতে ধরে রয়েছে সব, গতি আর স্থিতি একই পৃথিবীব্যাপ্ত করে রয়েছে।

শেক্সপিয়র লিখেছিলেন তাঁর কিং লিয়র-এ :

রাইপনেস ইজ অল। স্বদেশ সেন জানেন : কাঁচা বললেই একটা অপেক্ষা। পেকে ওঠা,

পূর্ণতা-র দিকে চলেছে এই মানুষ, প্রকৃতি জগৎ। সেই জগৎকে এক নবীন স্নেহ দিয়ে স্পর্শ করছেন এই কবি। বলছেন, 'ফুটিয়ে দিলাম, ও যে অফুটন্ত ছিল।' বলছেন, 'প্রথমভাগের হাসি / তার পাশেই বসো / বসো মানিক।' শিশুবেলার হাসি তো আমাদের জীবনের প্রথমভাগের হাসি। আবার এখানে বিদ্যাসাগরের প্রথমভাগও মনে পড়ে। মনে পড়ে কোনো শিশুর পড়তে বসার আনন্দ। সেও যেন এক খেলাই। এক আদর। এই আদর করে বলাটাই নানাভাবে বিছিয়ে আছে তাঁর কবিতায়। এর ফলে সমস্ত অচেনা মানুষ ছড়ানো ঘর সংসার, গাছ, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে চলে যাওয়া হাওয়া, ভোরবেলার কাজে বেরোনো লোক, উড়ে যাওয়া পাখি, চেনা-অচেনা কুলি-কামিন সবই যেন তাঁর নিজের পরিবার-এর অন্তর্গত হয়ে যায়। স্বদেশ সেন-এর কবিতায় কেউ যেন বাইরের লোক নেই। ওই দূর দিগন্ত পর্যন্ত যা যা দেখতে পাওয়া যায়, তেপান্তরের শেষে এই তালগাছ পর্যন্ত তাঁর আত্মীয়। আর

বলেই তাঁর কবিতা বলে ওঠে, 'সাহায্য করো বললেই আমি যেতে চাই, ইচ্ছে করে সব দুধ তোলায় সাহায্য করি।...' আর দিগন্ত পর্যন্ত যা কিছু চোখে পড়ে তাই যখন আত্মীয় হয়ে যায়, তখন এসে পড়ে বিশ্বলোক।

> যার যখন নিজের কোনো কথা নেই সে অপরিচিত। পিঁড়িতে এনে বসাও। দেখো কীভাবে কী হয়। যেদিকে যা শূন্য তার অন্তরালে কত কিছু হয়। আপনা আপনা প্রাণ ধকধক ধকধক করে। স্পষ্ট করে ওকে তোলো সাত সকালের তোলা, শব্দের সারিতে এনে বসাও। একবার তোলা চোখের দৃষ্টি দাও। কর্ণমূলে কথা রাখো, বুকে দাও কাজ গরম হাত। দেখো কী দিয়ে কী হয়। আম্মার দুধ ছলকে ওঠে কি না তলপেটে। খুব কাছ থেকে ভালো আর খুব বিশ্বাস নিয়ে চলে এসো টেবিল থেকে টেবিলে কার দু'কাপ চায়ের বরাত। বলো, গত উইলকিনসন, দাড়ি কাটো, মুখ ধোও, প্রকাশিত হয়ে এসো, শিউরে ওঠো স্নানের জলে, তৃপ্তিতে খাও, আগামী ও অবশ্যম্ভাবীর জন্য সুন্দর হও। চোখে যে জল তা স্বভাবের চোখে নতুন ফোঁটা হয়ে উঠুক। চন্দ্রসূর্য সাক্ষী, এক বাগানের থেকে সব বাগানের ঘাসে, বিশ্বলোকে এনে অনবরত বসাও।

এক বাগানের থেকে সব বাগানের ঘাসে...ঠিক, নিজের পল্লি পরিজন প্রতিবেশী থেকে, চরম একাকী অপরিচিত কথা হারানো মানুষটির কাছেও পৌঁছে দেওয়া যায় বিশ্বলোকের সৌন্দর্যের সাড়া। কাছে ডেকে বসানো যায়। এই কাছে ডেকে বসানোটাই স্বদেশ সেনের কবিতার স্নেহমর্ম। চন্দ্রসূর্য সাক্ষী, এই মমতা মাখা ভালোবাসাই, স্বদেশ সেনের স্বদেশ।
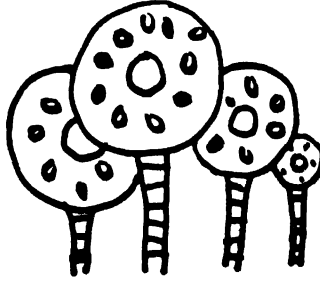
৭

গোসাঁইবাগানের পাঠকরা যেভাবে সাড়া দিতে শুরু করেছেন, তাতে আমার মন ভরে গেছে। যেমন গত সপ্তাহে অন্তত পাঁচজন আমার কাছে জানতে চেয়েছেন, স্বদেশ সেন-এর কবিতা কীভাবে বা কোথায় পাওয়া যাবে। কলেজ স্ট্রিটে খোঁজ করার কথা জানিয়েছি তাঁদের, কৌরব-এর কথা বলেছি, আমার কাছে যে বই আছে, তা থেকে ফোটোকপি করে দেব, বলেছি তাও।

এই আমার আনন্দ। কবিতা পড়ে, অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার। তবে এই এক্ষুনি যে পাঠকদের কথা বললাম, এই যে পাঁচজন, এঁদের মধ্যে কিন্তু একজনও কবিতা লেখক নেই। কেউ বিজ্ঞানী, কেউ নাট্যদলের নির্দেশক ও অভিনেতা, কেউ বা রবীন্দ্রগানের শিল্পী, কেউ সারা জীবন অভিনয় নিয়ে কাটানো, শম্ভু মিত্রের সময়কার বহুরূপী দলের সদস্য পঁচাত্তর উত্তীর্ণ যুবক। এই পাঁচজনের মতো আরও আরও সব পাঁচজনের দেখা আমি জীবনের এপথে ওপথে বারবারই পেয়ে গেছি, গোসাঁইবাগান লিখতে এসে আবারও পাচ্ছি। রাশিদ খান বা উল্লাস কোশলকরের গান যেমন কেবল সংগীত রিসার্চ অ্যাকাডেমির ছাত্রছাত্রী বা অন্য গায়ক গায়িকারাই শোনেন না, অনেক সাধারণ অগায়ক শ্রোতাও গিয়ে সম্মেলনগুলিতে প্রেক্ষাগৃহের পিছন সিটে বসে থাকেন তাঁদের গানের জন্য। কবিতারও এমন অনেক পাঠক আছেন, যাঁরা নিজেরা সাহিত্যচর্চা করেন না। যাঁরা নিজেদের খানিকটা লুকিয়ে রাখেন, দৈবাৎ তাঁদের প্রিয় কবির সামনে গিয়ে পড়লেও কেমন সংকুচিত হয়ে পড়েন। বলার কথা খুঁজে পান না। একজন প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসককে জানি, সমাজের নানা স্তরের অনেক উচ্চ পর্যায়ের মানুষজনই টেবিলে শুয়ে তাঁর নাকে কাপড় বাঁধা টুপি ও অ্যাপ্রন পরা মূর্তি দেখেছেন, সে সব জায়গায়, মানে ওটি-তে তিনিই সর্বোচ্চ। আমি বলে থাকি, আপনি মানুষের জীবন মুঠোয় নেন। তাঁকে বইমেলার মাঠে আঙুল দিয়ে দেখালাম, ওই যে মানুষটিকে দেখছেন, অন্য দুজনের সঙ্গে কথা বলছেন, উনিই অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত।

আসুন, আলাপ করিয়ে দিই। না না, আমি কী কথা বলব! অলোকরঞ্জনের কবিতাসমগ্র প্রথম খণ্ডটি নিয়ে ইনি মুগ্ধ, জানতাম। তাই বললাম। কিন্তু দেখি, মুখোমুখি কথা বলতে কুণ্ঠা। এই কুণ্ঠা আমি বুঝতে পারি। একবার ঘরোয়া এক সমাবেশে রাশিদ খান খুবই কাছাকাছি ছিলেন আমার, আলাপ করিয়ে দেওয়ার মতো বন্ধুও ছিলেন, কিন্তু গেলাম না। মনে হল, কী বলব, আপনার গান ভালো লাগে? এই কথাটা দিয়ে কতটুকু অর্থ বহন করাতে পারব? আমার জীবনের কত একাকী মুহূর্ত, ভালোবাসার মুহূর্ত ভরে ছিল ওই গায়কের সুরে, তা কি কখনও বলা যাবে?

আর বলার চেষ্টাই বা করব কেন? আমার সেই একাকী মুহূর্তটিকে কি আমি ওই সমাবেশের মধ্যে তাঁর সামনে ফুটিয়ে তুলতে পারব! তার চেয়ে নীরবতাই শুদ্ধ। শ্রেয়। উল্লাস কোশলকরকে দেখলেই আমার কী মনে পড়ে, তা কি আমি কখনও বলতে পারব?

তাঁকে দেখলেই আমার মনে পড়ে একটি বিশেষ গানের কথা। গগন ঘন ঘন ঘমাণ্ড কি। দেশ-এর একটি বন্দিশ। আমি দাঁড়িয়ে আছি পাঁচতলার একটা ফ্ল্যাটবাড়ির ছাদের দরজায়। ঘন কালো-নীল মেঘে বৃষ্টি এল এই মাত্র। চারদিকে ঝমঝম আওয়াজ। ওই নীল-কালো মেঘের মধ্যে ফাটল ধরিয়ে, ঝিলকে উঠল বিদ্যুৎ। আর আমার মনে পড়ল একটি মেয়ের কথা। সে এই কিছুক্ষণ আগে আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়েছে বাড়ি যাবে বলে। এখন নিশ্চয়ই রাস্তায়। তখন এত মোবাইলের চল হয়নি। বাড়ি পৌঁছোল কি না, জানার উপায় নেই। আমি শুধু নীচে নেমে এসে কাবেরীকে জিজ্ঞেস করলাম, ওকে একটা ছাতা দিয়ে দিয়েছিলে তো? কাবেরী বলল, কিছুতেই নিল না, বলল, হারিয়ে ফেলব। আমি ভাবতে লাগলাম, নিশ্চয়ই বৃষ্টিতে ভিজে জ্বরে পড়বে মেয়েটা। তারপর দ্রুত সেই উদ্‌বেগও চলে গেল। মনে মনে দেখতে লাগলাম বৃষ্টির ভেতর দিয়ে ছাতাহীন হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরছে সে।

এ কথাটা মেয়েটিকে কখনও বলা হয়নি। উল্লাসজিকে বলার তো প্রশ্নই নেই। আমার এই ঘটনাটুকু জানে কেবল ওই দেশ রাগ।

উল্লাসজি না হয় বিখ্যাত গায়ক, সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধামেশানো একটি দূরত্ব থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু সেদিনের ছেলে সন্দীপন? সন্দীপন সমাজপতি? সে তো আমার থেকে কতই ছোটো। এক আসরে গাইল, এই দেশ-ই : মেহা রে-এ, বন বন ডারে ডারে...! কী বলব? অবাক আমি তরুণ গলার গান শুনে। কিন্তু এ কথা বললেও কিছুই বলা হয় না। মেট্রোতে একদিন দেখা হল সন্দীপনের সঙ্গে। এ কথা সে কথায় সময় গেল। বলতে তো পারলাম না, তোমার গানটা আমার কী করেছে। ওর ওই আসরের পরদিনই গেছি শান্তিনিকেতনে। সেখানে তিনতলার ঘরে এক দুপুর। সামনে বারান্দায় দাঁড়ালাম। ঘন গাছপালার পিছন থেকে স্তূপ করা কালো মেঘ উঠে এল। আমার ভিতরে শুরু হল আগের সন্ধ্যায় শোনা সন্দীপনের ওই গান : মেহা রে...।' সেখানে সন্দীপন নেই। কোনোভাবে তার গানটাই আছে। দেখতে দেখতে আকাশ ছেয়ে ফেলল মেঘ, হাওয়া বইতে লাগল। তারপর মেঘ

এসে দাঁড়াল ছাদের ওপর। যেভাবে সন্দীপন, গানের শুরুতে 'মেহা রে' গাওয়ার সময় পা থেকে নি-তে যেতে খুব যত্ন করে দেরি করল, তারপর নি-তে সামান্য অপেক্ষা করে, অবশেষে সা-য়ে গিয়ে দাঁড়াল—মেঘটাও অবিকল সেইভাবে সময় নিল গাছপালার পিছন থেকে উঠে আমাদের ছাদের ওপর এসে দাঁড়াতে। সা রে মা পা নি সা। পুরো দেশ রাগ দিয়ে দিগন্ত থেকে ছাদ পর্যন্ত আকাশ ঢেকে গেল। বৃষ্টি শুরু হল এক ফোঁটা দু-ফোঁটা করে। বড়ো বড়ো ফোঁটা পড়ছে বারান্দায়। এখনও বৃষ্টি পুরো ঝাপটা নিয়ে আসেনি। ঘরের দরজায় এসে একজন দাঁড়িয়েছে। বলছে, খেতে চলুন, তিনটে বেজে গেল যে। তার মুখের দিকে তাকাতে পারি না অনেকদিনই। এখন আরও পারছি না। এ গাছ থেকে ও গাছে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল কী যেন পাখি। সন্দীপন যেন তখন অন্তরাটা ধরেছে: কারি ঘটা ঘন ফির উমরাওত। পাপিহা বোওলে সদারঙ্গ কি মনওয়া লরজে...ওই পাখিটা মোটেই 'পাপিহা' নয় আমি জানি। এমনকি ওই বৃষ্টিতে কোথাও সদারঙ্গ আছেন, ওই ঝোড়ো বাতাস আর গাছপালার দোলায় আছেন সদারঙ্গ, যিনি এই গানটি বেঁধেছেন। মেঘ দেখে যে সদারঙ্গের মন খুশি বলে এই গান দাবি করছে। কিন্তু আজ, এই শান্তিনিকেতনের দুপুরবেলায়, কেউই জানে না, 'পাপিহা' কোথায়। দেশ-এ কোমল গা কি সচরাচর লাগে? না তো। লাগে না তো। কিন্তু গানের কথার মধ্যে 'পাপিহা' আসতেই কোথা থেকে যেন কোমল গা গিয়ে পড়ল তার কপালে। যার জীবনে যখন প্রেম আসা উচিত নয়, জীবনে যখন প্রেম এলে খারাপ দেখায়, ঠিক তখন, তখনও, যদি কারও দরজায় এসে দাঁড়ায় প্রেম, তাহলে কী হয়? তাহলে সে, ওই 'মেহারে...' গানের বিবাদী স্বর লাগা 'পাপিহা' হয়ে যায়। একরকম চোট লাগা পাখি যেন। অসহায়ভাবে বেদনাময়—যখন বেদনাই তার সৌন্দর্য। সেই 'পাপিহা'র কথা তার গায়ককে গিয়ে বলা যায় না। গানটিকেই শুধু বলা যায়। কবিতার পাঠকও তাই। তার কাছে এসে যখন পৌঁছোয় কবিতাটি, তখন কবিতাটিকে সে নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যে বসতে জায়গা করে দেয়। তার ভিতরকার সঞ্চিত অভিজ্ঞতার পরিবেশের সঙ্গে কবিতাটির যে অভিজ্ঞতার সঞ্চয়, তা মেলামেশা করতে শুরু করে।

গোসাঁইবাগানের প্রথম সংখ্যায় লিখেছিলাম, অলোকরঞ্জন-এর 'নির্বাসন' কবিতাটির কথা। যার শুরু এইভাবে—'আমি যত গ্রাম দেখি / মনে হয় / মায়ের শৈশব।' সেই কবিতাটিই শেষ হচ্ছে—'ঝর্ণার পরেই নদী, নদীর শিয়রে / বাঁশের সাঁকোর অভিমান / যেই দেখি, মনে হয় / নোয়াখালি, শীর্ণ সেতু, আর সে নাছোড় ভগবান।' এই কবিতাটি সম্পর্কে আমার লেখা পড়ে চেন্নাইয়ের ব্যাঙ্ক অফিসার দীপঙ্কর গুপ্ত একটি সাক্ষাতের সুযোগে খুব সংকোচের সঙ্গে জানালেন, 'আপনার লেখা তো ঠিকই আছে। কী আর বলব! কিন্তু আমার আরও একটা কথাও মনে পড়ে।' দীপঙ্কর জানালেন, এই কবিতার মধ্যে কোথাও গান্ধিজির কথাও বলা আছে বলে উনি মনে করেন। কবিতাটি পড়বার সময় নোয়াখালি শব্দটি থেকে তাঁর নোয়াখালির সেই দাঙ্গার কথা মনে হয়েছে, মনে হয়েছে গান্ধিজির সেখানে যাওয়া, এমনকি ঝুঁকে হেঁটে যাওয়ার ভঙ্গি।

এর কিছুকাল পরে দেখলাম পাণ্ডুয়া থেকে প্রকাশিত ও শেখ নসরত আলি সম্পাদিত 'চিরাগ' পত্রিকায় রন্তিদেব সরকার এই কবিতাটির শেষ লাইনগুলি উদ্ধৃত করে লিখেছেন, 'যাঁরা নোয়াখালির দাঙ্গার কথা জানেন তাঁরা শেষের লাইনটি পড়লেই বুঝতে পারবেন, যে ওই শীর্ণ বংশের সেতু বেয়ে গান্ধিজির একটি ফোটো আছে, নোয়াখালিতে যখন উনি দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকায় যান।'

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম দীপঙ্করের অনুভব ক্ষমতায়। এই অজানা দীপঙ্কর, অচেনা রন্তিদেব, এঁদের মতো পাঠক আছেন বলেই না আজও আমি কিছু শিখতে পারি।

গোসাঁইবাগানে একবার লিখেছিলাম শক্তির একটি কবিতার কথা : 'হলুদ শস্যের মধ্যে হাত পেতে দাঁড়িয়ে রয়েছে / একা লোকটি...।' এই কবিতার মধ্যে একটি ডাক ছিলঃ 'অন্নপূর্ণা, অন্ন দাও' বলে... মাঠে একা দাঁড়িয়ে রয়েছে...। সুব্রত মুখোপাধ্যায় লিখে পাঠালেন, এই ডাক-এর কথা শুনে তাঁর মনে পড়ছে ভবানীচরণ দাসের গান : 'অন্ন দে, অন্ন দে, অন্ন দে মা, অন্নদা।' ভ্যান গখ-এর আঁকা বীজ ছড়ানো কৃষকের ছবি আমার মনে পড়েছিল কবিতাটি থেকে। মনে পড়েছিল দুর্গার সামনে দাঁড়ানো মহাদেব-এর ভিক্ষুকমূর্তি। আর একজনের মনে পড়ল ভবানীচরণ দাসের গান। একটি কবিতা থেকে অনুভবরেখা কত ভিন্ন ভিন্ন দিকে যায়, অনুভবের মস্ত একটা পৃথিবী,—কবিতা, ছবি, গান, নাটক—এক শিল্পের সঙ্গে অন্য শিল্পকে যুক্ত করতে করতে চলে, এ শুধু পাঠকরাই শেখান আমাকে। অথচ কতই না কুণ্ঠা তাঁদের। আজকের গোসাঁইবাগান যখন পাঠকদের নিয়েই তখন এক পাঠিকার গল্প বলে শেষ করি।

কলকাতায় থাকেন এক কবি, সুদূর শিলচর থেকে মাঝে মাঝে তাঁর কাছে এসে পৌঁছোয় চিঠি। যিনি লেখেন চিঠি, তিনি শিলচরের কাছে ডাকবিভাগে চাকরি করেন। সাধারণ চাকরি। কিন্তু তাঁর কবিতা পড়ার মনটি অসাধারণ। খুব ঘন ঘন যে চিঠি লেখেন, তাও নয়। কখনও এক বছরে একটি। তারপর দু-বছরে একটি। দুই চিঠির মধ্যে বিরতি লম্বা হতে থাকে। এক সময় চিঠি আসা বন্ধই হয়ে যায়।

একদিন একটি ফোন আসে কবির কাছে। অচেনা একটি যুবক ফোনেই প্রণাম নিবেদন করে আর্জি জানায় তাঁব কাছে যে, একদিন একটু দেখা করতে চায় সে। এমন অনেক ফোনই আসে কবির কাছে। এমন অনেকেই দেখা করতে চায়। তিনি জানিয়ে দেন, কোনো রবিবার সকালে দশটা-এগারোটায় আসতে পারে সে।

সাধারণত রবিবার সকালে এই কবি কোনো কাজ রাখেন না। সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেন। সেই রবিবার সকাল এগারোটায় তাঁর ঘরভর্তি লোক। এইসময় বেল বাজতে ঢুকল এক যুবক। বলল, আমার আসবার কথা ছিল। কবি বললেন, এসো, এসো। দেখা গেল, সে একা আসেনি। তার সঙ্গে আছেন এক নারী। বয়স মোটেই বেশি নয়। কিন্তু সামনের চুলে স্পষ্ট হয়েছে রুপোলি রেখা। ছেলেটি বলল, আমার পিসি। মোটা কাচের চশমার ভিতর থেকে তাকিয়ে নমস্কার করে তিনি জানালেন, যে শিলচর থেকে তিনিই মাঝে

মাঝে চিঠি লিখেছেন। কবি সৌজন্য করে বললেন, অনেকদিনই তো আর চিঠি আসে না আপনার। ভাবি, কী হল। যুবকটি ধীরে ধীরে জানায়, যে তার পিসির চোখে কিছু একটা অসুখ। কী অসুখ, তার দুর্বোধ্য একটি নাম বলেন সেই নারী। তিনি আর চিঠি লিখতে পারেন না। ডাক বিভাগের চাকরিটি কোনোমতে রক্ষা করছেন সহকর্মীদের সহায়তায়। আর যে-অসুখটি দেখা দিয়েছে, তা চোখের নয়। মস্তিষ্কের। ব্রেনে একটি অপারেশন হবে। তাই তিনি কলকাতায়।

অপারেশন কি হবে কলকাতায়? কোথায় হবে? আর কবে? না, অপারেশন হবে বোম্বেতে। কিন্তু ডাক্তাররা বলছেন অপারেশনের পর দৃষ্টিশক্তি হারানোর সম্ভাবনা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশি। যদি তাই হয়, তাহলে, আত্মীয়স্বজনদের তো আর কখনও দেখতে পাবেন না। তাই কলকাতায় এসেছেন প্রিয়জনদের চোখ ভরে দেখে যেতে।

থেমে থেমে, বললেন সেই নারী। যদি অন্ধ হয়ে যাই, আপনার কবিতা হয়তো কেউ পড়ে শোনাবে—কিন্তু কবিকে তো আর দেখতে পাব না। কবিকে কি না-দেখেই অন্ধ হয়ে যাব? তাই এলাম একবার। দেখে যেতে। এই নিন, এই ধুতি আর পাঞ্জাবি এনেছি আপনার জন্য। পরবেন। কবি তাঁর সামনের জানলা দিয়ে তাকালেন বাইরে। ঘর ভর্তি লোক নিজেদের মধ্যে নানা ভাগে ভাগ হয়ে গল্প করছে। কবি দেখলেন, বাইরে শুদ্ধ সারং-এর সময় এখন। রোদের দাপট! অথচ তিনি দেখলেন মারোয়ার অবরোহণের কোমল ঋষভ যেন ছেয়ে আছে দিগন্ত। কবি ভাবছেন, কবিতার জন্য সবচেয়ে বড়ো পুরস্কার এইমাত্র এসে পৌঁছোল আমার জীবনে। কিন্তু সে কথা কি আমি কাউকে বলতে পারি?
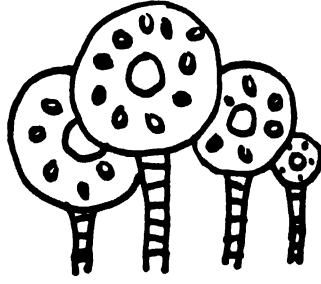
৮

আমার যে লেখাপড়া হয়নি, তার কারণ আমাদের ইস্কুলের পাঁচিলে একটা ফুটো ছিল। বড়োসড়ো একটা গর্তই বলা যায়। সেটা আবার ছিল একটু আবডাল মতো জায়গায়। জল খেতে যাওয়ার সময় সেই গর্তটা চোখে পড়ত।

একবার চোখে পড়ে গেলে নিজেকে আর আটকানো যেত না। ফুটো গলে বেরিয়ে পড়তাম। কোনোদিন টিফিন পিরিয়ডে। কোনোদিন আবার টিফিন পর্যন্ত তর সইত না।

বেরিয়ে পড়লে স্কুলের পিছনে একটা বন্ধ হয়ে যাওয়া বাজার। সেটা পার হলেই সরু লম্বা রাস্তা চলেছে, তার শেষেই একটা বটগাছ। বটগাছে অনেক মোটা সরু ঝুরি। বটগাছের সামনে দিয়ে একটা নদী চলেছে। বর্ষাকাল ছাড়া নদীটা সারাবছর রোগাই থাকে। তার নাম চূর্ণি। বইয়ের বাক্স হাতে নিয়ে নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। কত ছেলেপুলে বটের ঝুরি ধরে দোল খাচ্ছে, দুলতে দুলতে ঝপাং করে ঝাপ খাচ্ছে জলে। মাথাটা ডুবে যাচ্ছে। ভেসে উঠছে পরক্ষণে। সাঁতরে ফিরতে শুরু করছে ঘাটের দিকে। কেউ কেউ আবার মাঝনদীর দিকে চলে গেল। পারাপার করছে যে খেয়া নৌকো দুটো, তার কোনো একটার কিনার ধরে ভেসে ভেসে রইল। খেয়া নৌকো এপারে আসছে। আমার দিকেই। ঘাটে বাঁধা আছে একটা বাঁশ পেতে পেতে তৈরি করা মাচা-পথ। তার ওপর দিয়ে খড়মড় করে যাত্রীরা নামছে। আমি উঠে যাই খেয়ায়। খেয়া চলেছে লোকজন নিয়ে। ছাগল, সাইকেল, পোষা কুকুরও চলেছে খেয়ায়। ওপারে চলে গেলাম। ঘাটের ওপরে বড়ো একটা টালির ঘরের সামনের দাওয়ায় বসে আছে দুটি লোক, তাদের সামনে অজস্র খুচরো পয়সা। আমি তিন পয়সা দিলাম পকেট থেকে বার করে। দু-রকম তিনরকমভাবে তিন পয়সা দিতে পারি। দু-নয়া আর এক নয়া। অথবা পুরো একটা তিন নয়া। নয়তো পাঁচ নয়া দিয়ে দু-নয়া ফেরত নেওয়া। এই পয়সা দেওয়া, ভাঙানি ফেরত নেওয়া ব্যাপারটার মধ্যে বেশ একটা বড়োদের মতো ভাব থাকে। স্বাধীনভাবে পয়সা দেওয়া নেওয়া করছি। স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি। স্বাধীনভাবে তো একটু আগে ইস্কুল পালালাম।

এবার চানাচুর খেতে হবে। ঘাটের সামনে দিয়ে ঢালু রাস্তা উঠেছে ওপরদিকে। তার পাশেই দোকান। সাড়ে চারভাজা নামে একরকম চানাচুর পাওয়া যায় সব দোকানে। দু-রকম দাম। ছোটো প্যাকেট পাঁচ নয়া। বড়োটা দশ নয়া। চার আনা নিয়ে বেরিয়েছি বাড়ি থেকে। ইস্কুলে ঢোকার সময় একফালি চালতার আচার খেয়েছি। পুরো দু-আনা আছে এখনও। এখন ঘুরি তো। পরে রাস্তায় তিলের খাজা দেখলে খাব। রাস্তার দুপাশে কালকসিন্দার জঙ্গল। সাদা প্রজাপতি, কালো প্রজাপতি আর ফড়িং উড়ছে। নদী যখন পার হচ্ছিলাম, খেয়া থেকে দেখলাম কচুরিপানার একটা ঝাঁক ভেসে যাচ্ছে মাঝনদীতে। সেই পানার ঝাঁকে একটা বড়ো ডাঁটি উঠে আছে, তাতে ফুল। সেই ফুলটার সঙ্গে সঙ্গে একটা ফড়িং চলেছে। একটা তো নয়। দুটো। একটার ওপরে একটা। তখন বুঝিনি, কিন্তু আজ জানি, মিলনের কোনো স্থান কাল নেই।

হাঁটতে হাঁটতে হাইওয়ের ধারে পৌঁছে গেলাম। বড়ো বড়ো ট্রাক পিঠের ওপর মোট চাপিয়ে ছুটে যাচ্ছে। পিছন পিছন উড়ে আসছে ধুলো। হাইওয়ের ধার ধরে ঢালু রাস্তার চড়াই ধরে উঠে পড়লাম ব্রিজে। নীচেই শ্মশান। সাদা ধোঁয়া। নদীর ওপার দিয়ে সূর্য তখন পাটে বসেছেন। ব্রিজের পরেই সিনেমা হল। দিলীপকুমার আর বৈজয়ন্তীমালার মুখ। রং দেওয়া লাল বরফ বিক্রি হচ্ছে খেলাম না। তার পাশেই ঝুড়ি নিয়ে একজন বউ বসে আছে। তার কাছ থেকে একটা পেয়ারা কিনে খেতে খেতে ক্লান্ত মুখে ধূলিধূসরিত পায়ে যখন বাড়ি ফিরলাম, মা ভাবল ইস্কুল থেকেই ফিরছি। দেরি হল কেন? মাঠে ফুটবল খেলা হচ্ছিল মা, তাই দেখছিলাম।

এমন কিন্তু একদিন নয়। প্রায়ই করতাম। ইস্কুলের ওই পাঁচিলের গর্তটা দিয়ে বেরিয়ে যেতাম। মাস্টারমশাইরা তেমন খেয়াল করতেন না। আবার করতেনও। মা ছিল ওই ইস্কুলেরই সকালবেলার দিদিমণি। আমাদের কোনো একজন স্যার মা'কে বলে দিলেন। বাড়িতে চড় চাপড় খেলাম। আবার যে কে সেই। আমি বলে দিলাম, আমার ভাইকে। যে স্যার মাকে বলে দিয়েছিলেন, তিনি আমাদের পাড়া দিয়ে ছাত্র পড়াতে যেতেন। আমার ভাই মল্লিকদের ছাদে উঠে লুকিয়ে থাকত। স্যারকে একটা গলি পেরোতে হত। স্যারকে গলির মুখে দেখা গেলেই আমার ভাই তার কাজ শুরু করত। স্যারের নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ তলাপাত্র। কিন্তু, কোনো অজানা কারণে, তাঁকে 'মশা' বললে তিনি নাকি রেগে যান, এমন জনশ্রুতি ছিল। গলির মুখে ঢুকেই স্যার শুনতে পেতেন কেউ যেন বলছে, 'কী মশা রে বাবা...', 'কী মশা হয়েছে...!' আবার বেশ জোরে জোরে ডাকছে 'মশা-আ-আ...'। অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখে তিনি চারিদিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেতেন না। কারণ ভাই তো তখন মল্লিকদের ছাদে শুয়ে পড়েছে। মল্লিকদের বাড়ি দুই বৃদ্ধ বৃদ্ধা থাকতেন, তাঁরা কেউ সিঁড়ি ভেঙে ছাদে উঠতেন না। কাজের বউটি যা ছাদে যাওয়ার যেত। দুপুরে সামান্য যা কাপড় জামা শুকোতে দেওয়া ছিল, তা নিয়ে আসত। বিকেল-সন্ধেয় ছাদে কেউ যাওয়ার নেই।

এরপর ভাই বলত, 'অ্যাই মশা, নালশে মসা, হাঙর খাবি, হাঙর খাবি?' এই 'হাঙর

খাবি...' কথাটা কেন বলত ভাই, তা আমার অজানা ছিল। কোনো মশার পক্ষে হাঙর খাওয়া ব্যাপারটা যে অসম্ভব, তা কি ভাই জানত না? আমি একটা পাঁচিলের আড়াল থেকে দেখতাম স্যারের হনহন করে হেঁটে বিপজ্জনক গলিটা পার হয়ে যাওয়া।

কীভাবে যেন নরেন তলাপাত্র স্যার আন্দাজ করলেন এর পিছনে আমার ভাই আছে। আমি আর আমার ভাই একই ক্লাসে পড়তাম। নরেন তলাপাত্র স্যার এক সপ্তাহের মধ্যে ভাইয়ের কান মুলে থাবড়া মারলেন, ক্লাস থেকে বের করে দিলেন। রোদে নিল্‌ডাউন করিয়ে রাখলেন। অবশ্য আমি বা আমার ভাই যে পড়াশোনায় ভালোছিলাম, এ কথা আমাদের অতি বড়ো বন্ধুও বলতে পারত না।

এর মধ্যে মা করল কী, ওই তলাপাত্র স্যারকে আমাদের প্রাইভেট টিউটর করে নিয়ে এল। মুশকিলে পড়লাম আমরা। এমনিতেই স্যার আমাদের দু-ভাইকে একটু সন্দেহ করতেন যে, আমরা ওঁকে 'মশা' বলি। তার ওপর আমাদের তো পড়াশোনার ওই অবস্থা। তবে, তলাপাত্র স্যার যতটা ক্রুদ্ধ হবেন ভেবেছিলাম, ততটা কিন্তু হলেন না। আমরা ভাবলাম প্রথম প্রথম হয়তো একটু চুপচাপ আছেন। পরে নিজমূর্তি দেখাবেন। কেন-না, যে শিক্ষকই আমাদের পড়াতে আসতেন, দু-দিন না-যেতেই তাঁর অগ্নিশর্মা চেহারা আমরা দেখতাম। এমন বাঁদর সব ছাত্র পেলে কোনো মাস্টারমশাইয়ের মাথা ঠিক থাকে? তাঁরা তিতিবিরক্ত হয়ে নিজেরাই আসা বন্ধ করে দিতেন।

ভাই ঠিক করল, তলাপাত্র স্যারের আসাও শিগগির বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে। তার জন্য ভাই নতুন পদ্ধতি বার করল। ঠিক হল মারামারি করা হবে। তলাপাত্র স্যার পড়াতে আসতেন সকাল সাড়ে সাতটায় তখন আমরা শুকতারা পড়তাম। কিংবা সচিত্র বেতালের গল্প। পড়ার বই ওই সময় পড়ব কেন? মা ছ-টায় স্কুলে চলে যেত। বাড়ি ফাঁকা। জনতা স্টোভে ওমলেট বানিয়ে খেতাম। এই সময় মূর্তিমান অশান্তির মতো তলাপাত্র স্যার এসে হাজির হতেন। তলাপাত্র স্যারের বয়স কত? তখন তো আর স্যারেদের বয়স নিয়ে ভাবতাম না। আজ ভাবলে মনে হয়, বয়সটা যেন কমই ছিল। একটা বড়ো খাটের দু-দিকে আমরা দু-ভাই বইখাতা নিয়ে বসতাম। খাটের মাঝখানটায় একটা চেয়ার টেনে বসতেন তলাপাত্র স্যার। মা আমাদের শিক্ষিত করার জন্য ইংরেজি, বাংলা দুটো খবর কাগজ বলে দিয়েছিল। অঙ্ক কষতে দিয়ে বা কিছু লিখতে দিয়ে স্যার কাগজটা দেখতেন। আমি আর ভাই আমাদের প্ল্যান চালু করলাম একদিন। ভাই হাত বাড়িয়ে আমার পেনটা টেনে নিল। আমি. 'অ্যাই, আমার পেন দে', বলে হাত বাড়ালাম। ভাই সজোরে একটা চাপড় মারল আমার হাতে। স্যারের চমক ভাঙল। খবর কাগজ থেকে চোখ তুলে স্যার বললেন, 'কী হচ্ছে কী!' ভাই নালিশের সুরে বলল, 'আমার পেনে লেখা পড়ছে না স্যার।' আমি বললাম, 'তাই বলে আমার পেন নেবে কেন?' স্যার বললেন, 'তাই তো। তাই তো। ওর কলম নেবে কেন। দাঁড়াও আমার কলমটা দিচ্ছি তোমাকে।' আমি বললাম, 'আমাকে মারল স্যার! দেখেছেন, আমার হাতে মারল।' স্যার বললেন, 'সত্যি তো, মারলে কেন?' কিন্তু আমি

স্যারের বিচারের আশায় বসে না-থেকে আইন নিজের হাতে নিলাম। কষিয়ে এক চড় লাগালাম ভাইকে। ভাই আমার চুলের মুঠি ধরে ঝুলে পড়ল। আমরা দুজনে গড়াতে লাগলাম খাটের ওপর। আমাদের ঠেকাতে গিয়ে ঝুঁকে পড়লেন স্যার। আর আমাদের কারও হাতের ধাক্কায় স্যারের চশমা ছিটকে উঠল। খাটের ওপরেই পড়ল তাই ভাঙল না।

আশ্চর্য! স্যার কিন্তু রেগেও উঠলেন না। মারলেনও না। বরং হতভম্ব হয়ে বসে রইলেন। বললেন, 'ছুটি দিয়ে দিচ্ছি। আজকের মতো তোমাদের ছুটি দিয়ে দিচ্ছি। অঙ্কগুলো বাড়িতে করে রেখো।' পরের দিন আমাদের দু-ভাইয়ের জন্য দুটো রাইটার কলম কিনে আনলেন। যাতে মারামারি না হয়। আমরা এবার হতভম্ব। হঠাৎ একদিন, স্যার আমাদের অঙ্ক কষতে দিয়ে বললেন, তোমরা অঙ্ক করো, আমি একটু বারান্দায় বসি। একটু পরে জানলা দিয়ে উঁকি দিয়েই দেখি, স্যার বারান্দায় তক্তপোশে বসে, ঝোলা থেকে একটা খাতা বার করে তাতে কী যেন লিখছেন। মুখে একটা হাসি হাসি ভাব। আবার থেকে থেকেই ভুরু দুটো কুঁচকে মুখটা গোমড়াপানা হয়ে যাচ্ছে। স্যারের ওইরকম মুখ আগে কখনও দেখিনি। এরপর থেকে, প্রায় রোজই স্যার আমাদের কিছু লিখতে দিয়ে বাইরে চলে যেতেন। আমাদের বারান্দার সামনের পাঁচিলটা ভেঙে পড়ে গিয়েছিল, সারানো হয়নি। তার পিছনে ছিল গাছপালা ঘেরা একটা পুকুর। সেদিকে তাকিয়ে থাকতেন স্যার। আর খাতায় কীসব লিখতেন।

একদিন, 'অঙ্ক হয়ে গিয়েছে স্যার...', বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল ভাই, পাশে আমি। দেখি, স্যারের ঝোলাটা রাখা, তার পাশে ছোটো ছোটো দুটো পত্রিকা। ভাই একটা নিল হাতে। আমি আর একটা। একটা পত্রিকার নাম সন্ধ্যাদীপ। আর একটার নাম চূর্ণি। স্যার হাঁ হাঁ করে উঠলেন। কিন্তু একটা নিয়ে ছুটে পালিয়ে গেছে ভাই অন্যটা নিয়ে চলে গেছি আমি। দুটো পত্রিকার ওপরেই সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা 'কবি নরেন্দ্রনাথ তলাপাত্র। সৌজন্য সংখ্যা।' আমরা দু-ভাই এতদিন অনেক পত্র পত্রিকা দেখেছি। শুকতারা, শিশুসাথি, দেশ। কিন্তু পত্রিকায় লেখা ছাপা হয়েছে, এমন কোনো লোক কখনও দেখিনি। ততক্ষণে ভাই সূচিপত্র দেখে খুঁজে বার করেছে স্যারের নাম। এক পাতা এক পাতা করে কবিতা ছাপা হয়েছে। আমরা রুদ্ধশ্বাসে পড়লাম। কিচ্ছু বুঝলাম না। স্যারের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। আমি বললাম, আপনি বুঝি কবিতা লিখতে পারেন স্যার। কী দারুণ। মুখ নীচু করে স্যার বললেন ওই একটু আধটু। স্যারের মুখের ভাবটা তখন একেবারে অন্যরকম। ক্লাসে ছেলেরা অঙ্ক ভুল করলে যেমন হয় অনেকটা তেমন। আবার তেমন নয়ও। অকারণে চশমা মুছতে শুরু করেছেন স্যার। আমাদের হাঁ করে তাকিয়ে থাকা দেখে লাজুক হেসে স্যার শুধু এইটুকু বললেন, কবিতা দুটো তোঁদের এই বারান্দায় বসেই লেখা। আমি তখনও অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি তাঁর দিকে। সেই, ধরা পড়ে যাওয়া ভাব, সেই লাজুক হাসি ছাত্রদের সামলাতে না-পারা সেই বিব্রত মুখটি আমার সারাজীবন মনে থাকবে। কেন-না, সেই নরেন্দ্রনাথ তলাপাত্র ছিলেন আমার জীবনে দেখা প্রথম কোনো কবি।
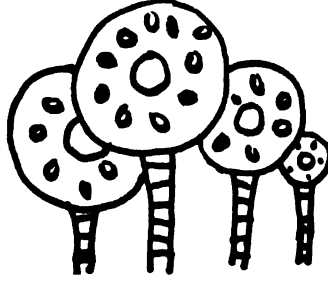
৯

কবিকে বলা হয় দূরদ্রষ্টা। অনেক দূর দেখতে পান কবি। কতদূর? রক্তকরবী অনেক দূর দেখতে পেয়েছে বলে আমরা জানি। জীবনানন্দের কবিতা দেখতে পেয়েছে বহুদূর। কতদিন ধরে কত মানুষের মনকে দেখতে পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের গান। আর মহাভারত দেখতে পেয়েছে যেন পুরো সভ্যতাকে। এই সবই আমরা জানি। নানা তর্ক সত্ত্বেও মোটামুটি মেনেই নিয়েছি। এই সকল রচনাই এক কালে বসে অনেক দূরের ভবিষ্যৎ সময়কে দেখতে পেয়েছে। কিন্তু আজ আমার মনে পড়ছে অন্যরকম দূরকে দেখার একটি কবিতার কথা। বলি তবে সেই কবিতা :

> ২০০১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জুন
> মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে এসেছে।
> সন্ধেবেলা বার বার ঘরবার করি, পুব আকাশে তাকাই
>
> মঙ্গল কি উঠল?
> এক সময় সাতটা সাড়ে সাতটায় দেখি, রাস্তার পাশের
> দেবদারুর মগডাল ছাড়িয়ে সে উঠে বসে আছে।
> মেঘ করেছে।
> মাছির চোখের মতো তুচ্ছ আলো জ্বালিয়ে একটা প্লেন
> গোঁ গোঁ করে মেঘের ফাঁকে
> দমদমের দিকে উড়ে গেল।
> মঙ্গল প্রেমের গানের রাঙা মুকুলের মতো দিনশেষে ফুটেছে, একলা,
> পাতলা মেঘ জলকণা দিয়ে তার রাগ আর নিঃসঙ্গতা মুছিয়ে দেয়।
> আমি অনেকক্ষণ তাকিয়ে আছি
> সেই নিঃসঙ্গ যোদ্ধা ধীরে ধীরে ওপরে উঠে
>   পাঁচতলার কার্নিশের ওপারে
> চলে গেল।

আর কয়েকদিন তাকে ওইরকম উজ্জ্বল দেখব,
তারপর ক্ষীণ দেখব,
তারপর আর দেখব না।
সে অথবা আমি, যে কেউ একজন
অনন্ত দূরে চলে গিয়েছি।

মঙ্গল। মনীন্দ্র গুপ্ত। শ্রেষ্ঠ কবিতা।

এই কবিতা হল আকাশে তাকালে যে দূরত্বকে দেখা যায়, সেই দূর দেখার কবিতা। কাগজ পড়ে জানা গিয়েছে যে, আজ ২৫ জুন মঙ্গল পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসবে। তারই জন্য একজন মানুষ সন্ধে থেকে ঘর বার করছে, কখন সেই লালগ্রহকে দেখা যাবে? ভোরে ধূমকেতু দেখা যায় শুনে আমরাও তো অনেকে শেষরাতে উঠে ছাদে যেতাম। এ অনেকটা সেইরকম। তারপর একসময়ে দেখা গেল, সে, মানে মঙ্গল, দেবদারুর মাথা ছাড়িয়ে উঠে বসে আছে। এখানে ছোট্ট ছোট্ট দুটি জিনিস চোখে পড়ে আমার, একটা হল, ঠিক কখন মঙ্গলকে দেখা গেল, তা নিশ্চিত নয়, সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যে কোনো একটা সময়, এমনকি পরেও হতে পারে—মঙ্গল দেখাটা এত জরুরি যে, সময়টাকে কে আর অত নিখুঁত করে মনে রাখে। দ্বিতীয় হল, এই দূর গ্রহ মঙ্গল যেন চেনা কেউ, উঠে বসে আছে, এই বলাটার মধ্যে সেই আত্মীয়তার ভাবটুকু আছে। আরে কখন উঠে বসে আছে, আর আমি কি না হাপিত্যেশ করছি সেই থেকে। এমন একটা ভাব, যা আমরা আপন কেউ চেনা কেউ সম্পর্কে বলি। কেন চেনা হবে না? কত ছোটো থেকেই আমরা মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে নানা তথ্য খুঁজে খুঁজে পড়ি। নানা আবিষ্কার জানতে পারি। ওই জন্য সে একদিকে চেনা। আর একদিকে অচেনাও। কারণ অন্যদিকে মঙ্গলগ্রহের কত রহস্য তো বিজ্ঞানীরা জানতে পারেননি এখনও। অবশ্য যে-কোনো আকাশবস্তুই আমাদের কাছে রহস্যময় অচেনা। এমনকি, অত যে চেনা বিমান, সে তো যন্ত্র মাত্র, মানুষের তৈরি যন্ত্র, কিন্তু গোঁ গোঁ করে মেঘের ফাঁকে যে উড়ে গেল, তা দেখেও কি ভেতরটা কেমন হয়ে গেল না! আমার তো হয়। হয়তো যশোর রোড দিয়ে যাচ্ছি, একটা প্লেন টেক অফ করল, উঠছে, উঠছে, শূন্যের দিকে উঠে যাচ্ছে—মনে কী যে একটা হতে থাকে। অথচ প্লেনের ভেতর বসে নীচে ক্রমশ ছোটো হয়ে যাওয়া বাড়ি ঘর দেখলে তেমনটি হয় না, কিন্তু মাটিতে দাঁড়িয়ে আকাশে আরও আরও শূন্যতায় চলে যাওয়া বিমানকে দেখলে যেমন হয়! এখানে মঙ্গল একলা, মেঘ করেছে। আজকে সে জ্বলজ্বল করছে একটু বেশি, কারণ আজ পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি তো ওই গ্রহ। তার রং লাল, আমরা জানি, তাই রাঙা মুকুলের কথা এল। প্রেমের গানের রাঙা মুকুল। কিন্তু দিনশেষে, অর্থাৎ প্রান্ত বয়সে যে প্রেমের মুকুল ফোটে, সে তো একলা, সাংঘাতিক একলা—লাইনের শেষে তাই সাদামাটা ভাবে রেখে দেওয়া আছে 'একলা' শব্দটি। এই 'একলা' শব্দটি এবার আরও একটু চলতে থাকে। পরের লাইনেই আছে পাতলা মেঘ জলকণা দিয়ে তার রাগ আর নিঃসঙ্গতা মুছিয়ে দেয়। 'রাগ' কথাটা এল। আর 'একলা' কথাটির বদলে এলো 'নিঃসঙ্গতা' শব্দটি।

এই দুটি কথার মধ্যে এ কবিতায় ছোটো একটি তফাত আমি দেখতে পাই। দিনশেষে

যে রাঙা মুকুল, জীবনপ্রান্তে এসে যে প্রেম, সে তো একলা, ঠিকই, সেই প্রেম আসার পরেই হঠাৎ সে সাংঘাতিক একলা হয়ে পড়ল একদিক দিয়ে। দিন শেষে ফুটেছে, একলা। আবার তার একটা ফুটে ওঠাও আছে। কিন্তু 'নিঃসঙ্গতা' কথাটার মধ্যে তার অনেকদিন ধরে একাকী থাকার একটা আভাস আছে। আর নিঃসঙ্গ থাকতে থাকতে অনেক সময় মানুষ কেমন যেন রাগী হয়ে যায়। মঙ্গলকে দেখতে পাওয়ার পরের কথাটাই ছিল, মেঘ করেছে। মেঘ করার থমথমে আবহটি রাগ কথাটির পূর্বভাস তৈরি করেছিল। এমন হতে পারে, সেই মুহূর্তে আকাশের বর্ণনা হিসেবেই মেঘ করেছে কথাটি এসেছিল, কিন্তু আড়াল থেকে তা ওই রাগ ও নিঃসঙ্গতার আবহ গঠন করছিল যেন। এই জায়গাটায় একসঙ্গে অনেকগুলি জিনিস এল। দিন শেষে রাঙা মুকুলের প্রেমচিহ্ন। তার ফুটে ওঠা। যদিও এ কবিতা কখনোই প্রেমের কবিতা নয়। একটি লাইনে মাত্র একটি গানের উল্লেখে প্রেম এসেছে, চলেও গেছে। তবু, 'ফুটেছে' আর 'একলা' কথা দুটির জন্যই এতটা বললাম এই নিয়ে—কেন-না, আমার একটি স্বভাব হল, নিজের জীবনকে একটু মিশিয়ে না-নিলে কোনো কবিতাকেই আমি দেখতে পাই না। প্রেমের প্রসঙ্গটি এখানে কণ্-স্বরের মতো লেগেছে। বাদক যেমন গান্ধারটিতেই আসলে জোর দেবেন, কিন্তু নখের কোনা দিয়ে একটু ছুঁয়ে এলেন মধ্যমকে, অপ্রত্যাশিত সৌন্দর্য এল পদটিতে। তেমনই স্বরের কণার মতো প্রেমের কণিকামাত্র লাগল এখানে। এরপরই এই লেখা অধিকতর নিঃসঙ্গতার কথা বলে। কারণ, আমরা দেখি ওই লালগ্রহ মঙ্গল এখানে নিঃসঙ্গ যোদ্ধা। সে যুদ্ধ কি তার একাকী থাকার জন্য যুদ্ধ? অথবা লাল রং কি ক্রোধের রং? একটু আগে, ওই লাল রঙই রাঙা শব্দের রূপে প্রেমের গানের কথা মনে করিয়েছে? এখন কি সেই লাল রং হয়েছে যুদ্ধের রং? তাই সে এখন যোদ্ধা? যদিও একাকিত্ব তার ঘোচেনি, তাই সে নিঃসঙ্গ যোদ্ধা। এদিকে সন্ধে-রাত উত্তীর্ণ হল; সেই রক্তবর্ণ গ্রহ, ওপরে উঠতে উঠতে কোনো একটা ফ্ল্যাটবাড়ির কার্নিশের আড়াল হয়ে গেল। কবিতাটিতে কিন্তু আড়াল হয়ে গেল লেখা হয়নি। লেখা আছে 'কার্নিসের ওপারে চলে গেল।' কেন, সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। তার আগে বলি, এরপরই এই কবিতাটিতে বিরাট একটি আশ্চর্যকে আমরা দেখতে পাই।

এই যে আজ লালগ্রহ মঙ্গলকে এত স্পষ্ট দেখা গেল, এ তো কেবল এইজন্য যে, আজ ২৫ জুন ২০০১, সে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে এসেছে। গত কয়েকদিন ধরেই যেমন তাকে উজ্জ্বল দেখা গেছে, এরপরও কয়েকদিন তেমনই দেখা যাবে। যদিও ক্ষীণতর হতে থাকবে তার আভা, একসময় আর দেখা যাবে না। যে মানুষটি সন্ধে থেকে ঘরবার করছিল পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসা মঙ্গলের রূপটি দেখবে বলে, সে বুঝতে পারছে, তাকে আর দেখব না। এরপরই দুটি লাইন আছে :

সে অথবা আমি, যে-কেউ একজন
অনন্ত দূরে চলে গিয়েছি।

এতক্ষণ কবিতাটিতে আমরা দেখছিলাম, মঙ্গল ফুটে উঠল, তারপর ফ্ল্যাটবাড়ির আড়াল হয়ে গেল, কদিন উজ্জ্বল থাকবে, তারপর আর তাকে দেখা যাবে না। এইসব কথা জানতে

পারছিলাম। দেখাটা চলছে কবিতায় এইভাবে। এইবারে শেষ দুটি লাইনে এসে দেখাটা ঘরে গেল। মহা আকাশের মধ্য থেকে যদি পৃথিবী গ্রহের মানুষটির দিকে তাকানো যায়?

কবিতাটি পড়তে পড়তে আমরা সবাই মাটি থেকেই লাল আলোর গ্রহটিকে দেখছি। ভাবছি, ওই তো গ্রহ, দেখা দিচ্ছে, কাছে আসছে, সরে যাবে এবার : আমিও যে মহাজগতের মধ্যে একটি বস্তু, আমিও যে প্রতি মুহূর্তে সরে সরে যাচ্ছি অবিশ্বাস্য বেগে, তা কি এতক্ষণ মনে রেখেছিলাম। কেবল এই গ্রহটি সরে যাচ্ছে, কে বলল? আমিও তো দ্রুত ধাবমান মহাশূন্যে? এই ঘূর্ণমান পৃথিবীর সঙ্গে? এক মুহূর্তে সব ওলট-পালট হয়ে গেল। এই কবিতাটির শেষপ্রান্তে এসে শরীর শিরশির করে। মনে হয়, যেন দুলছে এই মহাপৃথিবী। আমাকে নিয়ে সে অনন্ত দূরে কোথাও চলে যাচ্ছে। প্রতি সেকেন্ডে...কোথায় যাচ্ছে, তার বিন্দুবিসর্গ আমি জানি না। এতক্ষণ, মাটিতে দাঁড়িয়ে, এই কবির সঙ্গে, নিরাপদে, আকাশের তারা দেখছিলাম। এক নিমেষে আমার স্থিতির বোধ পালটে গেল। বিরাট ও অজানা ব্রহ্মাণ্ডেব মধ্যে আমি ছুটে চলেছি। এই গোল বল আমাকে নিয়ে কোথায় চলেছে? চারিদেকে এত তারা? এক ঝলকে স্ট্যানলি কুব্রিকের তৈরি দ্য স্পেস ওডিসি ছবিটির একটি দৃশ্য মনে ভেসে যায় : যেখানে এক নভশ্চর দুর্ঘটনার ফলে সংযোগ ছিন্ন অবস্থায় মহাকাশে হারিয়ে যাচ্ছিল ক্রমশ। দূরে সরে যেতে যেতে এক সময় সে মুছে যায় স্পেসের ভেতর। তেমন একটা পরিবেশ তৈরি হয় মনে। প্রায় বিশ্বরূপ দেখার অভিজ্ঞতা জন্ম নেয় যেন।

অথচ পুরো এই কাজটাই, এই কবি, মনীন্দ্র গুপ্ত করেছেন 'সে অথবা আমি' এই কথাটুকু মাত্র ব্যবহার করে। আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে শুধু 'আমি' শব্দটি এখানে এসে পুরো কবিতাটিকে মহাকাশব্যাপী অনন্তে স্থাপন করল। এ এক আশ্চর্য দেখা। অপ্রত্যাশিত দেখা। অনন্ত দূর থেকে এক হিসেবে নিজের অবস্থান দেখা। ওই দ্রুত সরে যাওয়া গ্রহটি থেকে যেন দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়ানো এক মনুষ্য প্রাণীকে।

এই কবিতাব শেষ দু-লাইন পড়বার পর এক অকল্পনীয় অভিজ্ঞতার অংশভাগী হই আমবা, যা পূর্বে কখনও ধারণা করিনি। বা করলেও, জীবনানন্দ থেকে ধার করে বলা যায়, তা এমন কৃতার্থ সংস্থানের মধ্যে ছিল না।

অন্যদিকে, যারা কবিতার পাঠক, তাঁদের কাছেও এটা স্মরণীয় ঘটনা হিসেবে দেখা দেয়, মাত্র 'আমি' শব্দটির স্থাপনার ফলে এত বড়ো একটি অভিজ্ঞতার কাছে যাওয়া যায়। এখানে, কবি, ইচ্ছে করেই বিবৃতিমূলক কবিতার ছদ্মবেশে লেখাটিকে হাজির করেছেন প্রথম থেকে। যে-কোনো পাঠক, মনীন্দ্র গুপ্তের কবিতাগ্রন্থের সঙ্গে কিছুকাল থাকলেই বুঝতে পারবেন, এই কবির হাতে খুব সহজ ও তুচ্ছভাবে বলা কথা চিরকালীন কবিতার অন্তর্গত হয়ে যায় কত অনায়াসে।

এখানে 'কার্নিসের' পরে 'ওপারে' কথাটি ব্যবহার করেছিলেন তখন, কারণ, তারপরই তিনি অনন্তের মধ্যে স্থাপন করবেন পাঠককে। 'ওপারে' কথাটির মধ্যে ভরা ছিল অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের একটি লুকোনো সংকেতে।

এমনই সব সংকেতে সংকেতে ভরে আছে মনীন্দ্র গুপ্তের কবিতা। তা নিয়ে, আমরা আবার কথা বলব অন্য একদিন।
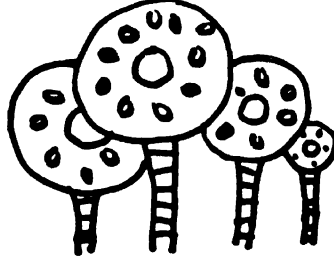
১০

আগে বলেছি না, ইস্কুলের পাঁচিলে একটা বড়ো গোল ফুটো ছিল বলে লেখাপড়া হয়নি আমার? ওই গোল গর্ত দিয়ে পড়াশোনা থেকে পালাতাম। পালাতে পালাতে কবে এসে পড়েছিলাম কবিতার নাগালের মধ্যে। সে আমাকে যা কিছু জানানোর, একটু একটু করে জানিয়ে যায়। রোজ রাত্তিরে শুতে যাওয়ার সময় ভাবি, রোজ সকালে উঠে ভাবি, কী পড়ব, কী শুনব, জানব কী কী উপায়ে। বই তো পড়েই মানুষ, কিন্তু এই যে রাস্তা, এই যে দোকানপাট এসবও কি পড়া যায় না? রাস্তা ভরে কত কত লোক! কত বিচিত্র পেশার মানুষ—এত যে বিদ্যুৎ বেগে ছুটে ছুটে যাচ্ছে চারদিকে, এদেরই কাউকে কখনও পড়ে দেখার চেষ্টা করেছি? সেরকম করে করিনি! দেখেছি, 'আচ্ছা?... বলে অবাক হয়েছি। তাইতো বলে চিন্তিত হয়েছি কিছুক্ষণ। 'দেখেছ?...' বলে সঙ্গীকে দেখিয়েছি। তারপর চলে গিয়েছি নিজের রাস্তায়। উপেক্ষা করিনি হয়তো, তাই বলে, মনেও রাখিনি। ভুলে গিয়েছি প্রায় পুরোপুরি।

কবিতা কিন্তু ভোলে না। ডিঙিয়ে পার হয়ে যায় না। ধরে রাখে সেইসব জীবিত পাঠ্যবস্তুকে। কেন ধরে রাখে? কারণ, তার মধ্যে আছে দরদ। সহমানুষের জন্য একাকী, নিঃশব্দ ভালোবাসা।

কে সেই সহযাত্রী মানুষ। এক এক করে দেখা যাক।

ট্যাক্সিওয়ালা

ট্যাক্সিওয়ালাদের জন্য মন কেমন করে না আপনার?
সারাদিন গাড়িবন্দি। গাড়িতেই ঘুম, বসে থাকা।
জুনের জ্বলন্ত গাড়ি। তেতে ওঠা টিনের মডেল।
অ্যামবাসাডরের পেটে গর্ত করে আশ্রয় নিয়েছি।

শুধু একটা ঢালু কাচ। সেটাই আমার বিশ্ব, স্ক্রিন।
মা কালী। লোকনাথ। ধূপদানি। স্ক্রু-ড্রাইভার
হলুদ কাচঘষা ন্যাতা, 'বর্তমান'। গুটনো, কালকের।

এর মধ্যে বসে বসে ট্যাক্সিওয়ালা বিষণ্ণ হবে না?
প্যাসেঞ্জারকে শুধু শুধু 'না' 'না' করি, নিই না ট্যাক্সিতে?

এক্ষুনি দমদম থেকে ফিরে এসে শুকনো ছোলা খেয়ে
আবার দমদম যেতে ভালো লাগে কারুব, বলুন?

কত ট্যাক্সি ড্রাইভার দেখেছি আমিও। তাদের কারও-কারও সঙ্গে কত গল্পও করেছি যেতে যেতে। কিন্তু তার জীবনটা কি কোনোদিন তলিয়ে ভেবেছি! এ কবিতা শুরুই হচ্ছে তাই, 'ট্যাক্সিওয়ালাদের জন্য মন কেমন করে না আপনার?' প্রথমেই ঠিক জায়গাটাকে ধরে ফেলল এ কবিতা। ধরে ফেলল, কলকাতায় যে এত ট্যাক্সি চলে, আমরা মধ্যবিত্ত, ট্যাক্সিতে প্রায়ই উঠি, কিন্তু ট্যাক্সিড্রাইভারদের সম্পর্কে কখনও ভেবেও দেখি না। কীরকম জীবন তার?

সারাদিন গাড়িবন্দি। গাড়িতেই ঘুম, বসে থাকা!

রোজই তো রাস্তার ধারে থেমে থাকা ট্যাক্সিতে ড্রাইভার ঘুমিয়ে আছে দেখি। দেখি তাদের জানলায় কনুই রেখে বসে থাকা। সারাদিনের রোদ্দুর লেগে গাড়ির ভেতরটা ফার্নেস। এখানে 'টিনের মডেল' কথাটির ব্যবহার অব্যর্থ। কারণ কবিতাটি লেখা হচ্ছে ড্রাইভারের জবানিতে। ঠিক পরের লাইনেই সেটা স্পষ্ট করে জানতে পারছি আমরা। যেখানে আছে অ্যামবাসাডারের পেটে গর্ত করে আশ্রয় নেওয়ার অপূর্ব উপমা। প্রথমত এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মের হাত থেকে বাঁচবার জন্য একজন মানুষ যে ওই গাড়ির ভেতর, ওই তেতে ওঠা টিনের মডেল-এর পেটে ঢুকে বাঁচার চেষ্টা করছে, এ তো এক কথা। অন্য কথাটি হল, এটি তো তার জীবিকা। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ও তো এই অ্যামবাসাডারের পেটে গর্ত করে আশ্রয় নিয়েছে। এই গর্ত করে আশ্রয় নেওয়া কথাটি শুনলেই আমাদের মনে হয় স্বাভাবিকভাবে কোথাও স্থান সংকুলান না হওয়ায় এই গর্ত খোঁড়া। অর্থাৎ, কোনো মতে জীবনধারণের জন্য এই পেশা। সকলেই হয়তো নয়, কিন্তু অনেকেই পাকেচক্রে ট্যাক্সিড্রাইভার হয়ে পড়ে। আমরা, সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষও কিন্তু, অনেকসময়ই যে পেশা নির্বাচন করি, তাতে স্থির হতে পারি না। এদিক ওদিক ঘুরে শেষে একটা পেশায় এসে পড়ি, যা হয়তো পূর্বপরিকল্পনায় ছিল না। সেও ওই গর্ত করে আশ্রয় নেওয়ার মতোই। অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষের জীবনেই যে জীবিকার একটি নিয়তি-বাধ্যতা ও নিরুপায়তা আছে, কষ্ট

হলেও তাকে সেটি চালাতে হয়, এ কবিতা সে কথাও বলে নিল। এর পরের তিন লাইনে ট্যাক্সিড্রাইভারের সামনে যা যা থাকে তার অনবদ্য ডিটেল ফুটেছে। এই তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণই হল, অন্য মানুষের, আমার সহযাত্রী মানুষের জীবনকে পাঠ করার প্রমাণ। মা কালী ও লোকনাথবাবার ছবি, ধূপদানি, পুরোনো স্ক্রু-ড্রাইভার, আধময়লা হলদে কাপড় ঈষৎ পশমি, এবং তুলনাহীন এই অর্ধেক লাইন : '...বর্তমান। গুটোনো, কালকের।' পুরোনো খবর কাগজ। ঠিকই কিন্তু 'বর্তমান' শব্দটি শুধু সংবাদপত্রের নাম-ই নয় এখানে। শব্দটা বলতে চায় এই ড্রাইভারের কাছে সমস্ত বর্তমান-ই পুরোনো। কারণ এর জীবন একঘেয়ে! এর আগেও এমনই একটি অর্ধেক লাইন আমরা পেয়েছি : সেটাই আমার বিশ্ব, স্ক্রিন। চালকের সামনের কাচ সম্পর্কে বলা হচ্ছে। এখানে স্ক্রিন কথাটিই অমোঘ। স্ক্রিন বললে আমাদের কম্পিউটারের স্ক্রিন মনে পড়ে, মনে পড়ে টিভির-পর্দা। আমরা টিভি আর কম্পিউটরের পর্দা থেকে, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পাই। স্যাটেলাইট থেকে তোলা অন্তরিক্ষে ভাসমান পৃথিবী নামক গ্রহের ছবি, চাঁদে মানুষের পদচারণা, গভীর সমুদ্রের তলদেশের জগৎ—সবই আমরা দেখতে পাই, টিভি আর কম্পিউটারের স্ক্রিন থেকে। এই ড্রাইভারের বিশ্ব দেখার উপায় ওই সামনের কাচ। তার মধ্যে দিয়ে সে রাস্তা দেখে। রাস্তাই তার বিশ্ব।

এর মধ্যে বসে বসে ট্যাক্সিওয়ালা বিষণ্ণ হবে না? হবেই তো। এই চূড়ান্ত বৈচিত্র্যহীন জীবনে? কবিতাটিতে, সারাক্ষণ ট্যাক্সিওয়ালা বলা হচ্ছে, কারণ, এরা নিজেদের ট্যাক্সিওয়ালাই বলেন, ট্যাক্সিড্রাইভার বলার তেমন রেওয়াজ নেই। এ-কবিতা 'ট্যাক্সিওয়ালা'র দিক থেকে লেখা, 'টিনেরমডেল' শব্দটি যেমন, এই পেশার লোকেরা যে ভাষা ব্যবহার করেন, তারই চিহ্ন। পরের লাইনে প্যাসেঞ্জার শব্দের মধ্যেও তারই প্রমাণ। বাকি, গুটিয়ে রাখা খবর কাগজ-এর মধ্যে, যেমন জীবনের বিষাদ, বিবর্ণ হয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত ছিল, তেমনই হলুদ কাচঘষা ন্যাতা, এখানে 'ন্যাতা' শব্দটির ব্যবহারের মধ্যেও এক ঘেয়ে নেতিয়ে পড়া, আকর্ষণ ও উজ্জ্বলতাহারা জীবনের কথাকে ছুঁয়ে যাওয়া আছে। 'ন্যাতা' শব্দটির, ক্ষেত্রে আমার কেবল মনে হয়, কবিতাটির লেখক একজন নারী বলেই এমন আশ্চর্যভাবে আনতে পারলেন শব্দটিকে। আমাদের সমাজে, একজন নারী যেমন ভেতর থেকে গৃহস্থালির কাজ জেনে বড়ো হয়ে ওঠেন, একজন পুরুষ সে সুযোগ সাধারণত গ্রহণ করেন না। ফলে, গৃহস্থালির কাজে লাগা জিনিসপত্রগুলোকেও বড়ো মর্মে মর্মে চিনে নিতে পারেন কোনো নারী। এখানে, ন্যাতা কথাটির মধ্যে তিনি অনেক অর্থ ভরে দিলেন। কাচঘষা কাপড় ব্যবহার করলে এই অধিকতর অর্থ দ্যোতনা আসত না।

কবিতাটির শেষ দু-লাইনে, এই 'ট্যাক্সিওয়ালা' যেন আমাদের বন্ধু হয়ে যায়। যে-সুরে কবিতাটি কথা বলে শেষ দু-তিন লাইনে, ওই সুরে বন্ধুই বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে পারে। আপনাদের শুধু 'না' 'না' করি সারাক্ষণ। এটাই দ্যাখেন! আর আমি কি একটা মানুষ না। আমারও তো একটা ভালো লাগা-মন্দ লাগা আছে, বলুন? ট্যাক্সি ড্রাইভারের সঙ্গে যাত্রীর

দেওয়া-নেওয়া, আমাকে গন্তব্যে পৌঁছে দাও, আর ভাড়া নাও তার জন্য—এই নৈর্ব্যক্তিক বিনিময়ের বাইরে আমাদের টেনে আনে এ কবিতা। এখানে, একজন ট্যাক্সিওয়ালার ভেতরকার মানুষটি বেরিয়ে এসে কথা বলে, একজন প্যাসেঞ্জারের ভেতরকাব মানুষটির সঙ্গে। কথা বলে, সম্পর্ক তৈরি করে। মানুষে মানুষে সম্পর্ক। বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর সম্পর্ক। এখানে ট্যাক্সিড্রাইভার মমতা এবং সমর্থন চাইছে, যেমন বন্ধুর কাছে আমরা চাই। এখানেই এ কবিতা বড়ো করে ধরে মানুষে মানুষে সম্পর্কের মূল একটি জায়গাকে।

এমন সম্পর্ক স্থাপনের কবিতা এ কবির হাতে আরও এসেছে যেমন:

চাঅলা

খড়গপুর লাইনে আমি চা বিক্রি কবতাম।
বউয়ের ক্যানসার হল। মরে গেল। তার
জন্য সব চলে গেল। বুঝে শুনে, ভাই,
এ জিনিস সাংঘাতিক। মেয়েছেলে। ধরুন। চা নিন।

বড়ো খুরি। না, আট আনা আরও। এ কী, উলটে পড়ে গেল?
তাহলে আরেকটা নিন। ঘাস বড্ড। পুরো দাম নেব না।
ভোগে লাগেনি তো কারও। আদ্ধেক আমারও যাক। নিন।

পুরুচশমা চাওলা, আপনার উষ্ণ চা খাবার জন্যই আসলে
আমরা দুজন আসি প্রেম করতে হাজরার বাগানে।

ভ্রাম্যমাণ চা বিক্রেতাকে নিয়ে এই কবিতা। এ কবিতাও শুরু হয়েছে চা বিক্রেতার জবানিতে। মাঠে ঘুরে ঘুরে চা বিক্রি করতে করতে জীবনকথা বলছে লোকটি। মাঠে বসতে আসা জোড়ায় জোড়ায় যুবক-যুবতিদের ভাঁড়ের চা দেওয়া তার বিকেল সন্ধের কাজ। রোজ দেখতে দেখতে মুখচেনা হয়ে যায় কোনো কোনো যুগলের সঙ্গে। তেমনই একটি যুগলকে মনের দুঃখের কথা বলছে লোকটি। চা দিতে দিতেই বলছে। ছেলেটিকে হুঁশিয়ার করছে, কেন-না, ছেলেটি তো নতুন। সংসার করার স্বপ্ন নিশ্চয়ই দেখছে মেয়েটিকে নিয়ে। বউয়ের ক্যানসার হল। মরে গেল। এবং তার জন্য যা কিছু সঞ্চয় ছিল, শেষ হল। নিশ্চই ধারকর্জও হল। সব দোষ হল যেন সেই বউটির। কেন তার ক্যানসার হল? হল তো হল। কেন সে মরে গেল? আসলে কিন্তু তীব্র অভিমান। বউকে নিশ্চয়ই খুব ভালোবাসত লোকটি। তাই না সে যথাসর্বস্ব নিঃশেষ করে চিকিৎসা করিয়েছিল। মারা যাওয়ার পর তার সব রাগ পড়ল বউয়েরই ওপর। কেন থাকল না। এ কিন্তু একরকম প্রেমেরই প্রকাশ। ওদিকে কথা বলতে বলতে ছেলেটি বা মেয়েটি চায়ের ভাঁড় নামিয়েছে

ঘাসের ওপরে। বড়ো বড়ো ঘাস। তার চাপে ভারসাম্য রাখতে না-পেরে চায়ের ভাঁড় কাত হয়ে পড়েছে। আর তাই আরেকটা দিচ্ছে লোকটি। পুরো দাম নেবে না সে। তার সব গেছে, কিন্তু এটুকু তো বেঁচে আছে এখনও। না থাকলেও অবাক হওয়ার মতো কিছু ছিল না।

এই কবিতা, নাটকের পদ্ধতিকে সচেতনভাবে ব্যবহার করেছে। আগের কবিতা, 'ট্যাক্সিওয়ালা'তেও সেই পদ্ধতির প্রয়োগ ছিল। কিন্তু এই চা-অলা কবিতায় সংলাপ-এর পদ্ধতি এসেছে তীক্ষ্ণভাবে, প্রায় প্রতি পদক্ষেপে বাঁক তৈরি করে এগিয়েছে। প্রথম অংশ চা বিক্রেতার কথা নিয়ে এগোয়। শেষ দু-লাইনের উপসংহার বলে মেয়েটির কথা। ' 'মেয়েটি' কেন বললাম? কেন-না, এ কবিতার লেখক একজন নারী। এ কবিতার শেষ দু-লাইনে যে বিশেষ মমতাধারা সঞ্চারিত হয়েছে, তা নারীর সহজাত। পুরুষের সাধ্য নেই এত অল্পে সেখানে পৌঁছোনোর। এ কবিতাও তো বড়ো অল্পে বলেছে নিজেকে। আমার উনিশ বছরের মেয়েকে ডেকে পড়ে শোনালাম কবিতা দুটো। উচ্চারণ করে পড়তে গিয়ে দেখি শেষে চোখে জল আসছে। কেন? অবাক লাগল। ভেবে দেখি, চা বিক্রেতার একটি বর্ণনা মাত্র আছে এ লেখায়। পুরু চশমা চা-ওলা। কোথাও যেন একটি শ্রদ্ধাও আছে লোকটি সম্পর্কে। মমতা আর শ্রদ্ধা একত্রে মিশে আছে : ওই বকবক করে চলা লোকটি কোথাও আপনজন ওই ছেলেটি-মেয়েটির। কবিতাটি পড়ার পর মনে হয় সে কি আমাদেরও আপনজন নয়। এমন মানুষ কি আমরাও দেখিনি কখনও! নিজ নিজ স্মৃতিতে টান পড়ে। কবিতাটি পড়ার পর এমন চরিত্র ভেসে ওঠে মনে। যেহেতু তৃতীয় চরিত্র নির্ভর লেখা। তাই নাটক-সূক্ষ্মতা বড়ো অভ্রান্তভাবে কাজে লেগেছে এখানে। বাঙালি জীবনে এমন মুখ আমরা দেখি আর ভুলে যাই। কবির শক্তি এখানেই—তিনি আমাদের ভুলে যাওয়া এইসব মুখকে মনে করিয়ে দেন। ভালোবাসতে শেখান। কবিতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে জীবনানন্দ দাশ জানিয়েছিলেন, সত্যিকার কবিতা পড়ে আমাদের কী মনে হয়। মনে হয়, এ জিনিস আমারও অভিজ্ঞতায় ছিল। কিন্তু এমন শ্রেষ্ঠ, কৃতার্থ সংস্থান-এর মধ্যে ছিল না। 'ট্যাক্সিওলা' ও 'চা-ওলা' কবিতা দু-টি পড়ে মনে হয় এদের আমরা দেখেছি। চিনিও। কিন্তু এভাবে তো দেখিনি কখনও। শেষ লাইনের আগের লাইনে 'উষ্ণ' শব্দটির ব্যবহার অসামান্য। আপনার উষ্ণ চা খাবার জন্যই আসলে—উষ্ণ কথাটি চায়ের উষ্ণতার কথা বলছে না শুধু। ওই মানুষটির স্বভাবের উষ্ণ আন্তরিকতার কথা বলছে। লোকটিও তো এই ছেলে মেয়ে দুটোকে রোজ দেখতে দেখতে আপনজন ভাবতে শুরু করেছে অজান্তেই। তাই না এমন করে বলে। ওই মেয়েটির সামনেই বলছে, এই জিনিস সাংঘাতিক। মেয়েছেলে। নিজের বউয়ের সম্পর্কে বলছে। কিন্তু মেয়েটার মনে কোনো বিদ্বেষ বিরূপতা জাগছে না। সে তো জানে, এ কথা প্রেমেরই অন্য রূপ। আবেকরকম ভাবে বিচ্ছেদ যন্ত্রণাকে বলা। আর ছেলেমেয়ে দুটিকে একসঙ্গে দেখার তাদের যুগল অবস্থার একটি স্বীকৃতিও তো ওই মানুষটির মধ্যে পাওয়া যায়। তার স্বভাবের উষ্ণতার মধ্যে। আবার এ কথাও তো ঠিক, মেয়েটির মনে হতেও তো পারে, এ লোকটি তো আমার বাবারই বয়সি হবেন। তাই পুরুচশমা চাওলা,

যার নামটাও জানি না, তিনিও নিকটজন হয়ে যান কীভাবে কখন। এও হল একরকম পড়া, মানুষকে পড়া, অচেনা ও অন্য জীবনের মানুষকে পড়া। কবি-ই তো পারেন অচেনাকে আপনজন করে নিতে।

আবার অচেনা লোক অচেনাই থেকে গেল, তবু সম্পর্ক হল একরকম, তাও কি ঘটে না?

উৎসব

পর নীরবতা। কথা বলতে ভুলেই গিয়েছি।
আশ্রয়। শ্রদ্ধার বাক্য। তারপরেই 'এদিকে'। 'এদিকে'।
ডাইনিং টেবিলে দেখা। বুফে সিস্টেমের খাওয়া-দাওয়া।
ফ্রাইয়ের ভিতর শুধু ঢেলে দেওয়া সর্ষের তরল।

স্বস্তি পাচ্ছি না কোনো। পাখাগুলো একদিকে ফেরানো।
ঘামে বসে আছে চুল। ক্লান্তি লাগছে হেসে যেতে খালি।
বন্ধুরা জটলায়। শুধু একজন সিগারেটভোগী।
রাস্তায় দাঁড়িয়ে তার বাতাসসেবন। ধূমপান।

অন্যায়, অন্যায় হচ্ছে। এরপর বিয়ে বসে যাবে।
বন্ধ ঘরে আগুন জ্বালানো। ঢাকা ছাতের তলায় ছাতনাতলা।
খোলামেলা নেই কোনো। ফুল নেই। বাতাস আসছে না।
সোনালি রাংতায় মোড়া পুরোনো বান্ধবী বসে আছে।

সকলের হাসাহাসি। একজনের চুপ করে থাকা।
সকলের আড্ডা। ঝুঁকে বর দেখা। একজন নীরব।
দুজন একাকী লোক বিয়েবাড়ি থেকে বেরোলাম।
দুজন একাকী লোক। আর দেখা হবে না কখনও।

স্বাভাবিক একটা বিয়ে বাড়ি। যেমন হয়। নতুন অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়। তেমনি আলাপ হল একজনের সঙ্গে। প্রথম আলাপের পরেই একটা নীরবতা দুজনের মধ্যে। কেউই কথা খুঁজে পাচ্ছে না। তারপর আবার বিয়েবাড়ির হুড়োহুড়ি। খাওয়ার সময় আবার দেখা। বুফে সিস্টেমের স্বাধীন ঘুরে বেড়ানো খাওয়া। সেই যাওয়া আসার ফাঁকেও কি দু-চারবার চোখে চোখ পড়ে যাওয়া নেই? দুজনই দুজনকে দেখছে, দেখে ফেলছে যেন। এখানে আছে ফ্রাইয়ের ভিতরে শুধু ঢেলে দেওয়া সর্ষের তরল। একটা ঝাঁঝ, জ্বালা, উপভোগ করা যায় এমন জ্বালা, চেপে রাখা অস্থির-অস্থির একটা অনুভূতি, সবই ওই একটিই লাইনে বেরিয়ে এল।

পরের স্তবকের শুরুতেই প্রমাণ রয়েছে সেই অস্থিরতার। স্বস্তি পাচ্ছি না। যেন গরম লাগছে। সুন্দর ডিটেল-'ঘামে বসে আছে চুল।' বন্ধুদের গোল হয়ে গল্প করা। তার মধ্যে একজন শুধু সিগারেট টানছে একা একা। এই বদ্ধ অবস্থাটি কিছুটা কাটাতে যে সামনের রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে একা সিগারেটের অছিলায়। আরও একজন একা কিন্তু রয়েছে সেই বিয়েবাড়িতে। যে দেখছে একজনের সিগারেট হাতে একা বেরিয়ে আসা। বিয়েবাড়ির এই বর্ণনার মধ্যে সারাক্ষণ একটা হাঁপধরা, দমবন্ধ ভাব তৈরি রাখা হয়েছে, যেখানে কেবলই হেসে যেতে ক্লান্ত লাগে। ভাড়া করা বাড়িতে বিয়ে, যেমন হয়। ফলে বন্ধ ঘরে আগুন জ্বালানোর মতো বিপজ্জনক কাজ হচ্ছে। সাধারণত ছাতনাতলা বললে আকাশখোলা একটা জায়গা বোঝায়, যেখানে ছাতনাতলা তৈরি হয়। কিন্তু, এখানে তাও ছাদ দিয়ে ঢাকা। একালের বিয়েবাড়ির এমন নিখুঁত ছবিও কি আগে কখনও পৌঁছেছে বাংলা কবিতায়? এত যে বদ্ধ লাগছে, গরম লাগছে, তা কিন্তু দু-জন নারীপুরষের ভিতরের অস্থিরতা। কেউই কোনোভাবে পরস্পরের কাছে এসে কথা বলতে পারছে না। আবার এমন কথাও এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন যে, এই যে বিবাহের অনুষ্ঠান, এ যেমন বাঁধা ধরা, বিবাহ বন্ধনটিও তো এক ধরনের বাঁধা-পড়া অবস্থারই প্রকাশ। এরা দুজন যে দুজনের সঙ্গে সব ভেঙে ছুটে গিয়ে কথা বলতে পারছে না, তার কারণ, অনুমান করা যায়, দুজনেই জীবনের এমন একটা পর্যায়ে দাঁড়িয়ে, যেখানে, অত্যল্প বয়সি ছেলেমেয়েদের মতো ইচ্ছে করলেই ছুটে যাওয়া যায় না। অনেক দিক ভাবতে হয়। সংকোচ হয় তার ফলে। বিবাহিত হওয়াটাও সে সংকোচের অন্যতম কারণ কি? এমন ইঙ্গিতও আছে? কবিতাটিকে যদি নিজের দিক থেকে দেখি, যা দেখা আমার স্বভাব, তবে সে ইঙ্গিতও পাই। কেটারার অধ্যুষিত, অত্যন্ত নিয়ম-বাঁধা ভাড়া করা বিয়েবাড়ির সব আয়োজনের পিছনে যে কোথাও একটা প্রাণহীন যান্ত্রিকতা আছে। আবার সামাজিক ভাবে সভ্যভব্য বলে পরিচিত হয়ে যাওয়া দুটি নারীপুরুষের পরস্পরের সঙ্গে আরও একটু কথা বলতে না-পারার নিরুপায়তা, তার সঙ্গে বিবাহবন্ধনের সম্ভাব্য বন্দিত্ব—সব একসঙ্গে আসছে। দুটি লাইন না তুলে পারছি না: খোলামেলা নেই কোনও, ফুল নেই, বাতাস আসছে না। সোনালি রাংতায় মোড়া পুরোনো বান্ধবী বসে আছে। শেষের এই ছবিটি নিখুঁত। পুরোনো বান্ধবীর আজ পুতুলে রূপান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সোনালি রাংতা শব্দটির অমোঘ ব্যবহারে জাঁকজমকের মিথ্যাটি প্রকাশিত। রাংতা সোনালি কেন? কারণ সোনার গয়না তো কনের গায়ে অনেকই আছে। সেই সোনার রং রাংতাই তো হয়ে যাবে যদি পুরো উৎসবটাই সাজানো আর দমবন্ধ হয়। শুধু কি উৎসবই সাজানো আর দমবন্ধ? অনেক সম্পর্কও কি তাই হয় না? পুরোনো নানা বিবাহিত যুগলের পরিণতি মনের ভেতর খেলে যায় হয়তো, পুত্তলিকা ওই মেয়েটির বসে থাকা দেখে। যথাসময়ে খাওয়াদাওয়া শেষ। বাড়ি ফেরার পালা। সকলের হাসাহাসির মধ্যে ছিল যে একজনের চুপ করে থাকা, মেয়েদের ঝুঁকে ঝুঁকে বর দেখার মধ্যে একজন যে অনাগ্রহী ছিল, একজন যে নীরব—সেই 'দু'জন একাকী লোক' বিয়েবাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। এখানে লোক শব্দটির ব্যবহার আশ্চর্য। মেয়েটিও এখানে একটি ব্যক্তি। 'দু'জন একাকী লোক' শব্দ বন্ধটি পরপর দুটি লাইনের প্রথমে এসে পাঠককে

নিঃশব্দে আঘাত করে। তার বুক ভার হয়ে আসে। কবিতাটির শেষ বাক্য—আর দেখা হবে না কখনও—হাহাকার হয়ে পড়ে থাকে।

কী করেই বা দেখা হবে। কেউ তো কারও ঠিকানা নেয়নি। ফোন নম্বর বিনিময় করেনি। এমনকি, প্রাথমিক আলাপের পর সৌজন্যসম্মত 'শ্রদ্ধার বাক্য' ছাড়া কথাও বলেনি। শুধু প্রথম আলাপের পর দুজনেই কথা হারিয়ে ফেলে ওই শ্রদ্ধার বাক্য বিনিময়ের মধ্যে আশ্রয় খুঁজেছিল। করমর্দনের পর নীরবতা। 'কথা বলতে ভুলেই গিয়েছি।' নিঃশব্দ প্রেমের এই কবিতার পর আমরা পাঠকরাও নীরব হয়েই থাকি। ভাবি, এত অল্প নিয়েও কি এমন কবিতা লেখা যায়?

নানা ধরনের সম্পর্ককে খুলে দেখানো এই যে কবিতাগুলো নিয়ে কথা বলছি, সেসব কবিতা আছে রেডিয়ো-বিতান নামক একটি বইতে। বইটি লিখেছেন যশোধরা রায়চৌধুরী। জনজীবনের মধ্যে ভিড় হয়ে থাকা মানুষকে কীভাবে পড়তে হয়, এ লেখাগুলো তার এক ধরনেব নিখুঁত দৃষ্টান্ত।

কবির সামর্থ্যের প্রমাণ একদিকে যেমন তাঁর শব্দ ব্যবহারে, অন্যদিকে তেমন তাঁর দৃষ্টির সূক্ষ্মতায়, পর্যবেক্ষণ শক্তিতে। কবি কী দেখছেন, সেটা খুবই জানতে চায় পাঠক। কারণ তাঁর দেখার মধ্য দিয়ে সেও যে দৃষ্টিশক্তিকে নতুন করে ফিরে পায়। অন্যথায় সে অন্ধ থাকে। চা-ওলা ও ট্যাক্সিওয়ালা কবিতা দুটি যেমন এক্ষুনি আমাদের চক্ষুষ্মান করে তুলল।

এবার আমরা অন্য একটি কবিতায় যাব।

পিকনিক

উড়াতে এসেছি মজা, মাঠভরতি। তোরা যে চাদর
পাতবি বলে এনেছিলি, তাতে সব বড়ো বড়ো ছোপ
সে কী রে, বক্তের নাকি? রুণি তোর হানাবাড়ি থেকে
আর কী কী এনেছিস : শৌখিন চামচ, কাঁটা, ছুরি ..

দে তো কাঁটা দুটো, আমি লোফালুফি দেখাব, ব্যালেন্স
বাঁদিকে আপনারা বউদি ডানদিকে তোরা খুকুমণি
আমি ঠিক মধ্যখানে সোডার বোতল
কিছুক্ষণ ভুসভুসিয়ে তারপর চুপ মেরে যাব, নেশা হলে...

মাঠময় উড়ে যাচ্ছে হাসি ও ফড়িং
মাঠময় উড়ে যাচ্ছে ইয়ার্কি, মজাক
উনুন, যা কোনোদিক ধরে উঠতে পারে না পুরোটা
তাকে আমরা জ্বেলে দেব হৃদয়ের মুহব্বত, মায়া দিয়ে দিয়ে

সেবারের পিকনিকে মায়াদিও ছিল না রে? ডিসেম্বর মাসে
কাপড়ে আগুন লেগেছিল, ও শেষসময়ে ভুল বুঝতে পেরে
নেভানোর ইচ্ছে নিয়ে বিছানায় এসে গড়াচ্ছিল
বেডকাভারে...বেডকাভারে...এটা তবে সেই বেডকাভার?

আমরা সকলে মিলে মজা মারছি যেটার ওপরে...

মাঠে পিকনিক হচ্ছে। চাদর পেতে সকলে বসা হয়েছে। সবাই আনন্দ করছে। কবিতাটিতে একবারও অবশ্য 'আনন্দ' কথাটি বলা নেই। বলা হচ্ছে মজা। অথবা আরও তীব্র : মজাক। যে চাদর বসার জন্য পাতা হয়েছে, তাতে ছোপ ছোপ দাগ। কীসের দাগ? রক্তের? একবার রক্ত কথাটি এসে দ্রুত চলে যায়। দাগ ধরা চাদরে বসে সবাই কী কী মজা করছে, তার বর্ণনায় ঢুকে পড়ে কবিতাটি। একজন খুব হইচই করছে। সে যেন তুমুলভাবে মেতে থাকতে চায় হুল্লোড়ে। একদিকে বিবাহিত মাঝবয়সি মহিলারা বসেছেন, ও পাশে কিশোরীরা। একজনের মধ্য থেকে স্ফূর্তির ফোয়ারা যেন ভসভসিয়ে উঠছে। সে নিজেই জানে চুপ মেরে যাবে একটু পরে। সকলের স্ফূর্তি উপভোগের বর্ণনাটি তুলনাহীন। যা তৃতীয় স্তবকে আছে। আছে এ কথাও, উনুন যা কোনোদিন ধরে উঠতে পারে না পুরোটা, তাকে আমরা জ্বেলে দেব হৃদয়ের মুহব্বত, মায়া দিয়ে দিয়ে। এই মুহব্বত কথাটা কিন্তু আচমকা আসেনি। কে জানে, ওই হুল্লোড়ের মধ্যে হিন্দি ছবির গানও হচ্ছিল কি না। এই হইচই-এর যা ধরন, তাতে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এই কবি মুহব্বত-এর আগে হৃদয়কে রেখে সংঘর্ষ তৈরি করেছেন, দিল্ কথাটাকে কোনোভাবে আনেননি কিন্তু! অন্যদিকে মুহব্বত আনবার আগে মজাককে এনে রেখেছেন। আর শুরুতেই তো বলে নিয়েছেন 'উড়াতে এসেছি মজা' মজা করতে এসেছি তো বলেননি। অর্থাৎ মুহব্বত-এর পূর্বভূমিকা হিসেবে শুধু নয়, বিশেষ একটি বাকভঙ্গি, হিন্দি-মেশানো এই বুলি, প্রথম থেকেই মিশিয়ে আসছেন। কেন-না, এই কবিতাটির যে প্রধান অস্ত্র শ্লেষ। তা আরও তীক্ষ্ণ ভাবে ফুটে উঠছে। আসলে এই শ্লেষের অন্তরালে আছে গভীর যন্ত্রণা। যে যন্ত্রণায় একজন ছটফট করছে। আর যন্ত্রণাকে বুঝতে না দেওয়ার জন্য, সেই ছটফটানিকে যেমন রূপান্তরিত করছে প্রবল হুল্লোড়ে, যেন সবচেয়ে বেশি মেতে আছে সে-ই, এমন একটা ভাব দেখাচ্ছে—এই কবিতাটিও তেমনই শ্লেষের আড়ালে ঢাকতে চেষ্টা করছে তার তীব্র কষ্ট। কার জন্য কষ্ট পাচ্ছে এই কবিতা? মায়াদির জন্য। এমনই একটা পিকনিকে আগের বার, মায়াদিও ছিল। যে মায়াদি আর নেই। পুড়ে মরে গেছে। গায়ে আগুন লেগে। আত্মহত্যার কথা স্পষ্ট করে বলা নেই, কিন্তু 'শেষ সময়ে ভুল বুঝতে পেরে'—এই বাক্যাংশের মধ্যে আত্মহত্যার ইঙ্গিত আছে। বেডকভারে যে ছোপ ছোপ দাগ কি সেই পোড়া ছাপ। নাকি রক্তের? তা কখনও হয় নাকি? ওই চাদর কেউ ব্যবহার করে কখনও? মনে হয় কথাটিকে আক্ষরিকভাবে নেওয়ার কথা বলছে না কবিতাটি। আসলে, এত লোকের মধ্যে একজনের শুধু মনে পড়ছে

: 'মায়াদিও ছিল না রে?' একবার নয় বারবার মনে পড়ছে। পিকনিক করতে আসার শুরু থেকে মনে পড়ছে। তাই জন্যই না কবিতা আরম্ভের বাক্য : 'উড়াতে এসেছি মজা!' দ্যাখো তুমি ওইভাবে মরে গেলে, কিন্তু আমরা মজা করতে এসেছি। এখানে আরও একটু তথ্য চাপা অবস্থায় রয়ে গেছে। কোনো একজনের উদাসীনতা। রুণি নামে কেউ। যার বাড়ি থেকে এই পিকনিকের অনেক জিনিসপত্র এসেছে। 'হানাবাড়ি' কথাটা ব্যবহার করা আছে এখানে। অর্থাৎ এই সেই বাড়ি, যে বাড়িতে ওই 'মায়াদি'-র অপঘাত ঘটেছিল সে ইঙ্গিত স্পষ্ট। রুণির প্রতি একটু ভর্ৎসনাও আছে। যে ভর্ৎসনা আসলে নিজেকে। 'কেন এসেছি? কেন এসেছি!' এবং শেষ লাইনে যে ভর্ৎসনা চূড়ায় পৌঁছোয় : আমরা সকলে মিলে মজা মারছি যেটার ওপরে। পাঠক শিউরে ওঠে শেষ লাইনটিতে এসে। মনে হয় আমিই যেন বসে আছি ওই বেডকভারের ওপর। আমিও সমান অপরাধী। আমি পাঠক, কিন্তু জীবনে এমন ভুলে যাওয়ার মুহূর্ত, ভুলে গিয়ে মজা করবার মুহূর্ত কি আমিও কাটাইনি?

স্বজনের প্রতি, বন্ধুর প্রতিই তীব্র ভালোবাসার কবিতা রচিত হয়েছে এক গভীর অপরাধবোধ মেশানো শোকের দ্বারা দগ্ধ হতে হতে। অথচ সেই দগ্ধ হওয়াকে প্রথম থেকে লুকিয়েছে হাসিঠাট্টা, শ্লেষের আড়াল। যন্ত্রণার সহোদরা যে শ্লেষ। যে শ্লেষ অপরকে, বা কোনো প্রতিপক্ষকে বিদ্ধ করে না। বিদ্ধ করে নিজেকে। নিজের কৃতকর্মকে। নিজের ভুলে যাওয়াকে। সারাক্ষণ আনন্দ করার কথা বলছে কবিতাটি আর সে পিঠে করে বইছে প্রচণ্ড ভারী একটি মৃত্যুঘটনা। এই সংঘর্ষটিকে সারাক্ষণ ধরে রয়েছে কবিতা। 'হৃদয়ের মুহব্বত' শব্দটি ব্যবহারের মধ্যে যে সংঘর্ষ বেরিয়ে আসে স্ফুলিঙ্গ তুলে, তা সেই কারণেই আরোপিত বলে মনে হয় না। কবিতাটির ভেতরেই তো সেই সংঘর্ষ সারক্ষণ চলেছে।

যে কবিতাগুলোর কথা লিখলাম, সে সব কবিতাই আমাদের জানায় দরদ-এর কথা। মমতার কথা। অনিবারণীয় ভালোবাসার কথা। মনে রাখতে হবে, কবি যশোধরা রায়চৌধুরী, এই কবিতাবলিতে যে চরিত্রদের এনেছেন, তারা কেউই কিন্তু কবির খুব কাছের মানুষ নন, পড়লেই বোঝা যায়। এমনকি এই মায়াদিও ঠিক বন্ধু নন। চেনাশোনা। অনেকটা বন্ধুর মতো হতেও পারেন। 'সেবারের পিকনিকে মায়াদিও ছিল না রে?' এই জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে মায়াদির সঙ্গে সম্পর্কের দূরত্বটুকুও বোঝা যায়। কিন্তু সব দূরত্ব ঘুচিয়ে অনাত্মীয়কে আত্মীয় করেছেন কবি। মানুষগুলোকে পাঠকের একান্ত নিজের করে তুলেছেন। এই কাজ পৃথিবীতে সম্ভব করতে পারে ভালোবাসা। এই রকম ভালোবাসাকে সঙ্গী করতে করতে রাস্তা হাঁটছে যশোধরা রায়চৌধুরীর কবিতা। আমরা তাকিয়ে আছি।
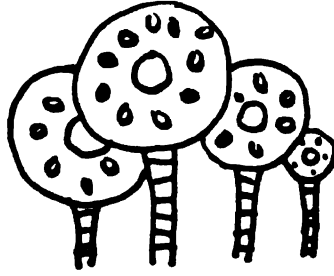
১১

ডায়েরি লেখার মতো একদিন কবিতা লেখা আরম্ভ করেছিলাম। সত্যি বলতে, ‘একদিন আরম্ভ করেছিলাম’ কথাটা ঠিক বলা হল না। ডায়েরিই লিখতাম। কেন, তা জানি না। অথবা এখন ভেবে দেখতে গেলে, জানি। ব্যাপারটা হল, মাথায় কথা আসত। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি দোকানে। মা কিছু কিনতে দিয়েছে শিবুদার মুদির দোকানে। দাঁড়িয়ে আছি। শিবুদা জিজ্ঞেস করলেন, কী দেব? উত্তর দিতে দেরি করছি। শিবুদা বললেন, কী রে, কী নিতে এসেছিস ভুলে গিয়েছিস? না, না, ভুলিনি। বললাম। কিন্তু কেন দেরি করছিলাম উত্তর দিতে? মাথায় কথা আসছিল। এমন সব কথা যার সঙ্গে শিবুদার দোকান, মা-র আনতে বলা জিনিসপত্র, হাতে ধরা টাকা, কোনো কিছুরই সম্পর্ক নেই। এমনিই কতগুলো লাইন পরপর মনে আসছে। আবার ভুল বললাম। লাইন বলাটা ভুল। তখন তো লিখি না। ফলে লাইন হিসেবে মনে আসছে না। কয়েকটা কথা হিসেবে মনে আসছে। একেবারেই গদ্যকথা। ছন্দমিল কবিতার ছাঁদ এসব কিছুই নেই তাতে। কারও সঙ্গে যেন কথা বলছি, ওইভাবে আসছে। বেশ একঘণ্টা, দেড়ঘণ্টা মনের মধ্যে ওইরকম কথার এসে পড়া চলছে। কার সঙ্গে কথা বলছি জানি না কিন্তু। শুধু বলছি। ওই দু-একঘণ্টা একটা ঘোরের মধ্যেই যেন আছি। তারপর একসময় সেই ঘোরটা আবার চলেও যাচ্ছে। আপনমনে একা কথা বলে যাওয়া চলতে চলতে অনেক সময় জোরে জোরেও কথা বলে ফেলতাম। কবে যেন একসময় অধেক ফুরোনো একটা অঙ্ক খাতার মাঝামাঝি জায়গা থেকে লিখতে শুরু কবলাম। মনে যা আসে তাই। সেটা ছিল পুরোপুরি গদ্য। একদিন দেখি, ভাই তার বন্ধুদের সামনে সেই খাতা থেকে জোবে জোরে পড়ে শোনাচ্ছে। আমি যাওয়া মাত্র, সবাই আমাকে দেখে খুব হ্যা হ্যা করে হাসতে শুরু করল। আমি আর ভাই এক ক্লাসে পড়েছি। আমার বন্ধুরাই ছিল ভাইয়ের বন্ধু। মর্মান্তিক রাগে দুঃখে আমি তখন ভাবছি বাড়ির পিছনের পুকুবটায় ডুবে মরি।

সেই খাতা ছিঁড়ে ফেললাম। সিদ্ধান্ত নিলাম আর কখনও ওপথে যাব না। ডায়েরি লেখা বন্ধ করে দিলাম। ভাই অবশ্য মাঝে মাঝে বিচ্ছিরি হেসে জিজ্ঞেস করত, আর লিখছিস না?

বন্ধ তো করলাম কিন্তু স্বভাব গেল না। একলা থাকলেই মাথায় কথা আসে। আপন মনে জোরে কথা বলার অভ্যাস থেকে সরে যাব বলে খাতায় লিখতাম কারণ লেখার মধ্যে গেলে আর বিড়বিড় করার পাগলামোটা লোকের চোখে পড়বে না। কিন্তু সেই তো আবার আপনমনে কথা বলার প্ররোচনা অন্তর থেকে শুরু হল। শেষমেশ আবার খাতাকলম টেনে নিলাম। জানি, যে, আমার কথাটা আমি লুকিয়ে রাখতে পারব না। আমার ভাই ঠিক খুঁজে বার করবে। তাই এবার লিখতে শুরু করার সময় একটা মতলব করলাম। লিখব, কিন্তু এমনভাবে লিখব যে ভাই পড়লেও ব্যাপারটা ধরতে পারবে না। ইশারা দিয়ে দিয়ে লিখব। অর্থাৎ লিখতে চাই, আবার একইসঙ্গে লেখার বিষয়টাকে আড়ালও করতে চাই। একইসঙ্গে নিজেকে প্রকাশ করা আবার নিজেকে লুকিয়ে রাখা এই অদ্ভুত একটা পদ্ধতির মধ্যে নিজের অজান্তেই নেমে পড়ছিলাম। তারপর কখন একসময় কবিতা লেখার মধ্যে এসে পড়লাম। দেখলাম, যা লিখছি তা কবিতা-আকার দিয়েই লিখতে চেষ্টা করছি। গদ্যর আকারে আর কিছু লিখছি না। অবশ্য কবিতা পড়বার অভ্যাস আমার ছিল ওই শৈশব কৈশোরের সময়টাতেই। দেশ নিয়মিত পড়তাম। তাতে কবিতার পাতা থাকত। পুজো সংখ্যাগুলোতে থাকত অনেক পাতা কবিতা। সেসব কবিতা পড়ে প্রথমে কিছুই বুঝতাম না। কিন্তু কেন যেন আবার ফিরে ফিরে পড়তাম। একটা লাইন, আবছাভাবে হয়তো গেঁথে রইল মনে। কোনো কোনো কবিতা পড়ে হতবুদ্ধি হয়ে থাকতাম। তারপর তো একসময় নিজেই একটা দুটো করে কবিতা লিখতে শুরু করে দিলাম। টুকরো-টাকরা কাগজে লিখি। লিখে একটা বড়ো লম্বা সাইজের খাতার মধ্যে টুকরো কাগজগুলো ভাঁজ করে রাখি। ওই খাতাটা যেন সিন্দুক আমার। খুব দামি সব মণিমাণিক্য রাখা আছে। তখনও কেউ জানে না আমার কবিতা লেখার কথা। কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারলাম।

কবিতা লিখলে একটা গভীর আনন্দ হয়। কাউকে বলি না, কিন্তু মনটা কেমন একটা আলোয় ভরে থাকে। রাতের বেলা, যখন ওই খাতা বা সিন্দুকটা খুলি, টুকরো কাগজগুলো দেখি, তখন কেমন একটা রোমাঞ্চ হয়। সবশেষে যেটা লিখেছি, হয়তো সেদিনই দুপুরে— সেই কাগজটা দেখি সবার শেষে।

কবিতা পড়াটাও তখন পাগলের মতো। যা পাই তাই পড়ি। এর কিছুদিন আগে জানতে পেরেছি লিট্‌ল ম্যাগাজিনের জগৎ-এর কথা। একটি ক্রিকেট ক্লাবের চোদ্দো নম্বর খেলোয়াড় ছিলাম আমি। জল নিয়ে মাঠে ঢুকত টুয়েলভথ ম্যান। ব্যাট বদলে দিতে হলেও সে যেত। ফিল্ডিং-এ নামত মাঝে মাঝে। তারপরও কোনো দরকার হলে তেরো নম্বর যেত। চোদ্দো নম্বরকে কখনোই কারও দরকার হত না। তা ছাড়া টুয়েলভথ ম্যান পরের ম্যাচে চেঞ্জ হত। সে হয়তো প্রথম এগারোয় ঢুকে গেল। কিন্তু চোদ্দো নম্বর কোনোদিন চেঞ্জ হত না। আমি মাঠের বাইরে বসে দলের জয়ের সম্ভাবনা দেখা দিলে তার উত্তেজনা ও

উল্লাসে অংশ নিতাম। টিম হারলে সকলের সঙ্গে বিষণ্ণ হতাম। এর বেশি নয়। তবে খেলা থাকলে সকাল সাড়ে ন-টার মধ্যে চানটান করে সাদা জামা-প্যান্ট পরে মাঠে চলে যেতাম। অনেকে হাসত। আমাদের ট্রেনার ভৃগুবাবু বলতেন, এসেছ, ভালো হয়েছে, নরেনকে সঙ্গে নিয়ে যাও ওই প্যাডটা সেলাই করে নিয়ে এসো। অথবা যাও তো সাধনের দোকান থেকে চট করে একটা বল কিনে আনো। এই নাও টাকা। কিছু একটা কাজ করতে দিয়ে গুরুত্ব দিতেন আমাকে।

এই ভৃগুবাবু লোকটি ছিলেন কিছু অদ্ভুত। নেটে, প্র্যাকটিসের সময় বলতেন, পরেশকে দেখেছ, যেন ভিনু মানকড়ের মতো ফ্লাইট দিচ্ছে। কিংবা বাঃ বাঃ, পেঁয়াজি ব্যাকফুটে তো একেবারে ওরেলের মতো। কাউকে কভারে দাঁড় করালেন, বললেন শোন, মনে রাখবি হ্যামন্ড কভারে দাঁড়াত। ভৃগুবাবু ছিলেন রোগা, ছ-ফিট লম্বা, ঈগলের মতো নাক, তীক্ষ্ণ চোখ—সামনে কেউ কিছু বলতে পারত না। আড়ালে হাসত। কলকাতার প্রথম ডিভিশনে ক্রিকেট খেলেছেন এই ভৃগুবাবু। আমি বাউন্ডারি লাইনের ওপার থেকে চার হওয়া বলগুলো কুড়িয়ে, ফেরত পাঠাতাম আর দেখতাম আমাদের ছোট্ট এই মফস্‌সল টাউনের গাছঘেরা বেলতলা মাঠ কীভাবে যেন লর্ডস বা মেলবোর্ন-এ রূপান্তরিত হচ্ছে, আমাদের খেলার সঙ্গীরা সব ইতিহাসপ্রসিদ্ধ খেলোয়াড়ে পরিবর্তিত হচ্ছে। বাড়িতে গাদা করা ইংরেজি-বাংলা ক্রিকেট বই ছিল ভৃগুবাবুর। সন্ধেবেলা ফেরার সময় প্রায়ই একটা করে নিয়ে আসতাম। আজ বুঝি, কবিতার বীজ, আমার জীবনে, ভৃগুবাবুর হাত ধরেও এসেছে। ক্রিকেট যে একটা মহান খেলা, আর আমরা যে কেউ তুচ্ছ নই কেবল কোনোভাবে এই বড়ো খেলাটার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছি বলেই—বিরাট একটি ঐতিহ্যের অংশ ধরে যে আমরা এসেছি—এমনই কিছু তিনি মনে করিয়ে দিতে চাইতেন তাঁর ছেলেদের। একটি সাধারণ জায়গায় দাঁড়িয়ে, কোনো দূর অসাধারণকে কল্পনায় আনা আমার তাঁর কাছেই শেখা। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চয়ই আজ অচল। কিন্তু সেদিন আমাকে রোমাঞ্চিত করত তাঁর ওইরকম সব কথা। আজও করে।

এই ভৃগুবাবু, আমাদের সেই নবাঙ্কুর ক্লাব থেকে, প্রতি বছর পুজোয় তিনদিন ধরে একটা প্রদর্শনীর আয়োজন করতেন। স্থানীয় একটি স্কুলে তিনটি ঘর নিয়ে প্রদর্শনী হত। চিত্রকলা ও লিট্‌ল ম্যাগাজিনের প্রদর্শনী। দুটি বড়ো ক্লাসরুমে টাঙানো ছবি। আর একটি ঘরে বিছিয়ে রাখা অজস্র লিট্‌ল ম্যাগাজিন। সারা বাংলা খুঁজে ভৃগুবাবু সেইসব লিট্‌ল ম্যাগাজিন সংগ্রহ করে আনতেন প্রদর্শনীর জন্য। আমি, একজন ভলান্টিয়ার হিসেবে পুজোর তিনদিন লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতাম। মাঝে মাঝে পাতা উলটে পড়তাম। লিট্‌ল ম্যাগাজিন নামক বহুমাত্রিক আলোকবিচ্ছুরণকারী বস্তুটির সঙ্গে ভৃগুবাবুই আমার পরিচয় করিয়ে দেন, সেই শেষ-ষাট, প্রথম-সত্তরে।

তিনদিনের এগজিবিশন মিটে যাওয়ার পরে, ভৃগুবাবুর বাড়ি থেকেও ডাঁই করা পত্র পত্রিকা বাড়ি নিয়ে আসতাম আমি। আধুনিক কবিতার বিরাট ও বৈচিত্র্যময় জগতের সঙ্গে

তখন আমার জানাশোনা পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে। অন্য একটা জিনিসও হত। ছাপা কবিতাগুলো পড়বার পর অনেকসময় মনে হত, আমার নিজের লেখাগুলো কী খারাপ! পাশাপাশি মিলিয়ে দেখতাম। আবার একটা কবিতা যদি খুব ভালো লাগল, ভালো লাগল মানে সবটা তো বুঝিনি, কিছুটা ভালো লেগেছে, সেই রকম লেখা—তাকে পাশে রেখে ওইরকম আরেকটা কবিতা লেখার চেষ্টাও করতাম, করেছি। তাহলে হয়তো আমার লেখাটা একটু ভালো হবে। খুব নকল করার চেষ্টা করতাম রত্নেশ্বর হাজরার কবিতা। ওঁর একটা কবিতার ফার্স্ট লাইন হচ্ছে, 'এই ছন্দে চুরি হয় চোখ থেকে ঘুম আর আস্তাবল থেকে ঘোড়াগুলো।' এমন একটা লাইন যে লিখেছে সে তো দেবতা! প্রথম লাইনটা পড়ে চোখ বুজে বসে রইলাম। তারপর পুরো কবিতাটা তন্ন তন্ন করে পড়লাম। কী ছন্দে যে চোখ থেকে ঘুম আর আস্তাবল থেকে ঘোড়া চুরি হচ্ছে সেটা কিন্তু কোথাও লেখেনি। ততদিনে এতটুকু বুদ্ধি হয়েছে যে বুঝতে পারছি এই ছন্দটা কিন্তু ঠিক কবিতার ছন্দ নয়। মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত বা স্বরবৃত্তের কথা বলছে না। অন্য কোনো ছন্দ, যা হয়তো জীবনের কোনো রহস্য, কিছু একটা সকলের অগোচরে হয়—সে কথা বলছে! কিন্তু, তবু সেই ষোলো-আঠারো লাইনের কবিতাটার আগাপাশতলা খুঁজে মরছি, যদি কোথাও বলে ছন্দটা আসলে কী। বললই না। তখন আস্তে আস্তে বুঝতে পারছি কবিতা তাহলে বলব বলেও কিছু কথা বলে না। এমনকি, মূল কথাটাও সে গোপন করে যেতে পারে। কবিতার তখন এমন মুড—মূল কথাটার ক্ষেত্রেই চুপ করে থাকল। অনেক সময় হয় না, কারও কাছে একটা কিছু বলতে গেছি, কিছুতেই বলতে পারলাম না। কথাটার আশপাশ দিয়ে ঘোরাঘুরি করে চলে এলাম।

অথবা মূল কথাটা হতে পারে ব্ল্যাক হোল-এর মতো। তাকে দেখবার তো কোনো উপায় নেই। কারণ কোনো বিকিরণ সে পাঠাচ্ছে না। কিন্তু তার চারপাশে মহাকাশের মধ্যে যে গ্রহ-নক্ষত্ররা রয়েছে, সেইসব আকাশ বস্তুর তো কিছু কিছু প্রতিক্রিয়া হয় কাছাকাছি ব্ল্যাকহোল থাকলে—তাদের প্রতিক্রিয়াগুলো পরিমাপ করেই বোঝা যায় ব্ল্যাকহোল কোথায় আছে, কী ধরনের চরিত্র তার—সেইরকম আর কী।

সেইসময় একজন খুব লিখতেন, অলোকনাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁর লেখায় পড়লাম,

> এইভাবে শীত আসে, এসে থামে আমাদের পুরোনো উঠোনে
> উনোনের আঁচে মুখ লাল করে তুমি বুনে নাও মোজা
> ছোটো মেয়েটার সোয়েটার...

ভেতরটা যেন কেমন হয়ে গেল। ছোট্ট ছোট্ট স্পর্শ। আমাদের তো বারান্দার সামনে উঠোন আছে। লেবু গাছ আম গাছ পেয়ারা গাছ। শিউলি আর রজনিগন্ধা। কয়েকটা পেঁপেগাছও। আমাদের উঠোনটাকে দেখতে পেলাম। না-দেখা একটি মেয়েকে দেখতে পেলাম। যে উনোনের আঁচে মুখ লাল করে সোয়েটার বুনছে। তখনও তো আমার জীবনে

কোনো মেয়ে আসেনি। কবিতার মধ্য দিয়ে এল। শামসের আনোয়ারের লেখায় দেখলাম :

লণ্ঠনের পাশে জ্বলে রয়েছে তোমার মুখ
যেন অপর একটি লণ্ঠন।

মনে হল এর চেয়ে সুন্দর কোনো মেয়েকে দেখিনি। আর বাস্তব জীবনে রাস্তায় কোনো মেয়ের মুখোমুখি পড়ে গেলে তখন সাহস করে তাকাতে পারি না।

শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় পড়লাম

এমন আশ্চর্য কিছু স্মৃতিচিহ্ন
যা তোমাকে দিতে পারি
তুমি তো নিজেই স্মৃতি, প্রণয়অঙ্গুরী
আমি অনামিকা থেকে কখনও খুলি না, কোনোদিন...

অথচ আমাকে তুমি কী সহজে বসিয়ে রেখেছ
প্রতীক্ষার রেস্তোরাঁয়, কফি দিয়ে,
নিজে গেছ নতুন দোকানে
কী যেন ভীষণ ভালো বুদ্ধমূর্তি কিনে নেবে বলে
আমার পছন্দ ছিল অন্যকিছু, সামুদ্রিক ঝিনুকের মালা
এ জীবনে, সে-মালা সংগ্রহ আর কখনও হবে না

এই শেষ বিকেলের নরম আলোয় তুমি এখনও
ফেরোনি...

এবার্ডিন মার্কেটে কিউরিও শপ

এ কবিতা পড়ে তখন বুকের ভিতর টনটন করে উঠত। মনে হত আসুক, কেউ আসুক। ওই কবিতার মেয়েটির মতোই, ছেড়ে যাওয়ার জন্যই আসুক। তারপর সত্যিই ছেড়ে যাক একদিন। আমি বসে থাকি। যদি লিখতে পারি অমন একটি কবিতা।

কবিতাটিতে যে শেষ বিকেলের কথা বলা আছে, আজ আমার জীবন এসে পৌঁছেছে তার কাছাকাছি কোনো অপরাহ্ণকালে। আজ আর কারও আসবার অপেক্ষা করি না। কারও ছেড়ে যাওয়ার ভয় পাই না। কেবল দেখতে পাই ওই কবিতাটি থেকে পূর্বী রাগের কোমল রে এসে প্রবেশ করছে আমার জীবনে। আমার কিশোরবেলার সকল জানা অজানা কবির কথা মনে পড়ে তখন। তাঁরা না-থাকলে আমি যে কবিতার কাছে আসতেই পারতাম না।
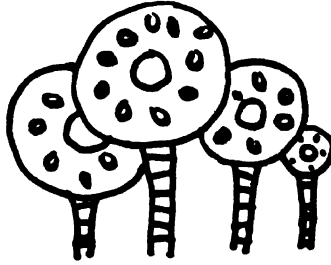
১২

সেটা সম্ভবত ৭৯ সাল। আমি তখন থাকি রানাঘাটে। শহরে এসেছি। দেখা হয়েছে এক কবি বন্ধুর সঙ্গে। আমরা বসলাম একটা দোকানে। সে বলল, চা খাবেন না কফি? আমি চা বলতে সে একটা চায়ের অর্ডার দিল। আর দুটো করে টোস্ট। বললাম, আপনি চা খাবেন না। সে বলল, আমি এই সময়টা নীচে কিছু খাই না। পরে বুঝেছিলাম, তখন সন্ধে নেমে গিয়েছিল। তখন তার মন অন্য নেশার জন্য ছটফট করছিল। সেই অন্য নেশাই হল ওপরের নেশা। চা কফি সেখানে অনেক নীচে। চা কফির নেশাকে ঠিক নেশার পর্যায়ে ফেলা যায় না। সিগারেট অবশ্য নেশা। এবং ক্ষতিকর বলেই পরিচিত। সে নেশাও আমার নেই। ফলে নেশা নিয়ে কিছু লেখা তো আমার অধিকারের মধ্যে পড়ে না।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক অফিসে কাজ করেছি এবং কবিতা লিখি, অথচ তাঁর সঙ্গে কখনও একপাত্র খাইনি—এ দিয়ে কেউ কি আমাকে ছ্যা ছ্যা করেনি? করেছে। তবে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সকলেরই এক আধটা গল্প আছে। আমারও কি নেই? একটা প্রায়-গল্প এই সূত্রে বলে নেওয়া যায়। দেশ পত্রিকার চাকরিতে তখন সদ্য ঢুকেছি। আমি বসতাম শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ঠিক পাশের চেয়ারে। একদিন সকাল এগারোটা নাগাদ শক্তিদা এলেন। তখনও শীর্ষেন্দুদা এসে পৌঁছোননি সেদিন। শক্তিদা সাধারণত সকালে ওই সময়টায় এসে সাগরদার ঘরে ঢুকে কথাবার্তা বলতেন, আর আমার টেবিলে এসে পৌঁছোত শক্তিদার নতুন একটা বা দুটো কবিতা। ঝকঝকে হস্তাক্ষরে লেখা। পাশে সাগরদার সই, S.G.। আমি গোগ্রাসে কবিতা দুটো পড়েই পাশে পয়েন্ট মার্কিং করতে শুরু করতাম প্রেসে পাঠানোর জন্য। সেদিন কিন্তু শক্তিদা সাগরদার ঘরে গেলেন না। বরং আমার পিছনে দাঁড়িয়ে বললেন, কী করছ? আমি তো উঠে দাঁড়িয়েছি। কিছু না, শক্তিদা। শক্তিদা বললেন, চলো, বেড়িয়ে আসি।

আক্ষরিক ভাবে এই বাক্যটিই বললেন, আমি একটুও বানিয়ে বলছি না। কারণ, পাঠকের

এ কথা হয়তো মনে পড়ে গেছে যে, 'চলো বেড়িয়ে আসি' নামে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটি ভ্রমণের বই আছে। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো আবার কিছুটা ভয়ে ভয়েও, পিছু পিছু চললাম। উনি আনন্দবাজার অফিস থেকে বেরিয়ে পাশের চাং-হোয়া রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসলেন। শশব্যস্ত ওয়েটার দৌড়ে আসতেই বললেন, দুটো। ব্যস, আর কিছু না।

আমি ঘামছি। দুটো? কার জন্য দুটো? শক্তিদা বললেন, জয়, একটু রাম খেয়ে দেখবে নাকি? করুণ স্বরে আমার উত্তর বেরোল : আমি কোনোদিন খাইনি শক্তিদা! আর কিছু বললেন না। ওয়েটার আসতেই বললেন, দাও, দুটোই এদিকে। কিছুক্ষণ পর যখন ফিরে এলাম অফিসে, তখন শীর্ষেন্দুদা এসে গিয়েছেন। কিছু একটা লিখছেন। ঘরে আগে শক্তিদা ঢুকলেন, পরে আমি। শীর্ষেন্দুদা মুখ তুলে বললেন, আয় শক্তি। তারপরেই আমাকে দেখে চমকে গিয়ে, আরে, জয় তোর সঙ্গে কোথায় গিয়েছিল? শক্তিদা বললেন, এই একটু বেড়িয়ে এলাম। শীর্ষেন্দু আমাকে আপদমস্তক পর্যবেক্ষণ করলেন। তারপর কিছুটা আশ্বস্ত ভঙ্গিতে পুনরায় খাতা কলমের দিকে মুখ ফেরাতে ফেরাতে বললেন, ও। তা তুই একাই বেড়ালি, না জয়ও বেড়াল? গল্পটি যদিও শক্তিদাকে নিয়ে, তবু, এ-খেলায় জয়সূচক রানটি শেষে নেমে শীর্ষেন্দুদাই নিয়েছিলেন।

আমার নেশার গল্প এইটুকুতেই শেষ। কিন্তু আমারও কি নেশা হয় না?

নাটকে নেশা হয়। নেশা হয় গানে। এক নাটক ঘুরে ঘুরে দেখি। সেও কি নেশা নয়? এক গান বারবার শুনি। সেও তো নেশা। সুমন, কবীর সুমন, প্রতি রবিবার বসেন ছোটো এক আড্ডায়। গান নিয়ে কথা বলেন, প্রয়োজনে গেয়ে শোনান, কয়েকজন তরুণ বন্ধুর সামনে। বাড়ি ফিরে আসার পর রাত্রে ঘোর লেগে যায়। পরদিন, সকালে, লিখতে বসে, স্পষ্ট হ্যাংওভার চলে। কোনো কাজে মন দিতে পারি না। গত সন্ধ্যার কথা আর গান ঘুরতে থাকে মনে।

আরেক আমার সুরের বন্ধু, তিনি যন্ত্রী, সরোদ বাদক তেজেন্দ্রনারায়ণ। এক সন্ধেয় বসে আছি তার কাছে, কথা বলতে বলতে টেনে নিলেন যন্ত্র। বেহাগ, নট-বেহাগ ছায়া নট, জয়জয়ন্তী, একটা পর একটায় চলে গেলেন যেন এমনই ভাবে চলে পথ।

এমন মাধুর্যময় আর অনায়াস সেই গমন রেখা—সারারাত আমার মধ্যে আবছা, অনতিস্পষ্ট এইসব সুরের চলাচল। লিখেছিলেন কবি বীতশোক ভট্টাচার্য একটি কবিতায়, "সঙ্গীত কেবল ছিল কল্পনায়, আমি শুধু চর্মচোখে প্রস্বর শুনেছি।" আমিও তাই, কোনো অন্ধ পুরুষ যেমন তার নারীকে শুধু স্পর্শে স্পর্শে, হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে আসলে দেখবারই চেষ্টা করে, আমিও তাই। চর্মচোখে প্রস্বর শোনার চেষ্টা করি। কী অপূর্ব এই লাইনটি, যেখানে চোখ আর কান-কে পালটাপালটি করে নেওয়া হল।

আমার এই দুই সুরের বন্ধুর মধ্যে কিন্তু আলাপ পরিচয় নেই। পরস্পরের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা নিয়ে তাঁরা মগ্ন আছেন যে যার নিজের কাজের মধ্যে। আমি শুধু ভাবি, এরা দুজন গান নিয়ে কথা বলছেন, আর আমি সেখানে বসে আছি। খুব মিলিয়ে দিতে ইচ্ছে করে

এঁদের। একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম। একটা রাস্তা দিয়ে ওঁরা দুজন চলেছেন। আধা গ্রাম্য রাস্তা। কালভার্টের নীচে জল। চারদিকে গাছ। গাছের পাতায় বৃষ্টিকণা। পিচ রাস্তার দু-ধারে খেতভরা জল কাঁপছে বাতাস লেগে। ওঁরা দুজন গল্প করতে করতে চলেছেন আগে আগে। পিছনে আমি আর আমার মেয়ে বুকুন; খানিকটা তফাতে। হঠাৎ ওঁরা দাঁড়ালেন, সুমন ফিরে বললেন, 'এই যে দেখুন, এই জায়গাটা হল গান্ধার।' আমি বললাম, 'তাই'? তেজেন্দ্র বললেন, 'এইমাত্র কোমল গান্ধার পার হয়ে এলাম আমরা।' আবার আমরা চলতে লাগলাম। একটু পরেই সুমন থামলেন। বললেন, 'বুকুন, এবার মধ্যম-এ এসেছি।' ঠিক আগে যেমন হয়েছিল। এবারও তাই হল। সমস্ত গাছের পাতার কাঁপন, জলভরা খেতের ওপর দিয়ে বাতাস বয়ে যাওয়া, সব কিছু থেকে মৃদু সুর উঠছিল, গা-আ-আ। এবার মধ্যম লেগে কাঁপছে সব। কিন্তু মৃদু সেই কাঁপন। আকাশে যে-রোদের আলো, সকালের রোদ, সেও সুরে বলছে, মা-আ-আ। আবছা, অনতিস্পষ্ট সুর। আমি আর বুকুন, ওঁদের সঙ্গে চলেছি। ওঁরা একমনে গল্প করতে করতে আগে হাঁটছেন। আসলে আমরা চলেছি যে-রাস্তায় সেটি সপ্তকের পথ। সুমন বললেন, 'পঞ্চম আসতে আর দেরি নেই। পঞ্চমে পৌঁছে আমরা একটু দাঁড়াব। একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার চলব। ওই যে দূরের গাছগুলো, ওইখানে ধৈবত, নিষাদ।'

'ওই, ওই যে।' এখান থেকে তাদের ঝাপসা দেখায়। আবার রোদ ঝিকমিক করে। তেজেন্দ্র বললেন, 'দূরে দূরে ওই যেসব কুঁড়েঘর দেখা যাচ্ছে, ওইখানে রাগরাগিণীরা থাকেন। আমার খাঁ সাহেবের সঙ্গে আগেও এসেছি এখানে।' আমি বললাম, এখানে রাগরাগিণীরা থাকেন বুঝি? মারোয়া-র সঙ্গে দেখা হয় না একবার? সুমন হাসলেন। আমরা অতক্ষণ থাকব না। ওই ওই দিগন্তের ধারে যে আকাশ ঢালু হয়ে গিয়েছে, ওইখানে শেষ বিকেলে মারোয়া-র আসার কথা। তার আগেই আমরা ফিরে যাব। তা ছাড়া, মারোয়া তো আসবেন উস্তাদ আমীর খাঁ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে, সেসময় ওঁদের বিরক্ত করার দরকার নেই। চলুন আমরা এগোই। পঞ্চম-এ আমরা পৌঁছে যাব এবার।

কিন্তু পঞ্চমে আসা পর্যন্ত আর দেখতে পাইনি এই স্বপ্ন। তার আগেই ঘোর ভেঙে গিয়েছিল। মনে রয়ে গেল সেই সপ্তকের পথ, যেখানে কোনো জায়গায় গান্ধার বেজে উঠছে অস্ফুটে কোথাও মধ্যম বেজে উঠছে। তারপরের সারাটা দিন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওই দৃশ্য আর পরিবেশ। সারাক্ষণ যেন সেই গান্ধার আর মধ্যম পার হয়ে পঞ্চমের দিকে যাচ্ছি। চারপাশের আলো আর জল সুরে কাঁপছে, জ্বলজ্বল করছে। ঘোর কাটছে না।

নেশার ঘোর কি একইরকম হয়? মনে হচ্ছে, আবার যদি এই স্বপ্নের ভেতরে ঢুকে পড়তে পারতাম। নেশা করলে কি এক স্বপ্ন দু-বার দেখা যায়? কী জানি! কিন্তু নেশার আমার দরকার কী? সুর দিয়েই তো আমি নেশার জগতে চলে যেতে পারি!
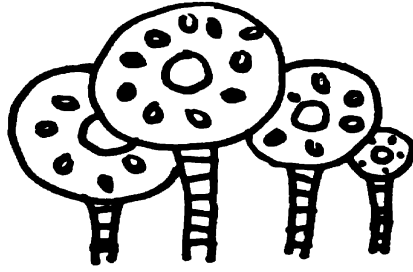
১৩

নালিশ

তখনও ট্রেনের কিছু দেরি আছে দেখে আমি বিরক্ত হয়েছি
মিথ্যে এত ছুটোছুটি
রিকশাওয়ালাটার কাছে খুচরো পয়সা নেওয়াই হল না।
তখনও ট্রেনের কিছু দেরি ছিল তাই আমি
"মাস্টার মাস্টার,
নালিশ লেখার খাতা দাও"—
ব'লে তার আপিসে ঢুকেছি।

বিশাল খাতার মধ্যে দ্রুত লিখে ফেলি :
কেন যে ট্রেনেরা রোজ দেরি ক'রে আসে,—ক্ষতি হয়।

শুধু ওই?
শূন্য গ্যালারির মতো রুলটানা প্রকাণ্ড কাগজ
অথচ এসেছে মাত্র ক'টি মৃদু কথা এক কোণে;
'ক্ষতি হয়!'
ভেবে একটু লজ্জিত হলাম।
আসলে, নালিশ ছিল যথেষ্ট জোরালো
রেলকর্তৃপক্ষ কিংবা বিধাতা, সমাজ, রাজনীতি
জীবিকা বন্ধুত্ব—সব কিছুর বিরুদ্ধে ছিল বিষম বিক্ষোভ।

অথচ কলম খুললে হিংসা চলে যায়। মনে হয়
ক্ষতি যা হবার তা-তো হয়ে গেছে
ক্ষতি হল খুব,
নষ্ট সময়ের স্তূপ ভেঙে তবু শব্দ আসে তার,
একেবারে না-আসার চেয়ে সে কি ভালো নয়!

বিশাল খাতাটা পড়ে থাকে—
দেরি করে যে এসেছে, ইচ্ছে করে, ভালোবাসি তাকে।।

কবিতা বার্তা দেয়। কিছু একটা জানায় সে আমাকে। এখুনি যে কবিতাটি বললাম সে কবিতাটিও জানায়। শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা এই কবিতা তাঁর অন্য অনেক খ্যাত-পরিচিত লেখার মধ্যে পড়ে না। এটি পাঠকের চোখ এড়িয়ে যাওয়া একটি লেখা। কিন্তু এই কবিতার মধ্যে আছে একটি দরকারি কথা। ট্রেনের জন্য অপেক্ষারত এক মানুষ তিক্ত-বিরক্ত হয়ে অভিযোগ করতে এসেছে স্টেশন মাস্টারের অফিসে। কমপ্লেন বুক চেয়ে নিয়েছে সে। তীব্র ক্ষোভের প্রকাশ এখানে রেখে যাবে বলে। আসলে তার নালিশ ট্রেন লেটকে উপলক্ষ্য করে হলেও, অনেক কিছুর জন্য জমে থাকা ক্ষোভ একসঙ্গে তার ভিতরে কাজ করে তাকে নালিশ লেখার খাতার কাছে টেনে আনল। ব্যক্তিগত জীবনে বন্ধুর সঙ্গে মনোমালিন্য, জীবিকা বিষয়ক খুঁটিনাটি অসন্তোষ, সামাজিক নানা ঘটনাকে মেনে নিতে না পারা, অন্যায়ের প্রতিবাদ করার সুযোগ বা সাহস না থাকা, সমস্তটা ভিতরে সঞ্চিত হয়ে ছিল দিনে দিনে। যেমন আমাদের সকলেরই হয়। কত খারাপ লাগার কথা মুখ ফুটে বলতে পারি না আমরা। কিন্তু ভেতরে সমস্তটা জমে থাকে। ঘূর্ণি তৈরি করে। তারপর হঠাৎ ট্রেন লেট বা এই ধরনের কোনো ব্যাপার ঘটলে, সেই কারণটাকে সম্বল করে সমস্ত ক্ষোভটা বেরিয়ে আসতে চায়।

এখানেও তাই হল। প্রবল হাঁকডাক করে তো আনানো হল কমপ্লেন বুক। কিন্তু কী লেখা হল তাতে?

লেখা হল, কেন যে ট্রেনেরা রোজ দেরি করে আসে—ক্ষতি হয়। সাধারণ একটি কথা, অত্যন্ত নম্রভাবে বলা। অত যে মনের মধ্যে ঘুরপাক খাওয়া অভিযোগ, সব কোথায় যেন হারিয়ে গেল। এর উত্তরই আছে তৃতীয় স্তবকের প্রথম লাইনে। কী বলছে সেই লাইন।

অথচ কলম খুললে হিংসা চলে যায়।

এইটিই হল, সেই বার্তা! মনে রাখতে হবে, নালিশ লেখার খাতা যিনি আনিয়েছিলেন তিনি একজন কবি। কবির কাছে কলম খোলার অর্থ আলাদা। কলম যখনই সে স্পর্শ করছে, ভিতরকার লেখকধর্ম জেগে উঠছে তার অজান্তেই। একজন কবি যখন লেখেন, তখন বিদ্বেষ প্রকাশ করার জন্য হিংসা প্রকাশ করার জন্য লেখেন না। তাই কলম খুলে লিখতে গেলেন ক্ষোভ, ক্রোধ—কিন্তু মুহূর্তে তা দূর হয়ে গেল।

বিদ্বেষ প্রকাশ করার জন্য লেখা নয়—এই বার্তা কবিতাটি আমাদের জানায়। আজকের দিনে খুবই জরুরি এই বার্তা। যদিও, এ কথা কারও মনে হতে পারে, আমি আমার চারপাশে তাকালে কি হিংসা দেখি না? সৃষ্টির মনের কথা মনে হয় দ্বেষ, এ কথা সেই কবেই কি লিখে রেখে যাননি জীবনানন্দ? তা ছাড়া আজকের দিনে চারিদিকে তাকালেই কোনো সহপাঠী, সহকর্মী, সহযাত্রী, সতীর্থের বদলে কেবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখা যায়। এই যখন সমাজের অবস্থা, তখন কবিতাকেই শুধু বিদ্বেষের বাইরে রাখা তো অনুচিত। সে তো জীবনের বাইরে চলে যাওয়া, সে তো একপ্রকার অসত্যকে প্রশ্রয় দেওয়া। তাহলে তো এক ধরনের বানিয়ে তোলা লেখা হয়ে দাঁড়াবে বিদ্বেষের স্পর্শবর্জিত কবিতা! জীবনে বিদ্বেষ, জীবিকায় বিদ্বেষ, বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রেও বিদ্বেষ। শুধু কবিতাকে বিদ্বেষমুক্ত রাখতে হবে, এ কেমন কথা?

নতমস্তকে স্বীকার করি, ঠিক এই যুক্তি। নিশ্চয়ই বিদ্বেষের চর্চাও আসছে কবিতায় জীবন থেকেই তো কবিতা আসে, জীবনে যে বিদ্বেষ পোষণ করে বা বিদ্বেষের মুখোমুখি হয়, কবিতাতেও সে প্রতি-বিদ্বেষ আনুক।

ধরা যাক দু-জন বিজ্ঞানীর কথা। একজন হয়তো দিন-রাতের পরিশ্রমে একটি ওষুধ তৈরি করলেন যা কোনো কালান্তক ব্যাধির নিরাময় করে। আবার অন্য একজন তেমনই পরিশ্রম করে বানালেন এমন একটি তেজষ্ক্রিয় বিষ, যা হয়তো বিমান থেকে প্রতিপক্ষ দেশের মাটিতে ছড়িয়ে দিলে সব শস্য মরে যায়, গাছ অফলা হয়, মাছ মরে ভেসে ওঠে, বন্ধ্যা হয় নারী-পুরুষ। দুজনেই শক্তিশালী বিজ্ঞানী। দুজনেরই উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রশ্নাতীত। দুজনেই প্রতিভাবান। প্রশ্ন হল আপন রুচি অনুযায়ী কে কোন দিকটা বেছে নেবেন। জানা যায়, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির মতো শিল্পী, যিনি একজন ইঞ্জিনিয়ারও ছিলেন, নতুন যুদ্ধাস্ত্রের নকশা করতেন, তার বিনিময়ে উপযুক্ত অর্থও নিতেন। বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসও সে যুগের পক্ষে নতুন একাধিক অস্ত্র বানিয়ে ছিলেন। সুতরাং মারণাস্ত্র বানাতেও প্রতিভার প্রয়োজন। কবিতা দরকার ভালোবাসার কারণে। মারণাস্ত্র দরকার হিংসার কারণে।

এখানে আমি বলছি কলম খুললেই যার হিংসা চলে যায়, তার কথা। এমন লোক নেই তা নয়। হিংসা চলে গিয়ে কী আসে।

বলছি কী আসে। কমপ্লেন বুক, তার এক কোণে একটুখানি অসুবিধার কথা নিয়ে চুপ করে রয়েছে সে ছবিটা দেখি। তারপর?

বিশাল খাতাটা পড়ে থাকে—

দেরি করে যে এসেছে, ইচ্ছে করে, ভালোবাসি তাকে।

হিংসা চলে গিয়ে কী এল? ভালোবাসা এসে পড়ল। যদিও শেষ লাইনটা পড়ে বোঝা যায় এটা আর ট্রেন নিয়ে লেখা নয়। সম্পূর্ণ অন্য কারণে, নিশ্চিতই কোনো এক নারীকে মনের মধ্যে নিয়ে লেখা। কবিতার কোন লাইন যে কখন কার প্রতি যায়, সে কি কবি

নিজেও আগে থেকে জানেন? অথবা হয়তো আমারই ভুল। হয়তো বিশেষ কাউকে মনে রেখে লেখা নয়। সেই ভালোবাসাকেই ভালোবাসা।

কিন্তু কবি তো প্রথমে মানুষ! মানুষেরই তো ধৈর্য টলে যায়। সব জানা, সব আত্মশিক্ষা সত্ত্বেও কি সে কখনও বেসামাল হয়ে পড়ে না? আর তখন জন্মায় অনুশোচনা। আত্মধিক্কার।

কেন তুমি

কেন তুমি হঠাৎ ক্ষমার শিক্ষা ভুলে গেলে?
এত ক্রোধ
ভাল নয়, নেহাত নির্বোধ, সে-ও জানে।
কেন তুমি কণ্ঠ থেকে যজ্ঞ-উপবীত ছিঁড়ে ফেলে
ভাসালে গঙ্গায়?

যা কিছু তোমার পাশে যায় আসে
সবই তার তোমার রচনা, ইচ্ছাধীন?
তা তো নয়
একা তুমি কতটুকু পারো?
আছে ধারে-কাছে ঢের অপ্রিয় আত্মীয় প্রতিবেশী
সম্ভবত পরার্থবিদ্বেষী, হীনমন্য, কিন্তু তুমি তাই বলে
ক্রোধী হবে, আরও ক্রোধী হবে?
মানুষ কী অনন্য বিষণ্ণ জীব
কী পরনির্ভর
তুমি পূর্বেও দেখেছ, দেখ নাই?

তবে কেন হঠাৎ ক্ষমার শিক্ষা ভুলে গেলে?
কেন তুমি কণ্ঠ থেকে যজ্ঞ-উপবীত ছিঁড়ে ফেলে
ভাসালে গঙ্গায়?

এইসব কবিতা আমার কাছে ডায়েরির মতো। এক্ষেত্রে, আমার এই ডায়েরি লিখেছেন শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়। চারপাশের পৃথিবীর কথা না হয় দূরে থাক, নিজের একান্তজন যারা, তারও কি আমার মত অনুযায়ী চলে? কেনই বা চলবে? সকলেই নিজের নিজের মতো হবে। কিন্তু এই নিজের মতো হতে হতে কখনও কোনো সীমা ছাড়ানো নিষ্ঠুরতা ক্ষত করে দেয় মনে। পুরোনো ক্ষত বহন করা এক কথা। আর আচমকা আঘাতের সামনে দাঁড়ানো অন্য জিনিস। এইসময় ধৈর্য হারিয়ে যায়। নিমেষে ক্রোধ জাগে। আর ক্রোধ

প্রকাশের পর যখন শূন্য হয়ে যায় মাথা, অনুতাপ এসে ঘিরে ধরে, তখন এসে দাঁড়ায় এই কবিতা। এইরকম মুহূর্ত কি আমাদের সকলের জীবনেই কখনও-না-কখনও আসেনি?

আগের কবিতাটিতে রয়েছে অথচ কলম খুললে হিংসা চলে যায়। আর পরের লেখাটিতে আছে, কেন তুমি যজ্ঞ-উপবীত ছিঁড়ে ফেলে ভাসালে গঙ্গায়। যখন মনের মধ্যে নালিশ জমে থাকে, নানা ক্ষোভ এসে কবির দৃষ্টির স্বচ্ছতাকে ঢেকে দেয় শুকনো মরা পাতা পড়ে ঢেকে যাওয়া দিঘির মতো। ব্যক্তিগত আপত্তি ও অপছন্দগুলোতে আটকে থাকে চোখ, মনে চাপা অশান্তির স্রোত চলতে থাকলে লেখায় তা মিশতে চায়—অন্যদিকে লেখা যে একটা মুক্তি। সেই মুক্তিটা হারিয়ে যায় তখন।

মুক্তি বলতে নির্গমনও বলতে পারে কেউ। যা ক্ষোভ তা উগরে দিলাম লেখাতেই। কেন-না লেখাই আমার রাস্তা। এ কথাও বলা যায়। যদিও নির্গমন আর মুক্তি ঠিক এক জিনিস নয়। মুক্তির মধ্যে একটি উচ্চতা আছে। একটা আকাশ আছে। নির্গমন বলতে মনে আসে নালা বা নর্দমা।

সেখানেই আসে দ্বিতীয় কবিতার লাইনটি। যজ্ঞ-উপবীত এসে পড়ে।

প্রাচীন ঋষিরা যখন অভিশাপ দিতেন, উপবীত ছিন্ন করে অভিশাপ দিতেন, এ কথা আমাদের মনে আছে। যখন শান্ত ঋষি ক্রোধী হতেন তখনই উপবীত ছিন্ন করার মতো ঘটনা ঘটত।

যজ্ঞ ও উপবীত-এর সঙ্গে ধ্যান কথাটির পূজা কথাটির সম্পর্ক আছে। এখানে আমি, কে ঈশ্বরবিশ্বাসী আর কে বিশ্বাসী নয়, সে কথা বলছি না। পূজা বা ধ্যান-এর সঙ্গে মনঃসংযোগ এবং গভীরভাবে নিবিষ্ট হওয়ার একটা অনুষঙ্গ চলে আসে। কবি যখন কবিতা লিখছেন, তখন, নিজের অজান্তেই তিনি, নিজের মনের এক ধরনের গভীর নিবিষ্ট অবস্থায় প্রবেশ করছেন। অন্তত রচনার সময়টুকুতে বিশেষ একটি মনোনিবেশের ঘোরের মধ্যে চলে যাচ্ছেন। যাঁরা প্রেরণা নির্ভর রচনার বিরুদ্ধতা করেন, বলেন, প্রেরণা কেবল স্বভাবকবিদের এলাকা, তাঁদের সঙ্গেও আমাব কোনো তর্ক নেই। আমি কেবল তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে, হাঁটতে হাঁটতে একটা কথা বলতে চাই। কথিত আছে, কোলরিজের প্রেরণানির্ভর কবিতা কুবলা খানের রচনা-বৃত্তান্ত শুনে পল ভালেরি নাকি বলেছিলেন, আমি সচেতন অবস্থায় গৌণ কবিতা লিখতে চাই বরং, কিন্তু অমন ভর-হওয়া প্রেরণাস্রোতে ভাসমান অবস্থায় মহা কবিতাও লিখতে চাই না।

. ঠিক, ভালেরি সম্পর্কে সকলেরই জানা যে, তিনি কবিতা লেখা বন্ধ করে দিয়ে কুড়ি বছর একাধিক্রমে গণিতচর্চা করেছিলেন। কুড়ি বছরের জন্য কবিতা ছেড়ে গণিতের কাছে চলে যাওয়া এ বড়ো সাধারণ কথা নয়। আমাদের মনে পড়বে গণিতে কবিতায় যাঁর সমান যাতায়াত ছিল সেই বিনয় মজুমদারের কথা।

কিন্তু ভালেরি, সচেতন অবস্থায় যিনি গৌণ কবিতাই লিখতে চান, তিনি অন্য এক জায়গায় কবিতা রচনা সম্পর্কে কী বলেছেন?

বলেছেন, প্রথম লাইনটা আসে স্বর্গ থেকে, বাকিটা তুমি তৈরি করে নাও। তাহলে? এটা কোথাও স্বীকার করছেন যে প্রথম লাইনটা স্বর্গ থেকে আসছে! অর্থাৎ কোনো অজানা থেকে আসছে। নিশ্চয়ই আমার নিজের ভিতরকারই কোনো অজানা? একেই প্রেরণা থেকে আসা বলতে দোষ নেই।

সেই অজানার, সেই স্বর্গের, সেই প্রেরণার সামান্য স্পর্শ ছাড়া হয়তো কোনো সত্যিকারের কবিতাই সম্ভব নয়। তবু, প্রথম লাইনটা তো স্বর্গ থেকে এল, তারপর বাকিটা যখন তুমি তৈরি করে নাও, তখন? তৈরি করে নেওয়ার সময়টা তুমি কী অবস্থায় থাকো? গভীর একটা মনোনিবেশের মধ্যে থাকো না? সারাদিন সামাজিক স্বাভাবিকতার যে অবস্থাটা তুমি বজায় রেখে চলেছ এতক্ষণ, লেখার সময়টা, সেই অন্যরকম মনোনিবেশের মধ্যে চলে গিয়ে তুমি একটু বেশি পরিমাণে একাকিত্বের উপর বসে থাকো না! সেই একাকিত্ব তখন যেন এক পদ্ম যার উপর তুমি উপবেশন করেছ। সেই এক পদ্মাসন।

যদি ওই উপমা না-ও মেনে নাও, এটুকুই শুধু আমার বলার, যে, ওই মনোনিবেশের সময়টুকুই হল কবির পক্ষে ধ্যানের সময়। সেই তার পূজা। যখন বাকিটা তুমি তৈরি করে নাও, প্রেরণার বিরুদ্ধতা করেই হয়তো তৈরি করো, কিন্তু ওই পুরো সময়টা, এক মনে ওই পরিশ্রম, তোমার পক্ষে পূজানিবিষ্টতা। সেইজন্যই, যজ্ঞ-উপবীত এত প্রাসঙ্গিক এই লেখায়। কারণ এই কবিতার লেখক, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, সারাজীবন ব্যয় করেছেন কবিতার সঙ্গে সঙ্গে থেকে। বাংলা ভাষার একজন প্রধান কবি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন চার দশকের বেশি। এখনও তাঁর কবিতা নতুনভাবে জীবিত হয়ে ওঠে, যেমন কয়েকদিন আগে পড়া 'তুমিই একা' লেখাটি।

মনের মধ্যে যদি প্রতিহিংসার বিষ থাকে, কলম খুললেই তা চলে যায়। এ কথা ইনি বলতে পারেন। অনুতাপ করতে পারেন, উপবীত ছিঁড়ে কেন তুমি ভাসালে গঙ্গায়। ক্ষমা করতে পারলে মন শান্ত হয়। বিদ্বেষের বিষ চলে যায় মন থেকে। আর ক্রোধী হলে মানুষ নিজেই তার উপবীত ছিঁড়ে ফেলে।

উপবীত স্পর্শ করে মন্ত্র জপেন, ধ্যান করেন পুরোহিত। আবারও বলি, পূজা, যজ্ঞ, ধ্যান এগুলোকে আক্ষরিকভাবে চিহ্নিত করতে চাইছেন না আমাদের এই কবি। বলছেন কলম খুললে হিংসা চলে যায়। কবিতা যখন লিখছেন, কলম খুলছেন, মন একাগ্র হয়ে উঠছে। যেন যজ্ঞের সামনে পূজারি। উপবীত স্পর্শ করে মন্ত্রোচ্চারণের সময় মন একাগ্র হয়, ওই যজ্ঞাগ্নির সামনে। কবিতাও যখন তাঁর খাতায় জ্বলছে, কবির মনও একাগ্র, নিবিষ্ট, তাঁর হাত কলম স্পর্শ করে রয়েছে। কবিতা রচনাই তখন এক যজ্ঞ। কলম আর যজ্ঞ-উপবীত আসলে একই কথা তাহলে। যা স্পর্শ করলে আত্মবিস্মরণকে অতিক্রম করতে পারা যায়। মনকে উদার ও বিস্তৃত করা যায়।

মানুষের মধ্যে যেমন ভালোবাসার চেয়ে প্রতিহিংসার শক্তি বেশিদিন ধরে কাজ করে, নখের বদলে নখ, চোখের বদলে চোখ উপড়ে নেওয়ার জন্য পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ যেমন হন্যে হয়ে আছে, কবিরও মধ্যে তো কাজ করে এই মানবস্বভাব। তাঁরা তো

মানবজাতির বাইরে নন। তাই প্রতিহিংসার কবিতা যেমন লেখা হয়, তেমনই—অথচ কলম খুললে হিংসা চলে যায়, এই অমোঘ সত্য, অত্যন্ত বিনীতভাবে উচ্চারিত হয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে, অবিচলভাবে। রাগ বা ক্ষোভের কবিতাকে তখনই পাঠক বক্ষে ধারণ করে, যখন তা সময়ের কোনো আলোড়ন স্পর্শ করে। কোনো গণহত্যা, কোনো নিপীড়ন, শাসক বা রাষ্ট্রের অন্যায়ের বিরুদ্ধতা করে যে কবিতা, তা কখনও প্রতিহিংসার কবিতা নয়। তা আসলে আহত ভালোবাসার কবিতা। যেমন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা। কিংবা নেরুদা যখন লেখেন পরপর তিনবার একই লাইন :

কাম অ্যান্ড সি দি ব্লাড ইন দি স্ট্রিটস
কাম অ্যান্ড সি
দি ব্লাড ইন দি স্ট্রিটস
কাম অ্যান্ড সি দি ব্লাড
ইন দি স্ট্রিটস

তখন তা এক মন্ত্রোচ্চারণই হয়ে যায়। ক্রোধী মন্ত্রোচারণ, ফৌজি অন্যায়ের বিরুদ্ধে।

আসলে, দুঃখ আরও বড়ো হলে তাকে নিয়ে ঘর করা যায়—লিখেছিলেন প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত। লিখেছিলেন, এইসব ছোটো ছোটো যন্ত্রণার ছুঁচ, কেবলই বিরক্ত করে...'

এইসব বিরক্তি থেকে, তিক্ততা ও বিদ্বেষ জন্মায়। মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। কবিতা লেখার সময়ও কেবলই ঢুকে পড়তে চায় এইসব বিদ্বেষ বিষ। সংক্রমণের মতো শব্দে মিশে যায়। ভাষাকে ব্যক্তিগত ক্রোধ মেটানোর উপায় হিসেবে ব্যবহার করার কাজে নামিয়ে আনতে চায়।

তার বিরোধিতাও কবিকেই করতে হয়। নিজেকে কেবলই প্রশ্ন করে! আমি এমন হয়ে যাচ্ছি কি? আমার ভেতরে কি দেরি করে যে এসেছে ইচ্ছে করে ভালোবাসি তাকে, এই লাইনটি বসতে জায়গা পায়! যজ্ঞের আগুনকে আমি কি সম্মান করতে পারি? উপবীত ছিঁড়ে ফেলি না তো? কবিতা আর গান ছাড়া তো নিজের মনকে বাঁচানোর কোনো উপায় আমার নেই! ঠিক সময়ে ঠিক কবিতা কি আমি মনে করতে পারি, যে কবিতা আমাকে আগলাবে? যেমন রৌদ্রে ভরা গাছপালার দিকে তাকিয়ে আমি কি এমন কবিতার কথা মনে আনি যাতে আমার মনে প্রসন্নতার আলো এসে পড়ে, কোনো প্রতিহিংসা জাগে না?

পারি তো, শরৎকুমারের লেখা একটি কবিতাই তবে বলি?

নিম বা সজিনা

দরজার দু'পাশে দু'টি ফক্‌কড় ছাতিম
বাবরি নেড়ে শিস দিচ্ছে, উদ্দেশ—কী জানি
বেরিয়ে বুঝলাম—ওই রাস্তার ওপারে একটা নিম
(নিম না, সজিনা)

পঙ্‌ক্তি মেলাবার জন্য নাম বদলে দিচ্ছ, তা বুঝি না!
আপনার বৌমাকে বলি, একই কথা, আসল ব্যাপার
উভয়ে সেবক, কিন্তু ছাতিমরা একদম বেকার)

ঠাট্টা করে শোনাচ্ছিল, শোভাঞ্জনবাবু
এমন হাড়-সাব দশা, রং-খেলার দিনে দেখছি কাবু।
সজিনা বা নিম
চূড়ায় একমুঠো রাঙা পাতা নেড়ে বলল, হে ছাতিম
তোমরা রং খেলো, শান্তিনিকেতনে গিয়ে ডিগ্রি নাও,
আমি গৃহস্থের কাজে লাগি
পাতায় বল্কলে।

দু'টি ডাল পেড়ে আনবে? আপনার বউমাটি শুনে বলে।

সারাজীবন নানারঙের ভালোবাসার কবিতা লিখেছেন শরৎকুমার।

যাকে প্রেমের কবিতা বলে, তা তো তিনি অজস্র লিখেছেন। কিন্তু ভালোবাসার কবিতা আলাদা। তেমন একটি কবিতা দিয়েই, আজকের গোঁসাইবাগান শেষ করি।

পাখি ও ছাতিম গাছ

একটি পাখি
সারা সকাল উড়ে বেড়িয়েছে
কাড়াকাড়ি, মারামারি, চুরি, ছিনতাই
ছোটোখাটো লুঠতরাজ সেরে, দেখো
নির্জন দুপুরে ছাতিমডালে ঠোঁট ঘষছে,
আপন মনে গুমরোচ্ছে অনুশোচনায়
আর ছাতিম গাছ
তার সহজবাহু তুলে, দুলে দুলে, দেখো
ফিশফিশ করে বলছে
ক্ষমা, ক্ষমা। ক্ষমা।
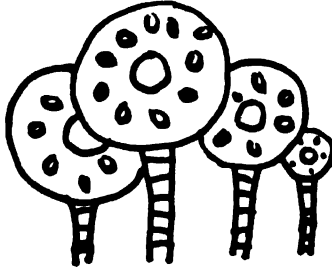
১৪

শেখার যে কোনো বয়স নেই, এ কথাটা নতুন করে শিখলাম সম্প্রতি। আমার একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল, 'স্বপন' শব্দটি দিয়ে এখনকার কবিতায় আর কোনো কাজ আদায় করা যাবে না। গত তিরিশ বছরে যেসব কবিতা আমার ভালো লেগেছে, তার কোথাও 'স্বপন' শব্দটি নেই। রবীন্দ্রনাথের গানে থাকলে আলাদা কথা। 'স্বপন যদি ভাঙিলে রজনী প্রভাতে', বা 'স্বপনে দোঁহে ছিনু কি মোহে' এসব গানে 'স্বপন' কথাটি যথার্থ। এমনকি, রবীন্দ্রনাথের পরেও, 'স্বপন যদি মধুর এমন হোক সে মিছে কল্পনা', সেও তো আমার প্রিয় গান। কৃষ্ণচন্দ্র দে-র গলায় কথাটি যখন সুরে পড়ে তখন 'স্বপন'-এর কোনো দুর্বলতা আছে বলে মনেই হয় না।

কিন্তু কবিতায় 'স্বপন' কথাটি মেনে নিতে পারি না। আর এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েই গিয়েছিল। যদিও নীতি হিসেবে একথা কিন্তু জানি যে, কবিতায় কোনো শব্দই অচ্ছুৎ নয়। সব শব্দেরই সমান সম্ভাবনা ও অধিকার, যদি ঠিক লক্ষ্যে লাগানো যায়। একথা জানি ঠিকই। তবু, 'স্বপন' কথাটিকে তা থেকে সরিয়ে রেখেছিলাম। সেদিন একটি কবিতা পড়লাম, যাতে 'স্বপন' কথাটা আছে :

গোপনে স্বপন আঁকি
স্বপনের মুখ
আমারে গিলিয়া খায়
বেটা সর্বভূক
কে জানে সুখের ছবি
আদি অন্ত বাঘ
বোঝে না মানবতত্ত্ব

নিত্য তার রাগ
আমারে গিলিয়া খায়
আহা সে কী মজা
জানে না উদরে তার
রেখেছি দরজা।

(সুখ)

এ কবিতা পড়ে আমি স্তম্ভিত। লিখেছেন মুজিবর আনসারী। আমার অচেনা এক তরুণ কবি। 'স্বপন' শব্দটিতে স্তরে স্তরে অর্থ যোগ করতে করতে চলেছেন উনি। অথচ 'গোপনে স্বপন আঁকি', এই লাইন দিয়ে কবিতা শুরু। মনে হবে কী দুর্বল লাইন! কিন্তু পরবর্তী ধাপ থেকে কবিতাটি অপ্রত্যাশিতকে ডাক দিতে শুরু করেছে। কবিতাটি শেষ পর্যন্ত পড়ে বোঝা যায়, শুরুতে ওই ধরনের লাইন কোনো দুর্বলতা নয়, বরং কবির এক সচেতন ছদ্মবেশ। যেই বললেন 'বেটা সর্বভূক', তখনই আশ্চর্যের আগমন হল। স্বপ্ন তো সত্যিই আমাদের বাধ্য নয়। অন্যদিকে স্বপ্নই তো মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। আবার তাকে গ্রাস করেও বাঁচায়। 'আমারে গিলিয়া খায়' লাইনটি দু-বার এসেছে, দ্বিতীয়বার, দ্বিতীয়রকম অর্থ যোগ করেছে। বলেছে, আহা সে কী মজা! এ আমরা ভাবতে পারিনি। কারণ এতক্ষণ কবিতাটিতে স্বপ্ন যে আমাকে ভক্ষণ করে এ নিয়ে অভিযোগ করা চলছিল। মুহূর্তে বাঁক নিয়ে এসে পড়ল 'আহা সে কী মজা' শব্দবন্ধ। এবং তারপরই অমোঘ শেষাংশ, 'জানে না উদরে তার রেখেছি দরজা'। স্বপ্নের ভিতর দিয়ে যেন আরও গভীরতর চেতনার দিকে চলে যাওয়ার সংকেত। বাস্তবের যে-ঘেরাটোপে আমরা সবসময়ে বসবাস করি সেটাই যদি সব হত, তবে তো মানুষ শুকিয়ে মরে যেত। কোনো সৃষ্টিধর্মিতাকেই সে বাঁচাতে পারত না। স্বপ্ন দেখতে পারে বলেই তো সে সৃষ্টি করে। আবার ঘুমের মধ্যেও তো স্বপ্ন আসে : ঘুমের ঘন গহন হতে যেমন আসে স্বপ্ন / তেমনি উঠে এসো এসো...। ঘুমের মধ্যে যে-স্বপ্ন আমরা দেখি প্রত্যেকদিন, সেই স্বপ্ন আনবার ক্ষেত্রে মানুষের অবচেতনার ভূমিকা থাকে। অবচেতনা-ই আমাদের ঘুমের মধ্যে স্বপ্নকে জাগায়। আবার, কিছু কিছু কবিতার মধ্যেও, ছবির মধ্যেও অবচেতনার ভূমিকা প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন চিত্রকর ও কবিদের দেখা মিলবে, যাঁদের সৃষ্টিতে অবচেতনার বড়ো ভূমিকা রয়েছে। তবে সব ধরনের কবিতায় বা ছবিতে যে তার ছাপ খুব স্পষ্ট দেখা যাবে, তা নয়। কবিতা রচনাকালে অবচেতনার যে ক্রিয়াশীলতা সেই বিষয়ে এসে পৌঁছেছে এ লেখাটি। স্বপ্ন, যে আমাদের বাঁচায়, অন্যপক্ষে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়—সেই বিন্দু থেকে শুরু হয়ে, কবির সৃষ্টিকালীন চেতনারহস্যের কথায় এনে এ-কবিতা পাঠককে দাঁড় করায়। সে এক রহস্যদরজা। মনে রাখতে হবে, এ কবিতার প্রথম শব্দটি ছিল 'গোপনে'। স্বপ্নের সমস্ত ক্রিয়া এবং কবিতার উদ্ভবও মানুষের মনের গোপনেই ঘটে। প্রেম বা শরীরে স্বপ্নও মানুষের মনের গোপনেই আসে প্রথমে।

এ কবিতাটি কোথায় পেলাম? 'জাগো জন্ম জাগো ভিটা' নামে একটি ছোট্ট বইতে পেয়েছি। বইটি পড়তে পড়তে পাতায় পাতায় চমকে উঠেছি। কথায় আছে না, আট ছয় আট ছয় পয়ারের ছাঁদ কয়? সেই আট ছয় পয়ারকেই মুজিবর আনসারী বেছে নিয়েছেন— কিন্তু চোদ্দো মাত্রাকে এক লাইনে ফেলছেন না। প্রথম আটমাত্রা এক লাইন, দ্বিতীয় লাইনটি তৈরি করছেন পরবর্তী ছ-মাত্রাটি দিয়ে। বইয়ের প্রতিটি কবিতা এই নিয়ম অনুসারে চলেছে। অথচ, কী আশ্চর্য, নিয়ম বলতে যে একটি যান্ত্রিকতার আশঙ্কা হয়, তা কোথাও নেই। প্রতিটি আটমাত্রার পর, একটি অর্থযতি আপনা থেকেই যুক্ত হয়েছে। ফলে দ্বিতীয় লাইনটির জন্য একটি সাসপেন্স একটি আকুলতা তৈরি হচ্ছে পাঠকের মনে। আবার, অপূর্ণ-থাকা ছ-মাত্রার টানও ওই আকুলতার সঙ্গে যোগ হচ্ছে। প্রায় সবকটি কবিতায় সেই গোপন টানটি নতুন এই কবি কী অনায়াসে বজায় রেখেছেন দেখে অবাক হয়ে গিয়েছি। পুরোনো পয়ারের ছাঁদ যেমন নিয়েছেন তেমনই অনেক জায়গায় নিয়েছেন সাধু ক্রিয়াপদ। নিয়েছেন প্রাচীন শব্দ। যেমন : 'সজিনা গাছের আঠা / সমুদয় কাণ্ডে / হায় কে করিল বাহ্যে / অমৃতের ভাণ্ডে।' অমৃতের ভাণ্ড একটি প্রাচীন কথা। কিন্তু কী অভাবনীয় তার প্রয়োগ! 'হায় কে করিল বাহ্যে'-র জন্যই 'অমৃতের ভান্ড' নতুন হয়ে উঠেছে। কৌতুকে নতুন। দেখায় নতুন। আর দেখা-ই তো 'দর্শন' নিতান্ত সাধারণ জীবনের মধ্যে 'অসাধারণ'-কে আবিষ্কার করার একটি দর্শন এ-কবিতাগুচ্ছের সর্বত্র উপস্থিত। অথবা : 'পথ বড়ো তীক্ষ্ণ মিহি / পেট বড়ো ভুখা / সাজো গো তামাক টানি / কালোত্তীর্ণ হুঁকা।' 'মিহি'-র আগে 'তীক্ষ্ণ' কথাটা যেমন আশ্চর্য তেমনই পরের লাইনে 'পেট বড় ভুখা' এসে পড়বে আমরা কেউ কি ভেবেছি? প্রতিটি কবিতাই সমিল। অথচ মিলগুলো খুবই স্বাভাবিকভাবে এসেছে। একটি ক্ষেত্রেও কবিতা পড়া শেষ হওয়ার পর আলাদা করে কোনো মিল চোখে পড়ে না বা মিলের জন্য মনে কোনো স্বতন্ত্র বাহবা জাগে না। কেননা কবিতাগুলির বিষয়ের সঙ্গে মিল ও ছন্দ একাকার হয়ে আছে। 'মাঝি কোথা নিদ্রা যায় / বন্ধুরে না হেরি / অকূলে বেয়াকুল প্রাণ / কী হইবে আখেরি।' এখানে 'আখেরি' কথাটি কী অপূর্ব। অথচ দেখলেন, 'হেরি' লিখতে ভয় পাননি কবি। এই বইয়ের মিলগুলি চমক সৃষ্টিকারী নয়, বরং মিলগুলির বিশেষত্ব হল এই যে, অনেক জায়গাতেই মিল এসে একটি অভাবনীয় অর্থমুখ খুলে দিচ্ছে, যার ফলে নতুন স্তর যুক্ত হচ্ছে কবিতায়। পুরোনো ভাষাকে সচেতনভাবে আশ্রয় করে একেবারে নতুন কবিতা লিখেছেন মুজিবর আনসারী। থেকে থেকেই আশ্চর্যের জন্ম হয়েছে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটিতে। 'তমসা' কবিতাটি পড়ে আমার মেয়ে বলল, মনে হল যেন একটা গান শুনলাম। ঠিক। এই কবিতাগুলির মধ্যে একটি গীতধারা বয়ে চলেছে। যেমন আমাদের প্রাচীন কবিতার মধ্যে গান ছিল। চার লাইনের এককে অগ্রসর হয়েছে কবিতাগুলি, সেখানেও গীতধর্ম থাকে। দু-লাইনকে ভেঙে চার লাইন করা হলেও চার লাইনের স্বতন্ত্র একক তৈরি হচ্ছে এখানে। আবহমান এসে এ বইতে ধরা পড়তে চেয়েছে। ধরা পড়েছে দরিদ্র, কৃষিজীবিত বাংলাও। এই বইটির মধ্যে কোথাও একটি আনন্দও ধরা আছে। সঙ্গে আছে লুকোনো কৌতুক।

কোথাও কোনো বিদ্বেষ নেই বা কবিতাগুলো কোনো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লেখা নয়। আমার কেমন ধারণা ছিল, আড়ালে বসে কেউ অসাধারণ কবিতা লিখছে, সকলের থেকে আলাদা কবিতা লিখছে— কিন্তু আমি জানতে পারছি না। এইবার তার প্রমাণ পেলাম। পাঠক, এ বই হয়তো আপনার হাতে পড়বে না। তাই কয়েকটি কবিতা আপনাদের দিলাম 'গোঁসাইবাগান'-এর উপহার হিসেবে। এই বইয়ের সুন্দর প্রচ্ছদটি এঁকেছেন কৃষ্ণেন্দু চাকী।

নাগর

জাগো তৃষ্ণা আদি ফুল
অরূপ সাগর
তব রূপে মজি আমি
অস্পৃশ্য নাগর
আধেক পিরিতি আহা
আধেক যাতনা
মধ্যিখানে শঙ্খচূড়
তুলে আছে ফণা
সজিনা গাছের আঠা
সমুদয় কাণ্ডে
হায় কে করিল বাহ্যে
অমৃতের ভাণ্ডে

তমসা

তমসা নদীর তীরে
আমাদের ঘর
ঘুটঘুটে অন্ধকার
ঘরের ভিতর
কখন যে বান ডাকে
ঘরে ঢোকে ঢেউ
কেউ কাঁপে থরথর
অবিচল কেউ
জলে ভাসে চূর্ণ চাঁদ
মিটিমিটি তারা
বহিছে অনন্ত স্রোত
তমসার ধারা

কেচ্ছা

কেচ্ছা নহে মন্দ কিছু
কান্দো কেন বসি
কেচ্ছা রসবতী কাব্য
রজনিতে শশী
সব কেচ্ছা জগতের
মধুর বচন
কান্দিও না রাধাসোনা
লায়লাকাঞ্চন
তোমার আমার কেচ্ছা
কী আনন্দ হায়
অন্তরে অনন্তকাল
বঙ্গবাসী গায়

অতল

সম্মুখে পাষাণগিরি
পশ্চাতে সুনীল
অতলান্তে ভাসে কাল
বাস্তু সাবলীল
কে গিরি লঙিঘবে এসো
অন্তরিক্ষে বসি
সুপক্ক ফলের আশে
লাগাই আঁকশি
আন্দোলিত কাণ্ডদল
বৃক্ষ দণ্ডবৎ
তোমারে ঘিরিয়া নাচে
সমূহ জগৎ

মুলুক

পবনের ঘোড়া তুমি
উড়িয়া উড়িয়া
নগর ছাড়িয়া যাও

আসমান ফুঁড়িয়া
চাঁদ সুরজের দেশ
কাজল পাহাড়ি
আরও দূরে বঙ্গ যার
পুঁতিয়াছে নাড়ি
ওখানে দাঁড়াও নত
ক্ষণকাল বুকে
দেখো জাগে গণ্ডগ্রাম
আপন মুলুকে

উঠান

পোলারে লইয়া বুকে
হইয়া নতমুখ
ধান পাছড়ায় বধূ
ফুদুক ফুদুক
গুঁড়া উড়ে চূড়া হয়
স্বর্ণবর্ণ ধান
ধানে প্রাণে পুণ্যময়
গরবি উঠান
খোলা বুকে দোল খায়
পোলা সুখদুখ
ধান পাছড়ায় বধূ
ফুদুক ফুদুক

দোসর

সুমতি কুমতি কাঁদে
আদি দুই বোন
একই গৃহে বসবাস
কেমনে গোপন
করিবে যাতনা হায়
একই ছেঁড়া শাড়ি
দু'জনে পিন্ধিতে গিয়া
করে কাড়াকাড়ি

নিত্য কলহ তবু
অবিচ্ছেদ্য জোড়া
সুমতি কুমতি কয়
এই মত মোরা

পিঁড়ি

বৃত্তপথ থেকে নামো
এসো আদি ভিতে
দেখো গজগিরি ঘাস
প্রাকৃত পিঁড়িতে
বসিয়া যুগের বুড়া
সেবিছে তামাক
উড়িছে কুণ্ডলী ধূম
পুড়িছে দেমাক
লতাগুল্মে ঢাকা ঘর
চপলা ঘরনি
রাঁধিছে শাকান্ন স্বাদ
লুটিছে ধরনি

মেলা

দুখের প্রতিমা তুমি
দীক্ষিত সোপানে
ওঠো নাকি নেমে যাও
ঘুঙুরেব গানে
কে যেন পাতিয়া কান
পুলকে ব্যথায়
অনন্তে বিছানা পাতি
সুখে নিদ্রা যায়
সম্মুখে ভুবনমেলা
অবিরত ঢেউ
কেউ মঞ্চে ছিল আগে
আজও নাচে কেউ
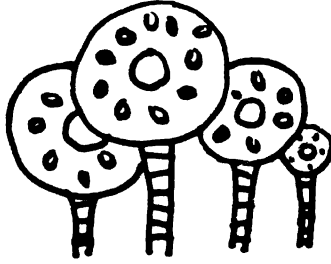
১৫

গোঁসাইবাগান পড়েন, এমন দু-একজন আমাকে প্রশ্ন করেছেন, আপনি সব কবিকেই ভালো বলেন কেন?

তাহলে এখন আর কারও লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি হয় না! নাকি আপনি সবাইকেই খুশি রাখতে চান!

আমি সবাইকে খুশি রাখতে চাই কি না এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার বাধে। তাই নীরব থাকব।

কিন্তু তার আগের প্রশ্নটি হয়তো আমার অচেনা কোনো কোনো পাঠকের মনেও এসে থাকতে পারে, তাই এ-প্রসঙ্গে দু-একটা কথা বলি।

আমি শুধু আমার ভালোলাগা কবিতার কথা আমার পাঠকের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই। এইটুকুই আমার লক্ষ্য। একটা ভালো লেখা পড়লে, একটা ভালো রেকর্ড শুনলে মনে হয় না, বন্ধুকেও ডেকে শোনাই! এ হল সেইরকম।

ত্রুটির কথা উঠলে বলব, ধরুন আপনি একটা কবিতার বই পড়লেন। তাতে কয়েকটা লেখা আপনার ভালো লাগল না। কিন্তু যে-লেখাটা ভালো লাগল তার দাম কি কম? ওইটা নিয়েই আমি খুশি।

স্বীকার করি, মানুষ ত্রুটিযুক্ত। ত্রুটিহীন মানুষ হয় না। একমাত্র দেবতাই হয়তো সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন। মানুষ তো আর দেবতা নয়। মানুষ ত্রুটিযুক্ত, তাই তার শিল্পও ত্রুটিযুক্ত। যে-শিল্প সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন, তা মানবিক নয়। আমি যখন প্রথম লেখার চেষ্টা শুরু করেছি, আজ থেকে ৩৭-৩৮ বছর আগে, তখন শুনতাম বাংলা কবিতা কেউ পড়ে না। কারণ তা দুর্বোধ্য। আজ প্রায় চার দশক পরেও, সেই একই কথা শুনি। এবং এ কথা সত্যি, কবিতার পাঠক চিরকালই কম। গল্প-উপন্যাসের প্রতি চিরকালই অনেক বেশি পাঠক আগ্রহী। কবিতায় যে অল্প কয়েকজন পাঠক মনোযোগী, তাঁদের প্রাথমিক অবস্থায় কিছু সমস্যা হয়। যেমন আমার হত। অথচ এই সময়ের মধ্যেই কত ভালো কবিতাও তো পড়েছি। তাদের কথা জানাতে ইচ্ছে করে।

মনে আছে, তখন আঁতিপাঁতি করে খুঁজতাম। অনেক কবিতাই বুঝতে পারতাম না। বলা ভালো, কেমন যেন একটু একটু বুঝতে পারতাম, আর অনেকটাই না-জানা থাকত। এক-একটা লাইন পড়ে চুপ করে বসে থাকতাম। মনে হত, কারও সঙ্গে যদি এটা নিয়ে একটু কথা বলা যেত।

আমি স্বীকার করব, কবিতা পড়তে গেলে এখনও আমার মাঝে মাঝে এরকম হয়। প্রথম বয়সে, এমন হলে নিজের বোধ-বুদ্ধির ওপর একটা অনাস্থা জন্মায়। অনেকের আবার কবিতা ব্যাপারটার ওপরই রাগ হয়ে যায়। তাদের সঙ্গে যদি বিষয়টা নিয়ে একটু কথাবার্তা বলা যেত তবে হয়তো খুলে খুলে যেত জট-বাঁধা ব্যাপারটা। আমার সেই প্রথম বয়সে যেমন নানা দ্বিধা জন্মাত, ভালো কবিতা খুঁজে পেতাম না, বা ভালো কবিতা পড়েও ধরতে পারতাম না কেন ভালো, তেমনই, ঠিক আমারই মতো দিশাহারা পাঠক নিশ্চয়ই কোথাও কোথাও আছেন এখনও। যাঁরা হয়তো কবিতা ভালোবাসি, এ কথাটাও জোরের সঙ্গে বলতে সাহস পান না। প্রধানত তাঁদের কাছেই এই গোঁসাইবাগান-এ আমি মন খুলে কথা বলি।

তবে, কবিতা নিয়ে কথা বলতে গেলে কোন কবির কোন কবিতা ভালো লাগেনি তাও কি বলা উচিত নয় আলোচকের? অবশ্যই উচিত। কিন্তু নিজেকে আলোচকের মর্যাদা আমি দিই না। আমার ভূমিকা সামান্য এক উপভোগকারীর। কোনো লেখা যদি মনকে না-ছোঁয় তবে আমি অন্য লেখা ঠিকই পেয়ে যাই যা আমাকে মুগ্ধ করেছে। সেটুকু নিয়েই কথা বলি। নিজের জন্য এই ভূমিকা আমি নির্দিষ্ট করেছি।

সেদিন একজন বলছিলেন, এখনকার কবিতায় আর কল্পনাশক্তির দেখা পাওয়া যায় না। নতুন কোনো কল্পনার ছোঁয়া আজকের কবিতায় নেই। তা অনেক সোজাসুজি বা ধারালো। তিনি নিজেই বললেন, সত্যিই তো, কল্পনার জায়গা কোথায় আজকের জীবনে! ঠিকই। রবীন্দ্রনাথ যে কল্পনার কথা বলেছেন, জীবনানন্দের কাছে এসে যা হল কল্পনাপ্রতিভা, সে সবের আর কোনো প্রয়োজন নেই আজ।

যিনি এ কথা বললেন, তিনি কোনো কবিতা লেখক নন। শিল্পজড়িত মানুষ। বয়স সত্তর পার হয়েছে। তখন কিছু বলিনি। তাঁর জন্য একটি-দু'টি কবিতা আজ বলি :

> অন্ধকার না-হতেই সমস্ত আকাশ জুড়ে একদল অন্ধ
> মানুষের যাতায়াত শুরু হল। তাদের লাঠির চাপে ফুটে
> উঠল শত-সহস্র নক্ষত্র ও গ্রহরাজি। তারা, উদ্‌ভ্রান্তের
> মতো, অথচ সাবধানে ঘোরাঘুরি করে। কী চাইছে কে
> জানে? বোধহয় রাত্রির আহার, চরিতার্থ কাম আর নরম
> বিছানা। সে-সব কোথায় পাবে? ছ-নম্বর দেওদার বাগানে
> ঘর ভাড়া পাওয়া যেত। তবে এত রাতে কিছু কি আর
> খোলা আছে? শিয়ালদায় চেষ্টা করে দেখতে পারে।

দু-একটা ফোন করুক। এই সব ভাবনার ফাঁকে ফাঁকে, দেখি
তাদের লাঠির চিহ্নগুলি ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে। বুঝি ভোর হল।
তারা কোথাও না কোথাও আশ্রয় পেয়ে গেছে, মনে হয়।

(রাত্রির আকাশ, অগ্রন্থিত কবিতা : উৎপলকুমার বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা)

এই কবিতার লেখক উৎপলকুমার বসু। সারা রাত কেটে গেছে এই কবিতার, রাত-জেগে। এই যে একটা দুটো করে তারা ফুটতে সান্ধ্য আকাশে আমরা রোজ দেখি, তারা যে মহাশূন্যে ঘোরাঘুরি করা অন্ধ মানুষদের লাঠির চাপে ফুটে উঠছে, এমন কখনও ভেবেছি? শহরে এসে পৌঁছোনো সব আশ্রয়হীন ও অপারগ মানুষের কথা বলছে এই কবিতা।

একেবারে বাস্তবের নানা প্রয়োজনের কথাও বলছে। দু-একটা ফোন করুক, বা ছ-নম্বর দেওদার বাগানে ঘর পাওয়ার মতো তথ্যও আছে এখানে। অথচ তার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে 'মহা বিশ্বলোকের ইশারা'। শুধু আকাশে ফুটে-ওঠা, ফুটে-থাকা তারার দিকে তাকিয়ে তার সঙ্গে নিরাশ্রয় অন্ধ পথিকের সংকটকে যুক্ত করে দেওয়া। দুটি স্বতন্ত্র জগৎকে মিলিয়ে তৈরি এই কবিতা বলে, দেখি, তাদের লাঠির চিহ্নগুলি ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে। বুঝি ভোর হল। এবং কবিতাটি আমাদের আশ্বস্ত করছে যেঅন্ধ পথিকরা নিশ্চয়ই আশ্রয় পেয়েছে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে সন্ধের তারা-ফোটা দেখা অথবা ভোর-হওয়া, তার বর্ণনা তো আমরা কতদিন ধরেই কত কবিতায় পড়েছি। তবু এখানে কী আশ্চর্যভাবে নতুন হয়ে উঠল সব! এবং তা হল কল্পনাশক্তির স্পর্শে। দৃষ্টিহারা মানুষের পাশাপাশি তাদের পথ খোঁজার সূত্রে তারা জ্বলে-ওঠা রাখা হয়েছে। বুদ্ধি এবং কল্পনা একত্র হয়ে কাজ করেছে এখানে। এই কবিরই আরেকটি কবিতা বলতে ইচ্ছে করছে :

বাড়ি ফিরে দেখি, বারান্দায়, টবের গাছে, ছোটো এক
সাদাফুল ফুটে আছে। এ-ও কী সম্ভব। আমার অবিশ্বাসী
দুই চোখ জলে ভরে যায়। আমি চুপ করে ওখানেই
দাঁড়িয়ে থাকি। বহুক্ষণ। যেন কত কাল। এই প্রসূতি
এবং তার শিশুটিকে নিয়ে কী করব ভেবেই পাই না।
প্রতিবেশীদের খবর দেব তো বটে। কাগজের লোকদেরও
ডাকব। কিন্তু আমাকে যে অবিলম্বে এদের জন্য রৌদ্রের
ব্যবস্থা করতে হবে। চাই বাতাস এবং জল সুশীতল। এবং
কিছুটা খাদ্য। সে কোথায় পাব। আপাতত অস্ফুটে বলি :
আমি একটু ঘুরে আসছি। তার আগে তোমাদের এক সীমাহীন
ভালোবাসার কথা জানিয়ে যাই যা মানুষকে কাঁদায়,
নয়তো কবিতা লেখায়, নয়তো বাজারে পাঠায়।

(সুখ-দুঃখের সাথী : ২৮)

টবের গাছে একটি সাদা ফুল ফুটে উঠেছে। তাই দেখে একজন মানুষ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। টবের গাছ ও ফুলটিকে দেখে তার মনে হচ্ছে, এই প্রসূতি ও শিশুটিকে নিয়ে কী করব ভেবেই পাই না। এই যে প্রসূতি ও শিশু বলে টবের গাছ ও ফুলকে ভাবতে পারা, এ এক আশ্চর্য নতুন কল্পনা।

পক্ষান্তরে উদ্ভিদজগতের সঙ্গে এক গভীর আত্মীয়তা বোধ করাও এর মধ্যে আছে। রবীন্দ্রনাথের 'বলাই' গল্পের সেই চেতনা কত আলাদা ও কত নতুন রূপ নিয়ে জন্ম নিল। মানুষের কত আগে বৃক্ষ ও উদ্ভিদ এসেছে পৃথিবীতে। আজ বৃক্ষকে বাঁচাতে আন্দোলন করতে হয়। নইলে সে লুপ্ত হয়ে যাবে। এই কবিতা, এক হিসেবে, এইখানে এসে জাতিস্মর-কবিতা। আবার এই কবিতা সীমাহীন ভালোবাসার কবিতাও। এই যে টবের গাছ, তার ফুলটি, এরাও আমার স্বজন। যেন এদের সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক। কবিতাটির কথা ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয় আমার। এই কবি, উৎপলকুমার বসু, তাঁর কবিতার জগৎ যে অনেক বড়ো, সে-প্রমাণ রেখেছেন নিজের সারাজীবনের কবিতায়। একবার তারাজগৎকে যুক্ত করলেন অন্ধ নিরাশ্রয়ের সঙ্গে, পরক্ষণে বাড়ির টবের গাছ ও ফুলকে বললেন প্রসূতি ও শিশু। যেন এই মা ও শিশুর খবর পৌঁছে দিতে হবে দিকে দিকে। অন্য এক কবিতার শেষ অংশে তিনি লিখেছেন :

> ... লেখাপড়া ভুলে গেলে
> কার ক্ষতি, অক্ষর মাড়িয়ে-ফেরা অনেক তো হল, আজ শুধু
> ঘাসে শুয়ে থাকি,
> খড়কুটো ডালপালা নাতি-নাতনির মতো পাশে শুয়ে থাকে।

(সুখ-দুঃখের সাথী ৩৯)

এ কবিতা মৃত্যুইচ্ছার কবিতা। ঘাসে শুয়ে থাকার কথা আছে এখানে। মাঠের খড়কুটো ডালপালা সব নাতি-নাতনির মতো হয়ে গেল এখানে। এও এক নতুন কল্পনা। আর মৃত্যু রইল না। মস্ত বড়ো এক জগতের অন্তর্গত হয়ে গেল এ কবিতা।

বোঝা যায়. প্রসূতি ও শিশুকে যিনি দেখে প্রতিবেশীদের খবর দিতে ছুটেছিলেন, তিনি এক গর্বিত পিতামহ। উদ্ভিদজগতের সঙ্গেও তাঁর রক্তের সম্পর্ক। তাই ডালপালা নাতি-নাতনি। এইসব চিন্তা ও কল্পনা কি নতুন চিন্তা-কল্পনা নয়? আজকের বাংলা কবিতায়? এবং এই সবই উৎপলকুমার বসুর সাম্প্রতিক রচনা। এখানে জানিয়ে রাখি শক্তির মৃত্যু, ভাস্কর ও সন্দীপনের মৃত্যু নিয়ে তিনটি অসামান্য কবিতা উৎপল লিখেছেন গত দশ-বারো বছরে। এই তিনটি কবিতার বিষয় মৃত্যু হলেও তাঁর পরিণামে কোথাও আছে জীবনের পুনর্জাগরণ। এই বিশেষ তিনটি কবিতা নিয়ে কখনও কথা বলার ইচ্ছে রইল।

আজ উৎপলের মৃত্যু সম্পর্কিত আর একটি কবিতা বলার লোভ সামলাতে পারছি না।

> থেকে গেল রাঢ়বঙ্গের এই ঢাল, এই ডাঙা জমি, পড়ে রইল

যোগিনীর পথে পথে ঘোরার পাদুকা—
ছেঁড়া কিছু অঙ্গবস্ত্র, খঞ্জনি ও পিতলঘুঙুর,
জলের পাত্র আর মাটির থালাটি বাইরেই তোলা রইল—
হ্যাঁ, একটা বস্তামতো থলির ভিতরে তেলচিটে বালিশ-চাদর
পাওয়া গেছে এবং মেডেল এক, নামহীন, হয়তো রুপোর,
ময়লায় কালো ও বিকৃত—এইসব সৌন্দর্যের মধ্যে তার
শবদেহ পাওয়া গেছে, বয়েস অনেক, পাশ ফিরে শুয়েছিল,
ভ্রূণভঙ্গি নিয়ে, পা গুটিয়ে, হাতের আঙুল মুখেতে পোরা—

যেন মায়ের পেটের মধ্যে অনন্ত সাগরে ভাসছে।

(টুসু আমার চিন্তামণি · ২০)

এক যোগিনীর মৃত্যুর ছবি এখানে। পথে পথে ঘুরে বেড়ানো, আবারও আশ্রয়হীন এক মানুষের কথা। এই কবি, যেমন অবচেতনার শক্তিকে তুলে আনতে পারেন কবিতায়, তেমনি, উদ্ভিদজগৎ, তারাগজগৎ, এবং সম্পূর্ণ অনাত্মীয় পথবাসী বা সহায়সম্বলহীন মানুষের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে পারেন ভালোবাসার শক্তিতে। রুক্ষ রাঢ় বাংলার ডাঙা জমি, যা ছিল এই যোগিনীর মাধুকরীর ক্ষেত্র, কত রোদ-বৃষ্টি সে পার হয়েছিল এই দেশে, সব পড়ে রইল, তার খঞ্জনি, জলের পাত্র, মাটির থালা, আর ময়লা বস্তার মধ্যে তেলচিটে বালিশ, চাদর—এইসবের মধ্যে তার শবদেহ পাওয়া গেছে। কীভাবে?

পাশ ফিরে শুয়েছিল, ভ্রূণভঙ্গি নিয়ে, পা গুটিয়ে, হাতের আঙুল মুখেতে পোরা। শেষ লাইনটি আমাদের স্তম্ভিত করে দেয়। এক শবদেহের শয়নভঙ্গি দেখে মনে হয়েছে যেন সে গর্ভস্থ ভ্রূণ! বা ভ্রূণ নয়, সম্পূর্ণ শরীর তৈরি হয়ে গেছে। এইবার জন্মানোর সময় হল। অনন্ত সাগর, মায়ের গর্ভের জল। চকিতে প্রলয় সমুদ্র মনে পড়ে।

মৃত্যুকে এই কবিতায় যেভাবে অতিক্রম করা হল, তার মধ্যেও কি সম্পূর্ণ এক নতুন কল্পনাশক্তির প্রয়োগ নেই? এই কবিতাও এক জাতিস্মর কবিতা। মৃত্যুমুহূর্তকে ঘুরিয়ে জন্মমুহূর্তের বিন্দুতে মিলিয়ে দেওয়া কবিতা।

উৎপলকুমার বসু, খুবই অনাড়ম্বরভাবে সম্প্রতি সত্তর বছর পার হয়েছেন। কেউই তেমন জানে না। এ হল সেই বয়েস, যেখানে পৌঁছে কবিরা অবসন্ন হয়ে পড়েন, নতুনত্বের অভাব জীর্ণ করে তাঁদের লেখাকে, কেবলই পুরাতন খ্যাতি নির্ভর করে বাঁচতে হয় তাঁদের। অথচ উৎপল, তাঁর কবিতায় কেবলই, একের পর এক আশ্চর্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন আমাদের। তাঁকে আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।
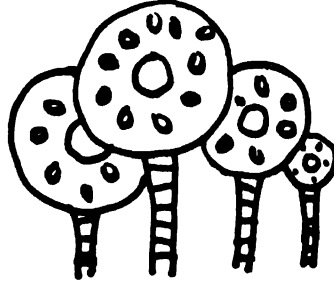
১৬

একবার নক্ষত্রের পানে চেয়ে—একবার বেদনার পানে
অনেক কবিতা, লিখে চলে গেল যুবকের দল
পৃথিবীর পথে পথে সুন্দরীরা মূর্খ সসম্মানে
শুনিল আধেক কথা—এইসব বধির নিশ্চল
সোনার পিত্তল মূর্তি : তবু, আহা, ইহাদেরই কানে
অনেক ঐশ্বর্য ঢেলে চলে গেল যুবকের দল
একবার নক্ষত্রের পানে চেয়ে—একবার বেদনার পানে।

এটি জীবনানন্দের একটি বিখ্যাত কবিতা। নাম : 'ইহাদেরই কানে'। ৫০ বছরের অধিক কাল ধরে এ কবিতা পাঠকদের জানা। এ-কবিতায় 'মূর্খ সসম্মানে'র মতো আশ্চর্য ও অপ্রত্যাশিত শব্দের প্রতিবেশিতা আছে, আছে কানে 'অনেক ঐশ্বর্য' ঢেলে চলে যাওয়ার মতো কথাও, যেখানে, 'ঐশ্বর্য' শব্দটির একটি সম্পূর্ণ নতুন ব্যবহার ঘটেছিল সে-যুগে। এই কবিতাটির মধ্যে একটি অভিমানের কথা বলা আছে। যুগে যুগে যুবক-কবিরা তাঁদের জীবন কবিতায় ঢেলে দিয়েছেন নারীদের উদ্দেশ্যে, নারীরা তা যথেষ্ট শোনেননি, এমন অনুযোগই এ কবিতার মর্মে। তাঁদের উদ্দিষ্ট প্রেমিকারা না হয় না-ই শুনলেন, তবু বেদনা ও নক্ষত্রের দিকে কবিরা চিরকালই চেয়ে থাকবেন ও তাঁদের কথা বলে যাবেন। এই ধরনের অভিমান-চিহ্নিত কবিতা বিনয় মজুমদারের 'ফিরে এসো, চাকা'র মধ্যেও দেখা যায়। যেমন—

ভালবাসা দিতে পারি, তোমরা কি গ্রহণে সক্ষম?
লীলাময়ী করপুটে তোমাদের সবই ঝরে যায়
হাসি, জ্যোৎস্না, ব্যথা, স্মৃতি অবশিষ্ট কিছুই থাকে না

আবার এর পালটা অভিমানও আছে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যার সে-শান্ত উপহার' গ্রন্থে 'জন্মদিনের মঞ্চে' নামক সংলাপ কাব্যে তার দেখা পাওয়া যায়। কোনো খ্যাতনামা কবির ৫০ বছরের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে কবির উদ্দেশ্যে তার প্রাক্তন প্রেমিকা বলছেন:

আমার পৃথক প্রেম অঙ্কুরিত হলে
ওর জন্য কষ্ট হত,
কেন না শুনেছি,
শুধুই আমার জন্যে তছনছ করেছে
জীবনযাপন, বৃত্তি, লেখাপড়া সবই—
কবি বনে গেছে আর লিখেছে সুন্দর
দোষারোপ করে।

সেই নারী, যিনি নিজেও কবিরই বয়সিনি, এ-কাব্যে যাঁর প্রাথমিক পরিচিতি জনৈকা নামে—তিনি এরপর বলেন :

অথচ কীভাবে সহস্র অজস্র পদ্যে
অভিযুক্ত করেছ আমাকে
মনে পড়ে?

এই যে অভিযোগ, বা এই যে 'সুন্দর দোষারোপ'—অভিমানের বলয় থেকেই তার জন্ম। তুমি কিন্তু আমাকে বুঝলে না, নারীর প্রতি পুরুষের এবং পুরুষের প্রতি নারীর এই চিরদিনের অভিমান মাঝে মাঝে যে প্রেমের কবিতায় ছায়া ফেলে যাবে, এ তো খুবই স্বাভাবিক। তবে যে-কবিতা বলে 'আর আমিই কি তোমাকে বুঝতে পারলাম?' সে-কবিতা আরও একটু বড়ো জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায়।

অন্যদিকে এমন কবিতার কথাও তো মনে আসে, প্রিয়কে কাছে পেয়ে যে-কবিতার মন ভরে আছে!

আমি যেন বলি আর তুমি যেন শোনো
জীবনে জীবনে যার শেষ নেই কোনো...

অমিয় চক্রবর্তীর বিখ্যাত এই দুই কবিতাপঙ্‌ক্তি, কতবারই তো কতজনের মনে এসেছে গত ষাট বছরে। আবার অর্ধেক শতাব্দী কাল অতীত হয়ে যাওয়ার পর পরবর্তী যুগের এক কবি যেন না-জেনেই এক উলটো দিকের কথা লিখলেন,

কে তোমার কথা শোনে? তুমিও বা শোনো কার কথা।
তোমার আমার মধ্যে দু-মহাদেশের নীরবতা।

একটি কবিতা বলছে গানের তানের মতো একের পর এক বলে যাওয়া কথাস্রোতের বৃত্তান্ত, চিরকাল বয়ে চলার মধ্যেই যার সৌন্দর্য, অন্যটি বলছে, দুটি হৃদয় যেন সমুদ্রের এপারে ওপারে স্থাপিত দুই মহাদেশ। যেন রাত্রির সমুদ্র মাঝখানে। বিরাট নীরবতা। কেউ কারও কথা শুনতে পাচ্ছে না এখানে। কবিতাটি শঙ্খ ঘোষের লেখা। 'শবের উপর সামিয়ানা' কবিতাগ্রন্থের কবিতা এটি। একেবারে শেষ কবিতা।

আর একেবারে শেষ কবিতা বলেই একটি অন্য কথাও মনে হয়। কেবলই কি দুটি নারী-পুরুষের প্রেম সম্পর্কের নির্যাস এতে আছে? সেই সম্পর্ক-নিয়তি শরীরে ধরে নিয়ে এ-কবিতা কি একটু চলে যাচ্ছে না পাঠকের দিকেও? যেহেতু বইটি সম্পূর্ণ হল এই দুটি লাইন দিয়ে। অনেকটা যেন কণ্-স্বরের মতো। আপনি লাগাবেন গান্ধার। গান্ধার-ই প্রধান লক্ষ্য আপনার। কিন্তু নখের কোনা দিয়ে আলতো একটু মধ্যমকে ছুঁয়ে এলেন। অন্য সৌন্দর্য এল। পাঠকের সম্পর্কে মনে মনে অভিমান বহন করা অবশ্য এই কবির প্রকৃতি নয়। বাংলা কবিতার দুর্বোধ্য পাঠকের প্রতি বই উৎসর্গ করেছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। আর 'কী বা এসে যায় কিছু ভাবে যদি তোমার পাঠকে?' এই বলে একটি কবিতা শেষ করেছিলেন বিষ্ণু দে। কিন্তু এই কবি, শঙ্খ ঘোষ, তাঁর কবিতায় বলেছেন :

তুমি কি কবিতা পড়ো? তুমি কি আমার কথা বোঝো?
ঘরের ভেতরে তুমি বাইরে একা বসে আছো রকে?
কঠিন লেগেছে বড়ো? চেয়েছিলে আরো সোজাসুজি?
আমি যে তোমাকে পড়ি, আমি যে তোমার কথা বুঝি!

এই কবিই লিখেছিলেন, আমার বিশ্বাস আছে আমাকে বিশ্বাস করো তুমি। এ লাইনও প্রাথমিক ভাবে নারী-পুরুষ সম্পর্কের কথা শরীরে ধারণ করলেও, কীভাবে যেন পাঠকের দিকে চলে যায়। চলে যায় সভ্যতারও দিকে। কারণ এ-কবিতার মধ্যেই আছে, আমাদের পৃথিবীতে কখনও ফেরে না হিরোশিমা। আর ওই যে একটু আগে বলেছি দু-মহাদেশের নীরবতার কথা, এই নীরবতা বা নিঃশব্দকে কিন্তু এই কবি, শঙ্খ ঘোষ, অনেক দিন ধরে সঙ্গে রেখেছেন। এই নীরবতা কিন্তু ওঁর কাছে বোবা ও বধির নয়। যেমন :

বলিনি কখনও?
আমি তো ভেবেছি বলা হয়ে গেছে কবে

এভাবে নিথর এসে দাঁড়ানো তোমার সামনে
সেই এক বলা

'আমি যেন বলি আর তুমি যেন শোনো'-র পাশে ওই 'নিথর এসে দাঁড়ানো' আর 'বলিনি কখনও'-ও এক সেতু তৈরি করে। প্রথমে জীবনানন্দের যে-কবিতাটি দিয়ে আজ শুরু করেছি, যেখানে অনেক কবিতা লিখে চলে গেছে যুবকের দল, সেই কবিতার যে গভীর অভিমান বা দুঃখ, তা-ও কিন্তু কেবল প্রিয়তমা নারীদের প্রতিই নয়। যুবকের দল অত যে কবিতা লিখে চলে গেল, তারা তা অর্ধেক শুনল, মনেও নিল না—এই যারা অর্ধেক শুনল, তাদের তো কোথাও পাঠক হিসেবেও আশা করেছিল সেইসব যুবক। তারা পড়বে, তারা বুঝবে। তাই না? তাহলে, এই অভিমান কোথাও নিজের যুগের পাঠকের প্রতিও যায়? আমার প্রেম তুমি বুঝলে না, এ হল একরকম অভিমান। আর আমার প্রেমের কবিতা তুমি মন দিয়ে পড়লে না, শুনিলে আধেক কথা, এ আরেকরকম। হতাশ যুবক-কবিরা তাই বেদনা ও নক্ষত্রের পানে চেয়ে তাদের কবিতা লিখে চলে গেল। জীবনানন্দের 'মহাপৃথিবী' বইয়ের এই কবিতা লেখার পরও ষাট বছর পার হল।

জীবনানন্দেব মৃত্যুর পরে জন্মানো এক কবির বইয়ে পাওয়া গেল এই কবিতা :

> গোলমাল করার জন্য আমাদের থেকে ওরা দূরে চলে গেছে।
> আত্মসুখী ছেলে ও মেয়েরা। যশোলোভী কবিগণ। ময়ূরপুচ্ছের গল্প
> এত জানা, এইবার আমরা কোনও বিভ্রমে পড়িনি।
> শেষবার সম্মিলিতভাবে
> বলেছিলাম : নিজেদের কথা বলো, বলতে বলতে আমাদের কথা
> যেন তাতে ঢুকে যায়। তোমাদের চোখের ঝর্নাতে
> আমাদের রাতগুলো আমাদের সমাজের বিভীষিকা সমাজের ওপরে উদার
> আকাশের হাতছানি যেন লুব্ধ ধরা দ্যায়। শোনেনি ভায়েরা।
> কেবল নিজের কথা, যৌনসুখ, বাথরুমে বমির গন্ধ, আলপথে
> শ্রেণীবাদী সংগ্রামী কুহকী গল্প, শেষতক
> 'আমি আমি' করতে করতে দূরে চলে গেল তারা, লিখে গেল.
> আমরা পড়িনি।
>
> আমরা ডাকিনি।

এই কবিতার নাম 'পাঠকের কথা'। লিখেছেন সংযম পাল। জীবনানন্দের ওই কবিতার এক প্রত্যুত্তর যেন। পাঠকদের পক্ষ থেকে এই কথা যাচ্ছে কবিদের দিকে। 'গোলমাল করার জন্য আমাদের থেকে ওরা দূরে চলে গেছে।' এই প্রথম লাইনটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছে। গোলমাল করার জন্য কারা আমাদের থেকে দূরে চলে গেছে? কবিরা। কবিরা? তারা কী এমন গোলমাল করতে পারে? এ-প্রসঙ্গে পরে আসব। এখানে আরও একটি জরুরি কথা আছে। সেইটি আগে বলে নিই। 'বলেছিলাম : নিজেদের কথা বলো, বলতে বলতে আমাদের কথা / যেন তাতে ঢুকে যায়।' এ কথাই আরও চল্লিশ বছর আগে

বলেছিলেন শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, তাঁর 'কোথায় সেই দীর্ঘ চোখ' কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতায়। ঠিক এক কথা নয়, তবে অনেকটা মিল-থাকা কথা। বলেছিলেন :

> নিজেকে সরিয়ে রেখে কিছু লেখো, নিজেকে বাদ দিয়ে
> দেখ এই বিশ্বে কত মানুষের ওড়াউড়ি
> মজ্জমান সূর্য নিয়ে অমরত্ব খেলা।
> অনেক গোপন কথা প্রত্যেকে যক্ষের মতো পুষে রাখে, তুমি
> কলসি কাৎ করে
> গেলাসে গেলাসে সব ঢেলে দিচ্ছ; বলছ না, বৃষ্টি রে
> ঝেঁপে আয়, চতুর্দিক থেকে এসে তোরা স্নান করা।...

এরপর শরৎকুমারের সেই কবিতা বলেছে অবিস্মরণীয় কয়েকটি একান্ত লাইন। যা পাঠকের একাকী কাতরতা।

> আমারও গোপন কথা কিছু ছিল, তুমি জেনে যাও।
> দেখা হলে যে-কথা লজ্জায়
> বলিনি, চিঠিতে লিখতে পারিনি যে-কথা
> আমাকে দেখেই তুমি বুঝে নাও।

পাঠক মুখ ফুটে বলতে পারেন না। কিন্তু মনে মনে আশা করেন, আমার মনের কথাটি নিশ্চয়ই বলেছেন এই কবি। সেই আশাতে বই তুলে নেন হাতে। না-পেলে ভাবেন, আমার সামান্য জীবন, সামান্য কথা, এর আর কী এমন গুরুত্ব যে, কবিতায় তা খুঁজে পাওয়া যাবে।

এখনও পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের গানে-কবিতায় সাধারণ মানুষ সবচেয়ে বেশি নিজের কথা খুঁজে পেয়েছে বলে আজও রবীন্দ্রনাথের মার নেই। জীবনানন্দের 'ইহাদেরই কানে' কবিতায় বলা আছে, 'অনেক কবিতা' লিখে চলে গেল যুবকের দল।' আর 'পাঠকের কথা' কবিতাটি বলছে, 'আমি, আমি' করতে করতে দূরে চলে গেল তারা, লিখে গেল, আমরা পড়িনি।'

এ-কবিতা, এক পক্ষে, আত্মসমালোচনারও কবিতা। কেন-না, পাঠকের কণ্ঠস্বরে বসে এ এক কবিরই লেখা। সত্যিই যদি নিজের জীবন বা নিজের প্রতিবেশী জীবনকে খুঁজে না পান পাঠক—তিনি দূরে চলে যেতে থাকা কবিদের আর ডেকে আনতে উৎসাহ পাবেন না। সেই জন্যই শেষ লাইনে 'আমরা ডাকিনি।' এই শেষ লাইনটি থেকে আর একবার প্রথম লাইনটির দিকে চোখ পড়ে আমার। 'গোলমাল করার জন্য' কথাটি নজরে আসে ফের।

এ কথা সকলেই জানেন, কাব্য-চর্চাকারীদের মধ্যে নানা ধরনের স্কুল বা মতবাদ থাকে। একটি স্কুলের সঙ্গে আর এক ধরনের স্কুলের মতবিরোধ তর্ক-সংঘর্ষ চলতেই থাকে। এবং তা চলে আসছে বছর বছর ধরে। সর্বকালেই এক কবির রচনা নিয়ে অপর কবির আপত্তি, এ-ধরনের লেখা এখন চলবে না. অন্যরকম লেখা প্রয়োজন—এ-ধরনের তর্ক উত্থাপিত

হয়েছে এবং তাকে খুবই স্বাস্থ্যকর বলেই মনে করা হয়। যদিও তার পরিণামে সব যুগেই কোনো কোনো কবির মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যায়। কখনও সাময়িক ভাবে বন্ধ কখনও-বা স্থায়ী ভাবে। পরবর্তী প্রজন্মের কবিরা এসব উত্তেজনা থেকে অনেক সময় কৌতুক অথবা আগ্রহ বোধ করেন ও নিজেরা ওই ধরনের বা আরেক ধরনের প্রশ্নে-প্রতিপ্রশ্নে জড়িত হয়ে তর্কবিস্তার করতে থাকেন। যাঁরা কবিতার গবেষক তাঁরা নব নব যুগে নব নব রসদ খুঁজে পান গবেষণার।

কিন্তু যে কবিতা লেখে না, কবিতা নিয়ে গবেষণাপত্র লিখতে চায় না, বা পত্রপত্রিকায় কবিতা বিষয়ক গদ্যরচনা ছাপাতে চায় না, কিন্তু কবিতা পড়তে ভালোবাসে, এই ভালোবাসা সে হয়তো পেয়েছে তার মায়ের কাছ থেকে—সে কী করবে? এমন পাঠকরা যে আছেন, সে-কথা আমি 'বাতাস আছেন' বা 'গাছ রয়েছেন'-এর মতোই সত্য অভিজ্ঞতা থেকে জানি। এক মা-মেয়েকে জানি যাঁরা অনেক পত্রপত্রিকা কেনেন বইমেলা থেকে। সেখানে এই ধরনের বিরোধিতামূলক গদ্য যে ক্রমশ ঝাঁঝবহুল ও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছে তা জেনে নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন তাঁরা—এগুলো জেনে আমাদের কী হবে? আমি গম্ভীর ভাবে বললাম, জানা তো সবসময়ই ভালো। মেয়েটি বলল, কবিতার মধ্যেও এগুলি দেখতে পাই অনেক সময়। আমি বলি, কবিতা তো কবিদের জীবনের অঙ্গ। তাই, তা নিয়ে যা সব তর্ক-বিতর্ক তাও তো কবিতায় আসবে। এগুলি ঠিক তর্ক নয়, বলে ম্লান মুখে চুপ করে যায় মেয়েটি। শেষে বলে, ওগুলি আর পড়তে ইচ্ছে করে না।

এই মেয়েটি বা তার মা—তাঁদের আশাহত হওয়ার কথা কোনোদিন জানাতে পারবেন না। ঠিক এই কথাটাই সংযম পাল ধরে দিয়েছেন তাঁর এই 'পাঠকের কথা' কবিতায়। কবিতা রচনা, কবিতা প্রকাশনা, কবিতা সমালোচনা ও সেই সংক্রান্ত বন্ধু-পরিচিতদের নিয়ে তৈরি হয়েছে ছোটো ছোটো সমাজ। তার মধ্যেও নানা দোলাচল, প্রীতি ও সংঘাত আছে। যে-ধরনের লেখার কথা মেয়েটি বলতে চায়, সেসব লেখাও নিশ্চয় কোথাও বাহবা পায়, বা কাউকে ক্রুদ্ধ করে, কিন্তু তা ঘটে খুবই ক্ষুদ্র একটা বৃত্তের ভেতর। যারা নিজেরা লেখালেখি করেন তাদের নিয়েই সেই বৃত্ত।

কিন্তু কবিতা রচনা ও তাঁর প্রকাশনার বৃত্তের বাইরে আছে বড়ো আর বহমান মূল জীবন। সেই জীবনে অংশগ্রহণকারী কেউ কেউ যখন কবিতার কাছে আসেন, তিনি, রচনার প্রকাশসমস্যা ও রচনাতত্ত্বের কথা জানার চাইতে, বহমান জীবন দেখতে চান। কিন্তু সে-প্রত্যাশা মুখে বলতে কুণ্ঠা বোধ করেন। কেননা কবিদের তাঁরা শ্রদ্ধার চোখ দিয়ে দেখেন। ভালোবাসার চোখ দিয়ে। দুটি বড়ো ঘরানার মধ্যে গায়ন পদ্ধতির কী কী তফাত তা জানলে ভালো। কিন্তু ঘরানাগুলির অন্তর্গত কলহ-সংবাদ জেনে কোনো শ্রোতার কী লাভ, যখন সেই দু-ধরনের গান থেকেই কিছু না কিছু আনন্দ সে নিতে পারে? কবিতার তত্ত্ব ও প্রকাশ-সংক্রান্ত তর্করচনাগুলিতে ধীরে ধীরে, অনেক সময় লেখকের অজান্তেই, তাঁর চেপে রাখা রাগ-ক্ষোভ-বিদ্বেষ মিশে যায়। সেই একই বিষয় বয়ে চলে আসে কবিতায়। পাঠকের মনে হয় এই নিজেদের মধ্যে গোলমাল, এগুলো জেনে আমার কী হবে। ধীরে ধীরে দূরে সরে যান তারা।

কিন্তু বাংলা কবিতার ঐশ্বর্যের তো আজও সীমা নেই। তাই দূরে না-যাওয়া পাঠকদের জন্যে, বিশেষত, সেই মা আর মেয়েটির জন্যে, শেষ একটি কবিতা নিবেদন করি। 'ক্ষুধাপ্রাণ'। এটিও লিখেছেন সংযম পাল। এই কবিতাটিও, জীবনানন্দের সেই 'চাল-ধোয়া-হাত'-কে মুখড়া হিসেবে ব্যবহার করে শুরু হলেও, দেখিয়ে দিয়েছে, এ গান কতটা নিজস্ব :

সোনামুগ ধোয় যে-মেয়ের
কালো হাতে শ্যামল আঙুল
ক্ষমা করে দিই সে মেয়ের
সকালের খুটিনাটি ভুল
আমি ওর হাতে হাত রেখে
ভাত ও ডালের সমাহারে
পেয়ে যাই অর্ধেক বিজয়

মনে হয় কোন সে বাতাস
নিচু স্বরে লোভে বেজে ওঠে
এরকম আমারও মায়ের
শাখা পলা আঁচলের খুঁটে
চেয়েছিল—ক্ষুধাপ্রাণ বাবা
পাত পেতে বসে বারান্দায়
বলে ওঠে : 'ছবি, ভাত দাও'

দুপুরের বেলাটি গড়ায়।

একটি চিরকালীন বাংলা এই কবিতার মধ্যে আছে। নিজের ঘরনীর খেতে দেওয়া দেখে, দেশের বাড়ির মা আর বাবার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। শুধু ডাল-ভাত মেখে খাওয়ার মধ্যে সাধারণ মানুষের যে-আনন্দ, তার প্রকাশ আছে এখানে, তা যেন অর্ধেক রাজ্য জয় করে আসা। খিদে-পেটে থালা নিয়ে বসে মাকে নাম ধরে ডেকে বাবার ভাত দিতে বলা, এ-ছবি কি পুরোনো হওয়ার? এ-কবিতার একদিকে জীবনানন্দ দাঁড়িয়ে আছেন।

এ-লেখা শেষ হওয়ার পর এসে দাঁড়িয়েছেন অক্ষয় বড়াল ও কুমুদরঞ্জন। মাঝখানে বাংলার সংসার, বাংলার স্নেহমমতাময় অন্নজল।
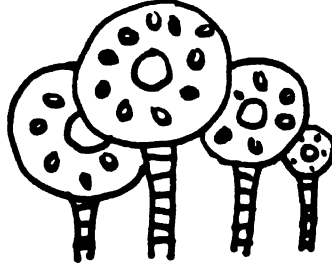
১৭

প্রথম যখন কবিতা লিখতে শুরু করেছিলাম, কারণ কী ছিল? সত্যি বলতে, এককথায় কোনো কারণ বলা যাবে না। এমনিই মাথায় কতগুলো কথা আসত। সে কথাগুলো মাকে বলার জন্য নয়। ভাইকে বা বন্ধুদের বলার জন্যও নয়। কেবল মনে হত, লিখে রাখি। প্রথমে গদ্য করে ডায়রির মতো লিখতাম। তারপর একসময় সেগুলো কবিতার আকার নিতে থাকে। এটুকুই ঘটনা।

কিন্তু ভেবে যদি দেখি, তবে খুঁজে পাব সেসব কথা কেন আসত। প্রাথমিক ভাবে সে-সব কথা তৈরি হত কোনো সামান্য ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে। বা, কোনো কথার উত্তর হিসেবে। কেউ কোনো কথা বলেছে, বা কোনো ঘটনা ঘটেছে, তারই ফলে মনে প্রতি-উত্তর হিসেবে কথাগুলো আসছে। এই ঘটনা কোনো মেয়েকে দেখে এক ঝলক ভালোলাগা হতে পারে।

আবার সেই সময়টায়, ১৯১৫-'১৫ সালে, চারিদিকে রক্তপাত চলছে, এই বাংলায় নকশাল আন্দোলন ওই বাংলায় ২৫ মার্চের গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধ আর স্টেশনে স্টেশনে উদ্বাস্তুর দল, এইসব থেকেও কোনো কোনো কথা মাথায় ঢুকে পড়ে, অস্থির করে, লিখে রাখার চেষ্টা করি। লিখতে লিখতে অনেক সময়ই জিনিসটা আর আমার হাতে থাকে না। আরম্ভের সময় ধারণা ছিল না, শেষে এরকমটা হবে—এই বিস্ময়ের মুখোমুখি হয়ে পড়াটা চলতে থাকে। যেটা আমার পরিকল্পনা, বা জানাশোনার মধ্যে একটু আগেও ছিল না, সেরকম কিছু একটা এইমাত্র লিখে বসলাম, এই ধরনের হতবুদ্ধি অবস্থা হত। সত্যি বলতে কবিতা লেখার সময় আজীবনই এ ধরনের অবস্থার মধ্য দিয়ে চলেছি। প্রায়ই আমার কয়েক মিনিট আগেও না-ভাবা কোনো মোড় এসে দেখা দিয়েছে লেখার মধ্যে, আমি তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। বা, করতে বাধ্য হয়েছি।

অন্য কবিদের কবিতা রচনাকালে যেহেতু আমি উপস্থিত থাকিনি, ফলে ঠিক ঠিক কী

হয়, তা ভালো জানি না। কেউ কেউ, যারা তাদের কোনো একটি কবিতার রচনাকথা বা ক্রিয়েটিভ প্রসেস লিখেছেন, আতে অন্তত কিছুটা জানতে পেরেছি।

কবিতা লেখার সময় কারও সামনে বসে থাকলে, তাঁকে রচনায় ব্যস্ত দেখা যাবে, কিন্তু তাঁর মনের ভিতর দিকে কী কী ঘটছে তা তো আর দেখা যাবে না। ফলে কোনো কোনো কবি যদি সামনে কোনো পত্রিকা সম্পাদককে বসিয়েও কবিতা লিখে দেন, তাহলে, ওই বিশেষ কয়েক মিনিট বা আধ ঘণ্টার জন্য তিনি মনের গভীরতর স্তরটিতে অজান্তেই প্রবেশ করে যান—সে-মুহূর্তে তাঁর চারপাশের পৃথিবী যতই কোলাহলমুখর তাড়াহুড়োর মধ্যে থাকুক না কেন। নইলে কফিঘরে কী রেস্তোরাঁয় কিংবা সংবাদপত্র দপ্তরে অথবা ছাপাখানায় বসে প্রুফ সংশোধন সূত্রে লেখকরা লিখতে পারেন কীভাবে! পারেন, কারণ সেই বিশেষ মুহূর্তটিতে নিজেকে তাঁরা ডুবিয়ে দিতে পারেন। বাইরের পৃথিবী তাঁকে ছুঁতে পারে না কোথাও।

আমি নিজে অমনটা পারিনি কখনও। কফিঘর, রেস্তোরাঁ, সংবাদপত্র দপ্তর বা প্রেসে বসে কবিতা লেখার মতো মানসিক নিবিষ্টতা কখনও পাইনি। এটা বুঝেছি, সব মানুষের স্বভাব যেমন একরকম নয় সব লিখিয়েও একরকম হয় না। আমি এখনও একটা কবিতা লিখতে লিখতে, সপ্তম লাইনে এসে হঠাৎ পঞ্চম লাইনটির পরিবর্তন করি। নবম লাইনে এসে মনে হল ষষ্ঠ লাইনটিকেই বদলানো দরকার। যখন ১৩ নম্বর লাইনে রয়েছি, তখন জানি না কবিতাটি ১৭ লাইনে শেষ হবে না, ২৫ লাইনে। এই যে নিজের লেখার মধ্যপথে এসে, এত বয়সেও, বুঝতে পারি না লেখাটা কোন দিকে যাবে বা কতবার বদলাবে, জানতে পারি না তার উদ্দেশ্য বা গন্তব্য কী—এটা আমি মেনে নিয়েছি। এবং এ জন্যই, অন্যদের কীভাবে কবিতা লেখা উচিত, বা এখনকার কবিতার ভাষা কেমন হওয়া উচিত—এ-বিষয়ে কাউকে কিছু বলার কথা ভাবি না। নিজের মনের মধ্যে ঢুকেই আমি পথ দেখতে পাই না—কীভাবে তবে আমি অজানা অনেক মানুষের মনের মধ্যে ঢুকে বলব এইভাবে লেখা উচিত! রচনাকালে অপর লেখকের মন কীভাবে ক্রিয়া করছে, তা যেহেতু জানার কোনো অগ্রিম উপায় আমার নেই, তাই আমি এ-ব্যাপারে সবসময় চুপ করে থেকেছি। কারও একটি কবিতা পড়বার পর তবে আমি কিছুটা বুঝতে পারি, কবিতা-লেখকের মন কীভাবে কাজ করেছে এই কবিতাটির পিছনে।

গত চল্লিশ বছর ধরে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন জনের গদ্য রচনা পড়েছি, এখনকার কবিতার ভাষা কেমন হওয়া উচিত সে-বিষয়ে নির্দেশ বা পরামর্শ-সহ। মুখেও বলতে শুনেছি—'এখন লেখা কেমন হওয়া উচিত'। এখানে 'এখন'টা কখনও ছিল '৭৩ সাল, কখনও ছিল '১৬-'১৬, কখনও '১৬, কখনও '১৬, কখনও '১৬, কখন-বা ১৬ ২৫। সে-সব রচনা আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করেছি। এসব বিষয়ে তর্কবিতর্ক ও আলোচনা হলে, তা-ও পড়েছি। এ তো আজকের ব্যাপার নয়, চিরকালই কবিরা, এসব নিয়ে কথা বলেছেন। এতে কবিতা সমাজের আবহাওয়া বেশ প্রাণচঞ্চল থাকে। তবে আমার মনে হয়, একমনে

বসে যে একটা কবিতা লিখছে, অভিজ্ঞতা বুনছে, তাঁর সেই অভিজ্ঞতা প্রকাশের ভাষাটা তাঁকে খুঁজে নিতে দেওয়াই শ্রেয়।

তা ছাড়া কবিতার পাঠক যারা, তারা এগুলো দেখে কিছুটা পিছিয়ে আসেন, বা একটু নিরুৎসাহিত বোধ করেন। পাঠক কোনো কবিতা পড়লে সেই কবির মনটুকু ছুঁতে চান। আমিও, নিজস্ব স্বভাব অনুযায়ী, দেখতে চাই কী কী অভিজ্ঞতার কথা এই কবিতা বলছে।

কখনো-কখনো চেনা অভিজ্ঞতা খুঁজে পেয়ে মনে হয় ইনি আমার আত্মীয়, একই রোদ একই বৃষ্টি একই মাঠপ্রান্তর লোকালয় আমরা ভাগ করে বাস করছি যেন। আবার আমার অচেনা জিনিস দেখলে মনে হয় ইনি আমাকে একটি নতুন দেশে নিয়ে যাচ্ছেন, নতুন অভিজ্ঞতার কথা জেনে পূর্ণতর হচ্ছি।

যদিও অভিজ্ঞতা নতুন হওয়া মুশকিল, এ কথা স্বীকার করি। এমনই বেশির ভাগ সময়ে হয় যে, চেনা অভিজ্ঞতা এমন নতুন দৃষ্টিতে দেখা হল, এমন নতুনভাবে বলা হল যে আমার মনটাও কিছুক্ষণের জন্য নতুন হয়ে উঠল।

এইরকম, জানা অভিজ্ঞতা কীভাবে সম্পূর্ণ নতুন হয়ে উঠতে পারে তার একটি আশ্চর্য প্রমাণ আমার কাছে এই কবিতাটি :

স্তন

তোমার স্তনে হাত রাখলে মনে হয় যে একটা
        ছোট্ট পাখি চেপে ধরেছি মুঠোর ভিতর;
জোরে চেপে ধরলেই মরে যাবে—
আঙুলের ডগা বুলিয়ে বুলিয়ে আমি তোমার
        স্তনের পালকগুলো খাড়া করে তুলি।
স্তনের ঠোঁটের মুখে গুঁজে দিই মমতার ক্ষুদ এবং কুঁড়ো,
তখন খুশিতে ডাকতে শুরু করে তোমার স্তনদুটো—
ডানা ঝাপটে উড়ে বেড়ায় আমার মুখ, কপাল, বুক এবং ঘাড়ের ওপর।

এই কবিতাটি লিখেছেন শামসের আনোয়ার। 'স্তন' বিষয়টি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আছে। 'স্তন' শব্দটিতে নতুন শক্তি ভরে দিয়েছিলেন জীবনানন্দ। বাংলা ভাষায় অনেক কবির কবিতায় 'স্তন'-এর ব্যবহার আছে। সার্থক ও সুন্দর ব্যবহার। কিন্তু শান্ত এই কবিতাটিতে একটি অপ্রত্যাশিত বিভাব এসে দেখা দিয়েছে। তা হল স্নেহ। কাম-ই এর বিষয়, এবং এর ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়ার মধ্যে শারীরিক ঘনিষ্ঠতা যেহেতু বাড়ছে, তাই উন্মাদনা আসার কথা। কিন্তু সেই উন্মাদনা প্রকাশিত হচ্ছে স্নিগ্ধ শান্ত একটি স্নেহের মধ্য দিয়ে। 'জোরে চেপে ধরলেই মরে যাবে—' অভিব্যক্তিটির তো তুলনা নেই। এটি একটি পুরুষের লেখা, যে তার পৌরুষের প্রবলতা সম্পর্কে সচেতন এমনকি কোথাও অহংকারীও।

তবু, এই যে স্তনে আদর করা, এই বিষয়টি এখানে এমনভাবে প্রকাশ পাচ্ছে যেন, পুরুষটির মধ্যে একটি মা-পাখি রয়েছে, যে তার শিশুটির মুখে খাবারের ছোটো ছোটো দানা, খুদ কুঁড়ো ভরে দিচ্ছে। এর উলটোটা যদি প্রকাশ পেত, যা অনেক সময় পুরুষ আদরের সময় নারীর কাছে আশা করে ও পায়, তাহলে তত অবাক হওয়ার কিছু ছিল না। কবিতার শেষে বোঝা যায় আদর আরও ঘন হচ্ছে বা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কিন্তু, উন্মাদ-তোলপাড়ের পরিবর্তে এখানে প্রকাশিত হচ্ছে স্নেহসবুজ খুশি। পুরুষটির এই আদর করার মধ্যে ফুটে উঠছে প্রেমিকার প্রতি একটি গভীর মায়া। যে-মায়ায় বাৎসল্যও এসে পড়েছে অবধারিত ভাবে। নারীর স্বাভাবিক শারীরিক প্রতিক্রিয়াও এখানে বলা হয়েছে, কিন্তু তা খুঁজে পেয়েছে একেবারে নতুন এক্সপ্রেশন। 'আঙুলের ডগা বুলিয়ে বুলিয়ে আমি তোমার / স্তনের পালকগুলো খাড়া করে তুলি।' কামের সীমার ভেতর যখন কবিতা ঢুকে পড়ে তখন তা স্বাভাবিক ভাবেই শরীরপ্রধান হয়ে ওঠে। সেই শরীর-প্রাধান্যও চমৎকার কবিতা হয়ে উঠতে পারে, এমন অনেক সার্থক দৃষ্টান্ত আছে বাংলা কবিতায়। প্রেম থেকে শুরু হয়ে শরীরে পৌঁছোনোই তখন সেসব কবিতার গতিপ্রকৃতি। এমনকি শুধু শরীর-তাড়না বা তার উপভোগ থেকেও সুন্দর কবিতা জন্মেছে, এমন উদাহরণ তো আছেই।

এই কবিতাটি সারাক্ষণ শরীরের মধ্যেই ডুবে রয়েছে, অথচ শরীরকে কোথাও ছাপিয়েও উঠেছে। যে পড়ছে, তাকেও কোনো মায়ায় জড়িয়ে নিচ্ছে এ-লেখা, যা কেবলই শরীর-সংক্রান্ত উত্তেজনা নয়। তাকে অতিক্রম করে মানুষের অনুভূতির আরও নানা স্তর ধরতে পারছে। শারীরিকতার সময়ে মানুষের সমস্ত অস্তিত্ব প্রবলভাবে আলোড়িত হয়ে চলে বলে কাম-এর সঙ্গে স্নেহ, কখনও প্রতিহিংসা, কখনও রাগ, এসব এসে মিশে যায়। ঠিক কবিতা লেখার সময় যেটা ঘটে। এখানে কবিতাটি স্নেহের স্তরটিকে বিস্তার দিয়েছে।

ষাট দশকের এই কবি, শামসের আনোয়ার, অকালে আমাদের ছেড়ে গিয়েছেন, আজ থেকে পনেরো বছর আগে। এই কবির সঙ্গে আমার কখনও দেখা হয়নি 'শামসের আনোয়ারের 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' বইটির ভূমিকায়, তাঁর বন্ধু, ভাস্কর চক্রবর্তী, জানিয়েছেন, 'নতুন শতাব্দীর যাঁরা তরুণ কবি, তাঁরা হয়তো অনেকেই জানেন না, 'কৃত্তিবাস' যখন খ্যাতির চূড়ায়, সেই সময়ে প্রথম কৃত্তিবাস পুরস্কার পেয়েছিল শামসের আনোয়ার। আমাদের সেই তুমুল হইচই এখন প্রায় স্মৃতি।'

ভাস্করও চলে গিয়েছেন, কিছুদিন আগে। শামসের সম্পর্কে ভাস্করের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ অসাধারণ ভূমিকাটি থেকে আরও কয়েক লাইন জানাই পাঠককে, তার মধ্য দিয়ে শামসেরকে আরও একটু জানা যাবে—'শামসেরের সঙ্গে বন্ধুত্বটাই ছিলো একটা বাঘের সঙ্গে বন্ধুত্বের মতো। এতটাই উদ্দামতা, সজীবতা, দুঃসাহসিকতা ছিল শামসেরের—এতটাই আক্রমণাত্মক, বিষণ্ণ আর ক্ষুদ্র—এতটাই আন্তরিক ছিল শামসের—এতটাই আন্তরিক যে, প্রকৃত শামসেরকে খুঁজে পাওয়াই ছিল মুশকিল।

খুঁজে অবশ্য ঠিকই পাওয়া যায় শামসেরকে, তার কবিতায়।'

আমরাও যাঁরা তাঁকে দেখিনি, তাঁর কবিতাতেই খুঁজে পাই তাঁকে। যেমন একটি কবিতায় তিনি লিখেছিলেন, লণ্ঠনের পাশে জ্বলে রয়েছে তোমার মুখ যেন অপর একটি লণ্ঠন। সেভাবেই তাঁর কবিতাও আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। তাঁর আর একটি কবিতা দিয়ে আজকের গোঁসাইবাগান শেষ করি।

পৌরাণিক

আজ আমি খুরপি নিয়ে শুয়েছি
কোপাবো নিজেকে
মাটিতে গড়াবে শামশেরের বীজ...
জন্মাবে আরও অনেক হাজার শামশের
যে শামশেরের জিভ লম্বা হয়ে ঠেকেছে
পায়ের কাছে
ঘাড়ে উষ্ণ জলপ্রবাহ
আর যার চোখের পাতা রক্তের সমুদ্রে ভিজে আছে
কপাল থেকে যার আছাড় খেয়ে পড়ে বৃদ্ধ অশথ গাছ
যার শরীরে শ্যাওলা আছে, দাম আছে
মাংসের শক্ত গিঁটে ভরে গেছে যার পিঠ
যে অনেক আগেই খেয়ে ফেলেছে হীরার সফল ছক্কা
আকাশে তারাগুলি ক্লিপের মতো বিঁধে থাকে যার মাংসপেশীতে
যে এপাশ ফিরলে স্মৃতি শুকনো পাটকাঠি
মড় মড় করে ভেঙে যায়
ওপাশ ফিরলে নষ্ট সুযোগ বিরাট ধারালো কাঁটা
বিঁধে থাকে...
জন্মাবে, সেই পৌরাণিক কষ্ট-বিদ্ধ শামশের আরো
হাজার শামশের হয়ে জন্মাবে
বিষ-ফুলের লতা জড়ানো থাকবে তাদের গায়ে
রোজ সকালে লতার শরীর ছিঁড়ে গজাবে ফুল
অদ্ভুত ফুল, দস্তুর কুকুরের মতো ওরা ডাকবে—
হাজার হাজার নতুন শামশেরকে।
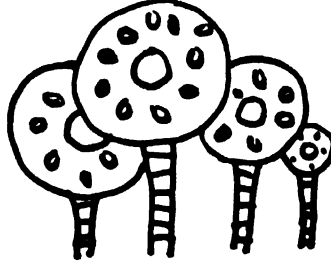
১৮

কখন যে কোন কবিতা আমাকে অবাক করে, তার ঠিক পাই না। হয়তো প্রধান কবি নন, একটা-দুটো বই লিখেই লুকিয়ে পড়েছেন, এমন কবিরাও যে হঠাৎ কোথা থেকে এসে আশ্চর্য করে দেন, তা কে জানে। গত কয়েকদিন হল কাঁধের ঝোলায় একটি পাতলা বই নিয়ে ঘুরছি, পাতা ওলটাচ্ছি। তার কয়েক পৃষ্ঠা আপনাদেরও দেখাই।

একটি মৃত্যুদৃশ্য

ওঃ সেই কখন থেকে নাড়ি টিপে বসে আছি
এখনও ভীতু ধুকপুক!
এতবার বাইপাস করলে তুমি
এত ছুরি কাঁচি গ্‌জাল চালালে

আগে থাকতেই ফ্রিজে এতগুলো যুবকের
টাটকা কলজে ঢুকিয়ে রেখেছি
একবার প্রাণপাখিটা ফুড়ত্‌ হলেই
ওদের কারওর একটার মধ্যে আবার ঢুকিয়ে দেবো

শিয়রে গঙ্গাজলও রেডি
তবু তোমার প্রতি প্রেমটা মরতে—

বেহায়া!

এত সময় নিতে হয়।

প্রেমের কবিতা। কিন্তু একেবারে নতুন ধরনের এক্সপ্রেশন। সারাক্ষণ নিজেকে ঠাট্টা করে চলা। নিজের অসহায় অবস্থাটিকে ধিক্কার দেওয়া। কিন্তু পুরো জিনিসটাই এমন মজা করে বলা যে, আমরা যেন উপভোগ করতে থাকি। যেন যন্ত্রণাটা দেখতে না পাই। যন্ত্রণাকে ঢাকা দেওয়াটাই যেন এক্ষেত্রে লেখার কারণ। হ্যাঁ, যন্ত্রণা তো আছেই। এই কবিতাটিতে দেখা যাক যন্ত্রণার একটি কারণকে।

ভয়ের কবিতা

আমার চোখের তারায় সেই বাঘিনির ওঁত পেতে থাকা
দেখে ফেলার পর থেকেই
তুমি ভয়ে আর আমার চোখে
চোখ ফেল না

পাছে সেই উপোসি বাঘিনি
ঝাঁপিয়ে পড়ে তোমার ঘরে
আগুন দেয় তোমার চালে
স্ত্রী-পুত্র নিয়ে পালাতে ভুলে যাও তুমি

পাছে ঘুম ভাঙে তোমারও উপোসি বাঘের—

যাকে ভালোবাসি, সে অন্যের। এই কথা জানার পরেও যে-ভালোবাসা যেতে চায় না, তাকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি রাগ হয় নিজের ওপর। তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া দরকার। কার হাত থেকে? সেই মানুষটির হাত থেকে? না। সে তো স্বেচ্ছায় দূরে চলেই গেছে। কিন্তু তার সম্পর্কে দুর্মর টান কিছুতেই যেতে চাইছে না। নিম্নলিখিত ইতিহাস সত্ত্বেও।

ট্রেকিং

মানুষ তো মাঝে মাঝে সিংহ হয়ে উঠতে চায়
জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য বলতে চায় যাত্রার ঢঙে
মানুষ তো মাঝে মাঝে ট্রেকিং-এ যায় নন্দাঘুণ্টি কিন্নর

তেমনি এসেছিলে তুমি
আমার বেপরোয়া বেহিসেবী উড়নচণ্ডী পাহাড় চূড়ে
আবার তাঁবু গুটিয়ে কখন ফিরেও গেছ

ঘরে
সমতলে
নিরামিষ মাছের ঝোল ইসবগুল আর বউ-এর কোলে

বেহিসেবের প্যারা গ্লাইডিং
ভয়ে ভয়ে দু-একটা দিন
(গুরুপাকে চশমামার্কা অম্লজীন সহযোগে)

লোকে যেমন ট্রেকিং-এ যায় কয়েকদিনের জন্য, এই প্রেম হয়তো, অন্যপক্ষের কাছে, তেমনই কয়েকদিনের জন্য একটা ছুটি কাটানোর বেশি ছিল না। একটু অ্যাডভেঞ্চারাস ছুটি কাটানো। তারপরে সে নিজের স্বাভাবিক ও নির্দিষ্ট আশ্রয়ে ফিরে গেছে। নারী-হৃদয় বুঝতে পারছে, এবং হয়তো, অন্যরাও তাকে বলছে, ভুল করেছ। ভুল করেছিলে। ভুল, ভুল, ভুল। আর সেই সূত্রেই এসে পড়ছে এই ভুলের কবিতা।

আঃ ভুল!

উন্মত্ত মুদ্রায় নাচতে নাচতে এগিয়ে আসছে ভুল
ধ্বস নামছে রক্তে
ও...ই ছাদের কার্নিশ পেরিয়ে ওলট-পালট উড়ে যাচ্ছে
ঠোঙায় মোড়া চাকরি, শালপাতায় পাপবোধ, পলিব্যাগে শালীনতার সংজ্ঞা

আঃ ভুল আসছে।

চিবুকের-সুঠাম হাড়, কামানো ঘাড়, হাত পায়ের অনায়াস মুদ্রা থেকে
কুলু কুলু স্রোত আমায় ঘিরছে
ভাষা জানি না ভুলের

ভুলের চোখে চোখ পায়ে পা মিলিয়ে কি উদ্দাম নাচছি!

উড়ে যাচ্ছে সব মৃত রাত।

এই ভুল, যাকে ভুল বলে চিহ্ন দেয় সমাজ, পাশাপাশি, নিজে যখন নিজের মুখোমুখি হও, তখনও স্বীকার করো যে ভুল জায়গাতেই ছুড়ে দিয়েছ তোমার মন, জগতে কেউই তখন পাশে থাকে না, এমনকি নিজের পাশে নিজেকেও দেখা যায় না—তখন মনে পড়ে, কী হয়েছিল। কী হয়।

রিলিফ ক্যাম্পে

অতর্কিতে একদিন তিনি ডাক দিলেন

এই জন্য এতদিন বেঁচেছিলাম?
অন্ধরাত্তিরে তোমার স্বর শুনে
সমস্ত ওভাম ককিয়ে কেঁদে হাত বাড়িয়ে দেবে বলে?

অন্ধকার দেহের এত মণিমাণিক্য ঝালর দেখব
পথের প্রান্তে পরমেশ্বরের সঙ্গে দেখা হবে
তিনি স্মিত হেসে মাংসগন্ধ বুকে তুলে নেবেন

তাই এতদিন এমন না খেয়ে শুকিয়ে মরেছিলাম?

এ ছাড়া তো সেই

আবার কবে ত্রাণ আসবে   হাপিত্যেশ ডোরবেলে কান পাতা

যদিও ভুখা দেবীরা জানে

পরমেশ্বর ব্যস্ত দেবতা।

এই যে সে আসে, যে অপ্রাপণীয়, এবং যে অবধারিত ভাবে চলে যায়, তারপরের ধিকিধিকি জ্বলে যাওয়া শূন্যতা ভরাবার জন্য নানা ভাবে জীবন নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চায়। প্রতিশোধ নিতে চায় নিজের ওপর। আর তারপর, একমাত্র বা প্রধান প্রেমকে আবারও স্বীকার করে। কিন্তু তার মধ্যেও না-পাওয়ার অপমান ও বঞ্চনার কালো মিশে থাকে।

সেলামি

তোমাকে ভালোবাসতে বাসতে
দু'মিনিট চোখ বুঁজে ঝিমিয়ে নিয়েছিল
প্রেম

ওই সব অন্য অন্য ভুল যুবকেরা
আসলে সেই তন্দ্রার ঘোর।

চটকা ভাঙতেই উঠে বসেছে প্রেম

তোমার সামনে এভাবে জীবনব্যাপী সেলাম হয়ে
ঝুঁকে থাকতে যে ও কত ভালোবাসে

তা তো তুমি জানো!

এই ক্ষোভ থেকে এসে পৌঁছোয়, প্রেমের সঙ্গে একেবারে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক যার, সেই ঈর্ষা। এসে পড়ে এক ধরনের হিংস্রতা।

ঠান্ডা মিষ্টি আরক প্রস্তুত প্রণালী

রূপকথার রানিরা কেউ পুরুষ পেত না পর্যাপ্ত
বড়ো মেজো সেজো পাট সুয়ো দুয়ো মিলে
সাকুল্যে এক রাজা নিয়ে বুক চাপড়ে
নিত্য চুলোচুলি—

ফিশফাশ ষড়যন্ত্র আড়ি পাতা বিষের পুরিয়া

আমারও ঠিক অমনি হয় জানো
তুমি যখন অন্য অন্য মেয়ের দিকে ফেরো
ঝাঁঝালো টক অম্বলে জ্বলে বুক গলা পেট
দু' কষ বেয়ে ফেনা ঝরে
হিক্কা ওঠে
সুতোর ডগায় দুলতে থাকে প্রেমাতুর প্রাণ

তোমার খোলা ছাড়িয়ে টুকরো করে
মিক্সিতে ফেলে ঘূর্ণি তুলি
থকথকে ক্বাথে চিনি, জল ও সুরভি দিলেই
ঠান্ডা মিষ্টি ঠান্ডা আরক
ঈর্ষাতুর গলা এবং বুক পেরিয়ে নিশ্চিন্তে পেটে

রূপকথার সেই গল্পটার কোনো রিপ্রিন্ট না বেরোয় আবার!

কিন্তু এই হিংস্রতাও আসলে একপ্রকার অসহায়তাই। মন উপায়হীন জ্বালায় ছটফট

করতে করতে কখনও বা এমন হিংস্রতায় পৌঁছোয়। আবার তা শান্ত হয়েও আসে। তখন ঘুরে দেখতে ইচ্ছে হয় নিজেকে। তখন মনে আসে :

বাঁশি

এরকম ভয়াবহ সৎ জীবন আমারও হতে পারত
সকালের রান্নাঘরে হাঁড়িতে বুড়বুড়ি কাটা ভাত
ছেলে ও স্বামীর টিফিন বাক্স
শাশুড়ির চা ও স্মৃতিরোমন্থন

ছেলের স্কুলের পড়া
এবং রাত্তিরের রুটি
ঘুমের আগে রোমাঞ্চহীন
নিয়মমাফিক—

এরকম আদ্যন্ত সতীজীবন আমারও হতে পারত
যদি না তুমি এসে চতুর কানাই
রোজ নতুন নতুন রঙের আগুন বাজাতে
বাঁশিতে।

এই কবিতায় 'ভয়াবহ সৎ' কথাটি জীবনানন্দ দাশের একটি কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে। যদিও পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, জীবনানন্দের কবিতার সঙ্গে কোনোরকম সাদৃশ্যই নেই এই কবির লেখার। জীবনানন্দের লাইনটি হল 'তার ভালোবাসা পেয়ে ভয়াবহভাবে সৎ হয়ে আছি—ভাবি।' যদিও এই কবিতাগুলো, 'তার ভালোবাসা' না পাওয়ার উল্লেখে উল্লেখে জ্বলন্ত, সারাক্ষণ।

যে-বইটি থেকে এই কবিতাগুলো তুলে দিচ্ছি, তার নাম হল 'বাঘিনীর ছেলে দেখা।' লেখক, অঞ্জনা চক্রবর্তী, এখানে সরাসরি কথা বলেছেন। এই ধরনের আক্রমণাত্মক ও ক্রুদ্ধ প্রেমের কবিতা বিরল। 'রিলিফ ক্যাম্পে' কবিতাটিতে 'ওভাম' শব্দটির ব্যবহার তুলনাহীন। পুরো বইটিতেই নানারকম ইংরেজি শব্দের ব্যবহার আছে। আছে হিন্দি শব্দের ব্যবহারও। 'বাঘিনী' শীর্ষক কবিতা আছে কয়েকটি। যেমন 'বাঘিনীর জন্য সভ্য মেনু'। এ বইয়ের কবিতার অনেকগুলো নাম বেশ অদ্ভুত কিন্তু আঘাতকারী। 'উইলস মেড ফর ইচ আদার কনটেস্ট জিততে হলে', 'অ্যাকশন থ্রিলার', 'কসমেটিক সার্জারি', 'বিধিসম্মত সতর্কীকরণ', 'জানেমন তারকাকে নোবেল প্রস্তাব', 'মেয়ে দেখা সংক্রান্ত প্রাক্-প্রস্তুতি'।

বিবাহযোগ্যা কন্যাকে পাত্রপক্ষের সামনে বসানোর যে-প্রথা চালু আছে, তাকে আঘাত

করেও 'বাঘিনীর ছেলে দেখা' নামটির আরেকটি তাৎপর্য পাওয়া যায়। এই বইয়ের কবিতাগুলো কোনো কোনো পাঠকের কাছে স্টান্টধর্মী মনে হতে পারে। কিন্তু কবিতা তো নানা ধরনের হয়। বেঁচে থাকার মাঝখানে বড়ো বড়ো ঝাঁকুনি আসে, প্রায়ই। কোনো কোনো লেখক সেই ঝাঁকুনির চলনকে ধরে দিতে চান। সেই ঝাঁকুনির মধ্য দিয়েই তখন অভিজ্ঞতাকে দেখতে পাওয়া যায়। তা ছাড়া, একটি বড়ো আঘাতের যন্ত্রণা এর অন্তঃস্থলে কাজ করছে এ-কথাটি যখনই বইটি পড়তে-পড়তে উপলব্ধি করা যায়, এই বইয়ের লেখকের কবিত্বশক্তি সম্পর্কে সংশয় থাকে না।

আমার অন্তত নেই। এই কবি সাধারণ্যে একেবারেই পরিচিতা নন। কবিতার পত্রিকাগুলো খুঁজলেও এর লেখা খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। এ ছাড়া বইটিতে ছন্দে লেখা কবিতা প্রায় নেই বললেই হয়। সরাসরি গদ্যে লেখা বইটি। যে-সম্পর্কের কোনো সামাজিক পরিণতি সম্ভব হয় না, তেমন কোনো সম্পর্কের আগুন ও বিষ এই বইটি বহন করছে। কিন্তু বিষ, আগুনের দাহ-ই এর শেষ কথা নয়, কারণ এর অন্তঃস্থলে আছে তীব্র এক প্রেমার্তি। আরেকটি কথাও পাঠকদের জানিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে আমার। বইটির উৎসর্গপত্রে-তে লেখা আছে :

পাগলকে—যাকে বিয়ে করেছি।

এই বইটি প্রকাশিত হয়েছে প্রায় বছর পাঁচেক আগে। আগেই বলেছি, এই অঞ্জনা চক্রবর্তীর কবিতা পত্রপত্রিকায় প্রায় দেখি না? হঠাৎই সেদিন কবিকল্প নামে এক পত্রিকায় চোখে পড়ল অঞ্জনার কবিতা। কবিতাটি পড়ে, তাঁর ইদানীং না-লেখার কারণ হয়তো কিছু অনুমান করা যায়।

হনিমুন

বিয়ের পর থেকে এমন হল আমার

সেই যে আমরা শিরীষ পলাশ আর
কি একটা হলুদ ফুলের বনে বেড়াতে গেলাম

তুমি যেই আমাকে ছুঁলে
আমার কপাল গাল বুক
দু'হাত দু'পা থোকা থোকা লাল কমলা ফুল

আমার সারা শরীর সদ্য ফোটা ভোর

তারা চোখ রাঙিয়ে রাত আসতে দিল না

চারদিকে অদ্ভুত আলো হয়ে রইল

রাত এল না, অন্ধকারও না মন খারাপও না

বিয়ের পর থেকে এমন হল আমার
যে লেখা টেখা সব বন্ধ হয়ে গেল

ওসব অন্ধকারটার একটুও না থাকলে
কি লেখা যায়
বলো?

এই বইয়ের কবিতাগুলো পড়ে অন্য একটি কথাও মনে হল। কবিতা রচনার প্রস্তুতি হিসেবে, নবীন বয়সে, আমাদের লেখার নানা প্রকরণ শিক্ষা করতে হয়। যাতে বিভিন্ন অবস্থায়, মনের মধ্যে জেগে-ওঠা ভিন্ন ভিন্ন কথা, ঠিক মতো বলতে পারি। তারই জন্য প্রয়োজন প্রকরণের উপর দখল থাকা। দেখা যায়, শেষে এমন হয়, নানা করণ-কৌশলের প্রয়োগের দিকেই মন চলে যায়, মনের কথাটি কোথায় গেল, তাই খুঁজতে বয়স বাড়তে থাকে। মনকে যিনি সোজাসুজি কবিতায় উন্মুক্ত করতে পারেন, তাঁর বয়স যতই কম হোক না কেন, বা যতই কম পরিচিতি থাকুক তাঁর, তিনি কোথাও আমার শিক্ষাস্থল।
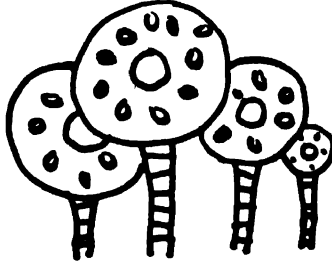
১৯

কবিতার লাইন কখনো-কখনো প্রবাদবাক্যে রূপান্তরিত হয়, এ কথা আমরা সকলেই জানি। যেমন 'ফুল ফুটুক না ফুটুক, আজ বসন্ত'। যেমন 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে'। যেমন 'অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে'। যেমন, 'যেতে পারি, কিন্তু কেন যাবো?', অথবা 'কেউ কথা রাখেনি'। এমন অনেকই বলা যায়। তবে, প্রবাদে রূপান্তরিত হওয়া কবিতার লাইনকে নতুন দৃষ্টিতে দেখে, তার ওপর আলো ফেলে, তা থেকে আবার নতুন মৌলিক কবিতা রচনার একটি দৃষ্টান্ত খুঁজে পেয়ে বিস্ময় মানলাম। কোনো কবিতার পঙ্‌ক্তি প্রবাদে পরিণত হতে গেলে, স্বাভাবিক ভাবেই, অনেকটা সময় পার হয়ে আসতে হয়। নইলে তা প্রবাদ হবে কী করে? ব্যক্তিজীবন ও সমাজের নানা বিচিত্র মুহূর্তে বারবার লাইনটির কথা মনে হতে থাকবে, কোনো কোনো ঘটনা বা অভিজ্ঞতার পর মনে পড়বে, আরে অমুক কবিতাটি তো এই কথা আগেই বলে দিয়েছিল—এইরকম মনে পড়া পুনঃপুনঃ ঘটতে থাকলে, তবে একদিন সেই লাইন প্রবাদে পরিণত হয়ে যাবে, সকলের অজান্তেই। আমি এক্ষুনি যে লাইনগুলো উল্লেখ করলাম, তার মধ্যে শঙ্খ ঘোষের লাইনটিই সবচেয়ে কমবয়সি। মাত্র পঁচিশ বছর বয়স তার। তবু, পঁচিশ বছরও খুব অল্প সময় নয়।

যাঁরা নিজেরা কাব্যের চর্চা করেন, তাঁদের নিজেদের মধ্যেও মুখে-মুখে ঘোরে কিছু লাইন, যা তাঁদের কাছে একরকম প্রবাদের মর্যাদা পায়। যেমন অলোকরঞ্জনের 'কে যেন বলল ট্রামে উঠবার আগে / এবার কিন্তু আঙ্গিক বদলান'। যেমন রণজিৎ দাশের, 'তাদেরকে দিও তুমি ছন্দজ্ঞান, লজেন্স দিও না'। আলোক সরকারের 'অসম্ভব সরোবর / চারিদিকে স্ফুরিত বিশ্রামে জাগে'। বীতশোক ভট্টাচার্যের 'সঙ্গীত কেবল ছিল কল্পনায়, আমি শুধু চর্মচোখে প্রস্বর শুনেছি।' তুষার চৌধুরীর 'লালা নিঃসরণ হলে কুকুর কি ঘণ্টাধ্বনি খাবে?' তুষারের এই লাইনটি পাভলভের সেই বিখ্যাত পরীক্ষাটিকে ভেতরে রেখেছে, তেমনই বীতশোকের লাইনটিও বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান ধরেই চলছে, সাপ তো শুনতে পায় না, এখানে

'চর্মচোখে' কথাটি এসে আমাদের চোখ আর কানের চমৎকার পালটাপালটি একটা সংস্থাপন দেখাচ্ছে। এগুলো খুবই বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহার। রণজিৎ এবং অলোকরঞ্জনের কবিতা পঙ্‌ক্তিগুলো প্রধানত কবিতা রচনাকে কেন্দ্র করেই লেখা, রণজিৎ-এর কবিতাটির নামই তো 'আমাদের লাজুক কবিতা'—সুতরাং যাঁরা নিজেরা কাব্যরচনায় ব্যাপৃত আছেন, তাঁদের এসব লাইন আত্মীয় হয়ে উঠবে তা স্বাভাবিক। আলোক সরকারের কবিতাটিরও সূচনার বাক্যটি হল 'উচ্চারণ সাধ্য নয় সব কিছু।' অর্থাৎ কোনো একভাবে তা কাব্য রচয়িতাকে সাবধান করছে। অন্তত আলোক সরকারের ক্ষেত্রে, এ-রচনা মূলত নিজেকেই বলা। অন্যকে কিছু শেখানোর চেষ্টা নয়। বিষ্ণু দে বলেছিলেন, কবিতা রচনা আসলে আত্মসচেতনতারই এক অভ্যাস, সে-কথাও এখানে আমরা মনে করতে পারি। কিন্তু 'ছন্দজ্ঞান' বা 'আঙ্গিক' বদলানো বা 'শব্দের ভিতরে এক রাত্রি আছে। যে কোনও শব্দের / ভিতরে গহন এক নিশীথিনী জাগ্রত নীরব'—এসব কথা তো কবিতা রচনা সম্পর্কিত কথাই। কবির জীবনে তো কবিতা রচনাক্রিয়া একটি মস্ত বড়ো অভিজ্ঞতা। সে অভিজ্ঞতার কথা তো তিনি কবিতাতেই লিখবেন, যেখানে তিনি তাঁর সব অভিজ্ঞতার কথা লেখেন! আর সে সব কথা যে অন্য অন্য কবিতা লেখকেরও মনের কথা হয়ে উঠবে, এ-ই তো স্বাভাবিক। আর তাই হয়েওছে। আমি এখন যে কবিতাটির কথা বলতে চাইছি, সে কবিতা পুরোনো একটি প্রবাদকে আত্মস্থ করে তাকে অন্য আলোয় দেখেছে।

অন্দর

কানাগলি। মধ্য দুপুরের রোদে
জন্মান্ধ সে কোন
কাগজকুড়নেওয়ালা হাঁটে।
কাগজের পরিবর্তে
যদি সে কখনও পায় একতাড়া নোট,
তাকেও কি, বাতিল কাগজ ভেবে, বেচে
অর্থ আনতে যাবে?

এই কবিতাটি পড়লে প্রথমেই মনে হয়, কী করে এমন আশ্চর্য একটি চিন্তা করলেন লেখক? আর এত সহজ এক সারল্যের সঙ্গে কবিতাটি লেখা, যেন মনে হয়, দ্যাখো, চিন্তাটুকু মাত্র উপস্থিত করেছি আমি, এর বেশি কিছু নয়। মনের ভিতরটা জলের মতো স্বচ্ছ হয়ে থাকলে, হয়তো এমন নিরাভরণ অবস্থায় কবিতাকে আনা যায়।

যদিও কবিতাটির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে এর অন্যান্য ঐশ্বর্যও চোখে পড়ে। এই কবিতাটির অন্তরালে রয়েছে একটি প্রবাদ, কবিতা থেকে আসা প্রবাদ, 'খ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশপাথর।' লেখক যে সচেতন ভাবে এর ব্যবহার করতে চেয়েছেন তা না-ও হতে

পারে, বরং তা না হওয়াই স্বাভাবিক। সচেতন ভাবে অন্য কবিতা, শ্রুতকীর্তি কবির রচনা, ব্যবহারের একটি খুবই পরিচিত দৃষ্টান্ত যেমন এইখানে :

নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা
সোনার কবরী খসা
অগণন ভিড়াক্রান্ত এ শহরে, হে শহর স্বপ্নভারাতুর
লেক আর খালপার, এসপ্ল্যানেড, আর চিৎপুর।

হ্যাঁ বিষ্ণু দে। তাঁর বিখ্যাত 'জন্মাষ্টমী' কবিতায় যে রবীন্দ্রপঙ্ক্তির প্রয়োগ তা অত্যন্ত সচেতন ভাবেই, যাকে বলে একটা কন্ট্রাস্ট তৈরির জন্যই করা এবং এইরকম অজস্র প্রয়োগ বিষ্ণু দে-র সারাজীবনের কবিতায় তাঁর অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হয়ে আছে।

কিন্তু আমি যে-কবিতাটির কথা বলছি এখন, তার মধ্যে খ্যাপার খুঁজে ফেরা মিশে আছে। সচেতন ভাবে নয়। কন্ট্রাস্ট তৈরি করার জন্য তো নয়ই। ছোটো থেকে লেখকের অবচেতনে খ্যাপার পরশপাথর খোঁজার এই গল্প মিশে ছিল। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা অনুযায়ী বলা যায়, 'যেমন জলের মধ্যে মিশে থাকে জলরঙ আলো'। তারপর, অন্যদিক থেকে, তা কবিতায় বেরিয়ে এসেছে। কবিতা থেকে তৈরি প্রবাদের ওপর ভর করে নতুন কবিতার সৃষ্টি।

তফাত তো আছেই। খ্যাপা জানত, খুঁজলে এর মধ্যে পরশপাথর মিলতে পারে। কাগজকুড় নেওয়ালা জানে না। তা ছাড়া সে 'জন্মান্ধ'। এইখানে এক নিমেষে টাইরেসিয়স এসে আমাদের ছুঁয়ে যায়। আর ওই একাকী কাগজকুড় নেওয়ালা আরও বড়ো, ট্র্যাজিক হয়ে ওঠে। এক হিসেবে এ-লেখাও কবিতার কথা। কবিও কি জন্মান্ধ নয়? রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের শেষ তিনটি কবিতা মুখে-মুখে বলবার সময়ও কি একাধিক বার (অন্তত তিনটি ক্ষেত্রে) শব্দ বদল করেননি? তাঁর সারাজীবনের কবিতাগানের পাণ্ডুলিপিমালা কি বারংবার কাটাকুটিতে ছিন্নভিন্ন নয়? জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতায় একপাতা ছাপা পাণ্ডুলিপিচিত্রই বা কী বলে? অথচ শতাব্দী-শতাব্দী ধরে কবিকে তো দ্রষ্টা বলে আসছে পৃথিবী। জন্মান্ধ টাইরেসিয়স, তিনিও তো দ্রষ্টাই ছিলেন। দৈবজ্ঞ টাইরেসিয়স? যিনি ভবিষ্যৎকে দেখতে পেতেন? হ্যাঁ, দেখতে পেতেন। পাখির ভাষা বুঝতে পারতেন। দৈববাণী শুনতে পেতেন। কিন্তু নিজের হাঁটার পথ দেখতে পেতেন না। এক বালক তাঁকে হাত ধরে নিয়ে যেত।

কবিও দ্রষ্টা, তাঁর লেখার মধ্যে। কিন্তু যখন লিখছেন, তখন তিনি জন্মান্ধ, শব্দ খুঁজে-খুঁজে-খুঁজে হাতড়ে-হাতড়ে ফিরছেন। উপযুক্ত ভাষা, শব্দ যেন সারা জীবনেও পাচ্ছেন না। খ্যাপা খুঁজে ফেরে যেরকম।

আবার, যে-সংসারে আমরা বাঁচি, যে-বিষয়সম্পদ সংগ্রহ করার জন্য হানটান করি আজীবন, অর্থকড়ির জন্য উদয়াস্ত দৌড়োই, সেই বিষয়সম্পদঅর্থনামযশ একদিন হয়তো আসে—কিন্তু দেখা যায় মহামূল্য জীবনের প্রহরগুলোকেই কবে যেন বিক্রি করে দিয়ে

এসেছি, ফাউস্ট যেভাবে তার আত্মা বিক্রি করেছিল মেফিস্টোফিলিসের কাছে। মনে রাখতে হবে, এই কবিতার নাম 'অন্দর'। এ-কবিতা শিল্পীমানুষের ভেতরের ট্র্যাজেডির কথা বলছে।

মহৎ বিষয়কে সন্তর্পণে ছুঁয়ে, আয়োজনহীন ভাবে যিনি এ কবিতা লিখেছেন, তাঁর নাম অমিতাভ দেব চৌধুরী। বাংলা কবিতার জগতে মোটেই খুব পরিচিত নাম নন। তাঁর কবিতায় তিনি নতুন ও অবাক করা বিষয় নিয়ে আসেন।

প্রেমকাহিনি

দুইটি বালক বসেছিল পার্কে দুপুরবেলাতে।
নৈঃশব্দ্য চিবিয়ে খায় হিরোহোন্ডা—গাড়লের কাশি—
ট্যাক্সির ঝাপটা। আর ক্রমে রোদ হয়ে আসে বাসি
শেষে, সূর্য অস্ত গেল দুজনের মাঝখানটিতে!

ছায়ারা ছড়িয়ে পড়ে ঘাসেদের প্রতি রোমকূপে
দুজনের মাঝখানে শূন্যতায় ছিল যে পাথর
তা হঠাৎ ফাটে ঝরনা হয়ে। ওই হ্লাদিনীর স্বর
বালক দুজনে শোনে, শিউরে ওঠে, ভয়ে ভয়ে কাঁপে।

সে কাঁপনে খুলে যায় রাতের ভেতরে আরো রাত
দুইজন নড়েচড়ে সহসা যুবক হয়ে যায়।
ঝরনা—সে তো পাথরের আমিষ-হৃদয়! জ্যোৎস্নায়
দুটি ছায়া খুব ঘন। হেডলাইট কখনও করাত।

দুজনে ফিরল ঘরে গোপনে গুটিয়ে রেখে মাস্তান আস্তিন
সারারাত পার্কে ভিজল দুজনের শৈশবের শেষতম দিন।

এই যে বালক দুটির কথা কবিতাটি বলছে, পাঠক নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, এরা কিছুটা বালক, কিছুটা কিশোর। যে-অভিজ্ঞতার কথা, এখানে রয়েছে তেমন অভিজ্ঞতা অনেকেরই জানা। কিন্তু কবিতায় কখনও লিখিত হতে দেখা যায় না। নারীরা তখনও এদের জীবনে আসেনি, বা আসার সময় হয়নি। কিন্তু কামনা জেগে উঠবার বয়স এসেছে তার অমোঘতা নিয়ে। সেই কামনা তার পথ খুঁজছে। তার অবধারিত চাপে, প্রয়োজনীয় নির্জনতা পেয়ে, তারা ওই যে 'সহসা যুবক হয়ে যায়' তারই মধ্যে সেই নিষিদ্ধ জগতে প্রবেশের স্বাদ রয়ে গেছে। নারীহীনতায় অথবা আকস্মিকতায় কিংবা হঠাৎ সমকামের জাগরণে, পরস্পরকে

আশ্রয় করেছে তারা। 'জ্যোৎস্নায় / দুটি ছায়া খুব ঘন। হেডলাইট কখনও করাত।' যেহেতু পার্কে বসেছে, রাস্তা থেকে চলন্ত গাড়ির হেডলাইট এসে পড়ছে গায়ে। অনুমান করা যায়, ছিটকে সরে যেতে হচ্ছে দুজনকে।

এই ছিটকে সরে যাওয়ার কথাটি কিন্তু কবিতায় নেই। যেহেতু 'হেডলাইট কখনও করাত', তাই এই ছবি মনে আসছে আমার। করাত কী করে? বিভক্ত করে। হেডলাইট এক্ষেত্রে সেটাই করছে। ছিটকে সরে যাওয়া, অন্তত সরে যাওয়া, এই লেখক না-লিখলেও আমার মনে আসছে কেন? কেন-না, অন্য এক ছিটকে-সরে-যাওয়া আমার পাঠ-স্মৃতিতে আসছে।

...মধ্য রাতে, ঘুমন্ত শহরে / সবাইকে চমকে দিয়ে ফিরে যেতে যেতে আমি / দেখতে পাই / সারি সারি / বাতিস্তম্ভ দাঁড়িয়ে রয়েছে কিন্তু পৌর ধর্মঘটের কারণে / তাতে আলো নেই / রাস্তার দু'ধারে ছিটকে সরে যাচ্ছে আলিঙ্গনে বদ্ধ নরনারী।

চল্লিশ বছর আগে লেখা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর এই মধ্য রাতের, ঘুমন্ত শহরের কবিতায় ছিল নরনারী—কিন্তু এই কবিতায় তারা দুটি বালক বা কিশোর। সেইখানেই এ-কবিতা আশ্চর্য ও নতুন। কেন-না নরনারীর সম্পর্কের কথা অনেক কবিতাই বলে। এ-কবিতা বলেছে দুটি কিশোর-বালকের কথা। দুজনেই এখানে পুরুষ। সত্যি বলতে সেদিনই তারা পুরুষ হয়ে-ওঠার দিকে এগোল। কবিতার শেষ লাইনটি দরকারি : 'সারারাত পার্কে ভিজল দু'জনের শৈশবের শেষতম দিন।' এখানে 'ভিজল' শব্দটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কবিতার একেবারে শেষ লাইনে খুব সচেতন ভাবে শব্দটি রাখা হয়েছে। এই লাইনটিরই পর বালক দুটি তাদের শৈশব পার হয়ে গেল। বিনয় মজুমদারের 'ছেলেবেলা' নামক কবিতা থেকে একটি লাইন ধার করে বলা যায় : এরূপ সবারই হয়, সবার শৈশবই এপ্রকার। শেষ লাইনের আগে যে আছে গোপনে গুটিয়ে রেখে মাস্তান আস্তিন, তারা বাড়ি ফিরে যায়, এর মধ্যে রয়ে গেল তাদের সদ্যজাগ্রত পুরুষত্ব, সেই পুরুষত্বকে স্পষ্টভাবে চেনা এবং সমাজ ও অভিভাবকদের কাছে তা লুকিয়ে রাখার কথা।

এরপর যে-কবিতার কথা বলব তার মধ্যেও আছে ছেলেবেলার কথা। একটু পুরোনো যুগের ছেলেবেলা। মা-বাবাও আছে যে-কবিতায়।

যুগান্তর

মাটিরই দুর্বল কুঁজো। বাবা-মা'র কথা কাটাকাটি
সহ্য করতে না পারলেই ফেটে যেত। রান্নাঘরে
নকল বন্যাব মুক্তি। আমাদের হঠাৎ উৎসব।
তারপর কিছুক্ষণ ভাববাচ্য। কিছুক্ষণ অকাল-বোধন।
মাটির মানুষ বাবা, মা-ও তাই। গলে কাদা একটু পরেই।
নতুন কুঁজোর সাথে সন্ধ্যায় নতুন রূপকথা।

আমাদের কুঁজো নেই, হা সভ্যতা, জানিও না কী গিয়েছে খোয়া।
খাবার টেবিলে রাতে, জমে ওঠে কথা খোঁচাখুঁচি।
দুর্বৃত্ত ঘড়ির কাঁটা দুয়ো দেয়। এঁদোকথা, ছেঁদোকথা
বিনির্মাণ শুরু করে রূপকথাদের।
আমরা কাচের গ্লাস ভাঙি,
রক্তের প্রবাহ খোঁজে মোহনার বন্ধ্যা পরিণাম।
শেষমেশ মিশে যায় শীৎকারে ও আর্ত লালায়।

আমাদের নষ্টঘরে, শয়তানও পাঠায় না শিশু।

কবিতাটির শুরুতে আছে 'মাটির কুঁজো'। বাবা-মা'র কথা কাটাকাটি। সেই সূত্রে কী করে যেন হুটোপাটি চলাফেরায়, কারও পা-লেগে হয়তো, কুঁজো ভাঙল। অমনি ভাইবোনদের মধ্যে খুশির হইচই। জল থইথই রান্নাঘর। তখনও রাগ পুরোপুরি কমেনি, তাই, বাবা-মা'র ভাববাচ্যে কথা বলা। 'মাটির মানুষ বাবা, মা-ও তাই, গলে কাদা একটু পরেই'। মাটির কুঁজোর সঙ্গে কী সুন্দরভাবে মানুষ দুটিকে মিলিয়ে দেওয়া হল। মাটির কুঁজো যেমন সহজ অনাড়ম্বর, মানুষ দুটিও তেমনই। 'দুর্বল' শব্দটির ব্যবহার লক্ষণীয়। যে-মানুষ সহজভাবে থাকে, অন্যরা তাকে দুর্বল ভাবে। সন্ধেবেলায় নতুন কুঁজো কেনা হয়েছে। তাতেই যেন বাড়িতে হাসিখুশির হাট বসে গেল। 'রূপকথা' শব্দটির মধ্যে সেই আভাস। আমরা তো সবাই জানি, রূপকথা সত্যি জিনিস নয়, বানানো—তবু তাকে বিশ্বাস করে খুশি হই। তখন জীবনটাও ছিল সামান্যতেই খুশি। একটা নতুন জলের কুঁজো এল, তাতেই যেন বাড়িতে উৎসব। এমন বুক মোচড়ানো, চোখে জল আনা একটি ছেলেবেলার কথা এ কবিতার প্রথম স্তবক বলছে। আর এখন? এই লেখকের একটি কবিতায় আছে : দেশের বাড়িটি গো আমার! এই ভাদ্রে, সত্যি বলো, ভালো আছ তুমি? বোঝা যায় আমাদের অনেকের মতো দেশের বাড়ি ছেড়ে আসা একটি জীবন ঢুকে পড়েছে এমন সভ্য জীবনযাত্রায়, যেখানে রাতে খাবার টেবিলে, কথা খোঁচাখুঁচি। এঁদো কথা, ছেঁদো কথা থেকে পরস্পরকে চোরাগোপ্তা আঘাত-প্রত্যাঘাত। শেষে ক্রোধ। কাচের গেলাস ভাঙা। পরিণামে, দাম্পত্যশয্যায় শরীরে শরীর দিয়ে বাসনার চাপে সাময়িক এক অমীমাংসিত উপসংহার। সেই রূপকথা নেই। কেন নেই? 'বন্ধ্যা' কথাটি কবিতার মধ্যে এককোণে লুকিয়ে বসে আছে যে! 'আমাদের নষ্টঘরে, শয়তানও পাঠায় না শিশু'। আধুনিক কালে, অনেক দম্পতিই স্বেচ্ছায় সন্তানহীন থাকার সিদ্ধান্ত নেন। কেননা, কাজের ক্ষেত্রে, কেরিয়ার এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে সন্তান বাধা হতে পারে। তাকে লালন করতে অনেকটা সময় চলে যায় জীবন থেকে। স্বাধীন চলাফেরায় বিঘ্ন হয়। তখন, একসময় দেখা যায়, দুটো মানুষ, একলা হলেই, সামান্য কারণে কথা দিয়ে আক্রমণ। শেষে শরীর দিয়ে ক্রোধের নিবৃত্তি। যে-রূপকথা, আমাদের অনেকেরই সামান্য জীবনের শৈশবে ছিল, তা আর নেই। কেন নেই? কারণ

আমাদের তো কুঁজো নেই। মাটির কুঁজো। মাটির মানুষও আর নই আমরা। প্রথম লাইনের 'দুর্বল' কথাটি আরেকবার মনে পড়ছে। সেসময়ের আর্থিক অসচ্ছলতার ইঙ্গিত এখানে রয়েছে। বাবা-মা'র কথা কাটাকাটি কেন? নানা অভাবের কারণে নিশ্চয়। কিন্তু আজ শিশুহীন সংসারে, নিজের শৈশবের তুলনায় অনেক সচ্ছল এই জীবনযাপন—তবু এর মধ্যে একরকম হাহাকার আছে, সেটাই তুলে ধরেছে এ-কবিতা।

এই কবি, অমিতাভ দেব চৌধুরী, থাকেন কাছাড়ে। এঁকে আমি কখনও দেখিনি। একটি পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মী ছিলাম যখন, দু-একবার টেলিফোনে দু-একটি কাজের কথা বিনিময় হয়েছে মিতবাক যুবকটির সঙ্গে। এঁর আরও নতুন কবিতা পড়তে ইচ্ছে করে। আপনাদের জন্য অমিতাভের আরও একটি কবিতা দিয়ে দিলাম।

বেগুনি

বারান্দায় শুকোয় শাড়িটি
সাদার ওপরে ছোপ-ছোপ
বেগুনির অসমাপ্ত শিখা।

মা পরত এই শাড়ি।

যেন তার
মনের উদ্যত লাল রং সব
চাপা দিয়ে বিষময় নীলে
তারপর ধরা দিল এই কূট রং।

বউকে বলতে হবে:
এ শাড়ি পরে না যেন আর।
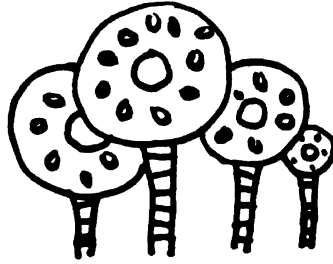
২০

মাতৃভাষা

জলের শব্দে মা'র কথা মনে হল।
ঝরনার জল, আর কোন্ ছেলেবেলা!
জল যেতে যেতে কী পাথরে ঠেক খেল—
উছলে উঠল, আর সেই ছেলেখেলা;
আলতো পাথর ডিঙিয়ে মায়ের পাশে;
মা'র হাঁটুজল; নীচু হয়ে আঁজলাতে
জল ভ'রে নিল, ঝরে গেল অভ্যাসে।
আঁজলাতে রোদ, অঞ্জলি-করা হাতে
ঝিকিমিকি ভ'রে রোদ হেসে মরে গেল;
ভেঙে পড়ে গেল এলোমেলো ভারি খোঁপা;
ঝরনার জলে মা'র মুখ ভেঙে গেল—
সেই একবার—আর সব বোবা, বোবা।

মায়ের কথা আমাদের কার না মনে হয়। এই কবিতাটি সেই মা'র কথা মনে হওয়া থেকে শুরু। আর মা-র কথা মনে হচ্ছে কীভাবে? জলের শব্দে। প্রথম লাইনটি স্মৃতির ভেতর থেকে পুরোনো জলশব্দ আর পুরোনো মা-কে ধরে ফেলেছে। মা তো পুরোনোই। আমার জন্ম দিয়েছে মা? আমার চেয়ে তো পুরোনো। যেমন এই পৃথিবী পুরোনো। পৃথিবী তো সকলের চেয়ে পুরোনো। মাটির দিকে তাকালে কি মনে পড়ে না, এই মাটি একদিন ফুটছিল? গরম তরল বুদবুদে? মা-ও যেমন আমাকে জন্ম দিতে গিয়ে যন্ত্রণায় আছাড়িপাছাড়ি ভাঙছিলেন! যেমন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'কাল মধুমাস' কবিতায় আছে:

মা তখন আমায় নিয়ে যন্ত্রণায় নীল। না, এ কবিতা সেইরকম তোলপাড় কোনো যন্ত্রণার স্মৃতি তো বলছে না। বলছে শুধু মা-র কথা মনে হল। জলের শব্দে। কীসের জল? ঝরনার জল। সঙ্গে সঙ্গে এল ছেলেবেলা। মা-র কথা মনে হলে তো ছেলেবেলার কথা মনে আসবেই। তৃতীয় লাইনটি বলছে, প্রথম চতুষ্কের আসল কথাটি। ওই যে ঝরনার জল চলে যেতে যেতে যেমন পাথরে ধাক্কা খেয়ে লাফিয়ে ওঠে, ফেনা তুলে—তেমনই, বর্তমান জীবন স্বাভাবিক ভাবে বয়ে যেতে যেতে, হঠাৎ কিছুতে ধাক্কা খেয়ে লাফিয়ে উঠে, ফিরিয়ে আনল স্মৃতি। মা-র স্মৃতি। কীসে ধাক্কা খেল? না, জলের শব্দে।

হ্যাঁ, জলের শব্দে, হয়তো স্নান করতে গিয়ে কল খুললে যে জলের শব্দ—অথবা কুয়ো থেকে জল তুলে চৌবাচ্চায় ভরার শব্দ, অথবা জল ঢেলে চাতাল ধোয়ার শব্দ—অন্য কেউ স্নান করে চলেছে, বাইরে আমি আছি, শুনলাম জল ঢালার শব্দ। সংসারে, প্রকৃতি থেকে দূরে, ঘরবন্দি, থাকতে থাকতে; জলের শব্দ শুনে দূর বয়সের খোলা প্রকৃতিকে, আর মাকে মনে পড়ে গেল। আমার কেমন মনে হচ্ছে, কোনো নদীসমুদ্র বা ঝরনা তীরের জলশব্দ শুনে মাকে আর প্রকৃতিকে মনে পড়া নয় এ কবিতার শুরু—তাহলে, যাকে বলে, বড্ড অবভিয়াস হয়ে যেত, আর হয়তো, কবিতাও লিখতে হত না। কখনও কোনো গন্ধ থেকে আমাদের ছোটোবেলা মনে পড়ে, কখনও কোনো গান থেকে স্মৃতি ফেরত আসে, এখানে জলের শব্দে এল। জল যেতে যেতে পাথরে 'ঠেক' খাওয়ার কথাটি বড়ো সুন্দর, আর অব্যর্থ। ও, একটা কথা। আমি ধাক্কা লিখেছি না? ভুল লিখেছি। 'ঠেক খেল' কথাটা ধাক্কার চেয়ে আস্তে। ধাক্কাটা অনেক কর্কশ আর প্রবলতার চিহ্ন আনে। ঠেক খাওয়া মানে সামান্য বাধা পাওয়া। স্বাভাবিক জীবন, বর্তমান কাজে ব্যস্ত মন, হঠাৎ জলের শব্দে পিছনে চলে গেল। জলের বয়ে যাওয়া, ঠেক খাওয়া দিয়ে, জলের শব্দে স্মৃতি মনে আসার কথা বলা হল। জল দিয়ে জলকে বুঝিয়ে আর একধাপ উঠে গেল অর্থস্তর। দু-রকম কাজ করানো হল জলের এই বয়ে যাওয়া দিয়ে। যেন মধ্যমকে সা ধরে গাওয়া হচ্ছে।

গান বলতেই মনে পড়ল, এই প্রথম চারটে লাইন, যেন সত্যিই গান। 'ছেলেবেলা'র সঙ্গে 'ছেলেখেলা'র মিল, অথবা, 'হল'রও সঙ্গে 'খেল', কী সাধারণ অথচ কী স্বাভাবিক। মিল বলে চোখেই পড়ছে না। তারিফ করার কথাও মনে আসছে না। আমি কবিতাটির সঙ্গেই এগিয়ে যাচ্ছি।

কী পাচ্ছি এগিয়ে গেলে! সেই যে ছোটোবেলায় ঝরনা, তার আলতো পাথর ডিঙিয়ে মায়ের পাশে দাঁড়ানো—মা তো লম্বা, তাই মায়ের হাঁটুজল—হাতে আঁজলা করে জল তুলছেন মা, জল আবার পড়ে যাচ্ছে। পাশে বালকটি কী করছে তা জানাচ্ছে না এ কবিতা। কারণ, বালকটি তো চুপ করে দেখছে মাকে। বিস্ময় আর খুশি মেশানো মা আর বালক। মায়ের খুশি জলের কাছে এসে, যেমন মেয়েদের হয়, সেই উচ্ছলতা আর বালকের কাছে এ-দৃশ্য নতুন—তাব সেই দেখার উল্লাস—যদিও বালকের সে-উল্লাসচিহ্ন কোনো চিত্রকল্পে নেই এ কবিতায়। তবে আছে। আছে অন্যভাবে।

মন্দাক্রান্তা সেন তাঁর একটি কবিতার বইয়ের নাম রেখেছিলেন, 'বলো, অন্যভাবে'। এ কবিতাও অন্যভাবে বলেছে মায়ের উচ্ছলতা, বালকের উল্লাস আর খুশি। কীভাবে বলেছে? বলেছে, এ কবিতার ছন্দের চালে। ছ-মাত্রার এই ছন্দ, তার সহজ এই চাল, কবিতার ভাববস্তুকে প্রতি মুহূর্তে প্রকাশ করতে করতে চলেছে। শেষে কবিতাটিতে একটি বাঁক আসবে, তার দিকে এগোচ্ছি আমরা। আঁজলাতে রোদ, অঞ্জলি-করা হাতে যে ঝিকিমিকি রোদ, তা হেসে হেসে মরে গেল। এখানে একটা কথা, 'আঁজলাতে' লেখার পরপরই, একই লাইনে, 'অঞ্জলি' লেখা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বর্ষশেষ' কবিতায়, একটি লাইনে 'পুরাতন পত্রপুট দীর্ণ করি, বিকীর্ণ করিয়া' লিখেছিলেন বহুকাল আগে, তাই একালের এক লেখক ত্রুটি নির্দেশ করে বলেছিলেন, 'করি' এবং 'করিয়া' রবীন্দ্রনাথ এক লাইনে লিখলেন, এটা দুর্বলতা। এখানেও কেউ বলতে পারেন, 'আঁজলাতে' আর 'অঞ্জলি-করা হাতে' পাশাপাশি এল, এটা ঠিক নয়। রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ' কবিতার মধ্যেও ধ্বনিপুঞ্জের শক্তিপ্রয়োগ ছিল এখানেও তাই আছে। বলা দরকার, সাম্প্রতিক কালে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতাতেও এমন প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। 'তা হলে এখুনি যা কিছু বলার এক্ষুনি বলো—' একই লাইনে লিখেছেন অলোকরঞ্জন। 'এখুনি' আর 'এক্ষুনি'কে পাশাপাশি দেখে কেউ একে দুর্বলতা বলে চিহ্ন দিতে পারেন এবং এটা তাঁরাই করেন সাধারণত ধ্বনিশক্তির ওপর দখল যাঁদের অনায়ত্ত থেকে যায়। ছন্দের কথা বলছি না, ধ্বনির কথা বলছি। তাঁরা অনেক সময় অন্যের রচনায় ধ্বনির শক্তিকে দিয়ে অর্থকে এগিয়ে নিতে দেখলে, সেটা ধরতে পারেন না। দুর্বলতা মনে করেন। এ-ও মানব স্বভাব। কারণ, মানুষ তো নিজের প্রবণতা অনুযায়ী চলে। 'এখুনি' যা বলার, সেটাকে 'এক্ষুনি' বলতে হবে যখন লিখছেন অলোকরঞ্জন, তখন 'এক্ষুনি' কথাটি ভেঙে যাচ্ছে 'এক্‌খুনি'-তে, কবিতাটি ছ-মাত্রার ছন্দে থাকায়। এই ভেঙে যাওয়ায় শক্তি ও গতি উৎপন্ন হচ্ছে। আর, বলে দেওয়ার কথাটার আর্জেন্সি আসছে। মানে 'তোমাকে বলতেই হবে, এই মুহূর্তে।' এইরকম একটা মনোভাব ধরা দিচ্ছে কেবল ধ্বনিগুণের মধ্য দিয়েই।

আমি যে-কবিতাটির কথা থেকে এত দূর চলে এলাম, সেই 'মাতৃভাষা' কবিতাটিতেও ওই ধ্বনিশক্তিরই ব্যবহার রয়েছে। সেই ধ্বনি ছবি ফুটিয়ে তুলতে তুলতে চলেছে। অলোকরঞ্জনের যে-লাইনটি বললাম, তার মধ্যে চিত্র ছিল না। এখানে আছে ছবি দিয়ে বলা। আঁজলায় রোদ, ওই যে জল তোলা হয়েছে হাতে, রোদ তো ওতেও পড়েছে—যেন আঁজলা ভরে রোদ-ই তোলা হল, জল নয়। তারপরই অঞ্জলি করা হাতে 'ঝিকিমিকি ভরে রোদ হেসে মরে গেল।' আঁজলা বললে হাতের অঞ্জলি-ভঙ্গি বোঝায় ঠিকই, কিন্তু 'আঁজলা' কথাটির মধ্যে সাধারণ আটপৌরে ভাব আছে। আঁজলা করে জল তোলার মধ্যে অঞ্জলি-ভঙ্গি থাকলেও 'অঞ্জলি' শব্দটির মধ্যে যে নিবেদনের সংকেত আসে, তা নেই। আঁজলাতে রোদ, অঞ্জলি-করা হাতে, ওই যে রোদ হেসে মরে গেল। ওইখান থেকে একটি বাঁক নিতে শুরু করল এ-কবিতা। তারপরই ভেঙে পড়ে গেল এলোমেলো ভারী খোঁপা। মায়ের

খোঁপা ভেঙে পড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। কারণ ও মেয়েটি, তরুণী সেই মা, জল নিয়ে খেলছেন যে, তার ফলেই, নড়াচড়াতে অযত্নে বাঁধা খোঁপা তাঁর ভেঙে পড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ, ঝরনার জলে মা-র মুখ ভেঙে গেল। এই মা-র মুখ ভেঙে যাওয়ার পর একটি ড্যাস রয়েছে। তারপরই সেই অমোঘ শেষ লাইন। 'সেই একবার—আর সব বোবা, বোবা'। 'সেই একবার' কথাটি দু-টি ড্যাসের মাঝখানে রাখা। স্মৃতির স্বচ্ছ জলাশয়ে বালকবেলার একটি দৃশ্য, মায়ের সঙ্গে, ভেসে উঠল। তার সূচনা হয়েছিল জলের শব্দে—তারপর উচ্ছল খুশির কয়েকটি ছবি—এত দূর থেকে পিছন ফিরে কয়েকটি মুহূর্ত মা-কে দেখা, তারপর সেই স্মৃতিপুষ্করের জল এলোমেলো হয়ে ভেঙে গেল। ছবি চুরমার। আর সব বোবা, বোবা। এই ছবিগুলো, পরপর মনে পড়ছিল, মায়ের সঙ্গে। ছোটোবেলার ছবি, ভেসে উঠছিল স্মৃতিজলাশয়ে, তারা যেন কথা বলছিল, ওই বয়সটার কথা, মা-র কথা, বলে চলেছিল। আর হঠাৎ ছবি ভেঙে যেতেই সব বোবা হয়ে গেল। আর কোনো কথা আসছে না।

কেন আসছে না, জলের শব্দে মা-র কথা মনে হল? মা কি আছেন এখনও? হয়তো নেই। নেই-ই। নইলে মা-র কথা জলের শব্দে মনে পড়বে কেন! মা চলে গিয়েছেন। তাই ঝরনার জলে মা-র মুখ 'ভেঙে' যায়। তাই 'ভেঙে পড়ে গেল' এলোমেলো 'ভারী' খোঁপা। 'ভারী' শব্দটাও দু-দিক থেকে আসছে। মায়ের ছবি আনছে। সন্তানবতী যুবতি, তাঁর অযত্নে তৈরি হাত-খোঁপা। এটি প্রথম ও সহজ ছবি। দ্বিতীয় অর্থটি প্রবেশ করছে, কবিতাটি শেষ হওয়ার পর। 'ভারী'-র মধ্যে বুক ভার করা বেদনা, বা, শোকভার, ছুঁয়ে যাচ্ছে পাঠককে। 'রোদ হেসে ম'রে গেল'—'ভারী খোঁপা ভেঙে পড়ে গেল', 'মা'র মুখ জলে ভেঙে গেল'—এই সবই আসছে শেষ কথাটির দিকে কবিতাটিকে এগিয়ে নিতে। আর সব বোবা, বোবা। বোবা শোক বলছে কবিতাটি, প্রায় একটি সুখের ছবি খুশির ছবি দেখাতে দেখাতে। কেন বলছিলাম রাগসংগীতের সঙ্গে মিল?

মা-র মুখ জলে ভেঙে যাবে। তার পূর্ব-ভূমিকা হিসেবে ভারী খোঁপা ভেঙে গেছে। 'ভাঙা' কথাটা কীভাবে ধাপে ধাপে অর্থন্তরকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। তার আগে রোদ হেসে মরে গেল। ওইখান থেকে শুরু হয়েছে তার শোকের দিকে যাওয়া। এই মুহূর্তে পাওয়া শোক নয়। পুরোনো শোক। স্মৃতির কাছে পাওয়া। এখন ধরতে পারা যায়, আঁজলাতে রোদ, তারপরেও কেন 'অঞ্জলি-করা হাতে'-র প্রয়োজন হল এ কবিতায়, কেন প্রয়োজন হল এই 'নিবেদন'-এর সংকেতটি। মা যেন, সম্পূর্ণ না জেনেই, ওই খুশি আনন্দর মুহূর্তটি, সন্তানকে নিয়ে খুশি উচ্ছলতার জীবনটি, বেঁচে থাকাটি, তখন নিবেদন করে দিচ্ছিলেন জলে। তর্পণের মতো। না-জানা তর্পণ। নিজেরই জন্য। 'অঞ্জলি' ধ্বনিটিও বিশ্লিষ্ট হল, ভার আনল, বিচ্ছিন্ন, বিশ্লিষ্ট হল শব্দ— সেই ভাঙার ফলে অতিরিক্ত শক্তি বেরিয়ে এল। এর আগে কবিতাটিতে মাত্র একটিই যুক্তাক্ষর আছে, এবং সেটি আছে লাইনের একদম শেষে। 'ঝরে গেল অভ্যাসে'। তাও, ঝরে যাওয়ার প্রসঙ্গেই আছে। ঝরে যাওয়া মুহূর্ত। শান্ত সুন্দর নিরাভরণ

আনন্দে ভরা জীবন কীভাবে, কিচ্ছু না-জানিয়ে হঠাৎ ঝরে যায়—তারই বিবরণ বলছে এ কবিতা। ওই যে ওই অঞ্জলি করা হাতে ঝিকিমিকি ভরে রোদ হেসে মরে গেল। যেন হাসিখুশি তরুণী মা চলে গেলেন ভরা জীবন থেকে, তারই গোপন চিহ্ন ওই লাইনে। এই লাইনটিতে 'র' যেমন এক ধরনের সহজ তরল ঝরে পড়াকে বলছে, গোপনে গোপনে, তেমনই পরের লাইনে ভেঙে পড়ে গেল এলোমেলো ভারী খোঁপা! তাতে 'ভ' আর 'প' 'ভার'-এর অনুভব আনছে। তারপরেই ঝরনার জলে মা-র মুখ ভেঙে গেল—এখানে উপর্যুপরি 'ল' এসে স্থির জলে ছবি এলোমেলো হয়ে যাওয়াকে ধরল। এই পরপর চারটি লাইনে 'ল' কিন্তু পরপর আছে। আঁজলাতে রোদ থেকেই আছে। ঝরনার জলে মা-র মুখ ভেঙে দেওয়া পর্যন্ত 'ল' তার কাজ করে গেল। এই জন্যই সংগীতপ্রসঙ্গ মনে পড়ছিল আমার । যেভাবে নির্বাচিত স্বরের পর স্বর দিয়ে দিয়ে একটি রাগকে ফুটিয়ে তোলেন গুণী—ছোট্ট এই কবিতাও সুখ থেকে শোকের দিকে তেমনই অপূর্ব সব সূক্ষ্মতা প্রয়োগ করতে করতে চলেছে। লক্ষ করলে, 'ল'-এর সংযত বিতরণ কবিতাটির প্রথম থেকেই আছে। যার ফলে 'জলখেলা'-র ছলোচ্ছল গোপনে ফুটে উঠছে শেষ লাইনের আগের লাইন পর্যন্ত। শেষ লাইনে 'ল'-এর প্রয়োগ সংগতভাবেই নেই।

এই কবিতাটি লিখেছেন বীতশোক ভট্টাচার্য। ১৯৫১ সালে তাঁর জন্ম। তিনি প্রতিষ্ঠিত কবি। প্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক। পণ্ডিত ও প্রবন্ধলেখক রূপেও খ্যাতনামা। সাহিত্যের অভিধান-প্রণেতা। তাঁর যখন মাত্র তেইশ বছর বয়স, তখন 'তিনজন কবি' নামক একটি সম্মিলিত কবিতাগ্রন্থে তাঁর পরিচিতি-পত্রে আরও অনেক দরকারি তথ্যের সঙ্গে 'শৈশবেই মাতৃহীন এই তরুণ'—এরকম একটি কথাও ছিল। বীতশোক ভট্টাচার্য দেশ-বিদেশের সাহিত্য ও কবিতার তত্ত্ব বিষয়ে বিদগ্ধ মানুষ। বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করার সুফল তাঁর অনেক কবিতায় সম্পদ হয়ে ফুটেছে। কিন্তু, আজ আমি এখানে, তাঁর যেসব কবিতায় মায়ের কথা ফিরে এসেছে তারই দু-একটি নিয়ে কথা বলছি। যেমন এই কবিতাটি :

হারমোনিয়াম

তোমার নিজের মাকে তোমার আজ ভালো মনে নেই।
এইটুকু মনে আছে একবার বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে
উঠোনের দিকে চেয়ে, একবার বিকেলের আকাশের দিকে
তারপর তোমার ওই মুখের ওপাশে চেয়ে গান গেয়েছিল :
ভেঙেছে চাঁদের হাসি...তারপর থেকে সেই আলো উছলে পড়ে
মায়ের দু'ঠোঁট ভরে উঠেছিল, ফুটেছিল চোখে ঝিকিমিকি
তুমি তা দেখেছ নাকি না দেখেই চেয়ে থেকে হাসি-হাসি মুখে
দেখেছ মায়ের হাত বেলো করে তোমার ও আঙুলের একটু ওপরে
আলতো আঘাত করে, তারপরে আর কিছু তত মনে নেই।

মায়ের পরনে ছিল ফুলফুল নীল শাড়ি, তবে তাও ভুল হতে পারে :
স্মৃতিটুকু থেকে গেছে, আলতো আঘাত ঝরে চোখ মুখ নাকের ওপরে।

এই কবিতাটিতে দাঁড়িয়ে, পাঠক, একবার, আগের কবিতাটির দিকে তাকান। প্রথম লাইনটি একেবারে বুক ভেঙে দিয়ে চলে যায়। 'তোমার নিজের মাকে তোমার আজ ভালো মনে নেই।' তারপর ভাবুন সেই বারান্দা, সেখানে মাদুর বিছানো। অপরূপ চলচ্চিত্র যেন। এখানে, মায়ের দু-চোখে ঝিকিমিকি ফুটে ছিল। ওই কবিতায় আঁজলায় ছিল ঝিকিমিকি রোদ—এই যে মা, ইনি তো তরুণী, এর চোখ নিশ্চয় উজ্জ্বল ছিল খুব। মায়ের গান গাওয়ার একটি-দুটি ভঙ্গি শুধু মনে আছে। পাশে বসেই তো গান গাইছেন মা—তোমার মুখের ওপাশে চেয়ে মায়ের গান গাওয়া। তারপরেই এক ছোট্ট ও আশ্চর্য ডিটেল : তুমি তা দেখেছ নাকি দ্যাখোনি? মা গান করছেন, তাই তোমার মুখ হাসি-হাসি—তুমি কী দেখছ? ছোটো তো, তাই মায়ের হাত বেলো করছে তোমার হাতের একটু ওপরে—আর তোমার হাতে মায়ের আঙুলের আলতো আঘাত লাগছে। ব্যস, এইটুকুই এ কবিতার বিষয়। মায়ের পরনে ফুলফুল নীল শাড়ি ছিল। ছিল? নাকি অত দূর দূরের শৈশবে তাকিয়ে ভুল দেখছ তুমি! হ্যাঁ। তবে তাও ভুল হতে পারে। কী রয়েছে তবে। স্মৃতিটুকু থেকে গিয়েছে। আর কবিতা? কবিতায় কী রয়েছে? রয়েছে, সেই যে ছোট্ট ছোট্ট আঙুলের পাশে মায়ের বেলো করা আঙুল, ছোট্ট আঙুলে ছোটো ছোটো অনিচ্ছাকৃত আঘাতও দিচ্ছিল, ওই যে ছোঁয়া লাগছিল তোমার আঙুলে—ওই ছোঁয়াটা থেকে গিয়েছে। মা তো গাইতে গাইতে বাজাচ্ছেন হারমোনিয়াম, তাঁর নিজের গতিতে আঙুল চলছে, শিশুর হাতে ধাক্কা লাগছে। সেই আলতো আঘাত ঝরে চোখ মুখ নাকের ওপরে। এইভাবে থেকে গিয়েছে। ওই সেই কবেকার ছোঁয়া, তা আজ, আদরের মতো ঝরছে চোখ মুখ নাকের ওপরে। মা যেন আদর করছে! অত দূরের হারানো বয়স থেকে আজ ফিরে এসে। এইখানেই কবিতা। ওই আলতো আঘাত বা স্পর্শের ওই ফিরে আসাই কবিতা। কে জানে, হারমোনিয়ামকে দেখেই সব মনে পড়ল কি না। আচ্ছা, আমি যদি, 'তিনজন কবি' নামক বইতে প্রকাশিত ওই তথ্যটি, 'শৈশবেই মাতৃহীন'—ওই কথাটি না-জানতাম? তাহলে কীভাবে কবিতাটি দেখতাম?

একইভাবে দেখতাম। শুধু, ভাবতাম, একটি তরুণী, যার নিজের মাকে আজ তার আর ভালো মনে নেই, এত ছোটোবেলায় তিনি চলে গিয়েছেন। সেই মেয়েটির মনে পড়ছে, ছোটোবেলায় মা তাকে গান শেখাচ্ছে। হারমোনিয়ামে বেলো করে করে শেখাচ্ছে। কেন ভাবতাম?

ওই যে, প্রথম লাইন, তোমার নিজের মাকে...। 'তুমি' আছে যে। আমি প্রথমেই ভাবতাম, একটি এমন মেয়েকে নিয়ে কবি লিখছেন, যার মা চলে গিয়েছেন খুব ছোটোবেলায়। কবির যে মা নেই, এই কথাটি '৭৪ সাল থেকে জেনে রাখার ফলে আমি

ভাবছি, এ লেখা হয়তো, নিজেকেই বলা, নিজেকেই 'তুমি' সম্বোধন করে লেখা। তাও হতে পারে। আমার মা নেই, এমন একটি মেয়ে মনে করছে, তার মায়ের গান শেখানো, তাও হয়তো অসম্ভব নয়; যে যেভাবে দেখবে।

মাকে খুব ভালো করে মনে-না-থাকার কথা অন্য একটি কবিতাতেও উল্লেখিত হয়েছে, কয়েক লাইন বলি তার থেকে :

আমি তো ছিলাম ন্যাংটো, বাবলাগাছ, বড়দি আমাকে
পুজোর পোশাকে ডেকে সাজালেন। মায়ের মতন,
অথচ মাকে তো আমি ভুলে গেছি, আমি এই ভেবে
নদীর ধারের থেকে উঠে এসে ছোট্ট পায়ে ছায়া নিয়ে ছুটে
একলা পথের দিকে চলে গেছি।...

বড়দিকে মায়ের মতন মনে হচ্ছে, বড়দি-র স্নেহভরে ডেকে ন্যাংটো শিশুটিকে সাজিয়ে দেওয়া—এসবই তো মা থাকলে করতেন। শিশুটি ছোটো পায়ে ছায়া নিয়ে নদীর ধার থেকে রাস্তার দিকে ছুটে যাচ্ছে...এ শিশু যখন যুবক হল তখন সে কী বলেছে?

ফেরি

চাই তো তোমার মত কারও ভালো লাগুক আমাকে।
ভালো : তা এখনও লাগে।—এরকম ওই কথাটুকু
বলুক না কোনও কেউ। ফ্রকপরা সতেরোর খুকু
বুকে আলতো ঢেউ দিক: তোমায় দেখে না, এই, ঠিক মাসিমাকে
মনে পড়ে। মাতৃমুখী : খারাপ কী। ছেলে মরা মাকে
মনে রাখে; এতটা না। যেন তা ছড়ার বই : ঘুঘু
সই, পুত কই; হাটে গেছে, কই হাট...একমাথা, রুখু
চুল, আমলকী ডাল, সিঁদুর, কালির ছোপ আঙুলের পাকে
শনাক্ত। হারিয়ে যায়। হারিয়ে ফেললে তুমি, এই চিঠিগুলি
তুমি হারিয়েছ।—ঈর্ষাপথে শাড়ি ঘোরে। পড়লে আঠেরোয়
চলনে নাচের কষ্ট বাঁচে জানি। লম্বা পার অম্লান সতেরো
ফরসা রোগা হেঁটে যাচ্ছে। কেন ইচ্ছে, ডাকি, ওকে ভুলে বলে ফেলি :
তোমার মুখের রেখা যেন রুগ্‌ণ শুশ্রূষার ভাঙচুরে ছোঁয়
আমার মায়ের মুখ। সে কী ভয়—তার পরে তুমি যদি ফের।

'তোমাকে দেখে না, এই, ঠিক মাসিমাকে মনে পড়ে।' এই সামান্য সংলাপ কী যে ঢেউ

তুলে দিয়ে যায় যুবকের মনে। সে-ঢেউ পাঠকের হৃদয়েও এসে লাগে। ওই যে ফ্রক পরা সতেরোর খুকু, 'বুকে আলতো ঢেউ দিক'—এই 'বুকে আলতো ঢেউ' কথাটা দু-দিক থেকে আসে। এক, যুবক হৃদয়ে ঢেউ বা স্পন্দন জাগল। দুই, যেহেতু সে ফ্রক পরে আছে, তার বুকের সামান্য স্তনের ঢেউ, ফুটে আছে, দুটিই আসে। মেয়েটি কেমন? এই কিশোরীটি? এ কবিতায় তার বর্ণনা আছে : ফরসা, রোগা, হেঁটে যাচ্ছে। তার আগে একটি অপূর্ব বাক্যবন্ধ যা পড়ামাত্র সবার মনে ভেসে উঠবে মেয়েটির হেঁটে যাওয়া। পড়লে আঠেরোয় / চলনে নাচের কষ্ট বাঁচে জানি। লম্বা পার অম্লান সতেরো। 'এই লম্বা পার অম্লান সতেরো'-র কি কোনো তুলনা হয়? দীর্ঘাঙ্গী এই রোগা কিশোরীকে আমরা সবাই চিনি। কখনো-না-কখনো দেখেছি, আমাদের সবার জীবনে। মেয়েটা কি একটু পাকা? একটু বড়োদের মতো ভাব? আবার বাড়িতে ফ্রক পরে বলে, ছেলেমানুষিও যায়নি। কেন বললাম, বাড়িতে ফ্রক পরে। আগের সময়ে, ধরা যাক তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে, যখন এই লেখক কিশোর থেকে যুবক হয়ে উঠছেন সেই সময়টায়, এইরকম ইউনিসেক্স পোশাকের চল হয়নি। মধ্যবিত্ত সংসারে কিশোরী মেয়েরা ফ্রক পরত বাড়িতে। অধিকাংশ স্কুলেও এইট পর্যন্ত ফ্রক পরে যাওয়া যেত। নাইন থেকে শাড়ি। ঈর্ষাপথে শাড়ি ঘোরে। অর্থাৎ তখন ওদের মধ্যে যেসব মেয়েরা 'একটু-দিদি', তারা শাড়ি পরলে, এই কিশোরীর ঈর্ষা হবে, স্বাভাবিক।

'একটু-দিদি' কথাটা শরৎকুমারের কবিতা থেকে বললাম, 'নীল জামাটা একটু-দিদি' তিনি লিখেছিলেন। তখন ওই কিশোরীর কাছে শাড়ি পরাটা বিরাট ব্যাপার। শাড়ি পরা মানেই বড়ো হয়ে গেলাম। তখন সেই বয়স, যখন বড়ো হতে প্রচণ্ড ইচ্ছে, কিন্তু 'বড়ো-হওয়াটা' আসতে যেন কেবলই দেরি করছে। সেই মেয়ে যখন পড়শি যুবককে বলে, তোমাকে দেখে না, এই, ঠিক মাসিমাকে মনে পড়ে, তখন, মায়ের কাছে যে স্নেহমমতার ছোঁয়া পাওয়া হয়নি, ছোটোবেলায় মা চলে গেছে বলে—এক মুহূর্তে এর কাছে তা পেতে ইচ্ছে করে। একে ডাকতে ইচ্ছে করে। আহ্বান করে আসন পেতে বসাতে ইচ্ছে করে—হ্যাঁ, নিজের জীবনে! ইচ্ছে হয় : তোমার মুখের রেখা যেন রুগ্‌ণ শুশ্রূষার ভাঙচুরে ছোঁয়। আমার মায়ের মুখ। মেয়েটি যে একটু রোগা, তার রুগ্‌ণ কোমল লম্বা পার অম্লান সতেরোয় তা ধরা আছে। ছেলেটি তো মাতৃমুখী। এইবার সে নিজের মুখ না দেখে, দেখছে, ওই মেয়েটির মুখ যেন ক্রমশ তার মায়ের মুখের আদল পাচ্ছে। সেই মায়ের মুখ—নিরুপায় হয়ে এ কবিতাও স্বীকার করছে যেন—'ছেলে মরা মাকে / মনে রাখে, এতটা না'। আসলে মনে রাখে, মার কথা বড়ো মনে পড়ে, তাই তো ওই বলা, যে, তোমার নিজের মাকে তোমার আজ ভালো মনে নেই। বড্ড মনে পড়ে, কিন্তু মুখটা, ঠিক ঠিক মনে পড়তে চায় না সবসময়, অত ছোটো তো তখন, কী করে মনে পড়বে—তাই নিজেকে ধিক্কার দিয়ে, ওই মা-র-মুখ-মনে-নেই বলা। আজ ওই মেয়েটির মুখে যখন মায়ের মুখ বসিয়ে নিতে ইচ্ছে হল, তার মধ্যে স্নেহ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আর প্রেম একসঙ্গে সঞ্চারিত হতে চাইল, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল সামাজিক অবস্থান। 'সে কী ভয়—তারপর যদি তুমি ফেরো'।

তোমাকে দেখে মাসিমাকে মনে পড়ে, এই কথাটা সহজে বলে, সেই লম্বা পার অম্লান সতেরো, সেই ফরসা, রোগা, সে তো হেঁটে চলে যাচ্ছে নিজের কাজে। তাকে ডাকতে ইচ্ছে হল। প্রাণপণ ইচ্ছে। কিন্তু. একবার ডাক দিলে, সে যদি ফিরে আসে। নিজের জীবনে তাকে বসাবার জায়গা কি আছে এখনও? তার স্থান করে দিতে পারবে কী সে যুবক! তা-ই তার ভয়। তাই সেই ডাক আর না-ডাকা ফিরে এল এই কবিতা হয়ে। ফিরে এল সেই চলে যাওয়া কবেকার মা, আর এই এসে পড়া আজকের মেয়েটি। যার মুখে মায়ের আদল চকিতে খেলা করে যেতে দেখেছে যুবক।

এই অসামান্য, বুক মোচড়ানো সুন্দরের জন্ম দেওয়া কবিতাটি একটি সনেট। পেত্রার্কের তৈরি করা নিয়ম প্রধানত অনুসরণ করেছে। এই কবি, বীতশোক ভট্টাচার্য অনেক অজস্র সনেট লিখেছেন, এটি তার মধ্যে একটি। নিয়মবদ্ধ মিলের প্রবল অনুশাসনের মধ্যে থেকে, এ কবিতা একবারও ছন্দমিলের দিকে চোখ ফেরাতে দিচ্ছে না পাঠককে, তার বেদনা-সৌন্দর্য, তার জীবনবস্তু এত মন তোলপাড় করা, যে, মাত্র দ্বিতীয় বা তৃতীয় পাঠে সেসব খেয়াল হয়। বাংলার লৌকিক ছড়া থেকে 'ঘুঘু সই পুত কই' এমন করে ব্যবহার করেছেন, মিলের মধ্যে এমন লুকিয়ে রেখেছেন, অথচ তার অমন মুনশিয়ানা চোখে পড়েই না। কেন পড়ে না? কারণ ওই জায়গাটায় তো আবার মৃতা মায়ের প্রতি ছেলের গভীর অভিমানকে ঝরতে দেখছি। মা যদি আজ আমায় খোঁজে, সখীকে বলে, বলে, ঘুঘু সই আমার ছেলে কোথা গেল, তখন সই যেন বলে দেয়, ছেলে হাটে গিয়েছে, হাট কোথায়, তার আমি কী জানি, তুমি কেন ওইটুকু ছেলেকে ফেলে চলে গেলে! এক মাথা রুক্ষু চুল নিয়ে সে ঘুরে বেড়ায় আজ! এইখানে মৃত্যু পরবর্তী গুরুদশার অশৌচকাল, অন্যপক্ষে, মায়ের যত্ন না-পাওয়া রুক্ষ চুল সন্তানের ছবি একসঙ্গে ফোটে। এ কবিতায় অভিজ্ঞতা এত গভীর, ও জীবনসত্য এত তীব্র বলে কিছুতেই এর করণকৌশলগুলি প্রথম পাঠে চোখে পড়ে না। লুকিয়ে লুকিয়ে থাকে।

মনে রাখতে হবে, ছেলেটি কিন্তু, ওই কিশোরীকে তার মনের কথাটি বলতে পারেনি, লুকিয়ে গেছে। মায়ের জন্য কষ্টও বলতে পারেনি, লুকিয়ে গেছে। মাসিমাকে মনে পড়ে, শুনে তার ভেতরে কী কী ঝড় উঠল—তা হ্যাঁ, লুকিয়েই গিয়েছে। এ কবিতাও এই দিক থেকে, তার বিষয়বস্তু ও প্রকরণে একাকার হয়ে থাকে। বিষয়ের ধর্মই প্রকরণের ধর্ম হয়ে ওঠে।

বুদ্ধদেব বসুও তাঁর মাকে মনে করতে পারতেন না, অন্তত তেমনই একটি স্বীকারোক্তি আছে তাঁর শেষ কবিতার বই 'স্বাগতবিদায়'-এর 'সন্ধিলগ্ন' কবিতায়: মাতার অশ্রুত নাম / অতিকষ্টে মনে পড়ে।...মা, আমি প্রণাম করি তোমাকে, অপরিচিতা, অদৃষ্টা আমার নিরভিমানিনী। সে কবিতায় আছে : মা, আমাকে ক্ষমা করো। আমি, ব্যর্থস্তনী, তোমাকে সরিয়ে দিয়ে / অন্য পুষ্টি খুঁজেছি, নিয়েছি কেড়ে—' এখানে 'ব্যর্থস্তনী' কথাটি মারাত্মক। বুদ্ধদেব বসুর ক্ষেত্রে, মাকে হারানোর পর দিদিমাই সেই শিশুর মাতৃস্থান পূর্ণ করেছিলেন।

মা যখন সন্তানকে দুধ দিতে পারলেন না, তখনই তিনি 'ব্যর্থস্তনী' যেন। যেন তাঁর স্তন ব্যর্থ হল। সেই না-পারার জন্য মা-ও কি কষ্ট নিয়ে গেলেন না?

বীতশোকের কবিতা মায়ের কাছে ক্ষমা চায়নি। সে এক অন্য যন্ত্রণা বলেছে। বীতশোকের কবিতায়, যে-মা আছেন তাঁকে আমি অনেক অনেকবার দেখেছি, আমার নিজের মাকে হারাবার পরেই দেখেছি বেশি করে। আগেও দেখেছি। বীতশোকের কবিতায় যে মেয়েটি আছে, তাকেও আমি বারবার দেখি। দেখেছি, সে আমার জীবনে এসেছে কয়েকবার। অন্যদিকে, আমার নিজের মেয়েও সতেরো পার হল তিন বছর আগে। তাদের নতুন করে চেনা গেল বলে বীতশোককে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। আর 'গোসাঁইবাগান'-এর পাঠকদের এই সূত্রে পড়তে দিই বিষ্ণু দে-র একটি কবিতা :

এই মুখে বহু চেনা মুখের আদল
শাড়ির ও কাঁচুলির উদ্ধত সংক্ষেপে
ভিন্ন রূপ, তবু কত মেয়ের মায়ের
স্মৃতি মুখে স্মিত, শত চিকন প্রলেপে
এ মুখ সাবেক, দেশি, বাংলা মনের
ঐতিহ্যের ছবি—যেন যামিনী রায়ের।

চেনা আরও স্পষ্ট হল, যেদিন বিকেলে
হঠাৎ সে অন্তরঙ্গ, আবেগে তন্ময়
অন্যদিকে চেয়ে চুপ, ডান পাশে হেলে
মৃদু কথা বলে, উপলক্ষ্য—শ্রোতা নয়,
উভয়ের চেনাজানা যে অন্যজনের
ব্যথা তার দুই চোখে নামায় বাদল—

সারা মুখে বাংলার আপ্লুত আদল

পুরাণ আর লোককাহিনি, ব্রতকথা আর একান্ত-জীবন মিলিয়ে মিশিয়ে বাংলার আপ্লুত আদল বারবার জেগে উঠেছে বীতশোকের কবিতায়। আমি শুধু মায়ের প্রসঙ্গটুকু এখানে বললাম। আর বলতে বলতে, স্মৃতির গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে কতবার সরে যেতে দেখলাম রবীন্দ্রনাথকে।

মা বুঝি গান গাইত আমার দোলনা ঠেলে ঠেলে
মা গিয়েছে, যেতে যেতে গানটি গেছে ফেলে।

আসলে, এই তিনটি কবিতাই তো মায়ের ফেলে যাওয়া গান।
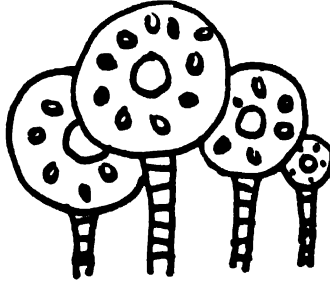
২১

যেসব জীবন আমাদের চারপাশে বয়ে চলেছে, যে-জীবনধারা আমি কিছুদূর জানি, তার কথা বলে চলে আমার এই বাংলার কবিতা। তেমনি, যে-জীবন তেমন জানি না, আভাসে বা অন্যের আলাপে একটু কিছু শুনেছি কখনও—তেমন তেমন জীবনের কথাও সে বলে।

বেনেপুতুল

চোখে সুরমা এঁকে আমি বেণিগুছি বুকে টেনে আনি
'হাসিতে নেশার রঙ না লাগালে হবে না চপল'
মুচকি হেসে অধিকারী চক্কোত্তি কড়া হাতে গাল টিপে দেন
মেয়েছেলের অধম, বলে হেসে ওঠে গুঁফো দ্বিজনাথ

শরীরে, শাড়ির ভাঁজে মেয়ে হয়ে উঠতে উঠতে ভাবি
আমি কি পুরুষ নই, আমি তবু মেয়েও নই—তবে
ওগো ও চপলরানি. ভগবান যাত্রা-অধিকারী
তোকে তিনি পাঠালেন ন্যাকড়াবুকে প্রাণ-বাতাস পুরে
সারারাত হেসে খেলে বেনেপুতুলের ছন্দে পাস
এক-একটি র‍্যাতের জাদু, কত সব পুরুষের বুকের পাঁজর

সে-কাঁপন ভগবান তোরই হাতে রেখেছেন, মানী,
তাকে ঢেলে ধন্য কর্ সকলের পুতুলজীবন

এই কবিতাটি এমন এক মানুষকে নিয়ে লেখা, যিনি নিজে পুরুষ, কিন্তু সারাজীবন নারী-চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এ ধরনের অভিনেতারা অতীত দিনের যাত্রা-থিয়েটারে ছিলেন,

যারা পুরুষ হয়েও মঞ্চে নারী সাজতেন। 'আলকাপ' নামে যে লোকায়ত নাট্যরীতি আছে, সেখানেও, দুটি পুরুষের, প্রেমিক-প্রেমিকা বা রাধাকৃষ্ণ সেজে অভিনয় করার প্রথা ছিল অথবা হয়তো এখনও আছে, যা আমি জানি না। এইরকম দুটি নারী ও পুরুষ অভিনেতার তীব্র হৃদয় সম্পর্কের কথা সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসে তীক্ষ্ণ ও মর্মঘাতী রূপ পেয়েছে।

এই কবিতাটিও আমাদের মনকে বিদ্ধ করে চলে যায়। এর সূচনার লাইনেই আছে এই অভিনেতা বা অভিনেত্রী সাজঘরে বসে মেকআপ নিচ্ছেন, তার কথা। চোখে কাজল আঁকছেন, এবং 'বেণীগুছি' বুকে টেনে আনছেন নারীসুলভতায়। এই কবিতার দ্বিতীয় লাইনটি খুবই প্রণিধানযোগ্য। কেননা, এখানে : 'হাসিতে নেশার রঙ না লাগালে হবে না চপল!' এই লাইনটিতে 'চপল' কথাটি দু-ভাবে ব্যবহার হল। একজন নারী, যদি নারীর ভূমিকায় অভিনয় করার সময় লাস্য আনেন তাকে নারীটির স্বাভাবিক অভিনয়-দক্ষতা ও স্বভাবের প্রয়োগ বলে মেনে নেয় সকলে। নট-নটীরা মানবহৃদয়ের ও মনুষ্য জীবনের ভিতরকার সব ধরনের অভিজ্ঞতা ও আবেগ নিজেদের মধ্যে সঞ্চয় করে রাখেন। কোনো বিশেষ চরিত্রে রূপ দেওয়ার সময় এবং নাটকের ভিতরকার কোনো বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব যেখানে হচ্ছে, সেখানে ভিতরকার কোষাগার থেকে সেই আবেগ ও অভিজ্ঞতার অন্তঃসার তুলে এনে প্রকাশ করেন অভিনয়ের মধ্যে। এমন নয়, যে, ব্যক্তিগত জীবনে সেই নট বা নটীর অনুরূপ অভিজ্ঞতা হয়েছে। এখানে, লেখক বা কবির সঙ্গে তার একটি সাদৃশ্য। কবি ও লেখক, অন্যের জীবনের অভিজ্ঞতা অন্তরে ধরে স্মৃতির মধ্যে সঞ্চয় করে রেখে দেন। লেখার সময় সেইসব অভিজ্ঞতা মিশিয়ে চরিত্র সৃষ্টি করেন! লেখক সৃষ্ট সেই চরিত্র, বা কবির রচিত কাব্যের অন্তর্গত কথক যেমন সর্বদাই, অবধারিত ভাবে, সেই লেখক বা কবি নন, (বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আত্মপ্রক্ষেপণ, কন্‌ফেশন বা আত্মব্যবচ্ছেদের কথা বাদ দিলে) এই নট-নটীদের অভিনীত চরিত্রও তেমনই, তাঁদের অভিজ্ঞতা ও হৃদয়বত্তার সারাৎসার। এখানে, পাঠক বুঝতেই পারছেন, জীবনানন্দের কাছে হাত পাতলাম আবার।

তা ছাড়া, গৌণ বা দুর্বল অভিনেতা যিনি, তিনি তার অগ্রজ বা সমসাময়িক কোনো কোনো শ্রুতকীর্তি নটের, বিশেষ বিশেষ মুদ্রা অভ্যাস করে করে আয়ত্ত করে নেন। চরিত্র রূপায়ণের প্রয়োজনে সেসব মুদ্রা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন। যিনি চতুর তিনি দু-তিনজনের মুদ্রা. স্টাইল, বা প্যাঁচ মিলিয়ে-মিশিয়ে দেন। এখানে, কবি বা লেখকের সঙ্গে তার আরেকটি মিল। যে গদ্যকার বা কবিতা লেখক, তখনও নিজের ভাষা তৈরি করে উঠতে পারছেন না, তিনি অনেক সময় এক বা একাধিক বিশিষ্ট রচয়িতার স্টাইল, মুদ্রা, এমনকি দৃষ্টিও—হরণ করেন। অনেক সময়ই নিজের অজান্তে। যাঁরা এরই মধ্যে সতর্ক, তাঁরা দু-তিনটি ধরন মিলিয়ে মিশিয়ে দেন—ফলে চট করে ধরা পড়ার আশঙ্কা কমে আসে।

অভিনেতাদের মধ্যে একটি শ্রেণি তবু আছেন, যাঁরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে, অন্য মানুষদের লক্ষ করেন। অন্য জীবনধারাকে লক্ষ করেন। কেবল কয়েকজন সার্থক অভিনেতা-অভিনেত্রীকে, লক্ষ করা নয়। এই যে রাস্তায় একজন লোক পান মুখে পুরল, এই যে বন্ধুর বড়ো পিসেমশাই বাজার থেকে এসে থলেটা নামালেন, ওই যে রাস্তার কলে জলের লাইন

নিয়ে তারস্বর ঝগড়ায় অচেনা মেয়েপুরুষরা অংশ নিচ্ছে—এসবই সারাদিন ধরে তিনি তাঁর ডায়েরিতে টুকে রাখতে থাকেন। সেই ডায়েরি যে সব সময় কোনো খাতাই হবে তা নয়। সেই অদৃশ্য ডায়েরিটিই হল অভিনেতার কোষাগার। সঞ্চয়ের ব্যাংক। তাঁর মন। তাতে যেমন খ্যাতনামা নট-নটীর অভিনয় মুদ্রা স্টাইল প্যাঁচ ধরা আছে, তেমনই আছে অনামা, সাধারণ সামান্য মানুষের বিভিন্ন অভিব্যক্তি। এই নিয়েই তাঁর কোষাগার। চরিত্রের আবেগ প্রকাশে গোপন সঞ্চয়কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আসে সেইসব অভিব্যক্তি। তখন তিনি হয়ে যান সত্যিকারের বড়ো শিল্পী। আর সাধারণ মানুষ তাকে চিনতে পারে : এ তো আমার কথা বলছে, আমাদের কথা বলছে।

এই জায়গাতেও কবি ও লেখকের সঙ্গে নট-নটীর আরেকটি সাদৃশ্য। লেখকও, সারাদিন যতক্ষণ চারপাশকে দেখছেন—ভেতরে ভেতরে টুকে নিতে থাকছেন রৌদ্র, গাছ, রাত্রি—নারী, পুরুষ, পশু—যানবাহন, রাস্তা, ঘটনা ও ঘটনাহারা জীবন। অন্য লেখকদের শ্রেষ্ঠ ও সার্থক রচনাগুলো মাত্র নয়। সেসব তো আছেই। কিন্তু পঠন-স্মৃতির সঙ্গে তাঁর কোষাগারে প্রতিনিয়ত জমা হয় প্রত্যক্ষ জীবন। তাঁরও কোষাগার এইভাবে গড়ে ওঠে। রচনা থেকে রচনা গড়ে তোলা নয়। জীবন থেকে রচনা জন্মানো। তেমনই জীবনবস্তু থেকে অভিনয় জন্মানো। দীর্ঘদিনের পাঠক, দীর্ঘদিনের দর্শক—এইটি উপলব্ধি করেন। একটু আগে কেন বললাম, 'চপল' কথাটি দু-ভাবে ব্যবহার হল? এই 'চপল' শব্দটিতে চাপল্য প্রথমত লাস্যের অনুষঙ্গে আনা হয়েছে—কারণ 'হাসিতে নেশার রঙ' রয়েছে তো। দ্বিতীয় কারণটি গুরুত্বপূর্ণ। চপল ভাদুড়ী নামে এক অভিনেতার কথাও এই 'চপল' শব্দটিতে বলা হল, যিনি নারী ভূমিকায় অভিনয় করেছেন আজীবন। যাত্রায় এবং থিয়েটারে। যাত্রায়, অধিকারী থাকতেন. যিনি এক ধরনের হর্তাকর্তা। হাসিতে চপল নেশার রং লাগতে হবে—এই কথাটাই বলতে চান তিনি। আবার 'চপল'কে নাম ধরে সম্বোধনও করলেন কথাটি বলতে গিয়ে। এই কবিতাটির লেখক বড়ো অনুপম ভাবে 'চপল' কথাটি লাইনের একেবারে শেষে রেখে দুটি অর্থই টেনে বের করে আনলেন বাক্যটি থেকে। এই হল কবিতা পড়ার সুখ। এই খুশি অন্য কোথায় পাব!'

অবশ্য এ লেখাকে কখনোই খুশির লেখা বলা যায় না। তৃতীয় লাইনে যে অধিকারী চক্কোত্তি-মশাই কড়া হাতে গাল টিপে দেন, তার মধ্যে রয়েছে অপমান। যদি সে শারীরিক ভাবে নারী হত, তাকে ওইভাবে গাল টিপে দিতেও হয়তো বাধত না অধিকারী মশাইয়ের। তাতেও অপমানই থাকত। কিন্তু, এ যেহেতু নারী নয়, পুরুষ—নারী ভূমিকায় সাজে মাত্র, তাই তার প্রতি এই অবজ্ঞা, বিদ্রুপ অত্যন্ত উলঙ্গ ও হৃদয়হীন। চতুর্থ লাইনে 'মেয়েছেলের অধম' বলে হেসে ওঠে যে-'গুঁফো দ্বিজনাথ', তার 'মেয়েছেলে' বলার মধ্যে এরা যে মেয়েদের কতখানি অসম্মানের চোখে দেখে, তা ফুটে ওঠে। কিন্তু তার চাইতেও একটি জরুরি, অব্যর্থ শব্দ প্রয়োগ আছে এই লাইনটিতে। সেটি হল 'দ্বিজনাথ'-এর আগে বসানো 'গুঁফো' শব্দটি। এই দ্বিজনাথ নিশ্চিতভাবে অধিকারী মশাইয়ের কোনো শাগরেদ। মাঝারি পার্ট-টার্ট করে। কিঞ্চিৎ গোমস্তা, কিঞ্চিৎ শাগরেদ। সব ধরনের শিল্পের ক্ষেত্রেই মালিক বা প্রোপাইটার বা ম্যানেজারের এমন শাগরেদদের আমরা দেখতে পাই। কিন্তু, যে-সময়টার

কথা এ কবিতায় বলা হচ্ছে, সেসময়ে আজকের চেয়ে অনেক বেশি নিষ্ঠুর ব্যবহার করতে পারতেন এইসব পুরুষেরা। আজকের দিনে অভিনেত্রীরা মহৎ শিল্পীর সম্মান লাভ করেন নিজ প্রতিভাবলে। তখন নটীদের জীবন ছিল অপমানে ভরা। আর এই শিল্পী, যিনি, নারী ভূমিকায় অভিনয় করেন শরীরে পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও—তিনি দু-পক্ষেরই অপমান অবজ্ঞার লক্ষ্য। 'গুঁফো' শব্দটি মারাত্মক এইজন্য যে, গোঁফ রাখার মধ্যে সদম্ভ পুরুষত্বের ঘোষণা রয়েছে—নারী-রূপে যিনি মঞ্চে আসবেন, তাঁর নিশ্চয়ই গোঁফ থাকবে না। তিনি কোমল—স্বভাবে, আচরণে, রূপসজ্জায়। কড়া হাতে গাল টেপার মধ্যে এক ধরনের শাসন ও ধর্ষকাম প্রকাশিত হয়। ও শেষ হয় প্রথম স্তবক।

কবিতাটির রচনাশৈলির মধ্যে একটি বিশেষত্ব আছে। ১২ লাইনের এই কবিতার প্রথম অর্ধেক, অর্থাৎ প্রথম ছ-লাইন বলছে নারী-ভূমিকার পুরুষ অভিনেতাটি। যাকে সবাই মেকআপ নেওয়ার সময় ঠাট্টা-বিদ্রুপ করছে, সে নিজে ভাবছে, শরীরে শাড়ির ভাঁজে মেয়ে হয়ে উঠতে উঠতে ভাবি—আমি কি পুরুষ নই, আমি তবু মেয়েও নই—তবে, এই 'তবে' কথাটি থেকে অনায়াসে এই কবিতার কথকের ভূমিকার রূপান্তর ঘটে। এত অনায়াসে, কোনো ঝাঁকুনি না দিয়ে একেবারে স্বাভাবিক ভাবে—অভিনেতা বা অভিনেত্রীটির গলা থেকে এই কবিতার কবির কণ্ঠে চলে যায় কবিতাটি। রচনা কৌশলের এমন অপূর্ব দক্ষতা, পারঙ্গমতা, পাঠককে মুগ্ধ, অভিভূত করে দেয়।

না, দক্ষতা, বা কৌশল কথা দুটো আমার ব্যবহার করা অনুচিত হয়েছে। দক্ষতা বা কৌশল শব্দ দুটি যা বোঝায়, তার তুলনায় অনেক গভীর স্তরে এই রচনার ধারা বইছে কবির মনের মধ্যে। আপাতত শব্দ দুটি ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চেয়ে আমি আগে কবিতাটির প্রসঙ্গে আসি।

এই যে অভিনেতাটি সাজ ঘরে মেকআপ নিচ্ছেন, চোখে কাজল দিচ্ছেন, না-থাকা স্তন দুটির মাঝখানে বেণিগুছি টেনে আনছেন, আয়নার দিকে তাকাচ্ছেন কটাক্ষে—এখনই তো তিনি ধীরে ধীরে নারী হয়ে উঠছেন এই প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। ওই চরিত্রটির মধ্যে ঢুকছেন। মনে পড়ছে, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেতার গাড়ি থেকে নামল। পাঞ্জাবি-পাজামা পরা মানুষটি হেঁটে ঢুকছেন উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরিতে। ১৯ বছরের প্রায় কিশোর আমি—হাঁ করে তাঁর প্রত্যেক অভিব্যক্তি পান করছি, যতটা মনে পড়ে চোখ দুটো খুব আনমনা—তারপর মঞ্চে বসে সুর মেলাচ্ছেন কতক্ষণ। যখন আলাপ হচ্ছে খরজে, যন্ত্রের আওয়াজ শোনাচ্ছে যেন সুরবাহারের মতো, গোবাদার সঙ্গে গিয়েছি, কোর্টপাড়ার গোরাদা, ফুঁপিয়ে উঠল। নিখিল ব্যানার্জির ওই সুর মেলানোর মতো চপলরানির ওই মেকআপ নেওয়া। অভিনেতা আয়নার সামনে বসে নিজের ভেতরে জেগে উঠতে থাকেন, চরিত্রটিকেও জাগিয়ে তুলতে থাকেন। মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে, একেলা রয়েছ নিভৃত শয়ন পরে। প্রিয়তম হে জাগো, জাগো, জাগো। একইসঙ্গে নিজের শিল্পীসত্তার অন্তঃসার ও চরিত্রটি—এই দুটি অংশ যে-শরীরে মিলেছে, সে-ই তখন প্রিয়তম। শরীর মানে, অভিনেতার বাইরের দেহপট নয়—নটের অন্তর্গত জীবনবস্তু ও তার সারবত্তার যে-মনোশরীর। সে তো ঘুমন্ত। তাকে জাগাতে হবে না! নইলে অভিনয় করবে কী করে সে!

এই যে বাইরের বাতাস, তা নিস্তব্ধ—আমি সা লাগাব গলায় কিংবা যন্ত্রে, পরপর কয়েকটি পর্দা লাগাব, তবে তো সুর জন্মাবে। এও সেই রকম। কিন্তু নিখিল ব্যানার্জিকে কেউ সুর মেলানোর সময় ঠাট্টা করার স্পর্ধা করবে না। আর বেনেপুতুলদের কবেব। কারণ সে তো মেয়েলি পুরুষ। প্রথম অর্ধেকে কবিতাটি ওই বেনেপুতুলের গলায় কথা বলতে বলতে, পাঠককে প্রায় কিছু বুঝতে না দিয়ে চলে এল কবির গলায়। কবি তখন কথকের ভূমিকা নিলেন। এর মধ্যেও রইল এক নাট্য। কোনো নাটুকেপনা নয়। বেনেপুতুল, নারীর ভূমিকায় অভিনয় করা সেই পুরুষ, সকলের দ্বারা বিষাক্ত শ্লেষে অবজ্ঞায় বিদ্ধ হতে হতে, আবার নিজের যন্ত্রের সুর তারই মধ্যে মেলাতে মেলাতে নিজেকেই প্রশ্ন কবছে যখন, আমি কি পুরুষ নই, আমি তবু মেয়েও নই—তখনই প্রায় সংলাপের মতো তাঁর কথা শুরু করলেন কবি। সত্যি! সে কি পুরুষ নয়? কিন্তু তবু নারীও তো সে নয়, জন্মগত কারণে। এইখানে কবির গলা বলে : ও গো ও চপলরানি, ভগবান যাত্রা অধিকারী। এই যে চপল ভাদুড়ীর কথা বলেছি প্রথমে—তিনি চপলরানি নামেই খ্যাত নাট্যসমাজে—এখানে ন্যাকড়া বুকে প্রাণ-বাতাস পুরে, কথাটি, সুরে সুরে বাঁশি 'পুরে'র মতো আরও আরও প্রাণ দিল কবিতাটিকে। 'ন্যাকড়া বুক' কেন? কারণ, রূপসজ্জা কালে, সকলেই জানে, অভিনেতাকে ন্যাকড়া আর নারকেলের মালা নিয়ে স্তন তৈরি করে লাগাতে হয়—যে-স্তন প্রকৃতি তাকে জন্মসূত্রে দেননি। ন্যাকড়া দিয়ে সেই কৃত্রিম স্তন তৈরি করতে হয়। তারপব সেই কৃত্রিম স্তনের নারী-সাজা পুরুষের জাদুময় অবিস্মরণীয় অভিনয় দেখতে দেখতে, যাত্রার দর্শক কখন যেন ভুলে যায়, দৃশ্যের পর দৃশ্য নটীকে দেখতে দেখতে তাদের একসময় আর মনে থাকে না নটী নন, ইনি একজন নট। কত পুরুষের পাঁজর ভেঙে যায় সেই নারী-চরিত্রটির জন্য আকাঙ্ক্ষায় কষ্টে—এমনকি কামনায়। সমস্ত পুরুষ-হৃদয়ে তখন সে-ই নায়িকা।

এইখানে এসে, অবধারিত ভাবে কবিতাটি একটি স্তবকের বিরতি নেয়। আর কী অমোঘ ও অব্যর্থ এই বিরতি। কত কবিতায় আমরা স্তবক বিন্যাস দেখি। চার লাইন বা ছ-লাইন বা দুই কিংবা তিন লাইনে কত কবিতা এসে স্তবকের বিরতি নেয়। অনেক সময়ই সেসব বিরতি হয় নিয়মমাফিক স্তবক বিন্যাস। কিন্তু এমন বিরতি পাওয়া বড়ো দুর্লভ। কারণ, এবার উপসংহারে এসে পৌঁছোল এ কবিতা। তখন কবিতাটি বলে, সব বিদ্রুপ ঠাট্টা শ্লেষ যখন অভিনেতা তাঁর শিল্পের মধ্য দিয়ে ছাড়িয়ে গিয়েছেন, তখন, শোনা যায় সবার বুকের পাঁজর কাঁপানোর যে ছন্দ—সে-কাঁপন ভগবান তোরই হাতে রেখেছেন, মানী। এখানে আবার, 'মানী' শব্দটির প্রয়োগ বড়ো অপরূপ। কার সাধ্য আছে, শিল্পীকে অপমান করবে! অপমান অবজ্ঞার কথা ছিল এ কবিতার শুরুতে। তখন এ কবিতার কথক ছিলেন সেই অভিনেতা বা অভিনেত্রী। এখন কবি তাকে জানিয়ে দিলেন তুমি, মানী, তুমি, শিল্পকে ধারণ করে আছ নিজের মধ্যে। তোমার মতো বড়ো আর কে? তোমার মতো মর্যাদা আর কার?

তারপর, শেষ লাইনটি চাবুকের মতো এসে বেদনায় আর আনন্দে আমাদের চোখ ভাসিয়ে দেয় চোখের জলে। এই যারা তোমাকে ঠাট্টা করছে, তাদের কি তোমার মতো শিল্পপ্রতিভা আছে! তারা কেউ না! ঘটনাচক্রে তারা তোমার অধিকারীমশাই, তারা তোমার অধিকারীর মুরুব্বি শাগরেদ, তারা বাইরের থেকে তোমার মালিক। কারণ তারা তোমাকে

টাকা দেয়, তোমার অভিনয়ের জন্য মাইনে দেয়। কিন্তু, তারা প্রতিভাহীন শুষ্ক অমানবিক ও সময়ে সময়ে নীচ ও হীনতাগ্রস্ত। ব্যবসার সামগ্রী ছাড়া তোমাকে কিছু মনে করে না তারা।

কিন্তু ওই যে অত মানুষ, যারা সারারাত তোমার অভিনয় দেখল, তারা জানে, বা এই মাত্র জানল, হয়তো আজীবন মনে রাখবে না, কিন্তু একরাতের জন্য কেঁপে গেল তোমার শিল্পের আগুনে। সে-আগুন, সে-কাঁপন, তোমারই হাতে। 'তাকে ঢেলে ধন্য কর্ সকলের পুতুলজীবন।' 'আগুন' কথাটি ব্যবহার করাও উচিত হল না আমার। কেন-না, ঢেলে কথাটি আছে কবিতায়। সৃষ্টি ক্ষমতার পূণ্য জলস্রোত। ওই যে কাঁপন, প্রেমের, কামনার, দুঃখের, বিচ্ছেদের যে-কাঁপন—তাকে আমরা কে অনুভব করি? আনন্দের বদলে আমরা পাই আমোদ। প্রেমের বদলে শরীর। কামনার বদলে কয়েক মুহূর্তের মনোহীন নির্গমন। আর দুঃখ? তা রূপান্তরিত হয় বিদ্বেষে। বিচ্ছেদ? তাকে তো বদলে দিই কুৎসা আর কর্দমনিক্ষেপে আর প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছায়। একমাত্র, নটরাজ তোমার কাছে তোমার অভিনয়ের সামনে এসে, হয়তো কয়েক ঘণ্টার জন্য আমাদের এই পুতুলজীবন, সত্যিকার মানবজীবন হয়ে উঠতে পারল। কারণ অভিনয় তো একটা সত্যি। একটা সত্যি তো অভিনেতা নিজে। সত্যিকে তো আমি কখনও দেখার চেষ্টা করি না। জানি না সত্যি কী। আমাদের মনের তলায় চাপা পড়া সত্যি আবেগগুলিকে কিছুক্ষণের জন্য জাগিয়ে দিল তোমার অভিনয়। সত্যি কাকে বলে তুমিই দেখালে, হে নটরাজ। নটরাজ কথাটি বলা মাত্র, আমার মনে অন্য একটি কথা এল। সেই শব্দটি হল অর্ধনারীশ্বর। এই যে অভিনেতা যাঁকে নিয়ে এই কবিতা, যে বলছে আমি পুরুষ নই, আমি তবু নারীও নই—সে অর্ধনারীশ্বর রূপে উদ্ভাসিত এই কবিতায়। আবার পুরোনো প্রসঙ্গে ফিরে যাই—অভিনেতা যখন মেকআপ নিচ্ছেন। যন্ত্রী যখন যন্ত্র মেলাচ্ছেন—আসলে তাঁরা তখন যোগে বসেছেন। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর একটি আড়াই-তিন মিনিটের বাংলা রেকর্ড আছে, যোগীশ্বরো হরো ভোলা মহেশ্বরো। উচ্চারণ তিনি যেভাবে করেছেন তা বোঝাতে বানানে 'ও'কার ব্যবহার করলাম। একটি বিদ্যুৎ চমক মিলিয়ে যেতে যতটুকু সময়, তার মধ্যেই স্বয়ং শ্রী রাগ এসে আসন নেন ওই প্রথম লাইনটিতে। আগে ক্ষমা চেয়েছি, দক্ষতা বা কৌশল শব্দ দুটি ব্যবহার করার জন্য! কেন, তা এবার বলি।

কবিতাটির প্রথম অর্ধেক বা প্রথম ছয় লাইনে অভিনেতার কণ্ঠ শোনা যায়, তারপর কোনো সংলাপ চিহ্ন, কোটেশন মার্ক ইত্যাদি ছাড়াই খুব সহজ অনায়াসে কবিতাটি কবির গলায় এসে কবিরই সংলাপ হয়ে যায়। কথকের বদল ঘটে, বিনা প্রস্তুতিতে বিনা ঝাঁকুনিতে, কোনো স্পষ্ট বিভাজন চিহ্ন ছাড়াই। এটি কেবলমাত্র দক্ষতাসঞ্জাত হতে পারে না। দক্ষতা একটু বাইরের জিনিস। এক অর্ধনারীশ্বর শিল্পীর প্রসঙ্গে এ কবিতা রচিত হচ্ছে, আর এই কবিতা লিখছেন একজন নারী, তাঁর নাম, সুতপা সেনগুপ্ত। মনে রাখতে হবে চপল ভাদুড়ী একজন পুরুষ আর তাঁর শিল্পী-নাম চপলরানি। তখনকার দিনে এটাই রেওয়াজ। রানি যোগ করে বলা হত এইসব শিল্পীদের। এঁদের বলা হয় বেনেপুতুল। পুতুল কথাটি জুড়ে আছে এঁদের শিল্পীপরিচয়ের সঙ্গে, পুতুল কথাটির ভেতরকার প্রাণহীনতা জুড়ে আছে তাঁদের

পরিচয়ে, দুর্ভাগ্যজনক ভাবে। শেষ লাইনে কবিতাটি বলেছে : ধন্য করো আমাদের পুতুলজীবন। কারণ আসলে তো আমরাই পুতুল। ওই শিল্পীর মতো নিরন্তর আগুন তো আমরা বহন করি না। আমরা, সমাজে আর পাঁচটা লোক যেমন, তেমনই। শিল্প-সংস্পর্শহীন। এই সূত্রে, চপল ভাদুড়ীর জীবন-কথাও, যতটুকু আমি জানি, পাঠককে একটু বলি। আগুনের কথাটা কেন বারবার বলে ফেলছি, সেটা তাহলে হয়তো স্পষ্ট হবে।

প্রভা দেবী ও তারাকুমার ভাদুড়ীর পুত্র অভিনেতা চপলরানি, দীর্ঘদিন তাঁর এক পুরুষবন্ধুর সঙ্গে একত্র বসবাস করেছেন। কেন-না, তিনি স্পষ্ট ও খোলা গলায় বলেছেন, তিনি ভালোবাসেন ওই পুরুষকে। দুজন পুরুষের একত্র বসবাস কার্যত আমাদের সমাজে নানা বিরোধিতার ও ঠাট্টা-বিদ্রুপের জন্ম দেয়। সেসব তিনি শৌর্যের সঙ্গে সহ্য করেছেন। কালক্রমে, তবু, প্রেমিকের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটে যায়। তাঁরা চিরতরে আলাদা হয়ে যান। তাঁর নিজের সংসারে ফিরে যান সেই প্রেমিক বা এইরকম কিছু ঘটে। চপলরানি, একজন সত্যিকারের শিল্পীর মতো সেই বিচ্ছেদে অবর্ণনীয় দুঃখ পান—এবং আজও মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেন যে সেইটিই তাঁর প্রেম। ওই পুরুষটিই। এইসব তথ্য আমাকে জানালেন, আমার দুই শিল্পীবন্ধু, ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায় ও দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরা অপরিসীম শ্রদ্ধা করেন চপলরানিকে। এঁর জীবন নিয়ে নাটকও অভিনীত হয়েছে বলে জানালেন ঋদ্ধি : খোলা জানলা বন্ধ চোখ। নবীন এক নির্দেশদের সঙ্গে কাজ করেছেন প্রবীণ এই নট। তাঁর জীবনকথা নিয়ে নানা লেখাও বেরিয়েছে পত্রপত্রিকায় যা ঋদ্ধির কাছেই আমি জানলাম। 'রমণীমোহন' নামে একটি নাটকে এখনও যে মাঝে মাঝে অভিনয় করেন এই অভিনেতা সে কথা জানালেন অভিনেত্রী ঈশিতা মুখোপাধ্যায়। কিন্তু, কবিতাটি যিনি লিখেছেন, সুতপা সেনগুপ্ত, তাঁর কি জানা ছিল এইসব তথ্য। খুবই সম্ভব যে জানা ছিল। সুতপা সেনগুপ্ত ব্যক্তিগত জীবনে অভিনেতা ও নির্দেশক রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী। তাঁর বাল্য ও কৈশোরে তিনি অজিতেশ, কেয়া, রুদ্র, স্বাতীলেখা, এদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পেয়েছেন। 'ফুটবল' নাটকের জন্য গান লিখেছেন তিনি একসময়। কোনো কোনো নাটকের অনুবাদের কাজে যুক্ত ছিলেন। অর্থাৎ পারিবারিক সূত্রেই নাটক ও নটদের সম্পর্কে তাঁর জানাশোনা থাকা খুবই সম্ভব। চপলরানির জীবনকথা তিনি জানবেন না এমন নয়। এই কবিতায় সুতপা একজন অর্ধনারীশ্বরকে অনুভব করেছেন, এবং সেই কারণেই অভিনেতা-কথকের স্বর, অত আয়াসহীন ভাবে কবি-কথকের স্বরে মিশে গেল কবিতাটির দ্বিতীয়ার্ধে। অন্তরে নিজেকে নারী অনুভব করলেও, শরীরে একজন পুরুষ এই অভিনেতা—আর তাই প্রথমার্ধে পুরুষ-স্বর, অভিনেতার—দ্বিতীয়াংশে কবি, যিনি একজন নারী, তাঁর স্বর—সব মিলিয়ে কবিতাটি একটি অর্ধনারীশ্বরের রূপ নিয়েছে। কবিতাটির বিষয় একজন অর্ধনারীশ্বর শিল্পী—ফর্মের দিক দিয়েও সেই অর্ধনারীশ্বর রূপটি ফুটল। বিষয় ও প্রকরণ একাকার হয়ে গেল। কোনো বড়ো শিল্প, তার ফর্মকে প্রকট করে দেখায় না। লাবণ্যকে, যেমন শরীর থেকে আলাদা করা যায় না, তেমনই। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও বলে নিতে চাই। হরমোনের কিছু হেরফেরে কোনো কোনো পুরুষ যে মেয়েলি-স্বভাব প্রাপ্ত হন ও অন্তঃকরণেও নারী হয়ে থাকেন, তা শারীরবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান আমাদের অনেক দিনই জানিয়ে দিয়েছে। সভ্যতাও

এগিয়ে চলেছে এইসব জ্ঞান সঙ্গে নিয়ে, কিন্তু, সেই সভ্যতাই তার বিদ্রুপের নিষ্ঠুরতাও বজায় রেখেছে পাশাপাশি। অথচ আমার বা তোমার শরীরেও হতে পারত অমন হেরফের। বাদল সরকারের 'ভোমা' নাটকে ছিল পরমাণু বোমার তেজস্ক্রিয়া বিষয়ে এই সংলাপ : 'তুমি জন্মে গেছ তো? আস্ত জন্মেছ? তোমার ছেলে জন্মে গিয়েছে? আস্ত জন্মেছে?' আমরা মনে রাখি না সে-কথা যে, হতে পারত হেরফের। এই ধরনের মানুষদের মধ্যে যাঁরা শিল্পী হয়ে ওঠেন, তাঁরা অর্ধনারীশ্বর রূপ স্পর্শ করেন। শ্লেষবিদ্রুপ পার হয়ে তাঁদের ভিতরে জেগে থাকে ভালোবাসা। ক্ষমা। সেই ক্ষমা, যা প্রতিশোধস্পৃহায় গ্রস্ত হয়ে আত্মের অপব্যয় করে না, শিল্পশক্তির অপচয় করে না। বরং সেই ভালোবাসা আর ক্ষমায় ধন্য হয়, আমাদের, এই বিদ্রুপকারীদের পুতুলজীবন।

এই কবি সুতপা সেনগুপ্তের আর একটি কবিতা বলব।

কাশীবাসিনী

এখানে যে বাবা বিশ্বনাথের চরণে প্রসাদ পড়ে
তার ইহকাল পরকাল এক, গলিত জীবনস্তূপ
সাবারাত ধরে গাঁজা ও জুয়াড়ি, বারবণিতার লীলা
কীভাবে বাঁচাবে তোকে অভাগিনী পুণ্য নরকবাস

সকালে নদীর কোলাহল ভেঙে কথকতা উঠে আসে
পায়রার মতো তীর্থযাত্রী খুঁটে খুঁটে খায় দানা
বিকেলে বাতাসা হরির লুটের ঘণ্টাধ্বনি ওঠে
আরতিশেষের আঁধারে বিধবা মেয়েরা বেশ্যা হয়

তবু দ্যাখো ওই কাশীবাসিনীর শরৎচন্দ্র এলে
যে বুকে মরেছে যন্ত্রণাসাড় সে-ঘোমটাগুলি ওড়ে
ঘাটেব সিঁড়িতে পড়ে থেকে শুধু বলেছে চোখের জল
শাদা জ্যোৎস্নার কানে সারি সারি শাদা ঘোমটার কথা

এই কবিতাটিতে আগেকার দিনে কাশীতে আশ্রয় নেওয়া মেয়েদের কথা আছে। আছে এই অমোঘ লাইন : আরতিশেষের আঁধারে বিধবা মেয়েরা বেশ্যা হয়। আছে 'শরৎচন্দ্র' শব্দটির অভাবিত প্রয়োগ। যা একাধারে শরৎকালীন চাঁদ ও তার জ্যোৎস্না, অন্যদিকে লেখক শরৎচন্দ্রকে মনে কয়ায়। মনে করায়, তাঁর কোনো কোনো লেখার কথা যেখানে কাশীবাসিনীরা উপস্থিত। তবু এই কবিতার শেষ তিন লাইন ভোলা যায় না। 'যে বুকে মরেছে যন্ত্রণাসাড়' এই কথাটির জন্য। কষ্ট পেতে পেতে একসময় কষ্ট পাওয়ার শক্তিরও মৃত্যু হয় মনে—এই কবিতার বিধবা মেয়েরা তেমন দশাপ্রাপ্ত। কিন্তু শেষ লাইনের ছবিটি

সব যন্ত্রণা পার হয়ে করুণ এক চিরসৌন্দর্যের দিকে নিয়ে যায়। যেখানে জ্যোৎস্নায় ধোয়া ঘাটের সিঁড়িতে বসে থাকা মহিলাদের, সাদা থান পরা, ঘোমটা দেওয়া, অপার্থিব ছায়ার মতো মনে হয়। এ জীবন আমি কি জানি? এ ছবি কি আমি দেখেছি? কিন্তু, এটুকু জানি, এ হল সেইরকম কবিতা, যা এক ধরনের অজানা, অল্প জানা জীবনকেও যুগ থেকে অন্য যুগে বয়ে নিয়ে যায়।

আরতি শেষের আঁধারে স্বামীহারা অসহায় বিধবাদের নিরুপায় ভাবে বেশ্যা হয়ে যাওয়ার কথা এ কবিতা বলেছে, আর সে ছিল অন্য যুগের কথা। আর একেবারে, আজকের কলকাতার এক শ্রেণির দেহপসারিণীর কথা জানায় সুতপা সেনগুপ্তের 'রাস্তার মেয়ে' কবিতা।

রাস্তার মেয়ে

'ধন্য আশা কুহকিনী' ভেবে তুমি ঘরে ফিরে আসো
ধন্য আশা কুহকিনী পরদিন আবার দাঁড়াও
প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে, মিছিলের আনাচে কানাচে
ভাবো, যদি নেতাদের চোখে পড়ে, হিল্লে হয়ে যাবে

কিছুই হয় না, তবু দাঁতে দাঁত চেপে বেঁচে থাকো
ভগবান চাপা হেসে দেখে যান, ভাঙা এসপ্ল্যানেড
কড়াইয়ে মুড়ির মতো ফুটে উঠছে বাড়ি ফিরবে বলে

তুমি একা, কালো, পোড়া—

ধন্য আশা, কুহকিনী মেয়ে

সেকালের কাশীর গঙ্গার ঘাট থেকে এ লেখা চলে এসেছে আজকের সন্ধেবেলার এসপ্ল্যানেড অঞ্চলে। এই রোগা রোগা, কালো, রং মাখা, যথাসাধ্য উগ্র সাজ করা মেয়েদের আমরা সকলেই দেখেছি। এরা দাঁড়িয়ে থাকে রাস্তায়। কোনো কোনো মেট্রো স্টেশনের গায়ে। মেট্রো সিনেমাহলের আশেপাশেও এরা ঘুরে বেড়াতে থাকে সন্ধে হলে। পথচারীদের দিকে তাকায় : এ যদি আসে। যদি ধরা দেয়। ধরা দিলে কী হবে? দরদস্তুর হবে, দরে যদি পোষায় কোনো সস্তা আস্তানায় নিয়ে তুলবে। এই আশা নিয়ে, ঘরে হাঁড়ি চড়িয়ে রাস্তায় আসে এইসব মেয়েরা। সেদিনের সেই বিধবা মহিলারা যারা আরতি শেষের আঁধারে বেশ্যা হতে বাধ্য হত, তারা যেমন সমাজের শিকার—আজকের এরাও তাই। এরা কি প্রতিদিন কোনো খরিদ্দার পায়, যাতে, দুটো পয়সা জোটে? না, পায় না। প্রায়ই এমন দিন যায় যে খালি হাতে ঘরে ফিরতে হল। সেই খালি হাতে ঘরে ফিরে আসা থেকে আরম্ভ এ কবিতার। নবীনচন্দ্র সেনের প্রবাদপ্রতিম কবিতাপঙ্‌ক্তি ব্যবহার করে তাই এ কবিতা শুরু।

সেই ধন্য আশা কুহকিনী বলেই, পরদিন সেই রাস্তার মেয়ে আবার রাস্তায় দাঁড়াচ্ছে। এমনকি মিছিল যাচ্ছে যখন, তখনও? সে মিছিলের মধ্যে তাকাচ্ছে। যদি কোনো ছোটোখাটো নেতার তাকে চোখে ধরে যায়, তবে, ভবিষ্যতে তাকে দিয়ে অন্য অনেক কাজ উদ্ধার করানো যাবে—এমনও হয়তো ভাবে মেয়েটি। অন্তত কবিতা সে ইঙ্গিত-ই দিচ্ছে, 'হিল্লে হয়ে যাবে' কথাটির মধ্যে। আজকের দিনে অধিকাংশ পুরুষ বা নারী, সমাজের কোনো প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির কাছে পৌঁছোতে চায়, তাকে ধরতে চায়, খুশি করতে চায় কেন? নিজেদের সংসারভাগ্যের পতন (এই শব্দটি বুদ্ধদেব বসু রেমব্রান্ট সম্পর্কে লেখায় বলেছিলেন) যাতে না-হয়, বরং উত্তরোত্তর উন্নতি হয়—সেইজন্য। যে-কোনো ক্ষেত্রে বড়ো নেতাকে, শুধু রাজনীতি নয়, অফিস-দপ্তর, শিল্প-সাহিত্য, প্রোমোটারি, সর্বত্র এইটেই প্রধান ও সহজ পথ। এমনকি কখনো-কখনো শিক্ষা বা পড়াশোনার এলাকাও এর বাইরে নয়। কিন্তু এইমাত্র যে ফিল্ড বা ক্ষেত্রগুলির কথা বললাম সেসব জায়গায় কেউই কিন্তু, এই কবিতার মেয়েটির মতো অত দূর নিঃসহায় নয়। তারাও 'হিল্লে হয়ে যাবে'ই ভাবছে—কিন্তু এই মেয়েটি যেমন কুটো আঁকড়ানোর মতো ভাবছে মিছিলের দিকে তাকিয়ে খুঁজছে, ভিড়ের দিকে তাকিয়ে খুঁজছে কোনো সম্ভাব্য পুরুষ যে আজকে কাস্টমার আর ভবিষ্যতের প্রোমোটার হতে পারে তার—এর মতো ডুবন্ত অবস্থা আর কার? অন্যদের সকলেরই সম্মানজনক জীবিকা আছে, তারা আরও উন্নতির আশায় নেতা বা মুরুব্বি খোঁজে। এই মেয়েদের দুবেলা খাওয়ার সংস্থান নেই। দুবেলা খাওয়ার সংস্থান যাদের কোনোমতে আছে—তারাই ভাঙা এসপ্ল্যানেড দিয়ে বিকেলে বাড়ি ফিরছে। ভাঙা এসপ্ল্যানেড কেন? অফিস ছুটির পর ভিড়ে ভিড়ে বিশৃঙ্খল এসপ্ল্যানেড। অফিস-ভাঙা ভিড়ে। এখানে কড়াইয়ে মুড়ির মতো ফুটে ওঠার তুলনাটি নতুন ও চমকপ্রদ। ছড়ানো হকার, দোকানপাট, ফুটপাতের ঠেলাঠেলি, ট্রাফিক ব্যস্ততা, সব বলা হল। এদিকে, এক কোণে বসে কোনো ভুজাওয়ালা বা বুড়ি হযতো মুড়ি-চিড়ে ভাজছে কড়াইতে—সেটাও পথ চলতে চোখে পড়ে গিয়ে থাকতে পারে লেখকের—সেইটেই সমস্ত বিকেল-সন্ধের কোলাহলমুখর এসপ্ল্যানেডের উপমা হিসেবে উঠে এল। এই সূত্রে মনে পড়ছে বিকেলের প্রবল ব্যস্ত এসপ্ল্যানেডের আর একটি অনন্য ছবি ফুটিয়ে তুলেছিলেন আর একজন শিল্পী। তিনি অবশ্য কবিতা লেখেননি। কিন্তু সমস্তটা একটি কবিতায় পৌঁছেছিল কয়েক মুহূর্তের জন্য। এই শিল্পী হলেন উৎপল দত্ত। 'দুঃস্বপ্নের নগরী' নামক নাটকের প্রথম কার্টেন উঠলে অদ্ভুত আলোর মধ্যে স্থির হয়ে থাকতে দেখা যায় কয়েকজন মানুষকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে। হঠাৎই আলোর বদলের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রিজ ভেঙে চলন্ত হয়ে ওঠে সেইসব মানুষ বা চরিত্ররা। এক মুহূর্তে আমরা বুঝতে পারি সদ্য অফিস ভাঙা বৈকালিক চৌরঙ্গিচত্বর এতক্ষণ ফ্রিজ ছিল, এই চলতে শুরু করল আমাদের প্রত্যেকের অসম্ভব চেনা চরিত্রগুলি নিয়ে। কবিতার উদ্ভাসন নিয়ে এসেছিল সেই নাট্যদৃশ্য। নাটক থেকে আবার কবিতায় ফিরি। ফিরে দেখি, রাস্তায় দাঁড়ানো মেয়েটির তবু হিল্লে হয় না। সে দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করে যায়। প্রথম যে কবিতাটি বলেছি আজ, বেনেপুতুল, তাতে ভগবান ছিলেন—এ লেখাতেও আছেন। কিন্তু এখানে তিনি নিষ্ঠুর চাপা হেসে সব দেখছেন। আগের দিনের অসহায় বিধবারা যেমন,

এই আজকের দিনের রাস্তার মেয়েও তেমনই, নিশ্চয়ই কোথাও ভগবানকে বিশ্বাস করে, প্রার্থনা করে তাঁর কাছে। অন্তত শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায়, এমন এক দেহপসারিণীর সামান্য গরিব ঘরের বর্ণনা চকিতে উঁকি দিয়ে গেছে : 'সেই স্বৈরিণীর কাদার শরীর নগ্ন করি অল্পমূল্যের পালঙ্কের পর। তার তলে প্রজাপতি ঋষির পট, রুদ্রাক্ষ, চন্দনপাখা, সিন্দূর, পাদুকা, দর্পণ, নারিকেলের জীর্ণ পাতাগুলি, দূরে শৌচকর্মের বারি, প্রতিষেধক আরক, স্তিমিত উজ্জ্বলতা...'। রাস্তার মেয়ে বলতে যেমন চলতি কথায় 'সস্তার বেশ্যা' বোঝায় পুরুষলোকেরা—এখানে, 'অল্পমূল্যের পালঙ্ক' এসে তেমনি একখানি ঘরের সীমিত সাধ্যের কথা বলল। জায়গা একেবারে নেই বলেই যে-খাটে খরিদ্দারকে গ্রহণ করতে হয়, তারই নীচে প্রজাপতি ঋষির পট, রুদ্রাক্ষ, চন্দনপাখা, হয়তো গুরুদেবের পাদুকার ছবি রাখা। অর্থাৎ ভগবানের নির্ভরতা। তার অল্প দূরেই রাখা শৌচকর্মের বারি! এই হল শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অনেক আশ্চর্যের এককণা দ্যুতি।

শক্তির কবিতার সেই বারাঙ্গনার যেমন ঈশ্বর ছিলেন, আমাদের এই কবিতার মেয়েটিরও কি তাই আছে? আজকে আমি যে তিনটি কবিতার কথা বললাম, তার দুটিতে, স্পষ্টভাবে, লেখক, ঈশ্বরকে তার দুটি হাতে নিয়ে যেন দু-ভাবে ব্যবহার করেছেন। মনে রাখতে হবে, এই কবিতাগুলির লেখকের ব্যক্তিগত ভাবে ঈশ্বরবিশ্বাস আছে কী নেই, তা নিয়ে আমার মনে কোনো দোলাচল হচ্ছে না। থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। ব্যক্তিগত ঈশ্বরবিশ্বাস আছে কী নেই, তা আমার লক্ষ্যও নয়। দুটি কবিতায়, দু-ধরনের অবস্থায়, ঈশ্বরকে দু-ভাবে দেখা হচ্ছে, ঈশ্বরের ভূমিকাকে। এইখানেই লেখকের স্বাধীন সামর্থ্যের পরিচয়। ভগবান ওই যে চাপা হেসে নীরবে নিষ্ক্রিয়ভাবে আমার অবস্থাটা দেখছেন, আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি, আর বিকেল পেরিয়ে সন্ধে হচ্ছে, সন্ধে পেরিয়ে রাত্তির, আর কেউ আসছে না আমার কাছে, অন্য অন্য মেয়েরা যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তারা একে একে খদ্দের পেয়ে অন্তর্হিত হল। আমি তবু দাঁড়িয়ে আছি...আর তুমি, ঈশ্বর, হাসি চাপছ আমাকে দেখে...এ কি মেয়েটির কথা হতে পারে না? কথক নিজের বর্ণনা বলে লিখলেও এখানে দু-দিকে আবার চলে গেল অর্থদ্যুতি।

মেয়েটি একা দাঁড়িয়ে আছে, সমস্ত লোক চলে যাচ্ছে, সে খরিদ্দার পায়নি, দাঁড়িয়ে আছে এই অবস্থায় চৌরঙ্গি জনতার মতো কবিতাটিও তাকে ছেড়ে চলে এল। ছেড়ে আসবার আগে একবার শুধু পিছন ফিরে দেখল তাকে শেষবারের মতো। কালো, পোড়া? পোড়া কেন? এই প্রতিদিনের অবর্ণনীয় যাতনাময় জীবনদাহ তাকে পুড়িয়ে দিয়েছে। আর এই যে সে আজ রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে—এমন তো সে ছিল না। সে তো কোনো ঘরের মেয়ে ছিল। কে জানে কোনো ঘরের বউ-ই ছিল কি না! যে অবস্থা, যে পরিস্থিতি তাকে আজ এই রাস্তায় এনে দাঁড় করিয়েছে, তারই আগুনে সে পুড়ে কালো। 'কালো', এবং 'একা'র পর খানিকটা জায়গা ছেড়ে ছেড়ে রাখা হয়েছে। তার একাকিত্ব বোঝাবার জন্যই হয়তো, লাইন চলাকালীনই লাইনের মধ্যে মধ্যে ওই স্পেস ব্যবহার। রূপহারা ওই মেয়েটিকে ত্যাগ করে কবিতাটি চলে যাচ্ছে ঠিক, কিন্তু একেবারে চলে যাচ্ছে না। আমাদের মনে স্থায়ী করে দিয়ে যাচ্ছে মেয়েটিকে। এরপর রাস্তায়, এসপ্ল্যানেড অঞ্চলে, মেট্রো

স্টেশনের পাশে, সল্টলেক-উল্টোডাঙা-ভিআইপির মোড়ে, এলগিন রোডে ঢোকার মুখটায়, যতবার অমন কোনো মেয়েকে দেখব, কবিতাটি কথা বলে উঠবে আমাদের মনে। সমাজের কাজ এভাবেও করে কবিতা। বোদলেয়রের কবিতা-ধারণা বিষয়ে বলতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু একবার বলেছিলেন, কবিতা এই জগতের কোনো কিছু বদলাতে পারে না, শুধু সকল দুঃখীর হয়ে দুঃখ ভোগ করতে পারে। সুতপা সেনগুপ্তের কবিতা সেই কাজটাই করেছে।

কবিতার শেষ লাইনটিতে এসে আবারও একবার অবাক হওয়া বাকি ছিল আমার। 'ধন্য আশা কুহকিনী' কথাটি উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে রেখে শুরু হয়েছিল আট লাইনের এই কবিতা। উপর্যুপরি দু-বার প্রথম দুটি লাইনে প্রায় ধ্রুবপদের মতো ধন্য আশা কুহকিনী কথাটি এসেছে। শেষ লাইনে, মেয়েটি একা দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার কাছে কেউ আসেনি। আসছে না। সে দাঁড়িয়ে আছে। আশা ছাড়তে পারছে না। আর আশাটুকুই তার শক্তি, আশা বিসর্জন দিয়ে ঘরে ফিরলে হয়তো অনাহার। হয়তো পঙ্গু বাবা। হয়তো বৃদ্ধা মা। কিংবা নিজেই হয়তো। একার পেট, তার জ্বালাও কি কম! কবিতাটি দুটি চার লাইনের স্তবক স্বাভাবিক ভাবে চেয়েছিল। কবিতার যে রচনাস্রোত, তারও তো একটা চাওয়া তৈরি হয়, কবিতাটি লিখতে লিখতে। কবি সেটাকে রাখলেন, আবার রাখলেনও না। স্পেস দিয়ে আলাদা করলেন, শেষ লাইনে মেয়েটির একাকী দাঁড়িয়ে থাকাটি। এবং ভেঙে দিলেন লাইনটি, সুষম, সটান রাখলেন না—কেন? মেয়েটির কছে তো কেউ এল না—পূর্ণ হল না তো তার জীবিকা-লক্ষ্য—শুধু আশাশক্তি রইল তার কাছে। এইবার তাই ধন্য আশা-র পর একটি কমা—যা নবীন সেনে নেই। আশাই এখানে একমাত্র ঈশ্বর। এই কথাটি দিয়ে আশাকে একদিকে আঘাত করাও হচ্ছে, শ্লেষের আঘাত, অন্য দিকে আশার মহিমাময় সামর্থ্যের কথাও বলা হচ্ছে—আশা ছাড়া কি মানুষ এগোয়? সভ্যতা এগোয়? এই কথা আর একটি কাজও করেছে। 'কুহকিনী' কথাটিকে আলাদা করে দিয়েছে। আর তাকে যুক্ত করেছে 'মেয়ে' শব্দটির সঙ্গে। চিরকালই নারীকে কুহকিনী বলে প্রশংসাচ্ছলে নিন্দা করে থাকে সমাজ। আর এই মেয়েটি? সে তো রাস্তা থেকে পুরুষ ধরবার কাজই করে। তাই তো সে রাস্তার মেয়ে। ওই মেয়েরা খারাপ মেয়ে। বেশ্যা। ধন্য আশার পর, কমা, একটুক্ষণ থেকে যখন 'কুহকিনী মেয়ে' শব্দটি পড়ছি, বুক মুচড়ে উঠছে আমার। হায় কুহকিনী! নবীনচন্দ্রের চিরপরিচিত লাইনটিকে নতুন যুগের নতুন বিষয়ের কবিতায় প্রবেশ করানো হল—তারপর, একটি কমা-র প্রয়োগে, তা থেকে নতুন অর্থ বার করে আনা হল। কুহক কোনো পথিককে আকর্ষণ করতে পারেনি, পারছে না আজ। অথচ. নবীনচন্দ্রের কবিতায় আশা-সম্বোধনের যে মূল সুর—সেই সুরও কিন্তু একদিকে এ কবিতার মূল সুরের মধ্যে রইল।

এইভাবে, আবারও এক যুগ থেকে, অন্যযুগে বয়ে এল অবিনাশী কবিতাস্রোত। এই ধারা চলেছে। আর আমি, পাঠক হয়ে ঘাটের সিঁড়িতে বসে সেই স্রোতের দিকে তাকিয়ে আছি।
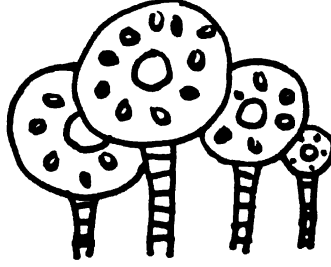
২২

সারাদিন কীভাবে কাটাই আমরা? নিশ্চয়ই, নানারকম কাজের মধ্যেই থাকি সকলে। ভাবতে গেলে দেখব, নানারকম অভিযোগের মধ্যেও থাকি। সারাটা দিন আমাদের কেটে যাচ্ছে কাউকে না কাউকে অভিযোগ করে। অন্যের প্রতি অভিযোগ করতে করতে আমাদের কারও এমনও হয়েছে যে, যত মৃদুভাবেই বলি না কেন, স্বর থেকেই বোঝা যাবে তা কোনো নালিশ বহন করছে। যেখানে নালিশ প্রকাশ করার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে না, সেখানে কথাটি হয়ে উঠছে শ্লেষ বা ব্যঙ্গ। কখনও চাপা। কখনও তত চাপা নয়। এ থেকে বোঝা যায়, না-বলা অনেক অভিযোগ মনের মধ্যে বহন করেও চলেছি। যা বলতে পারছি না মুখে, কিন্তু মনে মনে সারাক্ষণ বলছি। এইভাবে বাইরে হাসি আর ভেতরে অপরের প্রতি অভিযোগ নিয়ে কেটে যাচ্ছে আমাদের দিন। আর জীবন যখন এইভাবে অবিরত অভিযোগ বহন করে কাটছে, তখন কবিতা লিখতে গেলেও তো সেই অভিযোগই আসবে। শ্লেষ, বিদ্রুপ আসবে। কারণ জীবন থেকেই তো কবিতা আসে।

ঠিকই। কিন্তু, আজ যখন আয়ুর চার ভাগের তিন ভাগই পার হয়ে গিয়েছে, তখন মনে হয়, কেবল অভিযোগ করে আর অভিযোগ চেপে রেখে যে দিনগুলো কাটাচ্ছি, এই কি চেয়েছিলাম? জগতের সবার দোষ আছে, শুধু আমি ভালো! আমার কোনো দোষ হতে পারে না? এইখান থেকে কখনো-কখনো শুরু হয় নিজেকে অভিযোগের পালা। নিজেকে প্রশ্ন করা বা ফিরে দেখা নয়। অন্যদের অভিযোগ করে করে বিফল হয়ে, শেষে নিজেকে অপদার্থ, ব্যর্থ বলে ভাবতে শুরু করা। কেউই যখন বুঝতে পারছে না আমাকে, আমার অস্তিত্বের মূল্য কী? জীবনটা অভিযোগ থেকে বিদ্বেষের দিকে চলে যেতে চায়। তাকে বাধা দিতে গেলে তা ফিরে আসে নিজের দিকে! মনে হয়, শূন্য, শূন্য সব। সব চিন্তা প্রার্থনার সকল সময়, শূন্য মনে হয়। শূন্য মনে হয়। তখন, কারও কারও এত দূরও মনে হতে পারে, নিজেকে শেষ করে দিলেই বা ক্ষতি কী! আমি তো শেষই হয়ে এসেছি। অভিযোগ বহন

করে বেঁচে থাকা একজন মানুষ, অভিযোগ বহন করে বেঁচে থাকা আরও একজন বা আরও একদল মানুষের সঙ্গে মজার মজার কথা বলছে, হাসছে, হাসাচ্ছে—কী মানে এসবের।

যে আমাকে মুখ ফুটে বলেছে, আমি যাকে মুখ ফুটে বলিনি, আমরা দুজনেই, আমরা সকলেই, কখনো-না-কখনো, এই আত্মনির্যাতনের গহ্বরে খসে পড়েছি। সেইরকমই একটি মুহূর্তে আমার মনে পড়ে গেল এই কবিতাটি :

চেয়ে দ্যাখো

ততোক্ষণ মাথা ঝুঁকে পড়ে থাকো ব্রিটিশ মিউজিয়ামে—
যদি বই পাওয়া যায়, আর যদি না-ও পাওয়া যায়
চেয়ে দ্যাখো কার্ল মার্কস পড়তেন কোন্ প্রান্তে বসে,
ইউনেস্কোর উচিত ওই জায়গাটাকে তীর্থ বলে প্রতিপন্ন করা।

কোনো বই পাওয়া যায়নি? এসে যায় না, এই চেয়ে দ্যাখো
শুধুই আজকের জন্য প্রদর্শিত হয়েছে এখানে
কিট্সের হাতের লেখা চিঠি :
'পীসা থেকে এক ভদ্রলোক, শেলি, চিঠি লিখেছেন
ওঁর কাছে যেতে!'

অন্তত এ চিঠিখানি সংরক্ষিত আছে সভ্যতায়,
এসো, এই কথা ভেবে আত্মহত্যা মুলতুবি রাখি।

এই কবিতাটি লিখেছিলেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। আজ থেকে ২৬ বছর আগে এ লেখা ছাপা হয়েছিল। তারও কত আগে ইনি লিখেছেন :

ক্ষান্তি

বরবটির খেত ঘুরে রামনাথ বিশ্বাস রোদ্দুর।
তুমি খুশি হও, তুমি অভিযোগ কোরো না,
বোলো না 'অভাব' বলো 'বাড়ন্ত সকলি',
বরবটির খেত ঘুরে পর্যটন করছে রোদ্দুর।

আঙুল হেলিয়ে দোলে বরবটির সার
জননী পৃথিবী সুখী, তিনি রাজমাতা,

রত্নগর্ভা; আপাতত আর-কোনো শস্য নেই তাঁর,
আর-কোনো চাষি নেই। মনোনয়নের শস্য নেই।

তাবলে কী এসে যায়? কচি-কচি বরবটির মুখে
বাতাস লেগেছে, আর রোদ্দুরের তেজে
বেড়ে উঠে তারা হেসে কুটি-কুটি নেচে-নেচে সারা;
এবার মরতে তিনি রাজি। নৌকো খুলে দাও, মাঝি।।

এই যে প্রথম চার লাইন, এর মধ্যে ভারি সুন্দর একটা কথা আছে। আমাদের বাড়িতে মা-মাসিরা চাল আনতে হবে বা চাল ফুরিয়ে গিয়েছে না বলে বলতেন, 'চাল বাড়ন্ত'। অর্থাৎ 'নেই' বলতে নেই। কেন? নেই-ই যখন, তখন নেই বলব না কেন? বলো, ইচ্ছে হলে বলো। তবে 'নেই'-কে 'বাড়ন্ত' বলায় একটি সৌন্দর্য ফুটল। ইচ্ছের সৌন্দর্য। এই ইচ্ছেটুকু যে, আমি চাই সব ভরা থাক। অপাবৃতা ধরিত্রীকন্যা তাঁর একটি কবিতা, জল ভরার কবিতা, শেষ করেছিলেন এই বলে : 'খালি থাকবে কেন?' ঠিকই তো, খালি থাকবে কেন। 'নেই'-কে 'বাড়ন্ত' বলে বর্ণনা করার মধ্যে আগের যুগের মায়েরা একটি আশীর্বাদ উচ্চারণ করতেন। একটি মঙ্গলকামনা। এইখানেই কবিতার সঙ্গে তার সাদৃশ্য। কবিতা অনেক সময়ই শুভ্র মিথ্যা বলে।

বরবটির খেত ঘুরে রামনাথ বিশ্বাস রোদ্দুর। কথাটির মধ্যেও একটি লুকোনো মজা আছে। কেন হঠাৎ রামনাথ বিশ্বাস কথাটা এল? একজন বাঙালি পর্যটক ছিলেন যিনি সাইকেলে পৃথিবী ঘুরেছেন। তাঁর নাম রামনাথ বিশ্বাস। আজকে, এই বরবটির খেতে রোদ্দুর যেন রামনাথ বিশ্বাসের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই জন্যেই, চতুর্থ লাইনে, পর্যটন' কথাটি রয়েছে, পর্যটক রামনাথ বিশ্বাস আগে এসে গিয়েছেন বলেই। তবে প্রথম লাইনে আরও একটি সূক্ষ্মতা রয়েছে। অক্ষবৃত্তের এই আঠোরো মাত্রার লাইন, আমরা এইভাবে, নিজের অজান্তেই পড়ব—'বরবটির খেত ঘুরে | রামনাথ | বিশ্বাস রোদ্দুর।' 'বিশ্বাস' কথাটা রোদ্দুরের সঙ্গে উচ্চারণ করব অজান্তেই। রামনাথ বিশ্বাস যেমন পৃথিবী ঘুরেছেন, রোদ্দুরও তেমনই। বিশ্বাস আর রোদ্দুর কথাটা পাশাপাশি। ভেতরে বিশ্বাস করার শক্তি থাকলে অভিযোগ আর জয়ী হতে পারে না বলেই, এই 'জননী পৃথিবী', তাঁকে সুখী দেখতে পায়। যে সুখে 'এবার মরতে তিনি রাজি'। বসুন্ধরার কী মৃত্যু হয়? এই মৃত্যু কোনো বিনাশের কথা বলছে না। এ এক শান্তির অভিব্যক্তি। আমরা বলি না, এবার মরেও শান্তি? সেইরকম। এ স্নেহের কথাও, কেন-না, তাঁর সন্তান তো এই শস্যখেত। ভূ-পর্যটকের কথা প্রথম লাইনে ছিল। সেই সূত্রে এইবার এসে পড়েছে সমগ্র পৃথিবী। শস্যমাঠ। 'আঙুল হেলিয়ে দোলে বরবটির সার'—এমন একটি ছবি এখানে আছে—যা একাধারে চিরচেনা ও নতুন। বরবটিকে যে আঙুলের মতো দেখতে কে না জানে! কিন্তু কবিতায় এভাবে তাকে কখনও দেখিনি।

এই কবিতাটির মতো, 'চেয়ে দ্যাখো' কবিতাটিও, সেই নিজেকেই বলা। কিছু বইয়ের খোঁজে অলোকরঞ্জন গিয়েছিলেন সেখানে। কিন্তু বইগুলো পাওয়া গেল না। সে এক নিরাশার মুহূর্ত ঠিকই। সেই নিরাশা মুহূর্ত থেকে শুরু হয়ে এ লেখা যেখানে পৌঁছোল, সেখানে, আমাদের সমস্ত নিরাশা ও অভিযোগের মুখোমুখি সে দাঁড়াতে পারে। কীভাবে? মার্কস যেখানে বসে পড়াশোনা করতেন, সেই জায়গাটায় চিহ্ন দেওয়া আছে। এবং তা দেখে অত্যন্ত সংগত ভাবেই বলা হচ্ছে, 'ইউনেস্কোর উচিত ওই জায়গাটকে তীর্থ বলে প্রতিপন্ন করা।' অক্ষরবৃত্তের বাইশ মাত্রার মাপের মধ্যে অলোকরঞ্জন যে ধরিয়ে দিলেন লাইনটিকে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কারণ, '৬৭-তে তো তিনি তারা দেবী, তোমার মন্দিরে কবিতায় লিখে দিয়েছিলেন 'অনিমা সেনগুপ্ত যেবার কী একটা শিখর থেকে প্রাণ হারালেন,'—ওই বাইশ মাত্রাতেই। সুতরাং, তা নিয়ে বেশি না ভেবে আমি শুধু ভাবছি, যে ওই 'তীর্থস্থান'টি দেখতে পেল না তার কথা। এক্ষেত্রে আমার কথা। কিন্তু, আমার মতো মানুষের জন্য আছে এ কবিতার দ্বিতীয় স্তবক। 'শুধু আজকের জন্য প্রদর্শিত হয়েছে এখানে, কীটসের হাতের লেখা চিঠি।' কিটসের চিঠি? তা-ই? কী আছে সে চিঠিতে? সে চিঠিতে কিটস লিখছেন, পিসা থেকে এক ভদ্রলোক, শেলি, চিঠি লিখেছেন ওঁর কাছে যেতে।

এই সামান্য সংবাদটুকু আছে। লক্ষ করা যায়, এই কবিতাটির ধরন যেন কিছুটা বিবৃতির মতো। কিছু কিছু খবর বলা হচ্ছে। কিন্তু কী সেই খবর। শেলি, কিটসকে নিজের কাছে আসতে লিখছেন।

এবং এইখানে ঘুরে দাঁড়িয়ে কবিতাটি একটি অমোঘ বিশ্বাসবার্তা জানায় তার শেষ দু-লাইনে। 'অন্তত, এ চিঠিখানি সংরক্ষিত আছে সভ্যতায় / এসো এই কথা ভেবে আত্মহত্যা মুলতুবি রাখি।' সব কিছুই হারিয়ে যায়। কোনো সম্পর্ক, কোনো বিশ্বাস, কোনো আশা আর নিরাপদ নয়, ভেঙে যেতে পারে, ভেঙে যায়, ভেঙে গিয়েছে বলে মন যখন নিরাশা আচ্ছন্ন, তখন সে কার দোষে ভাঙল ভেবে অপর পক্ষের দিকে অভিযোগ নিয়ে যায়। আর শেষে মনে হয়, এই নিরাশা আর অভিযোগময়তায় কীই-বা মূল্য আছে আমার জীবনের? একে শেষ করে দিলেই তো হয়—তখন এই শেষ দু-লাইন একটা বিশ্বাসের দৃঢ়তা নিয়ে দাঁড়ায়। 'ঝরছে কথা আতসকাচে' নামক কাব্যগ্রন্থে আছে এই কবিতা, যে বই ছাপা হয়েছিল, ১৯৮৫-র এপ্রিলে, এখনও পাওয়া যায়। আশ্চর্য ব্যাপার, আত্মহত্যা 'মুলতুবি' রাখার কথা বলা হল। একবারও বলা হল না, কখনও আর ও কথা ভেব না। নিজেকে শেষ করার কথা ভাবতে আছে? ছিঃ। তুমি না মানুষ! এসব বলা হল না কিন্তু। বলা হল, মুলতুবি। এখানে, 'মুলতুবি রাখি'-র মধ্যে আসলে কিন্তু 'মুলতুবি রাখো'-ই আছে। কারণ, 'এসো, এই কথা ভেবে' এই কথাটি রয়েছে তো। 'এসো', এই আহ্বান অপরকে, বন্ধুজনকে সতীর্থকে বলা। যে আমারই মতো। একটু আগে আমি যেমন নিরাশাপীড়িত আর অভিযোগপ্রবণতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। এ-ও তো তেমনই। তার প্রতি মিথ্যে কোনো স্তোকবাক্য উচ্চারণ করল না এ কবিতা। সে জানে, সংবেদনশীল যে জীবন, তার সামনে বারবার নিরাশা

আসবে। আঘাত আসবে। অপরের প্রতি অভিযোগ করে করে বেঁচে থাকার গ্লানি থেকে সে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করবে—আত্মহত্যার মধ্যে দিয়ে। চেষ্টা না করুক, অন্তত চিন্তা করবে। বিশেষত কবিরা, শিল্পীরা, যুগে যুগে, আত্মহত্যা করেছেন। যাঁরা করেননি, তাঁদের অনেকেই জীবনে কখনো-না-কখনো আত্মহত্যার কথা ভেবেছেন, এমনকি পরিকল্পনা করেছেন, এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসের চতুর্দিকে ছড়ানো। সিলভিয়া প্লাথ, ভার্জিনিয়া উলফ, মায়াকোভস্কি বা ভ্যান গখ প্রমুখ। শেলি যে সমুদ্রে ভেসে গিয়েছিলেন, সে নিয়ে প্রশ্ন আছে, অস্পষ্টতা আছে। এই দুর্ঘটনা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কি না। যে-জিজ্ঞাসা উঠেছিল তাঁর বন্ধুদের মধ্যে। আছেন আমাদের জীবনানন্দ এই অস্পষ্টতার কিনারে। সেইজন্যই কোনো চিরকালীন আশ্বাস উচ্চারণ করতে চাইল না এ কবিতা। বলল, জানি, তুমি সেনসেটিভ, জানি তোমার মন বারবার অভিযোগ করবে পৃথিবীকে, জানি তোমার বাঁচতে ইচ্ছে করবে না অভিমানে। আমারও করে না, হে বন্ধু, হে পাঠক, হে ভবিষ্যতের কবি—তবু ওই চিঠিটি, কিটসের যে চিঠিতে শেলির সঙ্গে দেখা করার কথা আছে, ওই চিঠিটা তো সভ্যতা যত্ন করে আগলে রেখেছে। দুজন অত বড়ো কবি পরস্পরের কাছে আসতে চাইছেন, তাঁদের বন্ধুত্বের সম্ভাবনা জেগে উঠছে—এই উষা-মুহূর্তটি কোথাও ধরা আছে আজও। এইটা কি মস্ত আশ্বাস নয়? এসো, এই কথা ভেবে, অন্তত কিছু দিনের জন্য আত্মহত্যাকে মুলতুবি রাখার এই আহ্বানে কবি নিজেকেও জড়িয়ে নেন অজানা বন্ধুর সঙ্গে, পাঠকের সঙ্গে। মানুষ যখন ভয়ংকর একলা বোধ করে, কাউকে দেখতে পায় না তার মনের চারপাশে, তখনই সে আত্মহত্যার কথা ভাবে। এই যে, 'এসো' বলা হল, এই আহ্বান, আর অন্তত একজনকে সঙ্গী করে নিল। আত্মহত্যার সঙ্গী নয়। আত্মহত্যার বিরুদ্ধতা করার সঙ্গী।

এই কবি, অলোকরঞ্জন, বারবার অবিশ্বাসকে নিজের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাকে বিশ্বাসে রূপান্তরিত করতে চেয়েছেন। একটি কবিতার অংশ বলি এইখানে :

> ... ... আমি তাকে ছেড়ে
> চলে যাবো এই কথা ভাবছিলাম, কিন্তু যেই চলে
> যাচ্ছি দেখি পৃথিবীতে নতুন মন্দির হবে বলে
> কেউ বা মোহর দিল, কেউ বা কাহন
> যে শিশু আপন মনে উত্তরের বারান্দায় দোলে
> যে তার দোলনটুকু দিয়ে দিল : আর একজন
> দারুণ অনিচ্ছা দিয়ে মন্দির সুদৃঢ় করে তোলে।

নতুন মন্দির হবে বলে সাহায্য তোলা হচ্ছে, দান নেওয়া হচ্ছে, এইটুকু ভাবা যায়। যে যার সামর্থ্য অনুযায়ী দিচ্ছে, কেউ মোহর দিতে পারল। কেউ কাহন। কিন্তু যে শিশু বারান্দায় আপন মনে দোলনায় দুলছে, সে তার দোলনটুকু দিয়ে দিল? এটা আর ভাবা যায় না। আর

এইখানেই কবিতা শব্দের সীমাবদ্ধ অর্থের বাইরে নিজেকে নিয়ে যেতে পারল। যেমন মন্দির নির্মাণের জন্য অর্থ প্রয়োজন, কিন্তু, শুধু অর্থ নয়, অর্থকে পেরিয়ে অন্য কিছু, হয়তো তা ভক্তি, হয়তো তা আত্মনিবেদন, আমার কাছে যেমন তা ভালোবাসা—সেই ভালোবাসা সেই বিশ্বাসের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। কবিতাও তাই। যে শিশু দোলনায় দুলছে, সে তার দোলনটুকু দিয়ে দিচ্ছে—অত্যন্ত সাধারণ ভাবে বলা এ কবিতা, মুহূর্তে, এমন দ্যুতি, এমন আলোর প্রকাশ ঘটায়, যার বর্ণনা করা যায় না। যা অনির্বচনীয়। আর, এ কথাও মনে রাখতে হবে, নতুন মন্দির তৈরি হোক, এটা কিন্তু সকলে চায় না। তাই একজন অনিচ্ছুকও এ কবিতায় আছে। যে তার দারুণ অনিচ্ছা দিল। দিয়ে, শেষ পর্যন্ত মন্দির সুদৃঢ় করে তুলল।

আমরা বেঁচে আছি, কিন্তু সবই আমার ইচ্ছে আর পছন্দ অনুযায়ী চলবে কেন চারপাশে? বরং সেটা না হওয়াই তো স্বাভাবিক। হাত পেতে তবু মোহর নেব, কাহন নেব, কারণ আমাকে মন্দির গড়তে হবে। সারাজীবন ধরে লেখার সঙ্গে থাকা, সে তো এক মন্দির নির্মাণই। তেমনই অনিচ্ছাও নেব অপরের। অভিযোগও নেব। বিরুদ্ধতাও নেব। সব দিয়েই তো মন্দির, মানে আজীবনের কবিতা-সঙ্গ তৈরি হবে। কবিতা-লেখা যেমন একরকম কবিতার সঙ্গে থাকা—না লেখার সময় থাকাটা তো আরও কঠিন। সেই সময়টাও কবিতাকেই ধরে থাকব—মোহর, কাহন যদি দান হয়, সমর্থন হয়, বিরুদ্ধতাও একরকম দান, অনিচ্ছাও। সব দান একটি বড়ো চাদরের মাঝখানে জড়ো করে রাখব। সেই চাদর হল জীবন। ফিরে অভিযোগ করব না। হাসিমুখে বিরুদ্ধতা, অনিচ্ছাও নেব। যে যা দেয়। রাস্তা দিয়ে চলেছি দান নিতে নিতে। দু-দিকের বাড়িগুলো থেকে আশীর্বাদ পড়ছে, ভালোবাসা, প্রেম এসে পড়ছে চাদরের মাঝখানে। এসে পড়ছে কষ্ট, ক্ষোভ, অপমান, বিরূপতা, বিদ্রুপ, অননুমোদন। সবই নেব। নইলে মন্দির হবে কী করে? আত্মহত্যার কথা ভাবব না। কেন ভাবব? ওই যে শিশুটি দোলনায় দুলছে, সে তার দোলনটুকু দিয়ে দিয়েছে না আমাকে? আমার মন্দির তৈরির জন্য! আমার আর অভাব কোথায়?

তখন রোদ্দুরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাব অলোকরঞ্জনের এই কবিতাকে, যেখানে আকাশভরা কবিতার স্টল :

অমনোনীত

দেখেছো দিগন্ত আজ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করেছে?
এক একরকম মেঘ জেগে আছে এখানে-ওখানে,
আমার কবিতা ওরা প্রকাশ করেনি এ সংখ্যায়,
শুধুই তোমার ছবি সবগুলো স্টলে শোভা পায়,
আমি আজ আমার এই অমনোনীত হবার মানে
বুঝতে পেরেছি। এত আনন্দেও লজ্জাহীন যেচে
একবিন্দু ঈর্ষা কেন থেকে-থেকে ধমনী কাঁপায়!
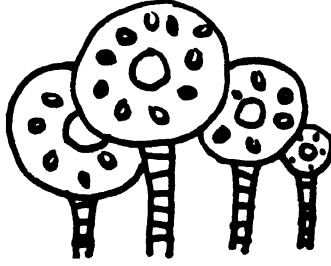
২৩

'...আজকে দুজনে তারা চিরস্থায়ী পৃথিবী ও আকাশের
পাশে আবার প্রথম এল...'

দুজন: জীবনানন্দ দাশ

সেদিন একটি লেখা পড়ে ভালো লাগল। নবীন এক সাহিত্যিকার লিখেছে, তার কয়েকটি স্বপ্ন নিয়ে। স্বপ্ন বলতে স্বপ্নই, পরিকল্পনা নয়। পরিকল্পনাকেও তো মানুষ অনেক সময় স্বপ্ন বলে উল্লেখ করে। যেমন ধরো, তোমার অনেক দিনের স্বপ্ন একটা ইস্কুল বানাবে। বা সুইৎজারল্যান্ড যাবে। বা শচীন তেন্ডুলকরের সঙ্গে দেখা করবে। এগুলো এক ধরনের আশা-ভাবনা, কিন্তু স্বপ্ন বললে অন্যায় নেই। আমি যে-লেখাটির কথা বলছি, সেটা অবশ্য ঘুমের মধ্যে একজন যে-স্বপ্ন দ্যাখে, তাই নিয়ে লেখা। স্বপ্ন সম্পর্কে প্রবন্ধ নয়। নিজের দেখা কয়েকটি স্বপ্ন, যেমন যেমন মনে আছে, সেটুকুরই বিবরণ লিখেছে সে। সংক্ষিপ্ত লেখা। কিন্তু মনে সোজা ঢুকে পড়ে। কারণ সত্যি কথা লিখেছে তো!

আমি তাকে নাগালের মধ্যে পেয়েই আমার স্বভাব অনুযায়ী হাত-পা ছুঁড়ে খুব বলতে লাগলাম, এমন স্বপ্নের কথা কি তোমার আরও মনে আছে? সে নম্রভাবে জানায়, যে, স্বপ্ন তার খুবই মনে থাকে, মাথা থেকে বেরতেই চায় না সকালের দিকে, এটা তার একটা সমস্যা। তা ছাড়া, রোজই সে ঘুমে স্বপ্ন দেখে। আমি বলে বসলাম, এইগুলো লেখো না! গদ্যে এরকম ছোটো-ছোটো স্বপ্নবিবরণ? খানিকটা রোজনামচার ধরনে, তারিখ দেওয়ার দরকার নেই। ছোটো একটা বই হতে পারে বেশ। এক-এক পাতায় এক-একটা স্বপ্ন শুরু হবে। এক-দেড় পাতায় ছোটো ছোটো লেখা। সে অবাক হল। আবার বেশ একটা উৎসাহও জাগল তার মনে।

সামনে আমার আর এক বন্ধু বসেছিলেন। সে উঠে যেতে, বন্ধু আমার দিকে তাকিয়ে

বিস্মিত, এটা আপনি কী বললেন ওকে? এরকম লেখা তো আগে হয়ে গিয়েছে। আমি কিছুটা হতভম্ব। হয়ে গিয়েছে? মানে? বন্ধু বললেন, কেন, কাফকা? কাফকার ডায়রিতে কি স্বপ্নের ডেসক্রিপশন নেই? স্বপ্নের পর স্বপ্ন? পাতার পর পাতায়?

আমি সত্যিই একটু বিপন্ন হয়ে পড়ি। বোঝানোর একটা দুর্বল চেষ্টা করি। যে, আমি যেমন বইয়ের কথা ভাবলাম, তাতে ডায়েরির মতো কিছু থাকবে না। কবিতার বই যেমন আমরা পাতা উলটে, একপাতা, দেড় পাতার একটি কবিতা পড়ি, দু-তিনটি কবিতা পড়ে তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকি বই কোলের ওপর উলটে রেখে—পরে, আবার পড়ি, বা আর পড়ি না—এটাও তেমন একটা বই হোক। তবে, কবিতা বা গল্প নয়। কেবল একজন মানুষের টুকরে-টুকরো স্বপ্নবিবরণ। এই বইয়ের কোনো শুরু বা শেষ থাকবে না। স্বপ্নের যেমন প্রথম দৃশ্য, শেষ দৃশ্য থাকে না। স্বপ্ন যেমন হঠাৎ মাঝখান থেকে শুরু হয়ে যায়। হঠাৎই একসময় ঘুম ভেঙে শেষ হয়। এ বইও হবে অনেকটা তেমন।

বন্ধু মানলেন না। তাঁর এক কথা, কিন্তু এটা তো আগে হয়ে গিয়েছে। ভুল পরামর্শ দিলেন আপনি মেয়েটিকে! সে খেয়ালবশে লিখে পত্রিকায় বের করেছে, ওই যথেষ্ট। যে-ধরনের লেখা আগে হয়ে গিয়েছে, তা আবার লেখা ঠিক নয়। সবাই বলবে কাফকার প্রভাব। তা ছাড়া, কোন প্রকাশকই বা ছাপতে রাজি হবে এমন উদ্ভট বই?

এটা অবশ্য আমি এক কথায় মেনে নিলাম। কে ছাপতে রাজি হবে, ভেবে দেখিনি। মাথায় একটা কবিতার লাইন যখন আসে, তখন এটা কোথায় ছাপতে দেব, তা আগে না-ভেবে কবিতাটা পুরো লেখার কথা ভেবেছি। সারাজীবন। সকলেই তাই ভাবে। বইয়ের পরিকল্পনাও তাই। মনের মধ্যে বইটা জন্মায়। লেখা শুরু করার পর জন্মায়। লিখতে লিখতে জন্মায়। পুরো বইটা। বা আদল পেতে থাকে। অনেক সময় কয়েকটা লেখা হয়ে যাওয়ার পর জন্মায়। বই, মনের মধ্যে জন্মায়। বাস্তবে সম্পূর্ণ লেখা হতে যদিও তার অনেক দেরি তখন।

ঠিক এই অনুভূতি আমার অন্যের সম্পর্কেও হয়েছে। কয়েকটা কবিতা, এমনকি, গল্প পড়েও মনে হয়েছে, এই নিয়ে একটা বই হতে পারে তো—আরও কিছু লেখা তৈরি হলেই, বইটা রূপ পাবে। অন্যদের বইকেও, আমি কখনো-কখনো, নিজের মনের মধ্যে, জন্মাতে দেখেছি। আর, সে সময়টা আমি যে ধরনের পেশায় যুক্ত ছিলাম, তাতে এই ধরনের অভিজ্ঞতা বারবার ঘটত।

এও একরকম সাহিত্য-সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা। নিজে কবিতা লিখতে লিখতে, যেমন হঠাৎ একটা বইকে মনের মধ্যে দেখতে পাই—কয়েকটা কবিতা একত্রে, ছেপে-সেলাই করে, বার কবা নয়—এ অনেকটা বিশেষ কোনো রাগরূপের মতো, যার কেন্দ্রে থাকে বিশেষ স্বরসমষ্টি, এ ক্ষেত্রে ভাবনাসমষ্টি—তেমনই, কয়েকটি লেখা পড়ে, অন্যের বইকেও মনের মধ্যে অনুভব করা যায়। পরে যখন সেই সব বই প্রকাশিত হয়েছে, তখন, একলা মনে একটা আনন্দ হয়, স্বপ্নপূরণের আনন্দ, আর এই স্বপ্ন হল আসলে পরিকল্পনা বা আশা-ভাবনা।

এ হল এমন একটা আশা, যাতে অনেকটা যেন নিজে-লেখার খুশিও মিশে থাকে, পরোক্ষ একটা সৃষ্টিচঞ্চলতা। একটা সুতো কাউকে হাত থেকে দিয়েছেন, আর সে সুতো নিয়ে দৌড়ে মাঠ পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল, যা আপনার দৃষ্টিসীমায় নেই, কিন্তু, ঝাপসা-মতো কিছু একটা অনুমান-কল্পনা আপনার আছে—তারপর সে যখন ফিরে এল, সেই ছেলে বা মেয়েটির উজ্জ্বল পরিশ্রান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে, আর তার পাণ্ডুলিপি পড়তে পড়তে মন ভরে উঠল—নানা অপ্রত্যাশিতকে সে ধরে ফেলেছে, এইটা দেখার উত্তেজনায়। তখন, অনেকটা যেন, বিপ্লবস্পন্দিত বুকে মনে হল আমিই লেনিন।

কারও মনে হয়তো কোনো একটি বিষয়ের উন্মেষমাত্র হয়েছে, একটু একটু সে দেখতে পাচ্ছে, দেখতে যে পাচ্ছে, নিজে হয়তো তত গুরুত্ব দিচ্ছে না সেই দেখাটাকে, ভাবছে, এ তো আর এমন কিছু নয়। কিন্তু তোমার যদি ভালো লাগে সেটা, তাকে যদি সেদিকে একটু ঠেলে দিতে পারো, তাহলে, এমন হতে পাবে, সে নিজের ভেতরে অবস্থানকারী সেই বিষয়কে পুরোটা না হোক, অনেকখানি তুলে আনল। তুলে আনতে গেলে তো নিজের ভেতরকার সেই খনিগহ্বরে নামতে হবে, সেই খননের পরিশ্রমটুকু তাকে দিয়ে করাতে পারলে—তুমিও অবাক, সে-ও অবাক। আর দেখা গেল, পূর্ণাঙ্গ একটি উপন্যাসই হয়তো লেখা হয়ে গিয়েছে। সেই লেখক, নিজেও ততটা ভাবেনি। ভাবেনি যে, এমনটা হবে। লিখন-অভিজ্ঞতার এও এক পরোক্ষ আস্বাদন। পরোক্ষ আস্বাদনেরও একটা আনন্দ-উত্তেজনা আছে, তা তো বললামই। আমি কি তারই বশবর্তী হয়ে, এখন, এই মেয়েটিকে ভুল দিকে চালিত করলাম?

কিন্তু, কাফকার মৃত্যুর বাহান্ন বছর পর জন্মেছে মেয়েটি। পশ্চিমবাংলার জেলা শহরে। কাফকার লেখার সময়, আর এর সময়, কত আলাদা। কত আলাদা দুই দেশব্যবস্থা, জীবনযাপন, বেঁচে থাকা—কত দূরবর্তী। সবচেয়ে বড়ো কথা, তিনি, কাফকা, একজন পুরুষ, আর সে নারী—ইত্যাকার প্রভেদের সারণি মনে মনে গড়ে তুলতে তুলতে খেয়াল হল, আমার বন্ধুও তো উঠে গিয়েছেন কখন। তাঁকে বলা হল না। কিন্তু তাঁর বলা কথাটা মনে ঘুরতে লাগল। এ বিষয় নিয়ে লেখা তো আগে হয়ে গিয়েছে। এই যে কথাটা মাথায় ঘুরতে লাগল, তার একটা কারণ আছে। কারণটি হল, এই 'বিশেষ' কথাটি আমি আগেও শুনেছি। অনেকবারই শুনেছি। আমার বয়স যখন ২৩/২৪, তখন আমাকে উৎসাহ দিয়েছে, আমাকে লিখতে শেখানোর চেষ্টা করেছে অনেকেই। তাদের কারও কারও পত্রিকায় তারা যত্ন করে আমার লেখা ছাপিয়েছে। তাদের অনেকের মুখে এ কথা শুনতে শুরু করি তখন। কয়েকজন যুবক একটি পত্রিকা বার করত, দু-তিনবার আমার কবিতা ছাপিয়েছে সেখানে, সেই '৭৬-'৭৭-'৭৮ সালে, আমি কৃতজ্ঞচিত্তে মাথা নীচু করে তাদের কথা শুনতাম। তারা বলেছিল, আমাদের লেখা (তাদের লেখা) শক্তি-সুনীলের স্টাইলের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ। আমরা ফিফটিজের ধারাটাকে পালটে দেব। আমরা ওদের মতো লিখি না।

আমি অবাক হয়ে ভাবতাম, কিন্তু বলতে সাহস পেতাম না, যে, শক্তি ও সুনীল তো

একটাই স্টাইল নন। দুজনে কত প্রবলভাবে আলাদা। শক্তি একাই তো কত ধরনের কবিতা লিখেছেন। তা ছাড়া ফিফটিজের মতো মানে কী, তাও বুঝতাম না। আলোক সরকার বা উৎপলকুমার, অলোকরঞ্জন বা বিনয় মজুমদার, তারাপদ বা প্রণবেন্দু বা শঙ্খ ঘোষ—এঁদের কি এক নিশ্বাসে উচ্চারণ করে সকলকে একটাই ধরন বলে চিহ্নিত করা যায়? কিন্তু এসব প্রশ্নের আগে একটা প্রশ্নই বড়ো হয়ে উঠল মনে। তা হল—কোনো মানুষ যে লেখে, তা কী জন্য লেখে? কারও মনের মধ্যে একটা আগুন জ্বলছে, একটা প্রবল অস্থিরতা—তা হয়তো কোনো বলতে না-পারা তীব্র আনন্দ, তা হয়তো কোনো তীব্র অপমান—তাকে প্রকাশ করার জন্য, তাকে প্রশমিত করার জন্য লেখে। হয়তো বাস্তব অবস্থাটা কিছুই বদলায়নি তখনও, কিন্তু লিখে ফেলার পর যন্ত্রণাটার একটা উপশম আসে। কারও মন গভীর কোনো দুঃখে স্থবির হয়ে আছে, কোনো শোক পেয়েছে সে, কারও সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না, প্রতিবেশী বা আত্মীয়স্বজন সান্ত্বনা দিতে এলে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে, তখন, একটা কাগজ টেনে কয়েক লাইন লিখে ফেলল হয়তো। অর্থাৎ মনের মধ্যে কোনো আলোড়ন বা আগুন বা আদিগন্তভাসমান স্থির-দুঃখ, অথবা মানুষের হাতে মানুষের নিধন দেখে কিচ্ছু করতে না পারায় অসহায় যন্ত্রণা—এইরকম কোনো কিছু প্রকাশ করার জন্য সে লেখে? নাকি বিশেষ একটা কবিতা-স্টাইলের প্রতিবাদে আরেকটা কবিতা-স্টাইল বানাব বলে লেখে? মনের কোন জায়গা থেকে লেখাটা জন্মায়? ভেতরটা ছটফট করছে, নিরুপায় একটা অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে, নাকি কোনো একটা স্টাইলকে নস্যাৎ করব—এই জেদ থেকে? কী থেকে লেখে? এই প্রশ্নটা সেই বয়সেই জন্মাত মনে। এ কথা ঠিকই, লেখার সময় নিজের একটা ভাষা খুঁজতে হত, আজও কবিতা লিখতে গেলে খুঁজেতে হয়। হয়তো কারও লেখার স্টাইলের প্রতিবাদ করব বলে নিজে লিখতে হবে এটা ভাবিনি কখনও, তাই, আজও নিজের ভাষা খুঁজতে হয় আমাকে, খোঁজাটা শেষ হল না আমার। কিন্তু যে-প্রসঙ্গে এ কথাটা তুললাম, তা হল, 'আগে হয়ে গিয়েছে'। সেই যুবকদের কাছেই প্রথম শুনেছিলাম, 'এ বিষয় নিয়ে লেখা আগে হয়ে গিয়েছে' এই ধরনের কথা। আমি অবশ্য তাদের মুখের ওপর তর্ক করিনি। শুনে গিয়েছি। বোঝার চেষ্টা করেছি। তারপর কবিতা যখন লিখতে বসেছি, দেখেছি, জীবনের সেই সময়কার অভিজ্ঞতা প্রভুত্ব করছে আমার ওপর, ওদের বা অন্যদের পরামর্শ-কথা মনে থাকছে না। যা লিখছি সেটাই একটা অজানার দিকে টেনে নিচ্ছে। কিন্তু, কে বলবে, আমি সারাজীবন ভুল পথেই চলিনি? ওরা যা বলত, বা ওদের মতো আরও অনেকে, কিংবা আমার বন্ধু এইমাত্র যা বললেন—এ বিষয় নিয়ে আগে লেখা হয়ে গিয়েছে— সেটাই হয়তো ঠিক। সেই দৃষ্টিভঙ্গিটাই হয়তো নতুন নতুন কাব্য আন্দোলনের জন্ম দেয়। আবার—আমি কোনো কাব্য আন্দোলনে অংশ নেব—এই ধরনের চিন্তা যে ব্যক্তি করে না—সে কি তবে লিখবে না, সে কি তবে লেখালেখিতে আসবে না?

ভরত দে বলে একজন ছিলেন, চুঁচড়ো-চন্দনগর ওই দিকে কোথায় যেন একটা থাকতেন। তিনি যে কোনো একটা পত্রিকা খুলেই, যার যে কবিতা দেখতেন, বলতেন,

ভালো, কিন্তু এ তো আগেই লেখা হয়ে গিয়েছে। শান্তভাবে বলতেন। বলে মিটিমিটি হাসতেন। শেষে এমন দাঁড়াল, আমি যখনই কিছু লিখতে যাই—দু-একলাইন লিখেই—ভরত দে-র হাসিটা দেখতে পাই। ভাবি, এটা আগে লেখা হয়ে গিয়েছে কি? লেখা থেকে উঠে পড়ি। শেষমেশ দেখলাম, হয় কবিতা লেখা বন্ধ করতে হবে. নয়তো ভরত দে-র সঙ্গে যোগাযোগ। দ্বিতীয়টাই করলাম। সেটা '৭৯।

কিন্তু, আজ, আমার বন্ধু যা বললেন, তাতে অন্য একটা দুশ্চিন্তা হল। আমি হয়তো ভুল পথে হেঁটেই লেখা-জীবন কাটালাম। সেটা আমার জীবন। তার দায় আমি নিতে পারি। কিন্তু মেয়েটিকেও আমি ভুল পথে ঠেলে দিলাম না তো! সে হয়তো আজ আমার বয়স আর অভিজ্ঞতা মান্য করে চলে গেল। সেও একদিন আমার বয়সে পৌঁছোবে। তখন তার হয়তো মনে হবে, আমি তাকে ভুল পথনির্দেশ দিয়েছি। যা লেখা হয়ে গিয়েছে, তা-ই আবার লিখতে বলেছি।

আসলে, কী নিয়ে লেখা হয়নি, তা কী করে জানব! প্রতিটি সূর্যাস্ত পুরোনো। প্রতিটি সূর্যোদয় অতীত। বহুকাল ধরে ঘটছে। বহু লোক দেখছে। সে সব লোকের মধ্যে লেখকরাও আছে। আমি জন্মাবার আগে আমার বাবা-মা প্রেমে পড়েছিলেন। কত কত যুগযুগান্ত ধরে পুরুষ-নারী একে অপরের প্রেমে পড়েছে। মাতৃশোক, পিতৃশোক, বন্ধুশোক পেতে পেতে চলেছে হাজার হাজার মানুষ। প্রতিটি সমুদ্রই আমার আগে অন্যরা দেখে ফেলেছে। প্রতিটি পাহাড়। আমার আগেও বিবাহিত অবস্থায় অন্য নারীর প্রেমে পড়েছে পুরুষ। আমার আগেও অন্যের প্রেমিকার প্রেমে ধন্য ও ছিন্নভিন্ন হয়েছে বহু পুরুষ। তাদের মধ্যে অনেকেই লেখক। আমি কী করব? কোনো কিছুই কেবল আমার জন্য, একাকী আমার জন্য রাখেননি বসুন্ধরা। সব সব সবই, আগে হয়ে গিয়েছে। এমনকি, আমিও পৃথিবীতে প্রথম জন্মালাম তা নয়, প্রথম মা বলে ডাকলাম, তা নয়। আর এ কথাও জোর দিয়ে বলবার নয়, আমার মৃত্যুটিও পৃথিবীতে প্রথম মানব-মৃত্যু হবে। সবই আগে হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু আমার মা যখন আমার হাতের ওপর কুড়ি মিনিটের মধ্যে মারা গেলেন, তখন আমি মৃত্যুকে বুঝলাম। মাতৃশোক বুঝলাম। জগতে আমিই তখন প্রথম। যে মাতৃশোক পেল। আমার ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতা প্রথম ঘটল, তাই নতুন। তার আগে বাবা গেছেন। বাবা যখন গেলেন, তখন বাবার ঘুমন্ত মুখ আর বেঁকে যাওয়া পা, আজও আমার মনে আছে। কারও পিতৃবিয়োগ হয়েছে শুনলেই এই ৪৭ বছর ধরে সেই মুখ আর পা আমার মনে পড়ে। এটা কি আগে হয়ে গিয়েছে? এই অনুভূতির জাগরণ? এই স্মৃতিচিত্রের উদ্ভাস? অন্যদেরও কি এমন ছবি মনে পড়ে নিজের চলে যাওয়া বাবা-মা সম্পর্কে? তা হলে কি আর আমার সেটা লেখার অধিকার রইল না? অন্যদের জীবনে হয়ে থাকতেই পারে, আমার জীবনে প্রথম, বারবার প্রথম। বাবা যাওয়ার পর মায়ের শোক নতুন হয়ে এল। আমার দ্বিতীয় শোকও নতুন। শক্তিদা বা সুভাষদা চলে যাওয়ার সময়ও শ্মশানে গিয়ে আমার বাবার শ্মশানযাত্রা মনে পড়েছিল। আমার প্রত্যেকটি শোক নতুন। আমার প্রত্যেকটি

প্রেম নতুন। প্রতিটি সূর্যাস্ত আমার কাছে এইমাত্র সম্ভব হল। এইমাত্র ঘটল প্রতিটি সূর্যোদয়। যদি আমি তা অনুভব করতে পারি, তবেই নতুন। যদি সেই অভিজ্ঞতাকে সর্বস্ব দিয়ে দিতে পারি, তবে তা নতুন। আগে লেখা হয়ে গিয়েছে, ভেবে যদি আমি দ্বিধা করি, তবে অভিজ্ঞতাকে বুক পেতে নিতেই পারব না কক্ষনো। তাকে, অভিজ্ঞতাকে, পার হতে গেলেও, তাকে বুকে ধরেই পার হতে হয়। সন্তান জন্ম দেওয়ার অভিজ্ঞতা তো চিরকাল কত নারীরই হয়েছে। লেখকরা তা নিয়ে লিখেওছেন। যেমন লিখেছিলেন গীতা চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'অপত্য' কবিতায় :

'...দেখা দেবে পৃথিবীর শেষ, প্রাথমিক / বিস্ময়, বৃহৎ মাথা ছাদ জাগছে নীলের ফোকরে / হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরছে আকাশ : শূন্যের স্বভাবী না / পা দিয়ে ঠেলছে মাটি, মুক্তি দে মুক্তি দে পিশাচিনী, / রক্তের প্রথম ভাগ দুধে রাখি : মা তুই বলবি না?'

পরবর্তী সময়ে মল্লিকা সেনগুপ্ত লিখেছিলেন এই অভিজ্ঞতা নিয়ে 'মোহ', 'কাঁচিজাতকের জন্ম', 'জন্মের ঘ্রাণ' বা 'রোহিতাশ্ব'-র মতো কবিতা। আর যশোধরা রায়চৌধুরী লিখেছিলেন পুরো একটি কবিতার বই: 'আবার প্রথম থেকে পড়ো'। আগে হয়ে গিয়েছে ভেবে এঁরা যদি পিছিয়ে যেতেন, আমরা কি তাঁদের এই অসাধারণ কবিতাগুলো পেতাম? অবশ্য লেখার সময় এসব ভাবা এঁদের পক্ষে সম্ভবই ছিল না। কারণ এঁদের ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতা ছিল প্রথম। প্রবল। অনন্য। সুতরাং—নতুন! কবিতাগুলি এই সাক্ষ্যই দেয়।

ভুল হোক, ঠিক হোক, অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতাই। লেখার জন্য কোনো অভিজ্ঞতাই ভুল নয়। জীবনের ভুল থেকে সার্থক লেখা জন্মাতে পারে।

মেয়েটিকে দেখা হলে বলব, কাফকা যে-স্বপ্ন দেখেছেন, তা কাফকার স্বপ্ন। তোমার স্বপ্ন আর কেউ দেখতে পারবে না। একমাত্র তুমিই দেখতে পারো। তুমি লেখো তোমার স্বপ্ন-সংকলন। তোমার ঘুমের মধ্যে ঢুকতে পারবে না জগতের কেউ। কারণ স্বপ্নের দ্বিতীয় দর্শক হয় না। তোমার পাঠককে তুমি স্বপ্নের ভিতরে ডেকে নাও। কেন-না, স্বপ্নের ভেতরই তুমি সবচেয়ে মুক্ত। সবচেয়ে স্বাধীন।
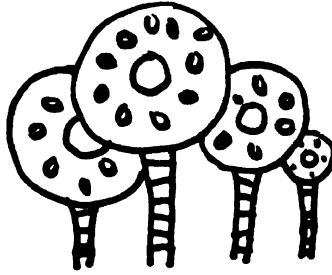
২৪

আজ বলব দাম্পত্যের কবিতা নিয়ে দু-চার কথা। কবিতা নিয়ে কোনো কথা বলতে গেলেই আমার যেমন একবার শঙ্খ ঘোষ মনে পড়েই, আজও তেমন পড়ছে, 'নিহিত পাতালছায়া'র কয়েকটি লাইন : প্রতি রবিবার তুমি নিজের মনের মতো সাজিয়েছ বাড়ি / আর কত দেরী আছে ভেবেছ আলতো ঠোঁটে গুনগুন গান / শুধু আমি কোনো দিন সময়ে ফিরি না / ঘর জুড়ে বেজে ওঠে টান...

স্বামীর বাড়ি ফিরতে দেরি করা আর ঘর জুড়ে এই যে 'টান' বেজে ওঠা, এটা যদি কোনো নারীর দিক থেকে দেখি, তাহলে এই কবিতাটি মনে পড়ে আমার :

পাখির সঙ্গে

পাখি এক পাখি দুই
কংক্রিটের ঘরে এক পাখিলতা প্রহরী আমার
সারাটা দুপুর একা সন্ধে একা ভাবি বয়ে যাব
ভাবি নষ্ট মেয়েদের মতো ইশারা ছড়িয়ে দেব জানলায়
রাত্রি দশটায় বাড়ি আসবে যে মানুষটা রাজ্য জয় করে
ভাবি তাকে শাস্তি দেব ফচকেমি করে
কাচের সন্ত্রান্ত ঘরে ঢিল ছুড়ে মেরে

সকালে কলেজ এক বিশ্রী কাজ, ভাবি ছেড়ে দিয়ে
গুজরাটি গ্রামে গিয়ে এক মাস থাকি
কাচফুলে রংফুলে রৌদ্রময় নকশার বিরাট চাদরে
সাদা শাড়ি পরে আমি নেচে উঠতেই

চারিদিকে ঘন হবে গাছ
দেবতারা ঝুঁকি মেরে বিস্ময়ে দেখবে
রুইতন হরতন ইস্কাবন চিড়ে।

পাখি এক পাখি দুই, দুলে উঠে বলে—
ওই তোর বর এল রাজ্য জয় করে।

মল্লিকা সেনগুপ্ত

কবিতার এই মেয়েটি স্বামীর জন্য একা একা অপেক্ষা করতে করতে অধৈর্য হয়ে উঠছে। অভিমান আর রাগ ঘন হয়ে উঠছে জীবনসঙ্গীর প্রতি। এভাবে সারা দিন একা একা কাটাব বলে একসঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি নাকি আমরা? এই একসঙ্গে থাকাটাই তখন বিয়ে-করা। এ কবিতাটি যখন রচিত, আজ থেকে প্রায় দুদশক আগে, তখনও তরুণ-তরুণীদের মধ্যে এখনকার মতো আইনি-স্বাক্ষর ছাড়া একত্র বসবাস স্বাভাবিক হয়ে ওঠেনি। যারা সারাজীবন দুজন দুজনের সঙ্গে কাটাতে পারব কি না এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারে না, তারাই ভাবে, এখন কিছুদিন একসঙ্গে থেকে দেখি। সুবিধে হলে জীবন কাটাব। নইলে আলাদা হয়ে যাব। এটা ভালো উপায়। কিন্তু, যারা মনে মনে এই সিদ্ধান্ত নিতে পারে—তারা আজও আইন-স্বাক্ষর করেই বসবাস করে। আমি তো তোমার সঙ্গেই থাকব ঠিক করেছি। তারপরেও বাড়ি ফিরতে এমন দেরি করার কী মানে! পাখিলতা আমার প্রহরী। একরাত্রি নিঃসঙ্গ কাটানোর একটি কবিতায় প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত লিখেছিলেন, আমার সঙ্গী নেই কেউ / আছে টেলিফোন। এখানে টেলিফোনের বদলে পাখিলতা। পাখি এক, পাখি দুই দিয়ে কবিতাটি শুরু। ঘর সাজানোর নানা জিনিস পাওয়া যায় দোকানে। তাই দিয়ে মেয়েটি সাজিয়েছে তার সংসার। হয়তো নতুন সংসার। 'প্রতি রবিবার তুমি নিজের মনের মতো সাজিয়েছ বাড়ি'—এই লাইনটি এবার, পরবর্তী কালের এক মেয়ের জীবনে সত্য হয়ে দেখা দিচ্ছে—যদিও এটা রবিবার কি না সেটা আমরা জানি না, সেটা জানা জরুরিও নয়। এখানে মেয়েটির অপেক্ষাই কবিতার বিষয়।

এই ঘর সাজাবার পাখি আমরাও দেখেছি পড়শি-বাড়িতে। ঘণ্টা লাগানো পাখিরা এক দুই তিন করে চমৎকার পাটের রঙিন দড়ি-সুতোয় ঝুলে থাকে। হয়তো বুকশেলফের সামনে। হয়তো ছাদের কাছ থেকে টাঙানো। অবিকল কীরকম এই পাখির গুচ্ছ, তা না-জানলেও, আন্দাজ করা যায় কাঠের তৈরি অথবা প্লাস্টিকের। এই রংচঙে পাখিগুলো জানলা দিয়ে হাওয়া এলেই দুলতে থাকে। আর হয়তো টুংটাং করে ঘণ্টি বেজে ওঠে ওদের দুলুনিতে। ভারি সুন্দর কোমল এক জলতরঙ্গের মতো ঘণ্টাধ্বনি ওঠে।

এই দোদুল্যমান পাখিরা, এবং কোমল ঘণ্টাধ্বনিই মেয়েটির অপেক্ষার একমাত্র সঙ্গী। স্বামী কাজ থেকে ফিরতে দেরি করছে, মেয়েটির রাগ বেড়ে দুঃখে আবার দুঃখ বেড়ে গিয়ে রাগে যাতায়াত করছে। মেয়েটির জীবনতথ্যও একটি অর্ধপঙ্‌ক্তিতে বলা আছে।

'সকালে কলেজ এক বিশ্রী কাজ।' অর্থাৎ সকালে তাকে কলেজে যেতে হয়। 'বিশ্রী কাজ' কথাটি বোঝায় এই মেয়েটি ছাত্রী নয়। তাই এই কাজ ছেড়ে দিয়ে গুজরাটি গ্রামে চলে যাওয়ার কথা ভাবে। পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়ার কথা কেউ ভাবে না সচরাচব। কিন্তু, চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথা প্রায়ই ভাবে। যদিও বাস্তবে করে উঠতে পারে না, কিন্তু ভাবে তো। তা ছাড়া আগেই মেয়েটি বলেছে, আমিও তরুণী আজও। ছাত্রী হলে, নিজেকে 'আজও তরুণী' বলে দাবি করতে হত না। অর্থাৎ তুমি যে এত দেরি করছ বাড়ি আসতে, আমি কি আর তরুণী নই মনে করো? এসব হল অভিমানের ভাবনা। মেয়েটির সারা দিনের অপেক্ষার মধ্যে মধ্যে, ভাবনার মধ্যে মধ্যে, ওই পাখিগুলো দুলে দুলে উঠছে হাওয়ায় আর ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছে, ওরা সেই হিসেবে প্রায় ঘড়ির মতো, কিন্তু ঘড়ি নির্দিষ্ট সময় অন্তর শব্দ করছে। আর এই পাখিলতারা হাওয়া এলেই শব্দ করে। আর হাওয়া তো যখন ইচ্ছে আসছে যাচ্ছে। কিন্তু বরের বাড়ি ফেরার নাম নেই। এই কবিতায় 'প্রহরী' শব্দটি ভারী মজার । একা বউকে বাড়ি রেখে গিয়েছ—প্রহরী কারা? না, ওই পাখিগুলো। যারা কাঠের বা প্লাস্টিকের পাখি। কিন্তু 'পাখিলতা' শব্দটিতে এক সৌন্দর্য আসে। পাখিগুলো দড়ি-সুতোয় বাঁধা, ফলে তারা যেন লতা। ঘরের লতানে গাছ। দ্বিতীয় লাইনে এই পাখিলতার মধ্যে গাছ আর পাখিকে ডেকে আনা হয়েছে কংক্রিটের ঘরে। ধরা যাক শহরে। আর এই একা একা অপেক্ষারত বধূটির মনে ধীরে ধীরে রঙিন অরণ্য জন্মাল। কবিতাটির শেষ প্রান্তে যেতে যেতে আমরা দেখলাম ওই শহরের দুপুরবেলায়, ওই কংক্রিটের ঘরে কী কী ঘটল। জাগ্রত স্বপ্নের মতো কাচফুলে রংফুলে নকশার বিরাট চাদরে মেয়েটি সাদা শাড়ি পরে নেচে উঠছে—উঠতেই—চারিদিকে গাছপালা ঘন হয়ে এল। ঘন হয়ে আসার মধ্যে প্রিয়-সঙ্গ প্রিয়-নৈকট্যের আভাস। গাছ হল প্রকৃতি-নিবিড় এক মুক্তি। অথচ মেয়েটি কিন্তু একাই সেই মুক্তির মধ্যে চলে গিয়েছে। ওই কংক্রিটের ঘরে অপেক্ষা করতে করতে এক অপরূপ সৌন্দর্যের জগৎ সে সৃষ্টি করে নিচ্ছে নিজের চাবপাশে। তার যে অত রাগ-দুঃখ হয়েছিল একটু আগে, সে যে বরকে 'শাস্তি' দেবে বলে নানা উলটোপালটা ভাবছিল সেইসব মিলিয়ে গেল ওই পাখিদের দুলে-ওঠা ঘণ্টাধ্বনিতে। কেন না বড়ো শখ করে, আনন্দ করে ওগুলো পছন্দ করে এনে ঘর সাজিয়েছে সে। ওই পাখিদের দেখে তার প্রকৃতি মনে পড়ল। হয়তো তখনও পর্যন্ত অবরুদ্ধ, তখনও-প্রস্ফুটিত-না-হওয়া স্নেহ মনে এল। ওই কংক্রিটের ঘরের মধ্যেই সে একা একা রচনা করল এক সুন্দরের জগৎ, যা দেখবার জন্য এমনকি আকাশ থেকে দেবতারাও ঝুঁকে পড়লেন। ঘর হয়ে গেল স্বাধীন জঙ্গল। অরণ্য-রঙিন এই মুক্তির দিকে মেয়েটির মনকে নিয়ে গেল কয়েকটি ছোটো ছোটো কাঠের পাখি।

যে পাখিরা আবার ঘণ্টি বাজিয়ে দুলে ওঠে, তখন, অনুমান করা যায়, দরজায় বেল বাজে। পাখিসঙ্গিনীরা একেবারে শেষ লাইনে এসে কথা বলে। বা তাদের মুখ থেকেই আমরা কবিতাটির অপূর্ব সমাপ্তি উপহার পাই : ওই তোর বর এল রাজ্য জয় করে।' ভালোবাসতে পারলে, যে-কোনো বন্ধ ঘরেও মানুষ অরণ্য-স্বাধীন মুক্তি আনতে পারে—

কাঠের পাখির মধ্যে প্রাণ দিতে পারে, এ কবিতা তারই উদাহরণ হয়ে থাকে।

মল্লিকা সেনগুপ্তের অল্প বয়সের লেখায়, এই ঘর বাঁধার স্বপ্ন প্রথম দেখা দিয়েছিল, এইভাবে :

ঘর

বাঁশের মাচান বাঁধো সঙ্গমের আগে, ঘর হবে
পুত্র বেঁধে নেবো পিঠে

নদী দৃশদ্বতী আজও বইছে সেখানে, পাখি, নতুন উদ্ভিদ।

বৈবশ্বত পিতা আমাদের—আশীর্বাদ করো যেন এবারের শীতে
যাযাবর হয়ে আর বেরিয়ে না পড়ি।

মানুষ যখন যাযাবর ছিল, সে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াত। তার নারী, সে আর এভাবে জীবন-জীবিকার খোঁজে বারবার উদ্বাস্তু হতে পারছে না, ঘর চাইছে। ঘর বেঁধে নিতে চাইছে। নতুন স্বামীর কছে। নতুন কেন? ওই যে, বাঁশের মাচান বাঁধো সংগমের আগে। আগে ঘরের ব্যবস্থা হোক। মাথা গোঁজার ঠাঁই। তারপর মিলন। এখানে পুত্র বেঁধে নেব পিঠে এই ছবিটিতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর রূপ মনে আসে। চিরায়ত একটি চিত্র। এ লেখাকে যদি 'পাখির সঙ্গে' কবিতাটির পূর্বভূমিকা হিসেবে ধরে নিই, তবে 'পুত্র বেঁধে নেব পিঠে' এই স্বরসংগতিটিও পরে আরও বিস্তার পায় কয়েক বছর পরের কবিতায় যেমন এই মোহ :

মোহ

এমন একটি মধু সরোবরে ভাসছি
জলতলে যার একটিই নীল মৎস্য
হাসছে খেলছে লেজ নাড়াচ্ছে ছন্দে
জলে বিদ্যুৎ তোলে আসন্ন জন্ম।
একটি পুরুষ আমাকে রেখেছে আগলে
পাঁজর কাঠির শক্ত মধুর বাঁধনে
যেন দুটি হাত ঝড় ও ঝঞ্ঝা ঠেকিয়ে
বাঁচিয়ে রাখবে শ্যামাক ঘাসের মাটিকে
মা ও ছেলের জন্য সাজাবে নৌকো।

গর্ভের মধ্যে যখন সন্তান রয়েছে তাকে আগলে রাখার জন্য মায়ের শরীর-মন যেমন সাবধানী স্নেহে আকুল, তেমনি যে এইবার পিতা হতে চলেছে, তারও দুটি আকুল ও শক্তিমান বাহু নিজের নারী-শিশুকে আগলে রাখছে প্রাণপণ। এই কবিতার মধ্যেও স্বামীর যে রক্ষাকারী প্রহরী-ভূমিকা, তা স্পষ্ট—যে ভূমিকার জন্ম হয়েছে প্রেম ও স্নেহ থেকে—সঙ্গিনীর নির্ভরতাকে সম্মান ও স্থায়িত্ব দিতে। এর পূর্ণতর একটি রূপ আমরা দেখতে পাই 'জন্মের ঘ্রাণ' কবিতাটিতে। যা 'ঘর' কবিতাটির পরবর্তী চেহারা।

জন্মের ঘ্রাণ

গাজর রঙের জামা থেকে বেরিয়েছে
দুটো মাত্র হাত, তারা গর্ভজননীকে
জীবনবীমার মতো আগলে রেখেছে
হাত এত সাবধানী কখনও ছিল না।

কখনও ছিল না এত তিরতির করা
উদ্বেগ আকুতি তার চোখের মণিতে
আসন্ন জন্মের ঘ্রাণ নিতে নিতে যেন
এই কয় মাসে যুবা বয়স্ক হয়েছে।

যে আছে সে সরোবরে কুণ্ডলী পাকিয়ে
থাকে বাবা ও মায়ের ঠিক মাঝখানে
জলে ঘন অন্ধকার, তাও নড়ে ওঠে
আকাঙ্ক্ষা জলের সেই অলৌকিক মাছ।

জল ও মাছের শব্দের কান পাতে তবু
শুনতে পায় না কিছু চকিত যুবক
'আমার মতোই ওর এক কান বন্ধ হবে না তো!'
—বলে সে ডুকরে উঠে কোলে মুখ গোঁজে।

পেটে যেন ধুমধাম ভূমিকম্প হয়
মাছ চুমু দিতে চায় পিতার কপালে
তার মাথা আঁকড়িয়ে ধরে আমি ভাবি
আমরা কি তিনজন বীমা হয়ে উঠব কখনও?

এ থেকে শেষ চার লাইন যদি দেখি : গর্ভজলে সন্তরণশীল শিশুটিকে মাছের কল্পনায়

ঠিক এর আগের একটি কবিতাটিতে দেখতে পেয়েছিলেন মল্লিকা সেনগুপ্ত। এবং গর্ভস্থ শিশুর আলট্রাসাউন্ড স্ক্যান করাকে বিষয় হিসেবে ধরে নিয়ে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কেউই কবিতা লেখেননি। সেখানে যে শুশুক বা জলজীব হিসেবে তাকে দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনে সে-ই 'মোহ' কবিতার ছোট্ট মাছ, যেন তার এখনও পর্যন্ত না দেখা পিতাকে, মায়ের গর্ভের ভেতর থেকেই হাত দিয়ে জড়াতে চায়। কারণ পিতা তো তার আসন্নপ্রসবা রমণীকে সাবধানে সসংকোচে জড়িয়েছে শিশুকে স্পর্শ করবে বলেই। নারীটিও শিশুস্পর্শ উপহার দিতে চায় বলে এই যুবা শিশুটির মাথা দু-হাতে জড়িয়ে নিয়েছে—স্নেহের ধারা এখানে দ্বিমুখী। শিশুটি জন্মায়নি তখনও, তবু, একটি সম্পূর্ণ পরিবারের স্নেহমমতা নির্ভরতা প্রেম বাৎসল্যের অপরূপ স্বর্গ এই চার লাইনে ফুটে উঠতে চায়। কেবল একটি শব্দ, এখানে স্বর্গের কল্পনাদেশ থেকে এবং তার যাবতীয় ভাবাবেগ থেকে ছিঁড়ে এনে দৃশ্যটিকে দৈনন্দিন বাস্তবের মাটিতে আটকে দেয়। সেই শব্দটি হল 'বীমা'! এইখানেই এ কবিতা আজকের দিনের লেখা হয়ে ওঠে। লেখার প্রথম দিকেও 'জীবনবীমার মতো' কথাটা এসেছে। নিরাপত্তা, আর্থিক সাবধানতা বা চুক্তির ব্যাপারটা, হিসেবের ব্যাপারটা এই শব্দটি থেকে বড়ো আশ্চর্যভাবে রূপায়িত হয়। মাত্র একটা শব্দে! আর এই কুশলী শব্দপ্রয়োগ একটি যুগের মানসিকতাকে ধরে ফেলে। জীবন মানে মূলত যেখানে 'বীমা'। সমস্ত সুখ আনন্দ বাৎসল্য প্রেমের সঙ্গে টাকার ব্যাপারটা যে অঙ্গাঙ্গী জড়িত সে-ধারণা কবিতাতে সাধারণত বলা হয় না। এই 'বীমা' শব্দটির প্রয়োগ একটি বাস্তব ও ব্যাবহারিক প্রয়োজনের প্রসঙ্গ যুক্ত করে দেয় গভীর আকুলতার পাশাপাশি। এই আশ্চর্যসুন্দর এবং নিভৃত মুহূর্তেও কি এ কথা মনে আসে না যে, সন্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে টাকার প্রয়োজন! সুরক্ষা, নিরাপত্তার প্রয়োজন? এই বাস্তব জিনিসটি 'বীমা' শব্দে উপস্থিত থাকে। এই প্রয়োগও সম্পূর্ণ নতুন। এইভাবে পুরো বিষয়টিকে একটি অপ্রত্যাশিত শব্দের মধ্যে দিয়ে অন্য মানসিকতার স্তর থেকে দেখা—যা বাংলা কবিতায় আমরা আগে দেখিনি। উলটোদিকে ওই তিনজন, মা-শিশু-পিতা, এই তিনজনই আবার পরস্পরের 'বীমা' হয়ে ওঠে। বিমা হল এক ধরনের কনট্র্যাক্ট, সুরক্ষা-নিরাপত্তা সম্পর্কিত কনট্র্যাক্ট—আর আমাদের একান্ত সম্পর্কগুলোও যে আসলে কোথাও এক ধরনের কনট্র্যাক্ট—এ কবিতা, এই বিশেষ যুক্তিনিষ্ঠ বাস্তব বিষয়ে আমাদের সচেতন করে। আজকের সমাজের যে জীবনযাপন তার একটি বিশেষ ধরনের মনোভঙ্গি সম্পর্কে পাঠককে সচেতন করে। এইভাবে—জীবন কী, তার বৈচিত্র্য কত—তা কবিতা থেকে শিখতে পারি। নারীটি, সেই আদিম জনগোষ্ঠীর নারীটি, যে, ঘর বাঁধতে চেয়েছিল বাঁশের মাচান দিয়ে, পুত্র পিঠে বেঁধে নিতে চেয়েছিল, সে আজকের কংক্রিটের ঘরে, রাক্ষুসে শহরে, নিরাপত্তার খোঁজে ব্যাকুল। সেই পুরাকাল থেকে আজকের দিনে এসে পৌঁছোয় নারীটি। যাযাবর অবস্থা থেকে যে ঘর বেঁধে স্থিত হতে চেয়েছে সেই কত যুগ আগে থেকে। এই শহরে একটি সন্তান আসছে, সামনে তাকে বড়ো করার জন্য কত যুদ্ধ অপেক্ষা করছে কে জানে—তাই সুরক্ষা, তাই বিমা। সেদিনের নবীনা-মাতা থেকে আজকের

তরুণী-জননী, সেই একই নিরাপত্তার খোঁজ। এইভাবে এই চারটি মাত্র লাইনেই ব্যক্তিগতকে পার হয়ে, 'বীমা' কথাটির ব্যবহারে, মধ্যবিত্তের মধ্যে যে নিরাপত্তাহীনতা, তার মধ্যে ঢুকে পড়ে কবিতাটি। নিতান্ত আপন পরিবারের আবেগ-মুহূর্ত থেকে শুরু হয়ে তা পৌঁছোয় সকলের প্রয়োজনবোধে, সকল পরিবারের কবিতা হয়ে ওঠে। কারণ টাকা বিষয়ক উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা সব মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যেই রয়েছে। সাধারণ মানুষের এই আকুল স্নেহ-আকুলতা, নিরাপত্তাহীনতা ও ভবিষ্য-আশা এখানে চিহ্নিত হয়ে থাকে।

বাবা-মা-সন্তানের আরেকটি কবিতায় তবে যাই। এ কবিতাটি লিখেছেন মণিভূষণ ভট্টাচার্য :

যাপন

বেশ ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে, সোয়েটার খুলো না এখন।

এই যে, খেয়াল রেখো দুপুরে সেলুনে যেতে হবে।

এটা কী করেছ, কি-তে দীর্ঘঈ বসাবে মনে করে।

কী পড়বে, ভাবছ কিছু, পরশুদিন কবিসম্মেলনে?

পাখি হলে উড়ে যেতে, পাখি নও এইমাত্র জানি,
পা দুটি বাঁধা-ই আছে লতা দিয়ে, সঞ্জীবনী লতা।
এ সবুজে তৃষ্ণা নেই, আছে শুধু স্নিগ্ধ সমীক্ষণ।

গোলাপজামের ঘ্রাণ টিফিনেব বাক্সে পুরে নিয়ে
আমাকে লিখতে বলে ট্রেন ধরতে চলে গেলে তুমি।

ছেলের কলেজ নেই। লেখা থাক। আয় তো দুজনে গল্প করি।

সন্ধ্যার একটু পরে দক্ষিণের দরজা খুলে যাবে।

এ কবিতাতেও একজন প্রতীক্ষা করে বসে আছে। কখন অন্যজন বাড়ি ফিরবে। এবার অপেক্ষারত মানুষটি স্বামী। স্ত্রী গিয়েছেন বাইরে, কাজে। কিন্তু সে-অপেক্ষার কথা আমরা জানতে পারছি, কবিতার শেষ দিকে এসে। তার আগে এক এক লাইনের পর একটি করে স্পেস। লাইনগুলো এক একটি সংলাপ। প্রথম চারটি লাইন। স্বামীটির সমস্ত কিছুতে

খেয়াল রাখেন স্ত্রী। বোঝা যায় স্বামী-মানুষটি কিছু-বা আপন-ভোলা। ভুলে যান কীসে ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। কিংবা এবার সেলুনে যাওয়া দরকার। এমনকি কবি সম্মেলনে কী কী লেখা পড়বেন, তা-ও স্থির করে উঠতে পারেন না। একবার হয়তো ভাবলেন, এইটা পড়ি। পরক্ষণে ভাবলেন, না থাক এটা। ওই দুটো পড়ব'খন। শেষ মুহূর্তে হয়তো সিদ্ধান্ত বদলালেন আবার। এমন মানুষকে একটু দেখে-শুনে না রাখলে হয়? এই স্নেহ-উদ্‌বেগের স্পর্শ কবিতাটির প্রথমদিকে নরম ছায়া বুলিয়ে যায়। এক এক লাইনের স্পেস হয়তো এ-জন্যও যে কিছুক্ষণ পরপর এসে স্বামীকে দেখে যাচ্ছেন স্ত্রী—এমনকি, এই সংলাপগুলো কয়েকদিন পরপরও হতে পারে। এ কবিতাতেও পাখি আছে। লতা আছে। কিন্তু আগের কবিতায় যেমন দড়িতে বাঁধা কাঠের পাখিরা প্রেমের উদ্‌বোধনে প্রাণ পেয়েছিল, এখানে তেমন নয়। জীবন্ত মানবী যেন প্রায়-পাখি। যদিও, ছদ্ম-বিবৃতিতে বলা আছে পাখি নও, এই মাত্র জানি। অর্থাৎ ভেতরে যে কথাটি রয়েছে তা হল, পাখি নও, কিন্তু পাখির সমস্ত গুণ তোমার মধ্যে। এখানে পাখি কথাটি চঞ্চলতা আনছে না, আনছে স্নিগ্ধতা, কোমল স্পর্শ। আর এখানে যে লতা আছে, 'সঞ্জীবনী লতা', তাও তো ওই মানবী নিজেই। যিনি সারাক্ষণ নানা কাজের ফাঁকে ফাঁকে এসে—ওইজন্য স্পেস, ওই কাজের ফাঁকে ফাঁকে আসার জন্যই—স্বামীর খবর নিয়ে তারপর ট্রেন ধরতে চলে গেলেন, নিশ্চয় চাকরিতে। তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মানে, একটি সুগন্ধের সাময়িক অন্তর্ধান।

অন্তর্ধান? না, তা নয়। এই যে সারাক্ষণ মনে পড়ছে, সকাল থেকে, অথবা গত দুদিন কী কী বলেছেন তিনি—সেটাই তো তাঁর বাড়ি-থাকা।

শেষ লাইনের আগের লাইন খুবই সাধারণ ভাবে বলা। তবু কেন যেন, পড়া মাত্রই আমার চোখে জল এসে যায়। আয় তো দুজনে গল্প করি। এই যে সন্তান, সে সদ্যোজাত শিশু নয়। সে বড়ো হয়েছে, কলেজে পড়ে। পিতাপুত্র যেন দু-ভাই। দুই বন্ধু এখানে। দুজনে গল্প করছি আমরা বাপ-ব্যাটায়। আসলে কী করছি আমরা? না, তোর মায়ের জন্য অপেক্ষা করছি। বাবা-ছেলেব এই সৌহার্দ্যের ছবিটি জেগে থাকে আমাদের মনে। জেগে থাকে সেই অপেক্ষাটিও। যখন অফিস থেকে ফিরবেন সেই নারী, যার জন্য বাবা-ছেলে বসে আছে। তখন দক্ষিণের দরজা খুলে যাবে।

'ওই তোর বর এল রাজ্য জয় করে'। পাখিলতাদের মুখ থেকে শোনা এই কথা যেমন আমাদের দ্রবীভূত করে, নীরব এক আনন্দে ভিতরের পাথর গলিয়ে দেয় --তেমনই এই, 'সন্ধ্যার একটু পরে দক্ষিণের দরজা খুলে যাবে'—লাইনটিও। আমাদের সাধারণ জীবনের মধ্যেও যে অসামান্য সুখ-স্বর্গ তার নিবিড় স্পর্শ নিয়ে উপস্থিত হতে পারে, মল্লিকা ও মণিভূষণের এই কবিতাগুলি আমাদের মনে করিয়ে দেয়। আমাদের মনের ক্ষত যত, ক্ষতি যত তার ওপরে এসব কবিতা শুশ্রূষার হাত রাখে। এরা আরেকবার বুঝিয়ে দেয় আমাদের সামান্য জীবন আমরা ঘিরে রাখতে পারি নিজেদের মধ্যে থেকে উৎসারিত স্নিগ্ধ আলোয়। যে আলোর নাম পরিবার।
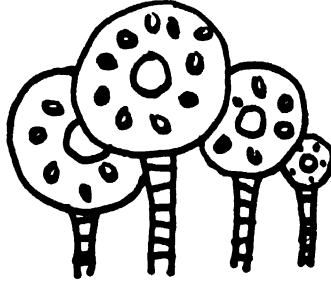
২৫

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মন পুরোনো হতে থাকে। তুমি তাকে বলো অভিজ্ঞ হওয়া। 'অভিজ্ঞ' কথাটা একটা ভালো উপাধি। পার পেয়ে যাওয়ার জন্য দরকার হয়। যেমন আমি, ইদানীং এটা ধরে পার হওয়ার চেষ্টা করি। যখন বয়স অল্প, তখন এই উপাধি সঙ্গে থাকে না। কেউ গুরুত্বও দেয় না। কিন্তু একটা জিনিস তখন সঙ্গে থাকে। একটা ঝকঝকে নতুন মন, সেই নতুন মনের ওপর যা কিছু এসে পড়ে তাকেই নতুন লাগে। যা ভালো লাগে তা অত্যন্ত ভালো লাগে, যা আপত্তিকর মনে হয়, তার প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে হয়। সেই মন-ই তখন নতুন একটা দেশ যেন। সে সব মনের কাছে এলে যথার্থই মনে হয় 'এলেম নতুন দেশে'। সেই মন, যা 'অভিজ্ঞ' উপাধিটি লাভ করেনি, সে তখন কেবল ভালোবাসে, বন্ধুত্ব করে, তেমনই কবিতাও লিখতে শুরু করে।

সেই বয়সে, মন যখন নতুন, তখন কিন্তু ভাষাটা নতুন হওয়া অনেক সময়ই মুশকিল হয়। কারণ যে কোনো বিদ্যা আয়ত্ত করতে তো সময় দরকার। রেওয়াজ করে করে গলা তৈরি না-করলে, যেমন স্বরস্থান নিখুঁত হয় না, হাত ঠিকমতো তৈরি না-করলে যেমন টিপ বা স্ট্রোক দুটিই সুরপূর্ণ আর ওজনদার হয় না, ভাষাও তাই। সংগীতে কিছু নিয়ম আছে। এক একটি রাগ, কত পুরোনো! কয়েকশো বছর বয়স তাদের। তাদের মধ্য দিয়ে নিয়মিত চলাচল করতে করতে, শুনতে শুনতে, একজন তার গলার সুর, আর গাইবার রাস্তা খুঁজে নেয়। কবিতার ক্ষেত্রে তো তেমন কিছু দেওয়া নেই। এই ওস্তাদের কাছে নাড়া বাঁধো। ওই ঘরানায় শেখো আগে। কবিতায় এমন কিছু পথও দেওয়া নেই। গুরুমুখী শিক্ষার রাস্তাও নেই এখানে। সে যতই নবাগত হোক না কেন, তাকে নিজেকেই সব করতে হবে। ভাষা খুঁজতে হবে। অন্যের মতো হয়ে যাচ্ছে কি না ভাবতে হবে নিজেকেই। প্রথম প্রথম হয়ে যাবেও তা। যেমন আমিই তো অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত আর রত্নেশ্বর হাজরাকে নকল করে কবিতা লিখতে শুরু করেছিলাম। রত্নেশ্বর হাজরার কবিতা বেরোল দেশ-এ :

বর্ণপরিচয়

ঘুরে গেলেই একটা ফাঁকা। আমি ফাঁকার মধ্যে দাঁড়িয়ে
মুঠো থেকে 'প' ছুড়ে দিই। প থেকে পৃথিবী এবং প্রশ্ন
প্রতিবাদ প্রতিশোধ এবং প্রেম ছড়িয়ে পড়ে—পড়তে পড়তে
প্রহর চলে যায়—
প্রেম শব্দে প্রভুর চেয়ে প্রেমিকা সহজ—যেহেতু প্রেম
সহজাত কবচকুণ্ডল সহজাত মৃত্যুবোধের সমান
যাকে চেনার ঢের আগে আমাকে ম নামক অক্ষর
শিখতে হয়েছে।
ম থেকে মধু মধুবাতা ঋতায়তে
মধুক্ষরতি মৃত্যু—আমি মৃত্যুকে দেখি কিন্তু চিনতে পারি না।

ছেলেবেলায় চ অক্ষর শিখতে শিখতে কেউ চাঁদ হয় কেউ চন্দন
আমি চাতক হয়ে উড়ে যেতাম চিহ্ন থেকে চিহ্নহীন একা—
জ-এর ওপর জাহাজ ভাসতো নদী পেরিয়ে সমুদ্রে
আমি জল চিনতাম।
জল চিনতে চিনতে জন্ম
জন্ম চিনতে চিনতে
আমি মৃত্যুর কাছে দাঁড়িয়ে থাকি—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে
বিন্দুর মতো চিহ্ন থেকে চিহ্নহীন—

এ-লেখা পড়ামাত্র আমি লিখলাম একটা কবিতা : 'একটি সূর্যাস্ত অথবা ম।' সে-কবিতা শ্যামলকান্তি দাশকে পাঠালাম। তখন আমার 'দেশ' বলতে শ্যামলকান্তি। সে নিজে দুর্দান্ত লেখে এবং তার কোনো পত্রিকা নেই। কিন্তু কাছে-দূরের লিখিয়েদের নিয়েই তার ঘর-সংসার। সে-ই সবার কাছ থেকে কবিতা নিয়ে নিয়ে এ-পত্রিকা ও-পত্রিকায় ছাপিয়ে দেয়। সে তখন আনন্দবাজার-এ চাকরিও পায়নি। সুতাহাটা নামক গ্রামে থাকে, তমলুক থেকে অনেক ভেতরে ঢুকতে হয়। আমার 'একটি সূর্যাস্ত অথবা ম' নামের কবিতাটাও ছাপিয়ে দিল শ্যামলদা—বিষ্ণু সামন্তের কাগজে। যেমন আমার অনেক কবিতা সে নানা জায়গায় ছাপিয়েছে। তখন আমার বয়স একুশ। কবিতাটা মোট তিন জায়গায় ছাপা হল। শ্যামলদা এখনও অল্পবয়সিদের কবিতা প্রকাশ করে, কিন্তু এখন তার নিজের একটা কাগজ হয়েছে। নামকরা কাগজ। 'কবিসম্মেলন'। নতুন কবিদের উৎসাহ দেওয়াটাকে সে এক ব্রত হিসেবে নিয়েছে। আজীবন।

পাড়ার মেয়ে শুভ্রা-শিপ্রা। বিকেলে তাদের বাড়ির গেট খুলে ভেতরে ডেকে নিচ্ছে অন্য দুই সখী-সহেলিকে। সবাই হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে কী এক রহস্যময় কারণে। সামনের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে, আমার মনে চলে এলেন রত্নেশ্বর : পাখি হলে পাখির বাড়িতে গেছে, ডালিয়ার বাগানে ডালিয়া...

অনেক বছর পরে, তখন কলকাতাবাসী হয়েছি, শুনলাম অকালে চলে গিয়েছে শুভ্রা। আমার চেয়ে অনেকটাই ছোটো ছিল। বিশ্বাসই করতে পারিনি। যাওয়ার তো বয়স হয়নি। কিন্তু চলে গিয়েছে, কনফার্মড।

কিন্তু কোথায় গিয়েছে? কার কাছে? চলে গেলে কার কাছে যায়? মনে হল : পাখি হলে পাখির বাড়িতে গেছে, ডালিয়ার বাগানে ডালিয়া। তাহলে পাখি দেখে কি শুভ্রার কথা মনে হয়? ডালিয়া দেখে? কে জানে?

যা বলছিলাম, আমার একুশ বছরের কথা। তখন রত্নেশ্বর হাজরা লিখলেন : মেঘ সারাদিন ধরে হেঁটে হেঁটে বিকেলে আমার কাছে আসে। মাঠের ওপারে থেমে ডাক দেয়: এসো রত্ন। এসো হে ঈশ্বর। পাগল হয়ে গেলাম। সারাদিন এই লাইন বলছি আর মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছি। একগুচ্ছ কবিতা লিখলাম, 'মেঘমালা' নাম দিয়ে। ভাগ্যিস কোনো বইতে এসব কবিতা নিইনি। কিন্তু সেই থেকে মেঘ আমার সঙ্গে রয়ে গেল। সেই রত্নেশ্বরের হাত থেকে পাওয়া মেঘ, কুড়ি বছর পরে এসে হল, 'মেঘবালিকার জন্য রূপকথা'। একজন সক্ষম কবি, এইভাবে, আমার মতো নতুন বয়সি কবিতা-লেখকের মনের মধ্যে ঢুকে গেলেন।

এমন অনেকেরই হতে পারে। শ্যামলকান্তি যে আমার ওই কবিতাটি ছাপিয়ে দিয়েছিল তা নিশ্চয় এজন্য—সদ্য লিখতে শুরু করা ছেলেমেয়েদের মধ্যে অব্যবহিত অগ্রজদের কিছু কিছু ছাপ থাকা অস্বাভাবিক নয়। পরে সে গিয়ে একসময় নিজের ভাষা খুঁজে নেবে এই হয়তো অনুমান ছিল তার এবং সম্পাদক বিষ্ণু সামন্তের।

এইখানেই আসে, আমার দ্বিতীয় কথাটি! পরে মানে কত পরে? অলোকরঞ্জনের লেখায় ছিল : 'পুরোনো বটের ছায়া ভালো, কিন্তু কতদূর ভালো?' কে যে কোথা থেকে তার কবিতার ভাষা খুঁজে পায় বলা শক্ত।

ক্লাস নাইনে পড়া একটি মেয়ে, রান্নাঘরে লণ্ঠনের আলোয় বসে মুখে মুখে শুনিয়েছিল একটি কবিতা—যে কবিতার নাম এখন ভুলে গিয়েছি, কিন্তু কবির নাম মনে আছে। শামসুল হক। কাকদ্বীপে থাকতেন। এখন তিনি প্রয়াত।

সেই কবিতাটি হল :

—নাম কী তোর?
—সোনার ভোর
—থাকিস কোথা?
—সুজ্জিপোতা
—খাস কি তুই?
—রূপোর জুঁই
—আসিস কীসে?
—পাখির শিসে
—কেন আসিস?
—ভালোবাসিস।

এই অনবদ্য কবিতাটি শোনার বছর দশেক পর আমি লিখেছিলাম, 'ঈশ্বর ও প্রেমিকের সংলাপ' নামে একটি কবিতা, শামসুল হকের এ লেখা না শুনলে 'ঈশ্বর ও প্রেমিক' কথা বলছে এটা আমার মাথায় আসত না। পরে, শামসুল হকের একটি ছোটোদের জন্য লেখা কবিতার বইতে এ-কবিতা আমি পড়ার সুযোগ পাই। অনেকবার বাড়ি বদলানোর সুবাদে, অজস্র বইয়ের সঙ্গে সে বইও হারিয়েছি। ষাট দশকের প্রতিভূস্থানীয় এই কবির কবিতা সংগ্রহ পড়েছি, তাতে এ-কবিতা খুঁজে পাইনি।

'আজকাল' সংবাদপত্রে, সেই '৮২-'৮৩-'৮৪-তে শু.হা নামে একজন ছড়ার খেলা শেখাতেন। কী করে লিমেরিক লিখতে হয়, তারই নিয়মকানুন বোঝাতেন তিনি। একটি করে লাইন দিয়ে দিতেন। সেই লাইনটিকে প্রথম লাইন হিসেবে লিখে দিতেন। পাঠকরা ছড়া লিখে পাঠাতেন তার ওপর। যেগুলো ভালো হত, ছাপা হত পরের বা তারপরের সপ্তাহে ওই বিশেষ পাতাটিতেই। এই শু.হা দুর্দান্ত ছড়া লিখতেন। দারুণ সব ওয়ানলাইনার দিয়ে দিতেন। একটি যেমন : ঠ্যাং তুলেছি পায়ের ওপর, ল্যাং মেরেছি হাতে। এই লাইনটি আমার মুখস্থ হয়ে গেল। পরবর্তী সময়ে 'ভুতুমভগবান' বইটি লেখার সময় এই সুরে আমি 'শীর্ষাসন' নামে একটি কবিতা লিখি। কেন-না, প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহেই শু.হা যেসব হোমওর্য়াক দিতেন আমি বাড়িতে সেগুলো নিয়ে ছড়া লেখার চেষ্টা করতাম। যেমন 'উন্মাদের পাঠক্রম' বইতে 'কোপ' নামে একটি লেখা আছে আমার—যার তাল আমার কানে ধরিয়ে দেয় শু.হা-র এই লেখাটি :

ভূত নাচিতং স্কন্ধে মম,
পুত নাচিতং ডিসকো
ম্যায় ঝুলিতং বাসে বাসে
বউ চড়িতং রিসকো
মেয়ে লিখিতং গোপন চিঠি
না জানিতং কিস কো।

শু.হা নামের আড়ালে ছিলেন শুভাশিস হালদার। এঁর কোনো বই আমি পড়ার সুযোগ পাইনি। যা যা মনে আছে, তারই কিছু এখানে স্মৃতি থেকে তুলে দিচ্ছি। এখন তাঁর কোনো লেখাও দেখি না দীর্ঘদিন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ-ও হয়নি কখনও। কিন্তু ঋণ তো এঁদের কাছে নিয়েইছি।

'৭৬ সালে হাতে এসে গেল একটি বই। তাঁর প্রথম কবিতা'—

আগে ছিলাম ভীষণ ভীতু
শরীর জুড়ে বর্ষা ঋতু
কী দিল ফুসমন্তর

খাই না এখন ভ্যাবাচ্যাকা
আসতে যেতে দিতিস দ্যাখা
দু-তিন ঘণ্টা অন্তর

কখনও রাগ কখনও খুশি
এবারে দে ও রাক্ষুসী
পাঁচ মিশেলি মন তোর

যা খুসি তাই জবাব দিবি
ভালোবাসার এই পৃথিবী
সবটাই তোর তালুক

দে অধিকাব এখন থেকে
তোর শরীরের স্নায়র ছেঁকে
তুলব দুটি শালুক।

পরে, এই কবিতাটিরই মিলের ক্রম অনুসরণ করে, লিখেছিলাম 'সাদা বিষ কালো বিষ' নামের একটি কবিতা। কেবল ছন্দটা পালটে চার মাত্রা করে নিয়েছিলাম।

এই কবির নাম শিশির চক্রবর্তী। মেদিনীপুরে থাকেন। কখনও দেখিনি। কবিতার বইয়ের নামটিও বড়ো সুন্দর : 'সোহাগ শীতলপাটি'।

'৭৬ সালে, কবি প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় এই বইটির আলোচনা করেছিলেন 'দেশ' পত্রিকায়। প্রণববাবুর উদ্ধৃত করা সুন্দর কয়েকটি লাইন পড়ে এই বই সম্পর্কে আগ্রহ জন্মায়। কুড়ি-একুশ বয়সে এই শিশির চক্রবর্তীর 'সোহাগ শীতলপাটি' পড়ে ছন্দ মকশো করতাম। একটি কবিতা বলি সেই বই থেকে :

সুখ

রূপসী তোর দোর গোড়াতে উপোস দিয়ে
সুখ চেয়েছি, দুঃখ তো নয়
আয় না সুখের পায়রা হয়ে ফুরফুরিয়ে
ডানায় মেখে সূক্ষ্ম প্রণয়!

কোথায় জীবন, সোনার জীবন, রকম দেখে
বিস্ময়ে নির্বাক হয়েছি
কী লাভ হল ভালোবাসার আগুন রেখে
ওতেই পুড়ে খাক হয়েছি।

...রূপসী তোর দোর খুলে দে, উথলে উঠুক
বুকের তলায় সুপ্ত নদী
দু'পারে তার লাল টুকটুক পলাশ ফুটুক
আশ মিটিয়ে ধূপ-ধুনো দি!

এইরকম সব কবিতায় ভরা সেই বই। 'সুপ্ত নদী'-র সঙ্গে 'ধূপ-ধুনো দি'-র মিল আমাকে মোহিত করেছিল। বাংলার চিরকালীন সহজ লিরিক এই বইয়ে ছড়িয়ে আছে। আর একটি কবিতা যার নাম মনে নেই। সেটি এরকম :

যাবেই যদি, এখনই কি?
জলে সূর্য ঝিকিমিকি—
দিন তো আছে।

আর্সিনি দিতে মান্য কিছু
অন্তত সামান্য কিছু
ঋণ তো আছে।

ফুল নেবে না? এমন অবুঝ?
পাপড়ি না থাক, গাঢ় সবুজ
বৃন্ত আছে।

আজ বুঝতে পারি, ওই বইটির কত বড়ো ভূমিকা ছিল আমাকে শিক্ষাদান করার ব্যাপারে। পরে জেনেছি, এই শিশির চক্রবর্তী পেশায় ছিলেন একজন কনস্টেবল। তাঁর আর কোনো বই সংগ্রহ করতে পারিনি। তাঁর বর্তমান বয়স ৭৭। আমার সেই অল্প বয়সের পর তাঁর লেখাও কোথাও বিশেষ দেখিনি। শিশির চক্রবর্তীর আর একটি কবিতা, যা পড়ে, আমার সে-বয়সে মুগ্ধ ছিলাম। পাঠকের জন্য তুলে দিই :

বাটি ভর্তি সুখ

প্রশ্ন তো নয়
প্রেম ও প্রণয়
পেলাম কতটুক

তীব্র নেশা
হয় হামেশা
কাটে না ঝাড়ফুঁক

যেই ছুঁয়েছি
হারিয়ে গেছি
এমনি তোমার ত্বক

দিন ফুরুলে
নিচ্ছি তুলে
ডুবিয়ে সারা মুখ

বুকের উপর
থেকে রূপোর
বাটি ভর্তি সুখ।

আজ থেকে ৩৫ বছর আগে গ্রামবাসী ও পেশায় কনস্টেবল একজন মানুষের লেখা একটি বই আমাকে হাতেকলমে অনেক কিছু শিখিয়েছিল। উচ্চাঙ্গ সংগীতের গুণীরা একটা কথা বলেন নবাগতদের। সমস্ত শুনবে। সমস্ত ঘরানার গান শুনে শুনে, যার যেটা ভালো বা তোমার পক্ষে গ্রহণযোগ্য মনে হবে, সেটা লাগাবে নিজের গানে।

দুজন সক্ষম গায়কের কাছে আমরা যে আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্ব দেখতে পাই, তার কারণও এইখানে নিহিত। সমস্ত ঘরানা শুনে, এবং নিজের ঘর বজায় রেখে, এক-একজন শিল্পী নিজের ব্যক্তিত্ব তৈরি করার পথে এগিয়ে যান। গানের লোকদের পিছন পিছন ছোটো থেকেই ঘুরতাম বলে কথাটা ঢুকে গিয়েছিল মাথায়। সব খুঁজে খুঁজে পড়তাম। মন নতুন ছিল বলে সেই সময়ে যা পড়ছিলাম তা ঝকঝক করে উঠছিল নতুন মনের আলোয়। ছন্দের কবিতা পড়তে খুব ভালো লাগে। চেষ্টাও করি লিখতে। কিছুতেই স্বাভাবিক শোনায় না। মাত্রার মাপজোক হয়তো ঠিকই রাখতে পেরেছি। কিন্তু কোথায় একটা অস্বাভাবিকতা। ইতিমধ্যে কোনো একটা যেন মোটা শারদসংখ্যায় শঙ্খ ঘোষের একটা কবিতা বেরিয়েছে। এ কবিতারও নাম মনে নেই। আশ্চর্যের কথা হল, আজ তেত্রিশ-চৌত্রিশ বছরেও সেই কবিতা তাঁর কোনো বইতে গ্রহণ করা হয়নি। এমনকি, এই সেদিন অগ্রন্থিত লেখার যে সংকলন বেরোল শঙ্খ ঘোষের, তার মধ্যেও নেই। সে কবিতার চারটি লাইন শুধু মনে আছে।

আরতি চা বানায়, আরতি ছাদে আসে
ঘুঁটেও ভিজে গেল, কাপড়ও।
মেদুর ধারাসারে ভারি-তো আসে যায়
কবিতা পড়ো আর না পড়ো।

পুরো কবিতার মাঝখান থেকে এই চারটি লাইন শুধু মনে আছে। এটা বলছি কেন? কেন-না, এই লাইনগুলো আমার লেখার প্রথম জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন

করেছিল। সব বই বা পত্রিকা তো কিনতে পারতাম না। কোনো লাইন বা কবিতা ভালো লাগলে, খাতায় টুকে নিয়ে সেগুলো পরে বারবার পড়তাম। আমাদের পাড়ায় শিবু বলে একটি ছেলে থাকত। সব পাড়াতেই শিবু নামে একজন থাকে। আমাদের পাড়াতেও ছিল। শিবুর সঙ্গে ক্রিকেট খেলা নিয়ে কথা হত। কবিতা থেকে সে পাঁচ হাজার মাইল দূরে। একদিন খাতায় লেখা এই চারটি লাইনের দিকে তাকিয়ে বসে আছি, শিবু এল। কী পড়ছ ওটা? খাতাটা টেনে নিয়ে জোরে জোরে পড়ল। বলল, এটার মিনিং কী? মিনিংটা বলো তো? তোমার লেখা নিশ্চয়ই। আমি তখন এত অবাক হয়ে গিয়েছি ওর পড়াটা শুনে যে, বললাম—আর একবার পড়ো তো! শিবু পড়ল। আবার পড়তে বললাম। আবার পড়ল। এবং বিরক্ত হল। কেন বারবার এটা পড়তে বলছ!

ওকে বলিনি। আজ বলছি কেন বলেছিলাম। শিবু ছন্দের বাবা-মা জানে না। এর মধ্যে যে ছন্দ আছে, মিল আছে তা-ও বোঝেনি। এমনকি মিল-টিল কিছু নেই কেন বলে কমপ্লেনও করেছে। কিন্তু, তবু, শিবু যখন পড়ল ওই চারটে লাইন, ঠিক সেইখানে সেইখানে থামল, নিজের সম্পূর্ণ অজান্তেই থামল—যেখানে যেখানে আমরা শ্বাস নেব। আমি তো হাঁ।

তার মানে ছন্দটা যদি মিল দিয়েও বা না দিয়েও ঠিক ঠিক ভাবে লেখা যায়, তাহলে যে-লোক ছন্দের কিছু জানে না, সেও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে পড়বে? এটা একটা শেখা। আমি তখন মাত্রাভাগ, পর্বভাগ, অন্ত্যানুপ্রাস এগুলো সম্পর্কে খুব সচেতন হয়ে উঠেছি। কবিতা লিখতে গেলেই নিজের চোখে আগে ছন্দটা পড়ছে, মিলটা পড়ছে, আর স্বাভাবিকও শোনাচ্ছে না। কেন শোনাচ্ছে না? এবার শিবুর কাজ বাড়ল। আমি শিবুর বাড়ি যেতে শুরু করলাম। একটা দুটো তিনটে কবিতা লিখি আর একসঙ্গে সেগুলো নিয়ে শিবুকে খুঁজতে বেরোই। শিবু সেগুলো চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ে আমার সামনে। যেখানটায় শিবু ঠেক খায়—সম্পূর্ণ না-জেনে ঠেক খায়, ওর হাত থেকে কবিতাটা নিয়ে আমি সেই জায়গায় একটা স্টার মার্ক দিয়ে রাখি। পরে বাড়ি এসে ঠিকটাক করি। পরের দিন শিবুকে আবার পড়াব। অর্থাৎ শিবু পড়বে, আমি শুনব। একটাই অসুবিধে, শিবু থেকে থেকেই জিজ্ঞেস করে, মিনিং কী? এগুলোর মিনিং কী? যাই হোক শিবু, নিজের অজান্তে আমার ছন্দশিক্ষকের কাজ করেছিল। শিবুর পড়ার সময় যে-কবিতা কানে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক শোনাবে, যে-কবিতায় শিবুর শ্বাস নেওয়ায় কোনো চাপ পড়বে না, কোথাও বাধবে না তার, সেটাতে ছন্দ ঠিক আছে ধরতে হবে। মাত্রা, ছন্দ, যতি, পর্ব—এসব কিছুই না-জানা একজন, এমনকি যে কবিতার পাঠকও নয়, এমন একজন আমাকে এক হিসেবে তালিম দিয়েছিল। এবং তার সূচনা হয়েছিল শঙ্খ ঘোষের ওই চার লাইন থেকে, যা আজ পর্যন্ত তাঁর কোনো বইতে নেই। এইরকম আরও একটা লেখা তাঁর কোনো বইতে নেওয়া হয়নি, সেও তিরিশ বছর আগে ছাপা কবিতা—তারও মাত্র চার লাইন মনে আছে এবং নাম মনে নেই—শারদীয় যুগান্তর-এ পড়েছিলাম, স্টলে দাঁড়িয়ে:

লাফ দিয়ে ওঠে হাড়ের ভিতর থেকে
পালাবার প্রবণতা
আমি যা পারি না আমি তা পারি না, বেশ
তা নিয়ে কী এত কথা?

বোঝাই যাচ্ছে, এসব লাইন মনে মনে বলতে বলতে ছন্দ শিখতে চেষ্টা করতাম আমি। মন তখন নতুন ছিল।

মন যখন নতুন থাকে, তখন, লেখার চার্জ থাকে। ভাষাটা থাকে না। বা থাকলেও, নিজের ভাষা আসে না তখন। কারও-না-কারও ভাষা মিশেই যায়। আমি আমার মতো সাধারণ কবিতা লেখকদের কথা বলছি। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শক্তি, শঙ্খ অলোকরঞ্জন, উৎপল, আলোক সরকার, বিনয় বা ভাস্কর চক্রবর্তীর মতো কবিদের কথা বলছি না, বলছি না মৃদুল রণজিৎ বা গৌতম বসুদের মতো প্রতিভাধরের কথা। যাঁরা প্রথম বই থেকেই বিশিষ্ট। সাধারণত মন যখন নতুন থাকে ভাষা তখন পূর্বজদের আংশিক ছায়ায় থাকে ঢাকা। আর দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে ভাষা যখন আয়ত্ত হয়, তখন নিজের মন আর পুরোপুরি নিজের থাকে না। অন্য অনেকের কথা জমে জমে ভারী হয়ে যায়। এখন তো কুড়ি বছর পঁচিশ বছর বয়স বেড়ে গিয়েছে। মনের ওপর জমে রয়েছে কত জনের প্রতি চাপা রাগ, কত বিষয় সম্পর্কে লোভ, কত ব্যর্থ, অবরুদ্ধ আর না-মেটা কামনা। সেই না-মেটা কামনা তবু ভালো। যদি তা প্রতিশোধ বা ঘৃণার দিকে না যায়। কতজনের কাছে কত অভিযোগ শুনতে শুনতে শুনতে শুনতে পুরোনো হয়ে যায় মন। উত্তর দিতে ইচ্ছে করে না। যাক সব মেনে নিই। মেনে নেব? কিন্তু কতক্ষণ। আবার ওই লাইন—'পুরোনো বটের ছায়া ভালো, কিন্তু কতদূর ভালো?' কতক্ষণ মানব।

যেই লিখতে বসবে অমনি, সেই উত্তর না-দেওয়া অভিযোগ মনে পড়বে। উত্তর বেরোতে চাইবে কবিতার লাইন হয়ে। জমে থাকা রাগ বেরোতে চাইবে কবিতার লাইন হয়ে। যে প্রতিশোধ নিতে পারোনি লেখার মধ্যে নিতে চাইবে সেই প্রতিশোধ। ব্যঙ্গ আর শ্লেষ আর বিদ্রুপে ভরে উঠে ঝকঝকে ধারালো হয়ে উঠবে লেখা। নিজস্ব ব্যঙ্গ, নিজস্ব বিদ্বেষের লেখা। নিজস্ব অভিজ্ঞতার লেখা।

অভিজ্ঞতা। তুমি তো 'অভিজ্ঞ' হয়েছ, না? উপাধিটি পেয়েছ যে! একবারও কি মনে পড়বে না তোমার, চুর্নী নদীর ধারে ধারে যখন ঘুরে বেড়াতে, ব্রিজের তলার খেয়া নৌকোয় বসে দেখতে জলে আলো-জ্বালা ছায়া ফেলতে ফেলতে ওপর দিয়ে ঝমঝম চলে যাচ্ছে ট্রেনের কামরাগুলো, অথবা মর্নিং স্কুলের কিশোরীরা ঘণ্টা শুনে দৌড়োল দলে দলে—তখনকার মন কি এখনকার ভাষা চেয়েছিল তোমার কাছে?

আজ তুমি বুঝতে পারো।

ভাষা খুঁজতে খুঁজতে শেষে মন পুরোনো হয়ে গেল—ভাষা ফেলে নতুন করে মন খুঁজতে বেরোনোর সময় কি আর আছে? পাখি-ফেরা গাছগুলোর তলায় এসে দাঁড়িয়েছে স্বয়ং পুরিয়া-ধ্যানেশ্রী রাগ। তার সঙ্গে দেখা করো। চলো আমরা 'অভিজ্ঞ' উপাধিটিকে

বিকেলের জলে ফেলে দিই। আবার রত্নেশ্বরের সেই কবিতাটি মনে করি, যেখানে সন্ধান কখনও শেষ হয় না, সতীর্থের সন্ধান। মন আর ভাষার সন্ধান

সে তার খোঁজে

পাখি হলে পাখির বাড়িতে গেছে
ডালিয়ার বাগানে ডালিয়া
পাতালের কাছে গেলে শোনা যায় পাতাল ছুটছে আজও
পাতালের খোঁজে
বাড়ির সন্ধানে যায় বাড়ি
বাগানের সন্ধানে বাগান
খুব ভোর বেলা উঠে রোদ চলে যায় তার রোদ্দুরের দিকে
গাছ তার ছায়ার ভিতর দিয়ে গাছের সন্ধানে চলে গেলে
ছায়ায় পিছনে যায় ছায়া
খেয়া পার হতে হতে লাল যাচ্ছে লালের রেখায়
বাতাসের পিছনে বাতাস
সন্ধ্যা হতে না হতেই অন্ধকার আশ্চর্য ফেরারী—

পাখি হলে পাখির বাড়িতে যায়
ব্যাধের সন্ধানে ঘোরে ব্যাধ
সঙের পোশাক পরে হত্যাকারী চলে যাচ্ছে তাঁবু ছেড়ে দিয়ে
ঘাতকের খোঁজে গেল যুবক ঘাতক
তোমার সন্ধানে তুমি যাও
পৃথিবীর পিছনে পৃথিবী
বিকেলের পিছনে বিকেল
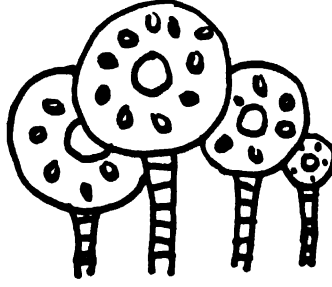
২৬

সময় কীভাবে যায়? কোনো মানুষই বুঝতে পারে না। হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে, বা কখনও আকাশের দিকে তাকিয়ে সে দেখতে পায় বেলা পড়ে এল। দিন শেষ হল। 'সময়ের চেয়ে আর দামি কিছু নেই' লিখেছিলেন কবিতা সিংহ। আর, বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন, প্রভু, ছুটি চাই। দিন কতদূর পশ্চিম, দেখুন।

অল্প বয়সে আকর্ষণ করেছিল পশ্চিম শব্দটির আশ্চর্য প্রয়োগ। এবং, তার আগের এই কমাটি। কমাটি এত অভূতপূর্ব লেগেছিল যে, প্রায় আমি উন্মাদ হেল্ডারলিনের মতো এ কথা বলবার অবস্থায় পৌঁছেছিলাম—'কী আশ্চর্য, দেখুন, একটি কমা'! বলিনি, কারণ, বুদ্ধদেবের হেল্ডারলিন অনুবাদের ভূমিকায় এই লাইনটি তখন আমি পড়িনি। যে কমাটি নিজেরই লেখা একটি বইয়ে, একটি গদ্য বাক্যের মধ্যে আবিষ্কার করে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন হেল্ডারলিন। কিন্তু কমাটি আমাকে তেমনই অবাক করেছিল। তা ছাড়া, এ কথাও সত্যি যে, পরে, মনে হয়েছিল কমা ব্যবহারের সমস্ত জীবনানন্দীয় ধর্ম থেকে, এই কমাটি, কত স্বতন্ত্র। তখন আমি একই সঙ্গে 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর চতুর্দশপদিগুলির পাশাপাশি গোগ্রাসে পড়ছি শক্তির সনেটগুচ্ছ। বুদ্ধদেবের চলন যদি হয় আমীর খাঁ সাহেবের বিলম্বিত, শক্তি তবে কুমার গন্ধর্ব। দুই বিপরীত মেরুর চরিত্র, সনেটে। সনেটেই।

তবে, এ কথা সত্য যে, তখন-তখনই যে এই দুই সংগীতগুণীর গায়নধর্মের ভিন্নতার সঙ্গে, মেলাতে পারছি দুই ভিন্ন কবিকে তা কিন্তু নয়। শুধু হঠাৎ হঠাৎ কেমন যেন সাদৃশ্য খুঁজে পাই। কাউকে বলতে সাহস পাই না। তখন সেই বয়স যখন ভুল করতে ভয় হয়। বয়স যত বেড়েছে, ততই ভুলের দিকে যাওয়ার ভয় চলে গিয়েছে। এখন জানি, ভুল করলেই জানার সুযোগ পাব। কারণ ভুল মানেই সংশোধনের অনন্ত সম্ভাবনা।

তবে ওই যে বলছি, প্রভু, ছুটি চাই। দিন কতদূর পশ্চিম, দেখুন—এই পশ্চিমের পরে,

কমাটি অপূর্ব—এখানেই বোঝা যায়, আমার মন এখন যে কোনো কবিতায় খুঁজছে প্রধানত তার কৃৎকৌশলের চমৎকারিত্ব। বুদ্ধদেবের, সেই জীবনপ্রান্তের দিকে চলে যাওয়া মন, যে এক ধরনের বিষাদ দ্বারা, সৃষ্টিশীল বিষাদ দ্বারা চালিত তখন, সেইটে অনুভব করার মতো সংবেদন সেসময়ে আমার নেই। কারণ তখন আমি ১৯ থেকে ২০-তে পৌঁছোলাম। বুদ্ধদেব তার কয়েক মাস আগে প্রয়াত হয়েছেন। আজ নিজে 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর বয়সে পৌঁছে বা সে-বয়স পার হতে হতে বুঝি, বুদ্ধদেবের মন তখন পুরিয়া ধ্যানেশ্রীও নয়। মারোয়া। 'মরচে পড়া পেরেকের গান'-এ। পুরিয়া ধ্যানেশ্রীর সময়টাও তো পার হয়েইছেন তিনি। 'স্বাগত বিদায়'-এ এসে পৌঁছোবেন শ্রী-তে।

কিন্তু বুদ্ধদেবকে নিয়ে আজ কথা বলতে চাইছি না আমি। আমি চাইছি সময়ের চলে যাওয়া নিয়ে বলতে দু-চার কথা। এ বিষয়ে সেরা যে দ্বিপদী আমার মনে পড়ছে এ মুহূর্তে, তা হল এই :

> সময় যায়
> বটপাতায়

দিনযাপন ১ এবং দিনযাপন ২ শীর্ষক দুটি কবিতায় কালীকৃষ্ণ গুহ এই শ্লোক ব্যবহার করেছেন। একটি কবিতা, সম্পূর্ণ করেছেন, এই দুটি লাইনেই। আবার পরের কবিতাটি শুরু করেছেন এই দুটি লাইন দিয়েই। দিনযাপন ১ এবং দিনযাপন ২। কখনও-কখনও একটি বিশেষ সুর যেমন সারাদিন মনে ঘুরে বেড়ায়—এই, 'সময় যায় / বটপাতায়' আমার কাছেও তেমন স্তবের মতো। আমি দেখতে পাই চূর্ণী নদীর তীরে মস্ত বট গাছ। তার নীচে বাঁশের মাচা-সিঁড়ির পথ। খচমচ করে দু-একজন যাত্রী উঠে গেল খেয়া-ডিঙিতে। ডিঙি তখন নদীর মাঝখানে। দু-চারজন আরও এপারে ওপারে দাঁড়িয়ে। প্রায়-স্থির জলে ধীরে ধীরে চলেছে খেয়া। আর হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে একটা দুটো পাতা চূর্ণীর জলে এসে পড়ছে। স্কুল পালিয়ে, মোটা একটা বট-শিকড়ের ওপর বসে চানাচুর কি ঝুরিভাজা খাচ্ছি আমি। সেই আমার কৈশোর।

ওই দুটি লাইনে তো এসব বর্ণনা নেই! কিন্তু, ওই যে বললাম শ্লোক। যে কবিতা শ্লোকের মতো, সে লেখা বহু অভিজ্ঞতাকে ছুঁতে ছুঁতে যায়। তাই শ্লোকগুলি অত বছর আয়ু পায় কাব্যে। নদী খেয়াঘাট, ডিঙি কিচ্ছু বলা নেই; তবু আমি নদী দেখতে পেলাম। সে আমার ব্যক্তিদৃষ্টির সীমাবদ্ধতা হয়তো, তবু দেখতে পেলাম। শ্লোকটি আমাকে নিজের অজান্তেই তাকাতে বলল আমার ভিতরের দিকে। একটা দুপুর। না দুপুর নয়। শেষ দুপুর পার হতে থাকা দুপুর! কী করে বলি! যেন ভীমপলাশের প্রহরে এই পাতা ঝরার বেলা। ভীমপলশ্রীতে রৌদ্রতেজ তখনও যায়নি। তাপ কিছু খর হয়ে আছে এখনও। আরোহণের মধ্যমটিতে তার প্রমাণ। কিন্তু, ফিরে আসার সময় নামতে নামতে, অবরোহণের কোমল গা

যেই লাগল, যেন খসে গেল পাতা। নি স গ ম প, প গ, ম গ, র স। সেদিন আমাদের দিদি গাইছিলেন, কোনো বাণী ছাড়া, কেবল এই পর্দাগুলো নিয়ে। নানাভাবে গাইছিলেন। দক্ষিণ কলকাতার পুরোনো বাড়ির চারতলার বারান্দায় বসে। কোথায় সেই রানাঘাট কালীনারায়ণপুরের ষাট দশকের গ্রাম্য খেয়াঘাট আর কোথায় ২০০৯-এর দক্ষিণ কলকাতার গ্রীষ্ম অপরাহ্ণ। আমার মনে একটি শ্লোক। সময় যায় / বটপাতায়। দিদির সঙ্গে কোনো যন্ত্রী নেই এখন। খালি গলায় গাইছেন। তিনি একাই থাকেন। তাঁর রেওয়াজের সঙ্গে থাকেন তিনি। রেওয়াজ-ই তাঁর স্বামী-সঙ্গী-প্রেম।

আমি যে পাশে আছি, সে খেয়াল নেই, গ ম প, গ, ম গ, রে স। এই যে থেকে থেকে সময় নিচ্ছেন। Pause দিচ্ছেন। গ-তে রইলেন, প থেকে গ-তে আসতে আসতেই পাতা ঝরল। তাহলে কি গানের মাঝখানে ওই Pause টাও সংগীত? ওই নীরবতাটুকু? এই গাছটা থেকে পাতাকে আলাদা হতে, হাওয়ার ধাক্কাটা শরীরে নিয়ে আলাদা হতে, নিজের আইডেন্টিটি থেকে সরে ছিঁড়ে আসতে, একটু সময় তো লাগে! বেদনা একটু। ওই কোমল গ সেই বেদনা। কিন্তু পাশেই যে মধ্যমে জমজমে দুপুর! গ-এর আগে তাই কি থামছিলেন দিদি, আর আমি প-এর পর কেমন গ লাগা মাত্র পাতা ঝরতে দেখছিলাম। ধীরে—আস্তে, কোনো তাড়াহুড়ো না করে কাউকে কিছু না বলে পাতাটা বটগাছ থেকে খুলে ভেসে পড়ল হাওয়ায়। এভাবে কত সম্পর্ক থেকে খুলে ভেসে পড়েছে আমারও জীবন। একটু Pause নিয়েছে তার আগে। ইমরতের সুরবাহারে শ্যামকল্যাণে তীব্র মা লাগার আগে একটু ফাঁকা সময় যায়, আজ যেন বুঝতে পারলাম, ওই ফাঁকা সময়, ওর মধ্যে কী আছে। সংগীতই আছে। ওই Pause বা নীরবতায়। আর আশ্চর্য, যে-কবিতাটা নিয়ে, এত কথা বলে চললাম, যা হয়তো, কবিতাটিরই মূল অর্থের সঙ্গে সম্পর্কিতই নয়, যা কেবল আমার ব্যক্তি স্মৃতিভাণ্ডারের সঙ্গেই যুক্ত—সেই কবিতাটি যদি এখন বলি, দেখবেন তাও চলেছে কেমন Pause-এর ব্যবহার করে করে। ঠিক যেভাবে চলে ইমরত-এর সুরবাহার। যেভাবে সেদিন, গাইছিলেন দিদি। একটা নোট থেকে অন্য নোট-এ যাওয়ার মধ্যবর্তী যে নীরবতা—তারই অন্য রূপ, দুটি সংক্ষিপ্ত লাইনের পর, একটি করে স্পেসের ব্যবহারে চলে এল। দিদি থামবার পরে বললাম, একটা শ্লোক শুনবেন? বলুন-না ভাই! আমি বলে চললাম :

দিনযাপন ২

সময় যায়
বটপাতায়

কী আছে আর?
বেদনাভার

বুঝি না, মন
কী নির্জন

দিনের শেষ
স্খলিত বেশ

যা আছে দুর
রাতদুপুর

আসে না ফের
শৈশবের

হিমশীতল
প্রকৃত জল

প্রকৃত মেঘ
স্থির আবেগ

আসে যা তা
জটিলতা

পিপাসা আর
অন্ধকার

একটি পর্দা বা দুটি তিনটি চারটি পর্দা, একত্রে লাগাবার পর যে নীরবতা যে Pause — তারপর একটি পর্দায় দাঁড়ানো, যেমন অভিঘাত তৈরি করছে, দুটি সংক্ষিপ্ত লাইনের পর একটি স্পেস ব্যবহার সেটাই আনছে। কবিতাটি অন্ধকারে এসে দাঁড়াল। নিজেকে লুকিয়ে নিয়ে। এই কবিতাটিকে আমি হয়তো ঠিক অনুসরণ করতে পারিনি। এব প্রথম দু-লাইন পর্যন্ত আমার আলোড়ন আমি বলেছি। গান যতক্ষণ চলছে, কবিতা যতক্ষণ চলছে, আমি আছি এক স্বর্গে। কবি, যন্ত্রী, গায়কের স্বয়ং সৃষ্ট স্বর্গে। যেই কবিতাটি গিয়ে অন্ধকারে দাঁড়াল, গান যেই শেষ হল—আবার পিপাসা জটিলতা যন্ত্রণাদাগ সচল হয়ে উঠল—নদী—নদীরেখা যেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে বিমান নীচের দিকে নেমে আসতে থাকলে, তেমনই। কিন্তু, একটি বিশেষ ধরনের রাগবিস্তারের ধর্ম, যে এই কবিতাটি তার চলনে বহন করে নিয়ে এল, এর গঠন বিষয়ে, রূপ বিষয়ে, বলার কথা এইটুকুই। বাইরের ছন্দ ও মিল প্রয়োগকে এ কবিতার লেখক কবে কখন যে অতিক্রম করে চলে এসেছেন তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর প্রয়োজনই হল না।

কবিতার ফর্ম বলতে আমরা পূর্বলিখিত কবিতা—প্রয়াত বা জীবিত অগ্রজদের পূর্বলিখিত কবিতা—অথবা কবিতা ধারার ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকেই বুঝি। এবং তাকেই মডেল হিসেবে সামনে রেখে 'এটা ভেঙে ফেলা উচিত' বলি বা 'ওটা খারাপ এটা শ্রেয়'—এইসব বলি। আরও নানান শিল্প যে, স্রোতধারার মতো ঢুকছে কবির জীবনে, তা থেকেও কবি তৈরি করতে পারেন—বা অজান্তে তৈরি হয়ে যেতে পারে রূপ, গঠন, আকার—সে সম্ভাবনা আমরা তত বেশি মনে রাখি না। কালীকৃষ্ণ গুহর শ্রেষ্ঠ কবিতা বইটিতে আমরা দেখব, কত লেখায় গানের উল্লেখ আছে। আছে বিভিন্ন গান শোনার অভিজ্ঞতার বর্ণনা। অর্থাৎ এই লেখকের জীবনধারার ভেতর গান ঢুকছে। কেবল কবিতা থেকে কবিতা তৈরি হবে তা কিন্তু নয়। কবিতা আসে জীবন থেকে। গানও একরকমের জীবন।

এবং জীবন যে কেবল গানের স্বর্গে থাকে না, পিপাসা আর জটিলতা আর অন্ধকারে নেমে আসে এ কথা সত্য। সময় যখন চলে যায়, বেলা যখন পড়ে আসে, দিনকে যখন মনে হয়, কতদূর পশ্চিম, যখন মনে হয় ছুটি চাই—সেই চলে যাওয়া সময়, হাতে না-থাকা সময় মানুষকে উদাসীন ও সুদূর করেই তুলবে সবসময় তাও অবশ্য নয়। তাকে ভীত করেও তুলতে পারে। তার একটি অনবদ্য প্রকাশ আমরা দেখব এই কবিতাটিতে:—

কণ্ঠস্বর

আজও এক কণ্ঠস্বর শুনি;
অর্ধেক শতাব্দী পার হল।

স্নানশেষে পিতামহ চণ্ডীপাঠ করছেন সকালে।
অমার্জিত পাঠ। অশাস্ত্রীয় উচ্চারণ। অর্থ আচ্ছাদিত।
মাঝে মাঝে কাক ডাকছে।

তবু ওই পাঠের ভিতরে তিনি খুঁজে চলেছেন
ধন আয়ু অতীত গৌরব।
খুঁজে চলেছেন জ্ঞান অশ্রু সকল পাপের জন্য ক্ষমা।

আজও সেই ভয় পাওয়া অভিভূত কণ্ঠস্বর শুনি...

এ কবিতাও শৈশব বা কৈশোর স্মৃতির উত্থাপন। আগের কবিতাটিতে আমার কৈশোর আমি দেখতে পেয়েছিলাম। আমার ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা থেকে বেরোতে পারিনি নৈর্ব্যক্তিক হতে পারিনি বলে। আগের কবিতায় লিখিত শব্দগুলোতে সন্ধ্যা হয়ে আসার সংকেত আছে সন্ধ্যা শব্দটি না থাকলেও। 'দিনের শেষ' এই আভাস দেওয়া আছে। রাত কথাটা তো আছেই। হিমশীতল / প্রকৃত জল এই অংশে জলের আগে প্রকৃত কথাটি ব্যবহারে, নিশীথিনীর গভীর স্থিরতা ধরা পড়ে। জলের আগে প্রকৃত শব্দটির আশ্চর্য প্রয়োগ এবং শ্লোকের কথা বলেছি এই জন্য যে, এই কবিতার প্রতিটি যুগ্মক যেন একটি সম্পূর্ণ কবিতা। অথচ এ কবিতার প্রথম দু-

লাইনেই আমি অনেকক্ষণ অভিভূত স্তব্ধতায় বসেছিলাম এক দ্বিপ্রহরে। যে কবিতার একদিকে অক্ষয় বড়াল (যদিও অক্ষয়বাবুর কবিতাটি নিশ্চিত সারং) অন্যদিকে জাপানি হাইকুর সংহতি। মাঝখানে তার গঠনকে যেন তৈরি করেছেন সুরবাহারের ইমরত খান। কারণ তো বলেছি, এক পর্দা থেকে অন্য পর্দায় যাওয়ার ভেতরকার স্তব্ধতাটুকু এ কবিতায় স্পেস হিসেবে এসেছে। সেই পদ্ধতিতেই দুপুর থেকে গভীর রাতের দিকে এ কবিতা এগিয়েছে। দিদিকে বলে চললাম কবিতাটা। 'হিমশীতল / প্রকৃত জল'কে কীভাবে পাব! দরবারি কানাড়ার অবরোহণকে যদি মন্দ্রসপ্তকে নিয়ে এসে ধীরে ধীরে একদম নীচের ষড়জ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে যাও, তবেই পাবে এই হিমশীতল / প্রকৃত জল। জীবনে প্রথম, দু-তিনবার, কবিতাটি আমার মুখে শুনে দিদি নেমে যেতে লাগলেন খাদের দিকে, সঙ্গে দরবারি কানাড়ার অবরোহণের ঢালু পথ। নীচের সা-এ আসতে মনে হল এই সে, বিকেলেই গভীর রাত নেমেছে। নীচে মুদিয়ালির জনবহুল রাস্তা দোকান সব উধাও। রাত্রি, আর স্তব্ধ দিঘি জল। তাহলে এইটা হতে পারল! একটা ছোটো কবিতা এতটা পারে। কিন্তু আবার বলি, এ আমার একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি। তুমি তোমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দিকে তাকিয়ে যদি পড়ো এই কবিতাটা। তুমি তো গান করো। তুমি এটা আমার চেয়েও ভালো দেখতে পাবে। আর যদি তুমি গানের দিক থেকে না দ্যাখো, জীবনের অভিজ্ঞতার দিক থেকে দ্যাখো, তাহলে যা ছবি দেখবে, সেটাই এ কবিতার চোখ। আমি যে-চোখে তাকিয়েছি—তুমিও যে সে-চোখে তাকাবে তার কী মানে। তোমার প্রবাসী প্রেমিকের চোখ আর আমার তাকানো কি এক?

আর পরের কবিতাটায় যে শৈশব-কৈশোরে দেখা পিতামহের কথা আছে—তা নানা কারণেই ভিন্ন। সাধারণত কবিতায় যে পিতা, পিতামহদের দেখা যায়, তাঁরা কোথাও আমাদের এখনকার জীবনের চেয়ে যেন একটু বড়ো। কারণ, আমরা তাদের দেখি আমাদের ছোটোবেলা দিয়ে। ছোটোবেলার চোখে তো সব কিছুই বড়ো বড়ো লাগে। গম্ভীর বা মহান কখনও। কখনও সম্ভ্রমযুক্ত একটা ভয় পাওয়া। কখনও বা স্নেহ বাৎসল্যের স্মৃতি। এসবই আমরা বড়োদের কাছে পাই।

কিন্তু বড়োদের ভয় পেতে দেখা! সে এক বিরল ঘটনা। অন্তত কবিতায়, কোনো শ্রদ্ধেয় সম্পর্ককে ভীত অবস্থায় প্রকাশিত হতে সচরাচর দেখি না আমরা।

ভয়। এই ভয়ের সঙ্গে থাকতে থাকতেই মানুষের জীবন কেটে যায়। এই যে আগের শ্লোকপ্রতিম কবিতাটি, কোথায় গিয়ে শেষ হল? পিপাসা আর অন্ধকার। এই অন্ধকার শব্দটির মধ্যে যা যা ভরে দেওয়া আছে তার মধ্যে ভয়ও একটি উপাদান। কেন তা মনে হচ্ছে আমার? দিন পার হওয়া রাত্রি, আর রাত্রির ভেতরে ডুবে থাকা রাতদুপুরের অন্ধকারও তো হতে পারে। নিশ্চয়ই পারে, কিন্তু আগে 'পিপাসা' শব্দটি বসানো হয়েছে বলে এ অন্ধকার শুধু রাত্রি-অন্ধকার নয় হয়তো। মানবপ্রবৃত্তির ভিতরকার নানা সব উপাদানের অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে ভয়ও একটা উপাদান হতে পারে। একটা হতে পারে না-মেটা বাসনা। ডিজায়ার। এই কবিতাটিই তুমি দ্যাখো, অমন শ্লোকধর্ম আর সংগীতধর্ম বহন করতে করতেও এসে পড়ল, পিপাসা আর অন্ধকারে।

কেন? এ বিষয়ে আমি একটা জিনিস ভাবি, জানো। কত গুলো পোর্ট্রেট আর ফোটোগ্রাফ দেখতে দেখতে ভাবি, তুমি দেখেছ নিখিল ব্যানার্জির ছবি? বা বাদনরত রবিশঙ্করের চেহারা? আমি সামনে বসে দেখেছি। তুমি তখন জন্মাওনি। মনে করো আমীর খাঁ সাহেবের মুখ। ধ্যানে বসেছেন যেন তানপুরা হাতে। মনে করো ব্রণক্ষত লাঞ্ছিত বিলায়েত খাঁ সাহেবের মুখ। যখন আলাপের একটা লম্বা ফেজ বাজিয়ে, তিন-চার সেকেন্ড নীরব হয়ে তাকিয়ে রয়েছেন মহাজাতিসদনের পিছনের দেওয়ালের দিকে—মনে হত এই মুহূর্তেই যেন কত সব অপ্সরা একে একে নামছেন আমাদের পিছনে, ওই দেওয়ালের গায়ে—যা তিনি দেখতে পাচ্ছেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি না। শিল্পীর সেই মুখটা যদি তোমাকে দেখাতে পারতাম। আমজাদ আলি খাঁ সাহেব বাজাচ্ছেন বাহার! শান্তিনিকেতনের গাছে গাছে ফুল ফুটছে। পাশাপাশি ভাব রামকিংকরের মুখ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মুখ, ভ্যান গখের মুখ, অমন যে দেবদূতদের সঙ্গে সংলাপ চালানো শান্ত স্থির দুর্গবাসী রিলকে, তাঁর মুখেও ভুরু কুঞ্চিত হয়ে আছে—ভাব মিকেলেঞ্জেলো আর টলস্টয়ের মুখ!

উল্কাপাতে উল্কাপাতে ক্ষতবিক্ষত মুখ এঁদের। এইসব শিল্পীদের। যাঁরা শব্দ-ধাতু-পাথর-আগুন-ঢালাই-রং-রেখার দাহ—এর ভিতর দিয়ে সারাজীবন চলেছেন! এঁরা যেন গরম, ফুটন্ত কর্দমময় মাটির কুণ্ডে প্রোথিত। বুদ্ধদেব বসুর শেষ বয়সের মুখ—এর মস্ত প্রমাণ। দাহের ভিতর দিয়ে নিঃশব্দে হাঁটছেন। আর সংগীত শিল্পীদের দ্যাখো—তাঁরা উড়ে চলেছেন, পাখায় পাখায় ভর দিয়ে! তাঁরা শুধু আলো! শুধু আলো।

পৃথিবীর মাত্র একজন শব্দশিল্পীর মুখ সংগীতগুণীদের মুখকে হার মানায়। দিব্য আলো তাঁর মুখে। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কে জানে আসলে তিনি উস্তাদই ছিলেন হয়তো। নইলে তাঁর গানের পর গানে রাগসংগীতের নতুন জন্ম কী করে ঘটল। আর পৃথিবীর মাত্র একজন সুরশিল্পীর চোখে ছিল, শব্দশিল্পীর আগুন! বেঠোফেনের ছবি দ্যাখো। পাবে। চোখটা। চোখটা শুধু। আগুনের স্ফুলিঙ্গের মতো চুলের ঢেউ ছেড়ে দিলাম! কেবল তাকানোর কথা বলছি। তাঁর বধির হয়ে যাওয়ার পরে আঁকা সেই পোর্ট্রেট।

কিন্তু শব্দশিল্পীকে হয়তো শেষ অবধি উড়ানকে ত্যাগ করে ফিরতেই হয় না-মেটা পিপাসা ভরা অন্ধকারে। সে নরকাগ্নিকে সঙ্গে নিয়ে চলে শান্তভাবে। হয়তো। যা আগুন নয়, অন্ধকার। সেই অন্ধকারেই আছে ভয়।

মন্ত্র পড়ছেন পিতামহ। সেই মন্ত্রোচ্চারণ শুদ্ধ নয়। অর্থ আচ্ছাদিত। শুধু যে উচ্চারণ ত্রুটিপূর্ণ বলে অর্থ বোঝা যাচ্ছে না তা নয়। সেই সঙ্গে যিনি পড়ছেন, তিনি ভাবছেন, বা এমন বিশ্বাস তাঁকে খানিকটা আশ্বস্ত করছে, এসব ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলে কিছু পুণ্য হবে! তাঁর মঙ্গল হবে। মানুষ যে দেবতাকে প্রণাম করে তা ভক্তি থেকে নয় শুধু। অনেক সময়ই ভয় থেকে। পরীক্ষা দেওয়ার আগে ভয়ই হোক, ইন্টারভিউ দেওয়ার ভয়ই হোক। আর, কোনো অন্যায় করে ফেলার পর পাপবোধ থেকেই হোক।

এই পিতামহ সেই বয়সে পৌঁছেছেন, যে বয়সে পৌঁছোলে মনে হয়, প্রভু ছুটি চাই, দিন

কতদূর পশ্চিম, দেখুন। কিন্তু এই পিতামহ কবি নন। কবি, তাঁর দিন পশ্চিম দেখে ছুটি চেয়েছিলেন। ইনি সংসারে আবদ্ধ মানুষ। তিনি এখনও পুজোপাঠ-এর মধ্যে খোঁজেন ধন, আয়ু, অতীতগৌরব। এই পিতামহও দেখতে পাবেন, দিন পশ্চিমে চলে গিয়েছে তাঁর। কিন্তু তিনি আগে যে সম্পদশালী ছিলেন, যা হারিয়েছেন এখন তা চাইছেন ঈশ্বরের কাছে। আজও অর্থসম্পদ চাইছেন। চাইছেন আয়ু। আর মনে পড়ছে যেসব পাপ করছেন তার কথা। ক্ষমা চাইছেন। ক্ষমা চাইছেন ভয় পেয়ে। আনন্দ পেলে, মুগ্ধ হলে মানুষ যেমন অভিভূত গলায় কথা বলে—একমনে মন্ত্রোচ্চারণের সময়, পিতামহের গলা অভিভূত হয়ে গিয়েছে—ভয়ে, শুধু ভয়ে।

আর শৈশবের বালকটি আজ পরিণত বয়সে, মনে করতে পারছে, শুনতে পাচ্ছে, সেই ভয় পাওয়া গলা। এ এক অভিনব মন্ত্রোচ্চারণ। আর তার সঙ্গে, মাঝে মাঝে কাক ডাকছে—সেটাও মনে পড়ছে। এই মন্ত্রোচ্চারণের মাঝখানে Pause-এ কাক-এর ডাক অদ্ভুত এক কণ্ঠ-কনট্রাস্ট তৈরি করছে। মন্ত্রোচ্চারণের ভীত গলার ফাঁকে ফাঁকে—কাক-এর ডাক শোনা যায় কবিতাটির মাঝখানে। আর ভয় পাওয়া কণ্ঠস্বরের কথাটা স্পষ্ট হয় শেষ লাইনে। দুটো যুক্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ ঠাট-এর দিক দিয়ে দুটোই এক হয়ে গেল।

কালীকৃষ্ণ গুহ-র কবিতা যাঁরাই পড়বেন, তাঁরা দেখতে পাবেন এই কবি খুব সামান্য খড়কুটো দিয়েই তাঁর কবিতার বাসা বানান। নিরাভরণভাবে প্রায় কোনো আয়োজন ছাড়া তিনি কবিতা লিখে আসছেন সারাজীবন।

এসব কবিতা তাঁর দিনলিপির মতো। কিন্তু, ব্যক্তিজীবনের স্বরবিতান নয় শুধু। এই কবির প্রথম জীবনের লেখা একটি কবিতা দিয়ে আজকের মতো থামব। এই কবিতা আমি প্রথম পড়েছিলাম আজ থেকে ৩৬ বছর আগে। আজও এ কবিতাটি পড়তে গিয়ে দেখছি—তা আরও তীব্র ভাবে বুক ভেদ করে চলে যাচ্ছে। এই কবিতাও একটি দাম্পত্যের কবিতা। এই বিশেষ সংকটের কবিতা বাংলায় আর কেউ লিখেছেন কি না জানি না।

শিশু

হাসপাতাল থেকে তুমি কীভাবে বাড়ি ফিরবে ভাবতে আমার
সমস্ত শরীর কাঁপে।
তুমি যখন তোমার শিশুটিকে দেখতে চাইবে, তখন
কীভাবে বোঝাব, সে

আমাদের বারান্দা ও উঠোন ছাড়িয়ে ভোরের আকাশে চলে
গেছে?
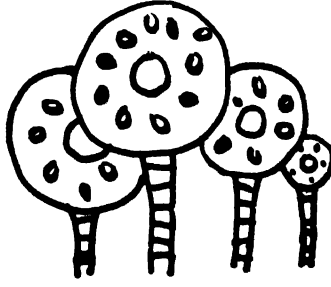
২৭

নিজের নিজের মতো করে এক-একটা জীবন বেছে নিই তুমি কিংবা আমি। এই জন্য যে, নিজের ভালো লাগা অনুযায়ী বাঁচতে পারব। উপভোগ করতে পারব বেঁচে থাকাটাকে। তার মধ্যে কাজ তো থাকবেই। বেছে নেওয়ার মধ্যে নিজের কাজটা একটা প্রধান বেছে নেওয়া। কাজের মধ্য দিয়েও তো আসে সেই উপভোগ! কিন্তু হয় কী, বেছে নেওয়াটা পুরোপুরি নিজের হাতে আর থাকে না। দেখা যায় অন্য অন্য জিনিস ঢুকে পড়েছে সেই বেছে নেওয়ার মধ্যে। কিছু করার থাকে না। একটা সময় দেখা যায়, আমার জীবনটা যেন আর আমার হাতে নেই! আমার হাতে নেই আমার আনন্দ বা বেঁচে থাকার উপভোগও। এটা হয়ে গিয়েছে মাত্রই বাইরের কিছু নিয়মাবলি পালন করে চলা। জেনে বা না-জেনে কতকগুলো কর্তব্যকর্মই সারাদিন ধরে করে চলেছি। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি জাঁতাকলে পড়ে যায় মেয়েরা। হঠাৎ একদিন লক্ষ করে, নিজের সেই জীবন বেছে নেওয়াটা কবে যেন আর নিজের হাতে নেই। চলে গিয়েছে কয়েকটি নিত্যকর্মের হাতে। রুটিনের হাতে। যে রুটিন

মানবী জার্নাল

ছ-টা বেজে দশ।
ও পাশ ফিরল। টিফিন ভরছি। কুইক! কুইক!
বাস এসে গেছে, ছুটতে-ছুটতে, আমিও ছুঁচ্ছি
ছেলের বয়স...

আটটা পঁচিশ।
চায়ের সঙ্গে রোদ এনে ঘরে ওকে জাগিয়েছি। খিদে-খিদে ভাব,
মরুকগে, ওর মিনি লাঞ্চবক্স সাজিয়ে দেব, তো,
আজও ট্রেন মিস্...

এগারোটা ষোলো।
'ডোন্ট ডিস্টার্ব' বাইরে ঝোলানো। কথা-বলা
শেষ। বস্ কী চাইছে? অ্যাজ ইউজুয়াল,
পায়ে পা ঘষল...

দুটো দুই। তাই
মিতালি ও আমি। পাতা ওড়াউড়ি। শূন্য তাকাই।
ওটা কোন গাছ, শিমুল? পলাশ? বেট ধরি যদি,
চাইনিজ খাই...

সাতটা তিরিশ
ঢের কাজ ফিরে। ওর বন্ধুকে ডেকেছে ডিনারে।
আমার জন্য ব্যথা-পা, এবং, রেলবাজারের ঘুমোনো আলোয়
আষাঢ়ে ইলিশ...
ন-টা বেজে ছয়।
ও ফেরেনি। তবে, ফিরবে। ক্লান্তি। টেবিলে তৈরি।
বিলোল চক্ষে বন্ধুটিকেও গল্প দিচ্ছি। সরষের ঝাঁঝ
সারা ঘরময়...

পৌঁনে বারোটা।
নিজেকে ভাবব? মানে, ওর গায়ে হাত পড়লেও
আলো জ্বলল না, সেই কথা? না কি, বালিশে প্রথম
রক্তের ফোঁটা...

(চৈতালি চট্টোপাধ্যায় : বিষাক্ত রেস্তোরাঁ)

· এই যে ঘুম ভেঙে ভোর ছ-টা থেকে দৌড়, এই দৌড়ের গতিবেগ ধরা আছে কবিতাটির চলনে। এর ছন্দও যেন ছুটছে। প্রতিটি বাক্যই ছোটো ছোটো। কাটা কাটা কথা। ছ-মাত্রার ছন্দ। প্রথম স্তবকে ওই কাটা কাটা কথা-র সবগুলোই আলাদা এবং ছ-মাত্রাতেই ভরা। 'আমিও ছুঁচ্ছি / ছেলের বয়স'-এ কথা দুটি পরস্পরযুক্ত কিন্তু আলাদা লাইনে ভেঙে যাওয়ায় কাটা কথার এফেক্ট এসে গিয়েছে আপনাআপনি। দ্বিতীয় স্তবকে এসে, প্রথম

স্তবকের অত বেশি কাটা কাটা ভাব সরে গিয়ে কথাগুলো একটার সঙ্গে একটা যুক্ত হচ্ছে একটু-একটু করে। কথাগুলো না-বলে, যদি বলি পর্বগুলো, আরও স্পষ্ট করতে পারব। ছ-মাত্রার ছন্দ তো সেটাই, যার প্রতিটি পর্বে ছ-মাত্রা থাকবে। এখানে যেমন, ছ-টা বেজে দশ। ছ-মাত্রা। একটি পর্ব। বাস এসে গেছে। ছ-মাত্রা। আর একটি পর্ব। এভাবে পুরোটাই চলছে। এই পর্বগুলি জুড়ে জুড়ে কবিতাটি তৈরি। কোথাও অপূর্ণ পর্ব ব্যবহার করা হয়নি পুরো কবিতায়, হয়তো বা নিয়মবদ্ধ জীবনের দমচাপা ভাব বোঝাতে। অপূর্ণ পর্ব এলেই একটা মুক্তি ঘটত। শ্বাসের মুক্তি। কিন্তু সেটা দেওয়া হয়নি। কারণ কোনো মুক্তির কথা কবিতাটি বলছে না। বলছে এক বন্দিদশার কথা। প্রথম স্তবকে সব ক-টা কথাতেই ছ-মাত্রা পূর্ণ হওয়ার পরেই যতি পড়ছে। ব্যস্ততা বোঝাতে। তার মধ্যে 'কুইক! কুইক'-এ আবার তিন মাত্রা—তিন মাত্রা করে পড়েছে। কারণ ওখানে ছুটোছুটিটা চূড়ান্তে পৌঁছেছে। বাচ্চাকে তৈরি করে স্কুল বাসে তুলে দেওয়া তো। তার দ্রুতি বোঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় স্তবকে এসে, যখন 'আটটা পঁচিশ'—তখন, 'চায়ের সঙ্গে রোদ এনে ঘরে ওকে জাগিয়েছি'। এই লাইনটিতে কথার ওই কাটা কাটা ভাব সরে গিয়েছে কিছুটা, কারণ তিনটি ছ-মাত্রার পর্ব জুড়ে এই কথাটি তৈরি। এ হল ছন্দের দিক। কিন্তু, কেন এই দ্বিতীয় স্তবকে ওই তিনটি ছ-মাত্রার-র পর্ব জুড়ে গেল! আমি কারণ খুঁজে পাচ্ছি দুটি। প্রথমত, বাচ্চাকে স্কুলবাসে তুলে দেওয়ার ঠিক পরপরই, অনেক সময়, (সর্বদা নয়), একটু যেন ওরই মধ্যে হাঁফ ছাড়বার অবসর পাওয়া যায়। ওইটুকুই যেন একটু বা শান্তি। তাই প্রায় যান্ত্রিক ছকে পরপর যে কাজগুলো এতক্ষণ করা হল, তা থেকে সামান্য মুক্তির স্বাদ পেয়ে নিজের সংসারটার দিকে যেন একটু তাকানো গেল। এতক্ষণ ওই যে ব্যস্ততা সেটা অবশ্যই নিজের সংসারেই জন্য, তবু, সুতীব্র দমবন্ধ-করা তাড়াহুড়োয় এতক্ষণ যেন চোখ বন্ধ ছিল। এবার দেখা গেল, ঘরে কী সুন্দর রোদ এসেছে। আর 'ওকে' অর্থাৎ বরকে ঘুম থেকে জাগানো হল চা এনে। চা-এর সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে রোদ আনা এর মধ্যে সংসারটি ধরে রেখেছে যে-মেয়েটি, তার কল্যাণময়ী মমতাময়ী রূপ ফুটল। আর তারই সঙ্গে ফুটে উঠল, সকালের রোদের মতোই, ঘুমন্ত স্বামীর প্রতি চাপা স্নেহ। এই যে নিজের সংসারের দিকে তাকানোর অবকাশ পেয়ে, ঘরের জানলা দিয়ে রোদ আসা দেখে নিজের দিনরাতের থাকার ঘরটিকে লহমার জন্য ভালো-লাগা, এ হল এক ধরনের যুক্ত হওয়া। এই রোদ ঘরে আনার মধ্যে দ্বিতীয় একটি অর্থ-আভাসও আছে। স্বামীকে ঘুম থেকে জাগানোর মধ্যে তার প্রতি মায়া-মমতার একটা যোগ। ওই রোদ আনা আর জাগানো। ইতিমধ্যে নিজেরও একটু খিদে পেয়ে গিয়েছে। পাবে না? ভোর থেকে যা ছোটাছুটি চলছে। কিন্তু সেদিকে মনোযোগ দেওয়ার সময় কোথায়! বদলে বরের জন্য অফিসের টিফিনবাক্স রেডি করে দেওয়া। ওটাও তো প্রাত্যহিক একটা কাজ। এখানে লেখকের সতর্কতা বোঝা যাচ্ছে। আগের স্তবকে ছেলের ক্ষেত্রে টিফিন কথাটি ব্যবহার করা আছে বলে, এখানে মিনি লাঞ্চবক্স আনা হল। এটাতে বরের অফিসের স্ট্যাটাসও বোঝানো গেল একটু। সম্ভবত কর্পোরেট অফিস। এদিকে নিজের কী

হল? বর আর বাচ্চাকে রেডি করে দিতে গিয়ে নিজের অফিসের ট্রেন মিস। অফিসে কী ঘটছে? ডোন্ট ডিসটার্ব লেখা বোর্ড বাইরে ঝুলিয়ে বস-পুরুষ পায়ে পা ঘষল—সেই পুরুষটিরও মনোভাব বোঝা যায়! এখানে অ্যাজইউজুয়াল কথাটির ব্যবহার ঝকঝকে। বস্ রোজই এই সুযোগটি নেয়। এবং মেয়েটিও সে-সুযোগ নিতে দেয়। দুপুরে, দুটো দুই তখন—অফিসের সখী তথা সহকর্মীর সঙ্গে একটু অবসর প্রহরে দুজনের বসে থাকা। কোথায়? কোনো খাবার দোকানে নিশ্চয়ই। ওই যে স্তবকের শেষে আছে চাইনিজ খাই! তারপর অর্ডার দেওয়ার পরের যে কিছুক্ষণ বসে থাকতে হয়, সেই বসে থাকা। খাবার যতক্ষণ আসছে না, ততক্ষণ বাইরে তাকানো। সে তাকানো শূন্য। বাইরে গাছ। পলাশ? শিমুল? এখন সব ভুলে গেছে মন। এইরকমই ব্যস্ত এখন জীবনযাত্রা। ব্যস্ততার কথায় মনে পড়ল ছ-মাত্রার পর্বে এই তিন মাত্রার পর যতি ব্যবহার প্রথম স্তবকেও ছিল। এখানেও আছে। সেই তিন মাত্রার ছেদ তুলে ধরেছিল তাড়াহুড়োর চূড়ান্ত অবস্থা। বাচ্চাকে তাড়া দেওয়া হচ্ছে। আর এই পলাশ? শিমুল? এখানে তিন মাত্রার পর যতির প্রয়োগ ফুটিয়ে তুলছে ক্ষণিক অবসর। আর সেই অবসর আসলে একটা শূন্যতা। ভ্যাকুয়াম। পলাশ না শিমুল, তাতে আর কী-ই বা এসে যায়! প্রবল ব্যস্ততার মধ্যে মধ্যে এই শূন্যতা ঢুকে পড়ে জীবনে। কিন্তু সেই শূন্যতাকেও অনুভব করাব সময় নেই। খাবার এসে গেছে টেবিলে। খেয়ে আবার অফিসে ফিরতে হবে তো।

অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে এবং ফেরার পরেও তো অনেক কাজ। বরের অফিসবন্ধু ডিনারে আসবে—তার জন্য ব্যথা পা নিয়ে বাজার থেকে ইলিশ কেনা। ঘুমোনো আলোয় কথাটিতেও ক্লান্তি এবং বিশ্রামের জন্য চাপা আকাঙ্ক্ষা। বরের বাড়ি ফিরতে দেরি হচ্ছে। কিন্তু বরের বন্ধু এসে গেছে। মোহময় চোখ নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলা। এই কথা বলাটাও একটা কর্তব্য একদিকে—কেন-না, বর পৌঁছোয়নি, বরের বন্ধু পৌঁছেছে—তাকে সঙ্গ দেওয়াটাও, সারাদিনের কাজের মধ্যে একটা কাজ। আর এই কাজটা করতে ভালোও লাগছে অন্যদিকে—কারণ, বিলোল চোখ, মুগ্ধ করার মতো তাকানো যে আমি হারিয়ে ফেলিনি—তার প্রমাণ, আমি পাচ্ছি বরের বন্ধুটির দিক থেকেও, সে কথা স্পষ্ট ভাবে বলা না হলেও আভাস আছে। 'গল্প দিচ্ছি' শব্দটার মধ্যে আছে এই ইঙ্গিত যে আমার এই বিলোল চক্ষু, এবং সঙ্গদানের মধ্যে ওই পুরুষটিকে মুগ্ধ করার স্যাটিসফ্যাকশন আছে, কিন্তু ওই বিশেষ পুরুষটির প্রতি সত্যি-সত্যি আমার তেমন-বিশেষ মুগ্ধতা নেই! তাই বেশ অনেকটাই ভান করছি করে যাচ্ছি—বর বাড়ি ফিরে এলে, যা করতাম না, বা করার অবকাশ থাকত না। সরষের ঝাঁঝ সারা ঘরময়। হ্যাঁ, ওদিকে কিচেনে, যে সরষে ইলিশ রান্না হচ্ছে, তার গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে—ঠিকই। কিন্তু এই আমিষ গন্ধের মধ্যে অন্য এক রান্নার ইঙ্গিতও আসছে। শক্তি লিখেছিলেন 'আজ বাতাসের সঙ্গে ওঠে, সমুদ্র, তোর আমিষ গন্ধ'। একা ঘরে, বিলোল চাহনি দেখে স্বামীর বন্ধুটির ভিতরেও যে আলোড়ন, কাম-আলোড়ন তৈরি হচ্ছে—না-বলা কাম-আলোড়ন, সেই অর্থস্তরটিও সরষে ইলিশেব ঝাঝে ঢাকা দেওয়া

আছে। কেন ঢাকা দেওয়া? বস যে পায়ে পা ঘষল সেটা তো স্পষ্টই বলা ছিল? এখানে ঢাকা কেন? কেন-না, এখানে তো সেরকম স্পষ্ট শারীরিক কোনো ঘটনা বাস্তবে ঘটছে না। দুজনের মধ্যেই ব্যাপারটা শুধু কেবল তাকানোয়, হয়তো কথা বলার ভঙ্গিতে, বিশেষ ধরনের গল্প বলায়, চাপা একরকমের উত্তেজনা। আসল অনুভূতিটা দুজনের মধ্যে কেউ প্রকাশ করছে না! ঢাকা দেওয়া আছে। যা মেয়েটিও উপভোগ করছে। যদি কেবলই ব্যাপারটা এইটুকু হত যে স্বামী ফিরতে দেরি করছে, তাই আমন্ত্রিত স্বামীবন্ধুর সঙ্গে কথা বলে সঙ্গ দিচ্ছি—তাহলে 'বিলোল চক্ষে' এবং 'গল্প দিচ্ছি' শব্দ দুটির প্রয়োজন হত না। এবং, সর্বোপরি, 'সরষের ঝাঁঝ সারা ঘরময়' কথাটিও আনতে হত না। কেন মেয়েটি এটা উপভোগ করছে? সেটা বলে দেবে এ কবিতার শেষ স্তবকটি। তার পুরো জীবনটা যে কী অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, তাও বলে দেবে এই শেষ স্তবক। রাত পৌনে বারোটা। শুতে গেছে দুজনে। মেয়েটির ঘুম থেকে ওঠা দিয়ে এ কবিতা শুরু হয়েছিল। ঘুমোতে যাওয়া দিয়ে শেষ হতে চলেছে কবিতা। স্বামী, ইতিমধ্যেই ঘুমন্ত। কেন-না, 'ওর গায়ে হাত পড়লেও'—এই কথাটিতে স্বামী ঘুমিয়ে পড়েছে সে-ইঙ্গিত আছে। তাকে জাগানোর চেষ্টা করতেও, বা জাগানোর কথা ভাবলেও নিজেরই মধ্যে তো জাগরণ ঘটল না। এমনকি তাকে স্পর্শ করা সত্ত্বেও ঘটল না। নিজেকে ভাবব? এই কথাটির মধ্যে আছে, মেয়েটির নিজের শরীর-বাসনা পূরণের ইচ্ছের কথা। সকালে যেমন একবার খিদে খিদে ভাব হয়েছিল বটে, তখন, সেই নিজের খিদের দিকে মন দেওয়ার সময় ছিল না—কর্পোরেট স্বামীর মিনি লাঞ্চবক্স সাজাতে ব্যস্ত হতে হয়েছিল তাকে—এবারও তার অন্য আরেক স্বাভাবিক খিদে মিটল না। কেন-না, তার ভেতরেই তো আলো জ্বলল না। 'আলো জ্বলল না' এক্সপ্রেশনটি খুবই সুন্দর। নিজেকে সে এবারে আরও ভাবছে! যেমন, দুপুরে চাইনিজ খাবার আগে, মিতালির সঙ্গে বসে পলাশ বা শিমুল গাছের দিকে তাকিয়ে একটা শূন্যতা এসেছিল! তবু ওই মিতালির সঙ্গেই একটা নির্ভার সখীত্ব মেয়েটির হয়তো আছে। কেন-না—বেট ধরি যদি! ওই ছেলেমানুষির খেলা সে খেলতে পারে হয়তো একজনই প্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে—যে ওই মিতালি। তবু, শূন্যতা তো এসেছিল। সেই শূন্যতাকে অনুভব করার অবসর ছিল না তখন। নিজের দিকে দু-এক পলক তাকানোতেই যে শূন্যতা যে চলে গিয়েছিল। এই রাত্রে, ঘুমিয়ে পড়া স্বামীর পাশে জেগে থাকতে থাকতে—সেই শূন্যতাবোধ ফিরে এল তার সত্যিকারের দানবীয় চেহারা নিয়ে। ভোর থেকে রাত এই যে দৌড়োনো, কোথাও কোনো উপভোগ নেই। আনন্দ নেই। খুশি নেই। সবটাই রুটিন। ছকে বাঁধা ঘরে পা ফেলে ফেলে চলা। অসম্ভব একটা তাড়া সর্বক্ষণ। কীসের জন্য বাঁচা তাহলে! এই বেঁচে থাকাটা যখন বেছে নিচ্ছিলাম, এই জীবনসঙ্গী যখন বেছে নিচ্ছিলাম, তখন তো বুঝতেই পারিনি, একদিন এইরকম খাটুনির যন্ত্র হয়ে যাব। কবিতাটির রচনা কৌশলের চমৎকারিত্ব হল প্রতিটি স্তবক শুরু হচ্ছে, ঘড়িতে ক-টা বাজল সেই সময়টি উল্লেখ করে করে। রুটিনের সর্বগ্রাস বোঝাতে। প্রায় প্রতিটি স্তবকের শেষ লাইনটিতে এসে একটি ছোট্ট এপিসোড শেষ হচ্ছে।

প্রথম লাইন এবং শেষ লাইন—দুটি-ই সব সময় ছ-মাত্রার একটি মাত্র পর্ব দিয়ে তৈরি হচ্ছে। প্রথম স্তবকে তো 'ক-টা বাজল' থাকবে, লেখক ঠিক-ই করে নিয়েছেন। স্তবকের শেষ লাইনটিতেই মুনসিয়ানার পরিচয়। এ ছাড়া পুরো কবিতায় অন্ত্যমিলকে চমৎকার লুকিয়ে ফেলা হয়েছে, তাদের দূরে দূরে রেখে। প্রথম পাঠে ধরা যায় না মিল আছে। মিল মানে তো মিলন। জোর করে মিল দিতে গেলে কবিতা নষ্ট হয়। মিলনে তো জোর চলে না। এই দুটি নারী-পুরুষের দাম্পত্য টিকে আছে, ভেঙে যায়নি, কিন্তু একজন আরেকজনের থেকে দূরে সরে গিয়েছে। ভেতরের দূরত্ব। করণ-কৌশলের এই এক অপূর্ব ব্যবহার—এ-লেখক চৈতালী চট্টোপাধ্যায় সম্ভব করতে পেরেছেন অন্তত এই কবিতাটিতে। কবিতাটির শেষ স্তবকে এসে, মেয়েটি যখন নিজের এই আপাত সুখী-সফল জীবনের চরম শূন্যতা অনুভব করছে, তখন এও বোঝা যাচ্ছে স্পষ্ট যে স্বামীবন্ধুটিকে 'বিলোল চক্ষে' 'গল্প' দিতে দিতে কী ধরনের সুখের ঝাপসা আস্বাদ পাচ্ছিল। যা তার জীবন থেকে এত তাড়াতাড়ি হারিয়ে যাবে ভাবেনি, সেই শরীর-সঙ্গও—যান্ত্রিকতার চাপে হারিয়ে গেছে। কবি মণীন্দ্র গুপ্ত, তাঁর প্রথম জীবনের কবিতায়, একবার লিখেছিলেন 'দম্পতি' নামের একটি লেখায়—ঠিক একই কথা :

তা ছাড়াও প্রত্যেক আগুনগুলো আপন স্বভাববশে
জ্বলতে জ্বলতে নিভে আসে
নিভে হিম হয়।

মেয়েটি ভাবেনি, তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের একটি মূল আগুন এত তাড়াতাড়ি নিবে আসবে। কারণ তার ভেতরেও তো আলো জ্বলল না। আগুন থেকেই তো আলো। অথচ অগ্নিইচ্ছা তার ভেতরে এখনও আছে। যদিও ঘুমন্ত স্বামীকে ছুঁয়ে তা আর জাগে না। কারণ, সেই জাগিয়ে তোলার যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চয়ই অনেকদিন স্বামীর ভেতরেই নেই। এইবারে কবিতার একেবারে শেষে এসে একটি অভাবনীয়কে আমরা দেখতে পাই। এই হিম, সম্পর্কহীন দাম্পত্যশয্যায় দুজন মানুষের মধ্যে একজন যে জেগে আছে, সে নারী! তার চোখ থেকে একফোঁটা জল বালিশে গড়িয়ে পড়ে। এটুকু স্বাভাবিক। কিন্তু আসলে তো জলের কথা নেই কবিতায়। আছে 'রক্তের ফোঁটা'। আর ৩ার আগে আছে অমোঘ প্রয়োগে 'প্রথম' শব্দটি। আমরা অনুমান করি, সারাদিনের দৌড়ের পর ক্লান্তি আর জীবন ও সম্পর্কের শূন্যতাবোধের হতাশায় মেয়েটির চোখ থেকে বালিশে জল গড়িয়ে পড়া। আসলে দীর্ঘদিনের মিলনহারা একত্র শয্যায় তার মনে পড়ছে, প্রথম মিলনকালটিকে। যখন কৌমার্য হারানো প্রথম রক্তের ফোঁটা শয্যায় পড়েছিল। সে-যন্ত্রণার মধ্যে কোনো পাওয়া ছিল। আনন্দ ছিল। আনন্দময় জীবনের প্রতিশ্রুতি ও আশা ছিল সেই রক্তের ফোঁটার মধ্যে। আর আজ চোখের জলই যেন রক্তের ফোঁটার মধ্যে। আর আজ চোখের জলই যেন রক্তের ফোঁটা।

কৌমার্য হারানোর প্রথম আনন্দরক্ত আর আজ সব-থেকেও-কিছু-নেই এই অনুভবের অশ্রুফোঁটা একাকার হয়ে গেল। 'বালিশ' শব্দটির ব্যবহারে—তুমিও বুঝবে, আমিও বুঝব, বিশদ না বললেও—একটি অভাবনীয়ের আগমন সম্ভব হল। প্রথম দিনেও হয়তো বালিশটিই ধারণ করেছিল সেই শোণিতপাত। আজ ধরছে অশ্রু। দু-দিনে বালিশটির অবস্থান, শয্যার ও শরীরের, আলাদা আলাদা জায়গায়। লক্ষণীয়, এই কয়েক বছরের ব্যবধান মেয়েটির জৈবনিক অবস্থানকেও নিয়ে এসেছে আলাদা জায়গায়! জীবনে মেয়েটির স্থানাঙ্ক সেদিনের তুলনায় আজ ভিন্ন হয়ে গিয়েছে। সেদিনের আশা আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তি আজ শূন্যতে এসে পৌঁছোল।

একেবারে অন্য একটি অভাবনীয়ের দিকে এবার আমরা যাব। এ কবিতাটিও দাম্পত্য সম্পর্কের কবিতা—তবে তা বলা হচ্ছে পুরুষটির দিক থেকে।

স্বামী-স্ত্রী

এসো, শুতে এসো। একা বিছানায় ভয় করে। অন্ধকারে পাশে থাকো।
পায়ে সায়েটিকার ব্যথা। পায়ের ওপর তোমার ভারী জানু চাপিয়ে রাখো।
ঘুম আসে না।
আঙুলে আঙুল জড়িয়ে চাপো, কানের পিছনে হালকা করে ফুঁ দাও।
ভয় করে। অন্ধকারে পাশে থাকো।
টাকপড়া মাথা—এখনও পাঁচ-দশটা চুল শীতে কুঁকড়ে আছে—
স্তনের তলায়, বুকে চেপে ধরতে ধরতে বলছ শুনতে পাই :
        আহা, এখনও মাথাটা তলতলে—
        আহা, সাত দিনের শিশুর মতো ব্রহ্মতালু দিপদিপ করছে।
হয়তো ঘুম আসছিল, কিন্তু এই কথা শুনে চোখের কোটরে
                                মণি স্থির হয়ে গেল।
কালকে দোল। আজ শুক্লা চতুর্দশী।
চাঁদ সেই গর্তে পাতকুয়োর পুরোনো জলে চিকমিক করছিল
তোমার বগলের ফাঁক দিয়ে আমি তাকিয়ে দেখছি।

বিয়ের আংটিটা কুয়োয় ফেলে দাও—
চাঁদের বুকে সেটা কাঁকড়ার ছানার মতো আটকে থাকুক,
কাশের ডাঁটায় বিঁধে বিঁধে দ্রোণের মতো একজন কেউ
একদিন তাকে ঠিক তুলে আনবে।
        এসব কি ভয়-পাওয়াদের রাতের স্বপ্ন? না কি
        ব্রহ্মতালু-দিপদিপ-করা শিশুর দেয়ালা?

পরের বছর
অ্যানাটমি ক্লাসে ফর্মালিন-এ চুবোনো শবের হাত পা কাটা হচ্ছে,
নাড়িভুঁড়ি টেনে বার করা হচ্ছে—
ছেলেমেয়েরা চলে গেলে সে টেবিলে শুয়ে ঘুমঘুম গলায় বলছে;
খোকা মাকে শুধায় ডেকে,
'এলেম আমি কোথা থেকে,
কোন্‌খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে।'
বলতে বলতে সে একা-ঘরে উঁচু সিলিংয়ের দিকে
তাকিয়ে থাকে, শব্দহীন গলায় ককিয়ে ককিয়ে ডাকে:
এসো, শুতে এসো
একা বিছানায় ভয় করে
অন্ধকারে পাশে থাকো।

এই কবিতাটিতে আছে দুই স্বামী-স্ত্রীর সংলগ্ন হওয়ার কথা। কিন্তু এই কবিতাটি কামকে পার হয়ে এসেছে। শরীর-বাসনা যদি, কাঁটাগাছ ও কাচ-টুকরো ছড়ানো, এক তেপান্তর—তবে তাকে পার হয়ে এসেছে এ কবিতা। আগের কবিতাটিতে আমরা বারবার শরীর-বাসনার, তার তৃপ্তি-অতৃপ্তির একটি বড়ো ভূমিকা দেখেছি—যে ভূমিকা চাপা পড়ে আছে জীবনের কাজের স্তূপে, রুটিন-বদ্ধতায়। এ কবিতা কোনো রুটিনের কথা বলছে না। এ কবিতায় সঙ্গিনীকে ডাকছে পুরুষ। বলছে এসো শুতে এসো। একা বিছানায় ভয় করে। এখানে শরীর আছে। কিন্তু শরীর-বাসনার উত্তপ্ত অশান্তি নেই। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর একটি উপন্যাসে ছিল যার নাম 'প্রেমের চেয়ে বড়'। প্রেমের কবিতা পড়তে তুমি অভ্যস্ত। অপ্রেমের কবিতাও অনেক পড়েছ। তোমার সঙ্গে আমিও পড়েছি। কিন্তু এ কবিতা, আক্ষরিক ভাবে, 'প্রেমের চেয়ে বড়'। শরীর কীভাবে আছে এখানে? আছে আশ্রয়ের মতো। শান্তির মতো। এ শরীর এখন কেমন? পায়ে সায়েটিকার ব্যথা। আগের কবিতাটিতে. তোমার মনে পড়ছে কি, ব্যথা-পায়ের কথা ছিল, মেয়েটির? সে বাজারে মাছ কিনতে গিয়েছিল। এই পুরুষটির অবস্থান কিন্তু অন্য। কেবল, বিছানায়, শুতে আসার সময়টুকুই এই কবিতায় ধরা আছে। সারাদিনের অন্য সময় এখানে বলা নেই। শরীরের কথা বলছিলাম। টাক পড়া মাথা—এখনও পাঁচ দশটা চুল শীতে কুঁকড়ে আছে। শরীরদাহের বয়স পার করে এ কবিতা পৌঁছেছে, যেখানে স্নেহের তাপ—সমস্ত প্রেম যেখানে সন্তান-জননীর গভীর আশ্রয়ে পৌঁছোয়, সেখানে। এক বৃদ্ধের আধো ঘুমন্ত মাথা, বুকে চেপে আছেন এক বয়স্কা নারী। আগের কবিতাটির মতো এ কবিতাতেও আছে বিবাহিত দুই নারী-পুরুষের কথা। কিন্তু এই যে যুগল, এরা যেন সমাজকে পার হয়ে এসেছে, শরীর-বাসনা পার হওয়ারই মতো। আগের কবিতাটিতে লক্ষ করো, সমাজে উন্নতি করার জন্য, জীবিকায় আরও আরও আরও উঠে যাওয়ার জন্য, আরও আরও সুখ-সমৃদ্ধি লাভের জন্য ওই জীবনটি যাপন করছিল দুই নারী-পুরুষ। তারই চাপে পরস্পর থেকেই দূরবর্তী হয়ে পড়ল তারা—একত্র

বসবাস করেও। বাইরে থেকে সমাজ ও উচ্চাশা ঢুকে পড়ল দুজনের মধ্যে। কখন যেন ছেদ করে দিল দুটি মানুষের একান্ত যোগসূত্রটিকে। এখানে, এই নারী-পুরুষ জানে, তাদের জীবন বড়ো অল্পদিনের। পুরুষটি যেন শেষবারের মতো আঁকড়ে ধরে প্রতিদিন, বিছানায় শুতে যাওয়ার আগে। শিশুকালে তার যেমন ভয় করত, একা শুতে. এ বৃদ্ধ বয়সেও যেন সেই ভয়।

বিবাহও পার হয়ে এসেছে পুরুষটি। বলছে বিয়ের আংটিটা কুয়োয় ফেলে দাও। কিন্তু একা বিছানায় শুতে যার ভয়, সে কিন্তু এই কবিতায় যেন এক ভবিষ্যৎকে দেখতে পাচ্ছে। বিয়ের আংটিটা সেই কোন দূর অনাগত কালে কোনো বালক তুলে আনবে কাঁটায় বিঁধে, সেটুকুতে নয়। জীবন পার হয়ে চলে যাওয়া এক জীবনের কথা বলা আছে এখানে। সমাজের চাপ ও উচ্চাশা কবেই পার হয়েছে সে পুরুষ, পার হয়েছে শরীরের বাসনাদাহ, পার হল—এ কবিতার শেষ অংশে—এমনকি নিজের আয়ুষ্কাল, জীবৎকালকেও।

হ্যাঁ জীবৎকালকেও পার হয়ে চলে এসেছে এই পুরুষ। স্টানলি কুব্রিক-এর 'দ্য স্পেস ওডিসি' ছবিতে মূল চরিত্র ডেভিড বোম্যান তারাজগতের মধ্যে এমন এক স্থানে গিয়ে পৌঁছোয় যেখানে শেষ দৃশ্যটিতে সে নিজের ভ্রূণের মধ্যে ফিরে যায় আবার। আর এই কবিতার পুরুষটি মৃত্যু পার হয়ে গিয়ে, হাসপাতালের ডিসেকশন হল-এ শুয়ে, ছিন্নবিচ্ছিন্ন শরীর নিয়েও ছোটোবেলার কবিতা বলে। খোকা মাকে শুধায় ডেকে / এলেম আমি কোথা থেকে। সেই শবঘরের টেবিলে শুয়ে সে কবিতাটির প্রথম লাইনে ফিরে যায় : 'এসো, শুতে এসো, একা বিছানায় ভয় করে'। এ কবিতা মৃত্যুকে পেরিয়ে গিয়েও বেঁচে থাকা, কোনো অস্তিত্বের কথা বলে। স্টানলি কুব্রিকের ওই ছবি 'দ্য স্পেস ওডিসি' যেমন বলেছিল, জীবৎকাল পার হয়ে যাওয়ার পর কোনো টাইম স্পেসের কথা যেখানে মানুষ তার ভ্রূণে ফিরে গেছে। কিন্তু শেষ, একেবারে শেষ দৃশ্যে যখন, এক অতিপ্রাকৃত ডিমের মধ্যে ডেভিড বোম্যানের চোখ-বন্ধ ভ্রূণ-অবস্থাটি আমরা দেখছি, হঠাৎ সেই অচেতন-প্রায় ভ্রূণের চোখ দুটি খুলে যায়। সরাসরি আমাদের দিকে তাকায় সে। পুরো পর্দায় তার মুখ ও তাকানো। সেই তাকানোর মধ্যে একটা স্পষ্ট চেতনা আছে। বাইরে ডিমের মতো হালকা খোলার আচ্ছাদন, যা গর্ভথলিও হতে পারে। প্রচণ্ড ধাক্কা লাগে দর্শকের। দর্শক কিছু বোঝবার আগেই তৎক্ষণাৎ ছবি শেষ হয়। মনে রাখতে হবে লেখক আর্থার সি. ক্লার্কের সৃষ্ট এই চরিত্র ডেভিড বোম্যান আবার ফিরে এসেছিল, আর্থার সি-র এই ট্রিলজির শেষ লেখা 'টু-থাউজেন্ড সিক্সটি ওয়ান : ওডিসি থ্রি' উপন্যাসে। সেখানে অবশ্য ডেভিড বোম্যান ছিল একটি আলোর কণা। অর্থাৎ প্রথম উপন্যাস যখন ছবি হল, তখন ডেভিড বোম্যান ফিরে গেল তার ভ্রূণ অবস্থায়। চিত্রনাট্যে আর্থার সি-র সহযোগ ছিল। আর তারও পর, ট্রিলজির শেষে, ডেভিড বোম্যান একটি আলোর কণা। আলোর কণা হিসেবেই সে অংশ নিচ্ছে উপন্যাসে। সে একটি অস্তিত্ব মাত্র। তার কোনো চেহারা নেই। কিন্তু উপস্থিতি আছে, ভূমিকা আছে।

এই যে কল্পনার অতিদূর প্রসার-ক্ষমতা—বাংলা কবিতার জগতে, কবি মণীন্দ্র গুপ্তের

লেখার পর লেখায় তা উপস্থিত। এবং এ কেবল অসামান্য কল্পনা বিস্তারই নয়, জীবৎকালের পরবর্তী জীবনের কথা বলে, সময়হারা যে-সময়, তার কথা বলে। তা আমাদের বাস্তবের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে একদিকে—দিচ্ছে অতিলৌকিক জগতের দিকে উড়াল, পাশাপাশি বলছে আমাদের অস্তিত্ব যে বিনাশহারা—সেই কথাও। অন্যদিকে গভীর ও তীব্রতমভাবে মানবিক হয়ে থাকছে এ কবিতা। সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্কের জন্য আমরা মানুষ—বারবার ছিন্নতা বা আঘাত এলেও আমরা সেই মানবধর্মেই অবস্থান করছি। আমাদের আর্তি নিয়ে। ভালোবাসতে চাইবার মরণহারা ইচ্ছে নিয়ে। তাই এ কবিতার শেষে আমাদের চোখ ছাপিয়ে জল ঝরতে থাকে। আমরা বুঝতে পারি, আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের ভালোবাসাও একটি আলোর কণা। যা মৃত্যুর পরেও থাকবে।

এই কবিতার ভাষা আপাতভাবে অত্যন্ত সাদামাটা। মণীন্দ্র গুপ্তের কবিতার ভাষা পড়লে মনে হবে খুবই সহজভাবে কথা বলছেন। কোথাও কোনো বাইরের কৌশল নেই।

নেই-ই তো। যা আছে তা কবিতার ভেতরে! 'তেহাই' পত্রিকায় একটি সাক্ষাৎকারে, সাহিত্যের ভাষানির্মাণ প্রসঙ্গে মনীন্দ্র গুপ্ত একটি আশ্চর্য সত্যকে বলে দিয়েছেন : 'আমি আমার সত্যিকারের ভাষায় কি অসামান্য হতে পারি না? আমার ভেতরের কথাগুলো তো বলা দরকার। আর আমার ভেতরটা যদি অসাধারণ হয়'...(তাহলে আমার কথাগুলোও কি অসাধারণ হবে না?) ঠিক তাই। এই সূত্রে তাঁকে জহর সেন মজুমদার বলেছিলেন : 'অনেক সময় নিজেকে চারপাশ থেকে গুটিয়ে নিয়ে আলাদা করতে ছদ্মভাষা তৈরি করতে হয়।' এ কথাও খুব গুরুতর কথা। এর প্রমাণও, এইরকম নানা ধরনের ছদ্মভাষার প্রয়োজন ও ব্যবহারকেও আমরা অহরহ দেখি। কিন্তু মণীন্দ্র গুপ্তকে কোনোদিন নিজেকে আলাদা করার চেষ্টা করতে হয়নি। নিজেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেননি তিনি। ছদ্মভাষারও দরকার হয়নি। মণীন্দ্র গুপ্তের মনের ভেতরটা অসাধারণ বলে, নির্দ্বিধায় বলেছেন নিজের কথা। আর সেই কথাগুলো কবিতা হয়ে চিরসময়ের বহমান জগৎকে ধারণ করেছে। পাঠক হিসেবে আমি সৌভাগ্যবান যে আমাদের প্রথম যৌবন থেকে আজ পর্যন্ত তাঁকে পূর্ণশক্তিতে কাজ করতে দেখতে পেয়েছি।
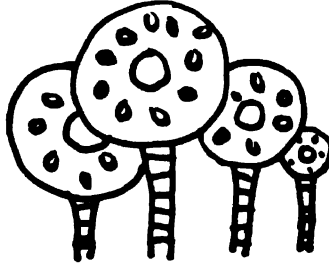
২৮

সম্পর্ক এমন একটা জিনিস, কোনো কোনো মানুষ কেবল সেটার জন্যই বাঁচে। বলতে পারতাম সব মানুষ, সাহস পেলাম না। টাকাপয়সার জন্যেও বাঁচে নাকি অনেকে। রাতে শুতে যাওয়ার আগে একবার উলটে দেখে নেয় দুটো-তিনটে পাশবই। অ্যাকাউন্টগুলোয় নজর দিয়ে মনে জোর পায়। বাকিগুলো আজ আর দেখাই হল না। না দেখলেও হবে। কাল দেখব। এমন মানুষও আছে জগতে। হয়তো কোনো লেখক, রাতে শুতে যাওয়ার আগে পাতা উলটে দেখে নেন, কোন পর্যন্ত লিখেছি আজকে। এমন ছেলেও হয়তো ছিল কখনও, খাওয়া হয়নি সারাদিন, সন্ধেয় দুটো মুখে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে—কিন্তু মনে কী আনন্দ! সারাদিন মাথায় মাথায় তিনটে কবিতা সে ভেবে রেখেছে। এখন কপি করে শুতে যাবে। কেউ বা ঘুমোনোর আগে চোখ বন্ধ করে ভাবল কোনো মেয়ের তাকিয়ে থাকা চোখ।

নানারকম মন মানুষের। আর নানারমক সম্পর্ক। ভালোবাসাই খুঁজে ফিরছে সারাজীবন। এই খুঁজে ফেরার শেষে যে অশান্তিটুকু হাতে আসবে কেবল, অন্তত সেই আশঙ্কাই সর্বাধিক—সে কথা তার মনে থাকে না। এই কথা ভেবেই একজন লিখেছিলেন একটা কথা, কবিতার লাইন হিসেবে : ভুল ভালোবাসা হতে পারে তবু ভালোবাসা ভুল নয়। এই কথাটা মন্ত্রের মতো মনে থেকে গিয়েছে কারও কারও।

যিনি লিখেছিলেন এই লাইনটি, প্রয়াত কবি ভাস্কর চক্রবর্তী, তাঁর অন্য একটি কবিতা মনে করে দেখি :

মেয়েদের কথা

'মেয়েরা তেমন নয়'—শান্তভাবে শেষ কথা বলে
আমার বন্ধুর বন্ধু বাড়ি ফিরলেন।

আমি এক নিশ্চল সাঁতারে
ভাসি, ভেসে যাই।

আঙুলে আঙুলে স্মৃতি, এ ঘরে ও ঘরে স্মৃতি
জেগে ওঠে—

রাত্রি সেই মেয়েটির শান্ত দুই হাতের মতন।

নীল রঙের গ্রহ, ভাস্কর চক্রবর্তী

বন্ধুর বন্ধু যে-মন্তব্য করেছেন, সে-বিষয়ে, শ্রোতা কিছু বলছেন না। অনুমান হয় তখনও কিছু বলেননি। কেন-না 'শেষকথা বলে বাড়ি ফিরলেন' বলা আছে। দুজনের কথাবার্তার মধ্যে শেষ কথা তো বটেই—মেয়েদের বিষয়েও শেষ কথা। এটা প্রায়ই আমাদের হয়, কারও কাছে কোনো কথা চুপ করে শুনে বেবিয়ে এলাম। কিন্তু মনে মনে কাজ করে চলল কথাটি। কবির ক্ষেত্রে অনেক সময়ই দেখা যায় সেই কাজ করে চলা থেকে কোনো লেখার জন্ম হয়। '৭৫-এ জরুরি অবস্থা ঘোষণার কিছু কাল পরে সন্দীপন চট্টোপাধায়-এর ঘর থেকে আড্ডা শেষে বেরিয়ে আসা শঙ্খ ঘোষের মাথায় যেমন ঘুরছিল আড্ডার একটা কথা। তিনি হাঁটছেন। আর কী ঘটছে? তাঁর লেখাতেই আছে : 'পদক্ষেপে পদক্ষেপে পেতে থাকি কয়েকটি লাইন।' সেই যে লাইনগুলো শঙ্খ ঘোষ পাচ্ছিলেন সেইগুলোই পরে হয়ে দাঁড়ায় 'রাধাচূড়া' নামের কবিতা।

যে-কথা শুনে চুপ করে চলে এসেছি, পরে মন কখনও কথাটির পক্ষে কাজ করে। বেশিরভাগ সময়েই কাজ করে কথাটির বিপক্ষে। 'মেয়েদের কথা' কবিতাটিতে, শ্রোতার মন পরে, নিশ্চল সাঁতারে ভেসে যায়। এই সাঁতার, স্মৃতির সাঁতার। মন ফিরে যায় কোনো একটি মেয়ের কাছে। তার সঙ্গে একাকী কিছুক্ষণ থাকার কাছে। মনে পড়ে আঙুল। আঙুলে আঙুলে স্মৃতি জেগে ওঠে। আঙুল দিয়ে যে আঙুলকে আঁকড়ে ধরা, সেই যেন আসল আঁকড়ে ধরা। আমার হাতের আঙুলগুলো তো এখনও আমার কাছে রয়েছে। এই মুহূর্তেও। তারা তো জানে কী পেয়েছে। সেই মুহূর্তটি কি বন্ধুর বন্ধুকে বোঝানো যাবে? আঙুলে আঙুলে স্মৃতির পরই, একই লাইনে আছে, এঘরে ওঘরে স্মৃতি—আঙুলে আঙুল জড়ানোর কিছুক্ষণ পর হয়তো তারা দুজনে আর সেই ঘরে বসে ছিল না, অন্য ঘরে উঠে গিয়েছিল দুজনে জড়িয়ে রাখা আঙুলের টানে, উঠে গিয়েছিল, যে-ঘর নির্জনতর—সেই ঘরে তখন হয়ত কেবল আঙুল আঙুলকে নয়—শরীর জড়িয়ে নিয়েছিল অন্য শরীরকে! আবার এঘরে ওঘরে স্মৃতি বলতে, এই শ্রোতার জীবন তো কেবল ওই দুপুর বা বিকেল বা সন্ধেটুকুই নয়—তার জীবনেরও তো এঘর ওঘর আছে—জীবনের বয়সের ভিন্নভিন্ন ঘর। ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা। বিভিন্ন বয়সের এঘরে ও ঘরে নানা স্মৃতি। মেয়েদেরই স্মৃতি হয়তো—জেগে ওঠে। এই স্মৃতির জেগে ওঠাটুকু বলার পরই কবিতাটির দৃশ্যান্তর ঘটে। কেন-না, একমাত্র, এই তৃতীয় স্তবকের দুটি লাইনের একটি লাইনেও ছন্দ তার পর্বকে মুক্তি দেয় না। অপূর্ণ

পর্বটি এসে এসে আগের দুটি স্তবকের প্রতি লাইনেই আমাদের যে মুক্তি দিয়ে যাচ্ছিল, অকস্মাৎ, এই দুটি লাইনে আমরা তা পাই না—অপেক্ষা করতে বাধ্য হই। কেন পাই না? আমার একটা আন্দাজ হয়: সেই যে স্মৃতি, শরীর-স্পর্শ আছে তার মধ্যে—কারণ আঙুলে আঙুলে জড়ানো পর্যন্ত বলা আছে, কিন্তু তারপর কী ঘটেছিল? এর মধ্যে তুমুল কিছু আগ্নেয়স্মৃতির উত্থান অসম্ভব নয়। কবিতাটি যেভাবে চলছিল, হঠাৎই, এই স্তবকে এসে তার গতি কিছুটা যেন স্বভাববিরুদ্ধ ভাবেই বেড়ে গেল। স্বভাব, মানে, এক-একটি কবিতার তো এক-একটি স্বভাব থাকে। পণ্ডিত রবিশঙ্কর যেমন বলেছেন, তাঁর কাছে, প্রতিটি রাগ এক-একটি মানুষের মতো। সেইরকম। খেয়াল করে দ্যাখো, একটি কবিতার কিন্তু নিজস্ব একটা স্বভাব থাকে। কবির একটা স্বভাব আছে। তার ছাপ সেখানে পড়ছে। অনেক সময়ই প্রায় পুরোটাই পড়ছে। আবার অনেক সময়, কবির যে-স্বভাবটা আমরা চিনি সেই স্বভাবটা ওই বিশেষ কবিতাটাকে হয়তো পুরো নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। কবির হাত ছাড়িয়ে বেরিয়েও যাচ্ছে। তাই খুব খেয়াল করলে দেখা যায়, সব সময় কবির স্বভাব আর কবিতার স্বভাব একই হচ্ছে তা নয়। এই লেখাতে, হঠাৎ এই তৃতীয় স্তবকে এসে কবিতাটা যেন কোথাও থামছে না। পুরো স্তবকটা পার হয়ে গেল, তাও থামল না। থামল না মানে, অপূর্ণ পর্বটা এল না। আগের দুটি স্তবকে কিন্তু প্রতি লাইনেই অপূর্ণ পর্বটি এসে আমাদের শ্বাস ফেলার স্বস্তি দিয়ে শান্ত করছিল। এবার সেটা দিল না। শরীর এল যে! শরীরতাপের স্মৃতি কাজ করছে। এঘরে ওঘরে স্মৃতি। উন্মাদনা বললে এ কবিতাটার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে—উন্মাদনা নয়—কিন্তু হঠাৎ ছটফট করে উঠল কবিতাটা। শান্ত স্বভাবের মানুষ, শরীরসঙ্গ পায় যখন, সে কি আর শান্ত থাকে? সেই বিশেষ ক্রিয়াটির ধর্ম মানুষটির স্বভাবকে সেই সময়টুকুর জন্য বদলে দেয়। এক-একটি কবিতা যে এক-একরকম স্বভাব পায়, কারণ, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় কথা বলে তারা। একই অবস্থায় সব কবিতা তো কথা বলে না। শরীরসঙ্গের স্মৃতি নিয়ে এ কবিতাও তাই তৃতীয় স্তবকে পৌঁছে কোনো অপূর্ণ পর্বে বা সমে পৌঁছোলো না। দ্বিতীয় লাইনটিকে তো একেবারেই অসমাপ্ত করে রাখা হল। যেমন আমাদের সব শরীরসঙ্গ সম্পূর্ণ হওয়ার সুযোগ পায় না—তেমনই অপূর্ণ অতৃপ্ত রইল তৃতীয় স্তবক—কেবল তার ছন্দ প্রয়োগে, এই ইশারাটিও রইল।

তারপরই আরও নীরবতা। স্পেস। কৌতূহল। শেষে, শেষ-লাইনটি সমে নামল। কী সেই সমতা? সমে এলে মন শান্ত হয়। 'রাত্রি সেই মেয়েটির শান্ত দুই হাতের মতন'। অন্য সব চলে গেছে তখন। যা বলা হল না—তা চলে গেছে মন থেকে। শুধু ফিরে আসছে শান্ত দুটি হাতের পাতা—যা রাত্রিকেও ধরে রাখতে পারে।

এসব কথা কি সেই বন্ধুর বন্ধুকে বোঝানো যেত কোনোদিন? মেজোপিসি বলল, মেয়েটা তো লক্ষ্মীট্যারা! কী মেয়ের সঙ্গে প্রেম করলি তুই! বড়োজ্যাঠা বললেন, ওরা পালটি-ঘর নয়। বাবা বললেন, শুনছি ফার্স্ট ক্লাস পায়নি—একে কী করে পছন্দ করলে তুমি! কাকিমা বললেন, তা ছাড়া একটু কেমন খুঁড়িয়ে হাঁটে না? সবই হয়তো ঠিক। কিন্তু বাস যখন ছেড়ে দিচ্ছে, আর তুমি দাঁড়িয়ে আছ টার্মিনাসে, এখন ও একমাস কলকাতা থেকে দূরে থাকবে, দেখা হবে না, বাস চলতে শুরু করা মাত্র একবার ঘুরে তাকাল তোমার

দিকে—ওই, ঠিক ওই তাকানোটা কি তুমি দ্যাখাতে পারবে বড়োজ্যাঠাকে, কাকিমাকে? একটা খাতার ওপর ঝুঁকে কী দেখতে দেখতে একবার হেসে ফেলল কিংবা হাতের ডটপেন দিয়ে চুল সরাল কপাল থেকে—ওইটা কি তুমি দ্যাখাতে পারবে মেজোপিসিকে? তুমি ট্রেনে উঠে দরজায় দাঁড়ালে আর কোথা থেকে ছুটতে ছুটতে একটা বিস্কুটের ছোট্ট প্যাকেট আর জলের বোতল হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলতে লাগল, খাবে তো? বলল, রাস্তায় খাবে তো? সেই যে বলছে, সেই গলাটা কি তুমি বাবাকে শোনাতে পারবে! তুমি তো ওইগুলোকে ভালোবেসেছ। তুমি সেই ভালোবাসাটা আর কাউকে বলে বোঝাতে পারবে না বলেই তো কবিতার খাতাটায় আশ্রয় নিলে।

এইরকম অথবা এর সম্পূর্ণ উলটো বা সদৃশ হাজার এক কারণে মানুষ কবিতা লেখার আশ্রয় নেয়। ভাস্কর চক্রবর্তী যেমন লিখেছিলেন তাঁর কবিতা লিখতে আসার কারণ, 'শয়নযান' বইতে : 'কেন লিখতে এসেছিলাম কবিতা? ছেলেবেলা থেকেই জীবন আমাকে যারপরনাই বিস্মিত করত। সকলেরই যেমন থাকে, আমার জীবনের পাশেও একেকটা আলো জ্বলত, মায়াবী এক আলো। আমার মতো—গরিব বাড়ির—এক পাঠবিমুখ ছেলের কাছে, কবিতা এসেছিল মুক্তির আশা নিয়ে।' যখন তাঁর কবিতা পড়ি, আমরা সবাই হইহই করে স্বীকার করে নিই, তাঁর প্রথম বই 'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা' থেকেই সম্পূর্ণ নিজের একটা শক্তিশালী ভাষা তৈরি করে নিয়েছিলেন এই কবি।

আর এই ভাষার মধ্যে তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন তাঁর মনটাকে। এমন একটা আশ্চর্য মন। যা বিষাদ-রৌদ্রের সহচর। এঘরে ওঘরে স্মৃতি, তিনি লিখেছেন না? তেমন একটি ঘরের কথা নিয়ে আসি তাহলে!

নিষিদ্ধ প্রেমের কবিতা-১

এই সেই ঘর যেখানে তোমার গন্ধ এখনও ভেসে আছে।
সব কিছুই আজ রূপকথা বলে মনে হয়।
রংমশাল, তুমি শখ করে জ্বালিয়েছিলে দু-চারদিন
এখনও জ্বলবে—সারাজীবন জ্বলবে—শুধু
আমাকে পুড়িয়ে মারার জন্যে।

কবিতা সমগ্র, ভাস্কর চক্রবর্তী

একটা ঘরে এসে দাঁড়ালেই মনে পড়ে, এখানে সে এসেছিল। সে শুধু এই ঘরে আসেনি। এসেছিল আমার জীবনে। হয়তো দিন কয়েকের জন্য। এই ঘরে কী তীব্র, তুমুল আগুনে জ্বলছিলাম দুজনে। তবু সেই আসা এখনও জ্বলছে। রংমশালের মধ্যে আছে বেঁচে থাকাকে রঙিন করে দেখার কথা। কিন্তু জ্বলাও তো আছে। আজকের গল্প-লেখক গৌতম সেনগুপ্ত যখন প্রথম লিখতে শুরু করেন, আত্মপ্রকাশ করেছিলেন 'শেষ রাতের ছবি' নামের ছোট্ট একটি কবিতা-পুস্তিকার মাধ্যমে। তাতে ছিল এক আগুনজ্বলা বাড়িতে একটি

টিয়াপাখির ঘাড় গুঁজে পুড়তে থাকার দৃশ্য। সেই পুড়তে থাকা এই কবিতার প্রান্তেও আছে। আছে কবির জীবনের মধ্যে। অভিযোগ ও কৃতার্থতা একই সঙ্গে মিশে আছে, শখ করে জ্বালিয়েছিলে কথাটির মধ্যে। এই দাহ যে কবিকে ছেড়ে যায় না, ফিরে ফিরে আসে তার প্রমাণ, নিষিদ্ধ প্রেমের কবিতাও ফিরে ফিরে আসে। ফিরে আসে আরও একটি ঘরের কথাও। কে জানে এঘর ওঘর, না কি একটাই ঘর।

নিষিদ্ধ প্রেমের কবিতা-৩

ও মেয়েটি ভেবে দ্যাখো, যদিও তোমার প্রেম, স্বামী ছিল
চুমু খেয়েছিলে তুমি এ-কবিকে
পাখাহীন দগ্ধ ছোটো ঘরে—মনে করে দ্যাখো।
মনে করে দ্যাখো তুমি চেয়েছিলে শান্ত বাথরুম
বলেছিলে? 'থেকে যাই'।—মনে করে দ্যাখো।
এ কবির কবিতাও অযথা পছন্দ করেছিলে—
ঠোঁট দিয়ে চাপছিলে এই ঠোঁট
মেলে ধরেছিলে বুক—ও মেয়েটি, মনে করে দ্যাখো।

কবিতা সমগ্র, ভাস্কর চক্রবর্তী

'অযথা' শব্দটির মধ্যে—যেমন আগের লেখায় 'শখ করে'-র মধ্যে—সামান্য অভিমান মিশে আছে, এটুকুই, অভিমান না থাকলে প্রেম কীসের! অভিমান আছে, কিন্তু অভিযোগ নেই। একটি মেয়ে, বিবাহিতা—সে সবকিছু ছেড়ে শুধু কবির সঙ্গে থেকে যেতে চেয়েছিল। পারেনি হয়তো। তবু চেয়ে তো ছিল! একটা দুপুরের জন্য হলেও—চেয়েছিল। তারই কৃতজ্ঞ-ব্যথায় ভরে যাওয়া আছে এই কবিতায়! কার না হয়েছে এমন! রাজা অয়দিপাউসকে মেষপালক বলেছিল, রাজা, অন্দরে তোমার নারী রয়েছে, তাকে জিজ্ঞাসা করে দ্যাখো যা বলেছি সত্য কি না। আমাদের অন্তরে যে-মন রয়েছে তাকে যদি জিজ্ঞাসা করি, যে স্মৃতির ভাণ্ডার রয়েছে সিন্দুকে, তাকে যদি জিজ্ঞাসা করি, তাহলে আমাদের কারও কারও জীবন সেই দাহের কৃতজ্ঞতা ফিরে পাবে। আজ সেই ঘটনাভূমির থেকে দূরে চলে এসে শুধু সৌন্দর্যটুকু জেগে থাকে, সেই মুহূর্তযাপনের সৌন্দর্যটুকু। আর থাকে সেই ঘর। সেইসব ঘরের চিরজ্বলন্ত ছবি। আসলে মেয়েটিকে তো বলা নয়—মনে করে দ্যাখো। ওটা নিজেকেই বলা। সাধে কি আর ভাস্কর একটা কবিতা শেষ করেছিলেন এই বলে :

মাস্টারমশাই মৃত্যুর চেয়েও জীবন আরও রহস্যময়
আমি ভাস্কর চক্রবর্তীকে আর সামলাতে পারছি না কিছুতেই।

দূর থেকে দেখার কথা বললাম না এখুনি! এই দূর থেকে দেখা নিয়ে একটা কবিতা তবে বলি।

দূরের টেবিল

এবার বয়স হল। মাছরাঙাদের কথা কেন?

আমার তাঁতের শাড়ি
ভালো লেগেছিল খুব ষাটের দশকে।

আরও ভালো লেগেছিল তাঁতের শাড়ির মহিলাকে।

অনেক বছর হল সেইসব—
আজ কিছু ক্লান্ত, তবু ভালো লাগে যেই দেখি

একটি মেয়েকে ঘিরে চার পাঁচজন বসে আছে
দূরের টেবিলে।

কীভাবে ধাপে ধাপে, এগিয়েছে কবিতাটি—কোনো ঝাঁকুনি ছাড়া। মাছরাঙা কথাটা এত সুন্দর। ওই শব্দটির মধ্য দিয়েই যেন মেয়েটির চোখ দেখা যায়, ঘাড় ফেরানো দেখা যায়। চঞ্চলতা দেখা যায়। নিশ্চয়ই কফি হাউসেরই কোনো মুহূর্ত। মেয়েটির যে একটি টান আছে, ঝিলিক আছে, তা দূর থেকেও বোঝা যাচ্ছে। তা ছাড়া এখন তো মেয়েটিকে খুশি-চঞ্চল দেখাবেই। কারণ অতগুলো ছেলে বা পুরুষ ওকে ঘিরে বসে আছে যে, সেই তাপে সে কি আরও উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠছে না দূর থেকে যে তাকে দেখছে, তারই চোখে! একজন নারী-কবি আমাকে বলেছিলেন এই 'মাছ-রাঙা' শব্দটি মেয়েদের পক্ষে অসম্মানজনক, কেন-না, মাছরাঙা মাছ শিকার করে। কোথাও মেয়েদের পুরুষ-শিকারি বলা আছে! আমার সে কথা একবারও মনে হয়নি। প্রথম লাইনেই তেমন কোনো অর্থসংকেত যদি সত্যিই থাকত তবে পরের দিকে পুরো কবিতায় সেটা একবার না একবার ঘুরে আসতই। এতে কেবল মেয়েটির সৌন্দর্যের কথাই বলা হয়েছে। আসলে শেষ লাইনের মেয়েটি, নিজে শেষ লাইনে থাকলেও, সে-ই তো প্রথম লাইনটি দিয়ে গেছে। পুরো কবিতা ধরে যে নিজের অতীত মনে পড়া। সে তো ওই দূরের টেবিলে বসা অচেনা মাছরাঙা মেয়েটিকে দেখেই মনে পড়া সেই ষাটের দশকের তাঁতের শাড়ি। আর তাঁতের শাড়ির মহিলাকে মনে পড়ছে একে দেখে। এই মাছরাঙা মেয়েটির সঙ্গেও, তবে একরকম সম্পর্ক হল। যেমন...কে ওই মেয়েটি? আমাদের ঘরের মেয়ের মতো মনে হয়। হয়তো মিনুর বোন হবে।...

অর্থাৎ এই মেয়েটি আমাদের চেনা। মধ্যবিত্ত বাঙালির চেনা একটি মেয়ে। বিনয় মজুমদার কবিতায় লিখেছিলেন একটি মেয়ের উক্তি : সে আমাকে বলেছিল, 'আমার দিদির সঙ্গে আপনার পরিচয় ছিল।' সে বলছে : এবং আমার নাম রাকা। এরপরই বিনয় একটি আশ্চর্য লাইন লিখেছেন : অনেক দক্ষিণে গিয়ে বৃষ্টি হও মেঘমালা, যাতে সে-যুবতী কোনো ঘরের ভেতর চলে আসে।

মুহূর্তে মেঘদূতের আবহ-অনুষঙ্গ নিয়ে এলেন বিনয়। কীভাবে? যখনই মেঘকে কিছু বলা হচ্ছে, দূরে গিয়ে কোনো নারীকে কোনো বার্তা জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে (এ ক্ষেত্রে

বৃষ্টিধারা হতে বলা) তখনই অজান্তে মেঘদূতের ঘরানাটিকে মনে এনে দেওয়া হচ্ছে। তা ছাড়া, প্রথমে ছিল, 'আমার দিদির নাম রিনি। এবং আমার নাম রাকা'। যখন 'অনেক দক্ষিণে গিয়ে বৃষ্টি হও মেঘমালা',—এল, অমনি এসে গেল 'যাতে সে যুবতী কোনও ঘরের ভেতর চলে আসে।' মেঘদূত-এর গোপন আবহ থাকায় 'যুবতী' শব্দটি আসবেই। যক্ষের যে প্রিয়া সে যুবতী। 'মেয়েটি' নয়। 'মেয়েটি' শব্দ সময় সময়ই যেন রোগা। 'মেয়েটি' শব্দ ক্ষীণাঙ্গী। আর 'যুবতী' শব্দ রসস্থ। ভরভরন্ত। ভাস্করের কবিতায় প্রধানত মেয়েটি দেখা দেয়। বারবার। যে আমারে ডাক দেবে এ জীবনে তারে বারংবার / ফিরেছি ডাকিয়া / সে নারী বিচিত্র বেশে, মৃদু হেসে, খুলিয়াছে দ্বার... বলাবাহুল্য, সে ঠিক একজনই নয়। কে যে কখন কাকে কবিতা দিয়ে যাবে, সে কি আগে থেকে কেউ বলতে পারে।

'দূরের টেবিল' কবিতায় যেমন তাঁতের শাড়ির মহিলাকে মনে পড়ল, কিন্তু কাকে দেখে মনে পড়ল, সেটা বলতেই সময় নিল এ কবিতা। প্রথম লাইনে মাছরাঙাদের বলে চুপ করে যাওয়ার পর একেবারে শেষ স্তবকে তার দেখা পাওয়া গেল। এবং তার আগের স্তবকটি, ওই 'মেয়েদের কথা' কবিতাটির মতোই, কোনো অপূর্ণ পর্ব আনছে না। আমরা শ্বাস ধরে আছি, তথা ইন্টারেস্ট ধরে আছি, শেষ লাইনের আগের লাইনে অপূর্ণ পর্ব এলে আমরা শ্বাস ফেলি। আসলে তা এক চাপা দীর্ঘশ্বাস-ই। শেষ লাইনটি প্রায় অস্ফুটে আসে তারপর: দূরের টেবিলে। যে টেবিল, যে সঙ্গ, যে মাছরাঙা—জীবন থেকে অনেকটা দূরেই যেন চলে গেছে তখন। 'মেয়েদের কথা' কবিতায়, শরীর-সঙ্গ মনে ফিরেছিল তারই আলোড়নে যেন শেষ লাইনের আগের লাইনটি তার দম কিছু ধরে রেখেছিল। আর এখানে, কেবল পুরোনো সেই তাঁতের শাড়ির মহিলাকে মনে পড়ছে, তার সঙ্গে কাটানো কোনো কোনো মুহূর্ত মনে পড়ছে হয়তো, আর মনে পড়া যখন আসে মিছিলের মতো আসে—তাই কেবল 'সেইসব' শব্দটি দেওয়ার পরই জোর করে একটা ড্যাস। থামো, আর মনে পড়িয়ো না। তারপর ধীরে ধীরে বর্তমান বাস্তব মুহূর্তটিতে ফিরে আসা। আর দেখতে পাওয়া : একটি মেয়েকে ঘিরে চার-পাঁচজন বসে আছে...পুরো স্মৃতির ভ্রমণ ঘটে গেল, নারী-স্মৃতি মনের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল, তাই অপূর্ণ পর্ব আসছে না, যে প্রসঙ্গ ছুঁয়ে, কিন্তু অবশ্যই যে প্রসঙ্গকে অনুক্ত রেখে এ কবিতা শুরু হয়েছিল, সেখানে ফিরল। তাই ফিরে এল শ্বাস। সেই দূরের টেবিলটিকে আমরা সবাই নিজের নিজের মতো করে দেখতে পেলাম।

মেয়েদের নানাভাবে দেখতে পেয়েছেন ভাস্কর চক্রবর্তী। আমি কয়েকটি প্রেমের কবিতার কথা বললাম এতক্ষণ। মেয়েদের সঙ্গে নানারকম সম্পর্কের কবিতা তিনি লিখেছেন। যেমন : কে ওই মেয়েটি? হয়তো মিনুর বোন হবে। এই কবিতায় অচিরে তিনি লিখবেন : এসো, সুসংবাদ এসো। আর কোনও ইচ্ছে নেই, শুধু ওই / মেয়েটির সঙ্গে যেন / আমাদের তরুণ কবির বিয়ে হয়। এ কবিতাতেই আছে, আমাদের / ঘরের মেয়ের মতো মনে হয়। আবার আছে 'আমাদের' তরুণ কবি। আমাদের ঘরের মেয়ে আর 'আমাদের' তরুণ কবি—'আর কোনও ইচ্ছে নেই' এই দীর্ঘশ্বাস মুছে দিয়ে এ কবিতায় আশীর্বাদ এসে পৌঁছোয়। শুভকামনা ও আশীর্বাদের ফোঁটা পরিয়ে দেয় মেয়েটির কপালে।

তেমনই যে-কবিতা শুরু করছেন একেবারে ব্যক্তিগতকে ছুঁয়ে : আমার দু-চোখের পাতা

দিয়ে আমি মুছিয়ে দিতে চেয়েছিলাম তোমার মুখ—কয়েকটি লাইন পরেই সেখানে আসছে এ ছবি : আধ পোড়া মেয়েরা এখন জানলায় দাঁড়িয়ে একটা চলতি ফিল্মের গল্প করছে। জীবনে কিছু না-পাওয়া মেয়েদের তিনি দেখেছেন তাঁর লেখায়, একেবারে প্রথম জীবন থেকে : 'আমাদের ম্যাট্রিক-ফেল মেজদিকে' আমরা দেখেছি ভাস্করের কবিতায়। এখানে জানলায় দাঁড়িয়ে থাকা আধপোড়া মেয়েদেরও দেখলাম। অলোকরঞ্জন লিখেছিলেন :

অথচ তখনো
সারিসারি মুখ
ঝুঁকে থাকে বোবা জানলার গায়

দেখেও দ্যাখোনি
আমরা কেমন
সুন্দর, আর কতো নিরুপায়।

অলোকরঞ্জনের মুখগুলি বোবা, আর ভাস্করের আধপোড়া মেয়েরা চলতি ফিল্মের গল্প করছে—আসলে তারাও কি বোবা নয়?

একসঙ্গে নিরুপায়, আর সুন্দর ভাস্করের কবিতা। ভালোবাসবার জন্য নিরুপায়। ভালোবেসে সুন্দর। মেজদির কথা যেমন আছে। আছে ছোটোবোনকে নিয়ে বিখ্যাত কবিতা :

আমি-কি পাহারা দেব
ছোটোবোন ঘুমোয় যখন

দুপুরে, আকাশ নীল
শরীরের, শান্ত কলরব

আমি-কি ঘুমোব পাশে
ছোটো বোন ঘুমোয় যখন

ভাস্কর চক্রবর্তী, কবিতা সমগ্র

যতিচিহ্ন নিয়ে সারাজীবন অসম্ভব সতর্ক-সচেতন এই কবি, লেখাটিতে কোনো পূর্ণ যতি রাখেননি। ধারটা ফাঁকা। যা আছে ভেতরে। কমা আর হাইফেন। কেন যতি নেই লাইনের শেষে আমি ধরতে পারি না। আসলে কবিতা ধরতে সময় লাগে আমার। বছর বছর কেটে যায়। আমি অপেক্ষা করে থাকি। এ কবিতা সত্তর-আশির নতুন কবিদের মুখে মুখে ফিরেছে ভাস্করের আরও অনেক কবিতার মতোই। এরপরেও তাঁর কবিতায় বোনের কথা লিখেছেন ভাস্কর : ছোট বোন / ছোট নেই আর। লিখেছেন, একফোঁটা চোখের জল ঝরে পড়ল

মরুভূমিতে / মা আর ছোট বোন খুঁজতে বেরলো? মাকে নিয়েও কিছু কবিতা আছে ভাস্করের। যেমন এই কবিতাটি :

সোনালি চুলের স্মৃতি

মা বলতেন, কেন বাড়ি থাকিস না
আমি জানি। ঝাঁ ঝাঁ দুপুর
মেঝেতে শুয়ে থাকতাম দুজনে। পাশেই
যে নদীটা বয়ে যেত
তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ঝিমিয়ে এসেছিল।
সম্ভবত নীল রঙের একটা গান
ঘরছাড়া করত আমাকে, পথখরচ
থাকত সামান্যই, আমি
এ তল্লাট থেকে সে তল্লাট ভেসে বেড়াতাম।
আধকাপ কফির একটা দুপুর
বিকেলবেলার দুয়েক টুকরো ভাঙা স্বর।
আজকাল ভাবি, হাওয়া
কোথায় থেকে এসে কোথায় যায়! চওড়া লালপেড়ে
শাড়িটা পরে কে জানে কোথায় এখন
বিড়বিড় করছেন মা
থমথমে একটা তুফান আবার জট পাকাচ্ছে মাথায়
সব কথা কি লেখা যাবে কোনোদিন?

কবিতা সমগ্র, ভাস্কর চক্রবর্তী

মেঝেতে মায়ের পাশে ছেলে শুয়ে আছে ঝাঁ ঝাঁ দুপুরবেলা—আর পাশ দিয়ে একটা নদী বয়ে যাচ্ছে। মা-ছেলের ভালোবাসার এমন অপরূপ প্রকাশ কি আমরা বড়ো একটা দেখেছি কবিতায়? আর ওই যে নীল রঙের গানটা? ছেলে বড়ো হয়ে যাওয়ার পর যা তাকে ঘরছাড়া করত?—গান কখনও নীল রঙের হয়? ভাস্করের কবিতাতেই তো এমন হতে পারে। জগতের আর কোথাও পারে না। আর সেই বড়ো হয়ে যাওয়া, রাস্তায় ঘোরা ছেলেটা কী করে? আধকাপ কফি নিয়ে সারা দুপুরটা বসে বসে পার করে দেয় কফি হাউসে। আর ভাবে, হাওয়া কোথা থেকে এসে কোথায় যায়। সত্যিই তো, এই যে একটা হাওয়া এল। কোথা থেকে এল? কোথায় যাবে? সংসার, রাস্তাঘাট, দোকানপাটের মধ্যে বাস করেও ভাস্করের কবিতা থেকে থেকে এক-একটা হলক তানের মতো বড়ো কল্পনার ঢেউ এনে দেয় তার মধ্যে। হাওয়ার আসা যাওয়ায় যে অজানা চিহ্নিত হয় তাতে একপলক রবীন্দ্রনাথ মনে পড়ে। জল যায় ভেসে / জানিনে কোন দেশে। সেই বড়ো হয়ে যাওয়া বারমুখো হয়ে যাওয়া ছেলেটা দুপুরে কফির দিকে তাকিয়ে বসে থাকে আর তার মনে পড়ে

মা কী করছে এখন। চওড়া লালপেড়ে সেই শাড়িটা পরে বিড়বিড় করতে দেখতে পায় মাকে। মা তো বুড়ো হয়েছেন। দেখতে পায়। বিড়বিড় করছেন, কিন্তু সব কি লেখা যাবে। সে তো লিখতেই চায়। সর্বস্ব দিয়ে। সমস্ত জীবনকে পুড়িয়ে সে তো লিখতেই চায়। মাকে সে হয়তো মনে মনে বলে, আমিও তোমার মতো বুড়ো হব...কিন্তু লিখতে লিখতে, লিখতে লিখতে, বুড়ো হওয়ার আগেই সে চলে যায়। আর চলে যাবে যেন জানত। তাই কয়েকটি কবিতা লিখে রেখে যায় মেয়ে সোনাঝুরির জন্য। তার মধ্যে একটি লেখা আছে, যে-কবিতায় নিজে চলে যাওয়ার পর পিতৃহীন মেয়েটাকে সে দেখতে পাচ্ছে। নারী, প্রেম, মা, বোন, মেজদি, জানলায় দাঁড়িয়ে গল্প করা অভাবী মেয়েরা সবাইকে ছুঁতে ছুঁতে নিজের মেয়ের কথাও লিখে রেখে যায় ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতা—আর 'মেয়েদের কথা' বিষয়টি সম্পূর্ণতা পায় তখন, বিস্তার পায়। যদিও নিজের মেয়েকে নিয়ে এ কবিতা যখন লেখা হয় তখন কি কেউ জানে মাত্র কদিনের মধ্যে লোকটা চলে যেতে বসেছে? এ কবিতা বিষয়ে একটি বাক্যও বলার সাধ্য আমার নেই। শুধু কবিতাটা রইল।

সোনাঝুরির জন্য আরও একটা

আমি দূর থেকে দেখছিলাম
ছেঁড়া একটা জামা পরে মেয়েটি বাজার করছে।

মা হয়তো পাঠিয়েছে বাজারে। টাকাপয়সা কম।
মনে হল, মুঠো শক্ত করে ধরল একবার বাজারের থলিটা।
ঘাম মুছল।

নীচের ঠোঁটটা একবার কামড়ে ধরল কি দাঁত দিয়ে?
—আমাদের সোনাঝুরি না? আরে, কত বড়ো হয়ে গেছে!

কেমন আছ সোনাঝুরি? কেমন আছ?
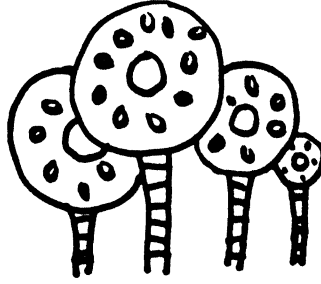
২৯

আমার কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল দেওয়াল-পত্রিকায়। রানাঘাট স্টেশনে টাঙানো হল, খুব ছবি-টবি এঁকে। পুরো পত্রিকাটাই হাতে-লেখা। একজন খুব সুন্দর ছবি আঁকত; লতাপাতা, পাখি, চালাঘর, নদী এইসব যত্ন করে এঁকে তার মধ্যে গোটাতিনেক কবিতা, একটা গল্প—এক কলাম-এ যতটা ধরে ততটা আর কী—আর খুব বড়ো একটা সম্পাদকীয় নিয়ে স্টেশন-মাস্টারের ঘরের পাশে দেওয়ালে আটকানো হল। আমি পরে একা একা স্টেশনে যাই, বারবার। সকালের দিকে সবারই অফিস আর কলেজ ইউনিভার্সিটি যাওয়ার তাড়া—কে আর দেওয়াল পত্রিকা পড়বে? বিকেল-সন্ধেয় সব লোক হু-হু করে বাড়ি ফেরায় ব্যস্ত, কেউ মুখ তুলে দেখছেও না দেওয়ালে ঝোলানো বোর্ডটা। একদিন কী মনে হতে দুপুরের দিকে গেলাম। ফাঁকা ফাঁকা প্ল্যাটফর্ম, আড়াইটে-তিনটে বাজে। আগের ট্রেন মিস করেছে এমন দু-একজন ঘুরছে, সিগারেট-বিড়ি খাচ্ছে। আমি পায়চারি করছি আর আড়চোখে বোর্ডটার দিকে তাকাচ্ছি। হঠাৎ একজন বোর্ডটার সামনে থামল। আমিও থমকে গেলাম। লোকটা একটা সিগারেট হাতে দাঁড়িয়েই আছে। মনে-মনে চিৎকার করে উঠলাম : পড়ছে রে। পড়ছে। টানা তিনদিন স্টেশনে দু-বেলা পায়চারি দিচ্ছি, এতক্ষণে একজনকে পেলাম। পড়ছে তো, কিন্তু কী পড়েছে? কোনটা? বোর্ড-এর বাঁদিকে দাড়িয়ে আছে লোকটি, পড়ছে সম্পাদকীয়টাই। বাঁ থেকে কখন সরে ডানদিকে যাবে, এটা আমি আড়চোখে দেখছি, কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে। আমার কবিতাটা কখন পড়বে? কখন? লোকটি সিগারেট ফেলে পা দিয়ে পিষে দিচ্ছে। আর হুড়মুড় করে কৃষ্ণনগর লোকাল ঢুকছে প্ল্যাটফর্মে। লোকটি দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল। আমার প্রথম প্রকাশিত কবিতার প্রথম পাঠক না-হয়ে সে উঠে পড়ল ট্রেনে।

এখন পিছনে তাকালে মনে হয়, একজন পাঠকের জন্য এতখানি তৃষ্ণা ছিল আমার? এইখান থেকে শুরু করেছিলাম? অবাকই লাগে। এটাকে নিশ্চয়ই যশপ্রার্থনা বলে। অন্যদিকে, নিজের লেখা কি সত্যিই কারও মন স্পর্শ করতে পারল—এমন প্রশ্ন বা সন্দেহ

তো নিজের সম্পর্কেই সবচেয়ে বেশি থাকে, সেই সন্দেহ থেকেই ওই আগ্রহ জন্মাত।

প্রশ্নের উত্তরও পেলাম কয়েকদিনের মধ্যে। আমার স্কুলের এক সহপাঠী ওই কবিতাটি দেখে নানা তামাশা করল। তারপর আর একজন বলল, 'এটা কী? আধুনিক কবিতা? তুই লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে আধুনিক কবিতা লিখতে লেগেছিস!' আর একজন বলল, 'এর মানে কী? এ তো মানে বোঝা যাচ্ছে না!' ইতিমধ্যে ১৫ দিন পরে দ্বিতীয় সংখ্যাটি টাঙানো হল। তাতেও আমার লেখা কবিতা আছে। যে কষ্ট করে এতসব লেখে, আঁকে, অর্থাৎ সম্পাদক, সে-ও বলল, তোমার দুটো পদ্য তো আমি দেখে-দেখে টুকলাম, আমিও কিন্তু কিছু বুঝছি না! তোমার ভাষাটা এইরকম কেন?

এ থেকে কয়েকটা জিনিসের প্রমাণ আজ পাই। প্রথম, দুটো দেওয়াল-পত্রিকায় কবিতা লিখেও আমি তিনজন পাঠক পেয়েছিলাম। আমার পাঠক-ভাগ্য ভালো। দ্বিতীয়ত, আমি কবিতা হিসেবে যেগুলো লিখেছিলাম, তা অতি খারাপ ছিল। কিন্তু তৃতীয় জিনিসটি দরকারি।

আমার মনে এই চিন্তা এল, কীভাবে লিখলে তাহলে অন্যের মনকে ছুঁতে পারব? সম্পাদক কিন্তু সম্পাদকের কাজ করেছে। সে ভাষা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। আর সেই বয়সেই আমার মনে হল, তাহলে ভাষাটা কী হওয়া উচিত? আমার মনের মধ্যে যেভাবে কথাগুলো আসছে, আর লিখতে বসলে সবসময় যে একটু-একটু পালটে পালটে যাচ্ছে, সেটা তো বুঝতে পারছি। সেই যা-আসছে, আর লেখার সময় যা একটু পালটে-পালটে যাচ্ছে, সেই ভাষাতেই একটা কোনো লেখা দাঁড় করাচ্ছি, যেটা কবিতা হিসেবে দাবি করছি আমি। কিন্তু সেই যে ভেতর-থেকে-আসা আর লিখতে-লিখতে একটু-একটু পালটে যাওয়া ভাষা, সেই ভাষাটায় যা দাঁড়াল, তা অন্যদের পক্ষে বোঝা সম্ভব হচ্ছে না। এমনকি দয়ালু সেই যুবক, আমার চেয়ে বয়সে একটু বড়ো, সে কষ্ট করে লিখে দিলেও এবং পাশে লতাপাতা এঁকে দিলেও—কী বলতে চাইছে লেখাটা—সেটা বুঝতে পারছে না!

এবার আমি কী করব? আমি কি আমার মনে-মনে যে-ভাষায় জিনিসটা আসছে, সেটাকে একবার লিখে নেব? তারপর সেটাকে আমূল বদলে এমন কোনো একটা ভাষায় লেখার চেষ্টা করব, যা ওরা বুঝতে পারে? ওরা কী বুঝতে পারে, তা নিশ্চিতভাবে আমি জানব কীভাবে? আর ওরা তো ঠিক একজন নয়—কয়েকজন। আর ভেতর থেকে স্রোতের মতো কতকগুলো লাইন যে মাঝে-মাঝে ভেসে ওঠে, সেগুলোর কী হবে! সেগুলো যদি আগাগোড়া ভুল কিছুও হয়, তাহলেও সেগুলো যখন আমার মনের মধ্যে আসছে তাদের আমি অনেক দূর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। অনেক দূর। পুরোটা নয়। লিখতে-লিখতে পুরোটা একটা চেহারা নিচ্ছে। ওর মনে, তার মনে কী ভেসে উঠছে, আমি জানব কী করে? ওরা হয়তো লেখে না, তাই হয়তো অমন কিছু ভেসেও ওঠে না! কিন্তু একা থাকলে নিজের মনে কথা তো বলে? বলে যদি, তা হলেও, ওরা নিজের সঙ্গে একা-একা কী কথা বলে, আমি জানব কীভাবে? আর তা ছাড়া দশজন লোক মনে-মনে দশরকম কথা বলতে পারে। কিন্তু উলটোদিকে, আমার পক্ষে সহজ—আমি যখন মনে-মনে কথা বলি, সেই কথাটা জানা। আর সেই কথা বলতে-বলতেই, সেই ধারাস্রোতের মতো কথা বলাটা, কবিতায় পালটে যেতে থাকে। এরও অনেকদিন পর অলোকরঞ্জনের কবিতায় পড়ব : 'দেখেছ

কখনো / শেষ বর্ষণ / হঠাৎ কীভাবে তারা হয়ে যায়?' ঠিক সেইটাই তো হয়। বৃষ্টি-ঝরা আকাশ কখন যেন বৃষ্টিহারা হয়ে তারা দেখায়। এইভাবেই নিজের মনে কথা বলতে-বলতে তো দেখতে পেয়ে যাই কবিতার টুকরোগুলো। প্রথমটা টুকরো-টুকরো থাকে। তারপর জোড়া হয়। আবার কখনও সবটাই, ঝড়ের মতো, তৈরি হয়ে একইসঙ্গে আসে।

এই জিনিসটা, অর্থাৎ কথাস্রোতের ওই তোলপাড়, যখন নিজের মনের মধ্যে ঘটছে, তখন অন্য কে কীভাবে বুঝতে পারবে কিংবা পারবে না, এ নিয়ে কোনো কিছু ভাবার সময়ই থাকে না। ওই লেখাটা যখন চলছে, তখন এতটাই ভেতর দিকে টেনে নিচ্ছে বুঝতে পারলাম, আমি উপায়হীন। দ্বিতীয় রাস্তা আমার নেই। নিজের ভেতর থেকে যে কথাগুলো আসছে, তার ভাষা যেমনই হোক, সেটা ধরতে-ধরতে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া রাস্তা নেই আমার। আমার বলাটা যদি অন্যেরও মনের কথা হয়ে যায়—শেষ বর্ষণ হঠাৎ যদি তারা হয়ে যায়—সেটা একটা চান্স। এই চান্স ফ্যাক্টরের ওপর নির্ভর করেই আমাকে লিখতে হবে। কারণ আমি অন্যের মন জানি না।

দেওয়াল-পত্রিকায় টাঙানো আমার লেখা নিয়ে যারা মন্তব্য করছিল, তাদের ক্ষেত্রে একটা সুবিধে ছিল, তারা কবিতার পাঠক নয়। তাদের কাছ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখা সহজ। এরপর কালক্রমে, ছোটো-ছোটো পত্রিকায় আমার একটা-দুটো করে লেখা ছাপা হতে শুরু করল। যোগাযোগ হতে লাগল অন্য যারা লেখালেখি করে—তাদের সঙ্গে। কবিতার ভাষা বা কবিতা কেমন হওয়া উচিত, সে-সম্পর্কে তাদের সকলেরই দেখতাম স্পষ্ট ধারণা রয়েছে, যা আমার ছিল না। সত্যি বলতে, আজও নেই। আমি চুপ করে শুনতাম। তখন মেনেও নিতাম সব কথা। আমি অতটা জানি না বলেই মেনে নিতাম। কিন্তু লেখার সময় দেখতাম কারও কথা আর মনে থাকে না। যে-জিনিসটা ভেতর থেকে তাড়িত করছে, সে এতটাই গ্রাস করে ফেলছে যে, অন্য মতগুলো নিজের ওপর প্রয়োগ করার অবকাশ পাচ্ছি না।

অন্যদের লেখাও যখন পড়তাম, তারা আগে 'এখনকার কবিতা-কীরকম-হওয়া-দরকার' এই বিষয়ে যা যা বলেছে, তার সঙ্গে মিলছে কি না, তা-ও দেখতাম না। মিলুক বা না-মিলুক, তাদের অনেক লেখা খুবই ভালো লাগত। কারও সঙ্গে যখন দেখা হচ্ছে, তখন সে কবিতা বিষয়ে তার ধারণা হিসেবে যা-ই বলুক, তার লেখা যখন পড়ছি তখন লেখাটাই এসে ঢুকছে আমার জীবনের মধ্যে। আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে। দুটোর মধ্যে যেই সংস্পর্শ ঘটছে, অমনি সেটা কোথাও জ্বলে উঠছে। এই জ্বলে ওঠাটাই কবিতার মানে হয়ে দাঁড়াচ্ছে তখন আমার কাছে।

সেই জ্বলে-ওঠা আজও অব্যাহত। যদিও বহুবার শুনেছি, সেই ৩০-৩৫ বছর আগেও, বাংলায় নাকি ভালো কবিতা আর লেখা হচ্ছে না। একইরকম কথা আজও মাঝে-মধ্যেই শুনি, কিন্তু আমি ঠিক খুঁজে পাই। আর কবিতা যখন জীবনের সঙ্গে এসে মিশে যায়, তখন তার নানা দিকে যাওয়া। যেমন, জহর সেন মজুমদার লিখেছেন তাঁর কবিতার দুটি লাইনে : 'কাল মেয়ের কাছ থেকে আলো নিয়েছি। আজ ছেলের চোখ থেকে পাখি। আমাদের নৌকোভর্তি আশাবাদ এ-বাংলা ও-বাংলা পারাপার করে।' যখনই মেয়ের কাছ থেকে

আলো আর ছেলের চোখ থেকে পাখি নেওয়ার কথা বলা হল, সমস্তটা যেন গান হয়ে গেল। গান, কিন্তু লিরিক-অর্থে নয়। লিরিক-কবিতা বলে যে জিনিসটাকে বোঝানো হয়, তা-ও ঠিক নয়। 'ছেলের চোখ থেকে পাখি' এই অংশটি এত অসামান্য, স্নেহের এমনই এক নতুন প্রকাশ যে, এতে মনের ভেতরে সে-ই অবস্থাটা তৈরি হল, গান শুনলে যেমন হয়। লাইনগুলোর মধ্যে ছন্দ-ব্যবহার বা মিল-প্রয়োগ নেই, তবু এটা গান। অর্থাৎ এর অন্তর্বস্তু, গান।

গানের প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ছে এক দশক আগে, সুমন গিয়েছিলেন বাংলাদেশে গান গাইতে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা আর তাঁকে বাড়ি ফিরতে দেবে না, কিছুতেই না। ফেস্টুন আর প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়িয়ে আছে তারা। তাতে লেখা : 'গানের কোনও দেশ নাই। তুমি আমার দেশের দোয়েল।' যে-কবিতার লাইন আমি বললাম এক্ষুনি, তার মধ্যেও আছে : আমাদের নৌকোভর্তি আশাবাদ এ-বাংলা ও-বাংলা পারাপার করে। এই যে আমাদের বাড়ির সন্তানরা, তারাই তো এখন কলেজগুলোর গেট থেকে দলবেঁধে বেরোয়— তারাই কি দল বেঁধে দাঁড়িয়েছিল না, ওপার বাংলার সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে? ওই ছেলেমেয়েরা তো আমাদেরও সন্তানপ্রতিম। সেইসব মেয়ের কাছ থেকে আলো, আর সেইসব ছেলের চোখ থেকে পাখি, নিলাম আমরা। সেইসব পাখি দোয়েল হয়ে গেল।

চারিদিকে ছড়িয়ে আছে কবিতা—'এ'-র সঙ্গে কখন 'ও' যুক্ত হয়ে যাচ্ছে। তবে সমস্ত কবিতা বা কবিতার লাইন যে এত সোজাসুজি মনের ভেতরে ঢুকে আসে, তা নয়। কবিতাটির ভাবনাধারা যদি জটিলতার পথ দিয়ে যায়, তবে সে-কবিতা ধরতে একটু দেরি হয়। আবার অনেক সময়, যদি একেবারে একটা অচেনা ভাষায় কবিতার মধ্যে কথা বলে কেউ, তখন সেটা অপরিচিত বলে প্রথমটা ধাক্কা দেয়। এমনকি খারাপ কবিতা বলেও মনে হয়। নতুন দিনের লেখকদের হাতে এমন জিনিস দেখা দিতে পারে, যার ভাবনা ও ভাষায় আমি অভ্যস্ত নই। কিন্তু এটাও বুঝতে পারছি, তা একেবারে জীবনের কেন্দ্র বা 'কোর' থেকে উৎসারিত। তেমনই একটি কবিতা দেখা যাক :

বাসন্তী

সে কি বাসন্তী স্যান্যাল যে চেপে চেপে আলতাছাপ দিতে দিতে যায় আর হাতে ডলে নেয় পদ্মপাপড়ি

সে কি বাসন্তী মুখার্জি যে মোমবাতি জ্বালিয়ে জানলায় দেয় সকালে যাতে বিরক্ত হয় তার প্রেমিক

সে কি বাসন্তী শেঠ যে সোমবুধশুক্কুর ভাবছে ছেলেসহ পুকুরে ঝাঁপ দেবে আর মঙ্গলবেস্পতিশনি ভাবছে ছেলেছাড়া

সে কি বাসন্তী মণ্ডল যার আলজিভ ছোটো বলে পাঁউরুটির দোকানে সবাই ভ্যাঙায় আধো আধো

সে কি বাসন্তী সাহা যে এমন হাতের লেখায় ফর্ম ফিলাপ করত লোকে ভাবল ছাপা

সে কি বাসন্তী হালদার যে ইচ্ছে করেই রোজ পেরিয়ে যায় স্টপেজ আর চটি টেনে টেনে ফেরে গোড়ালির নলী খেয়ে

সে কি বাসন্তী সেন যে সিগারেট না-খাওয়া ঠোঁটে চুমুই দেবে না

পুরুষের ঠোঁট চাই কালো ও কটু

সে কি বাসন্তী ঘোষ যে খেবুনমাসিকে রোজ ফোন করে যাতে বাপের বাড়ির ডাকনাম শুনতে পায় একবার

সে কি বাসন্তী সাহা রায় যে বাজার করা ছেড়ে দিল কারণ যতবার মাছ টিপতে সে উবু হয় পুরুষরা তার ঘাড়ে আর পিঠে নিশ্বাস ফেলে শিরশিরিয়ে দেয় রোম

সে কি বাসন্তী গাঙ্গুলি যে শুধু শাড়িই পরল আর স্বামী হাজার নাইটি এনে দিলেও বলল ছি

সে কি বাসন্তী সরকার যে যত বার উপনিষদ পড়তে চাইল খুঁজে পেল তৃতীয় তাক থেকে

সে কি বাসন্তী চক্রবর্তী যে উফ কী গরম মরে যাব বলে ফ্রিজে ঢুকিয়ে দিল তার মাথা আর বুঝতেই পারল না তানপুরার মতো বেরিয়ে থাকা পাছা দেখতে হাজির হচ্ছে প্রতিবেশীরা ‘বৌদি সরবত হবে’ বলে

সে কি বাসন্তী দাশগুপ্ত যে সংগমকালে এমন খাট ধামসাল পাশের ঘরে হাসতে হাসতে উলটে গেল ননদ শাশুড়ি

সে কি বাসন্তী চ্যাটার্জি যাকে দেওর বলল ‘তুই বঁটি ছেড়ে এসে ফ্যান চালিয়ে দিয়ে যাবি মাগী’ আর শাস্তি হিসেবে ক্লিপ লাগিয়ে দিল বৃন্তে

সে কি বাসন্তী লাহা যে গাডার টিপ করে মারছে ঠাকুরদার ছবির একদম নাকে

সে কি বাসন্তী রায় যে কথায় কথায় জীবনানন্দের নাম বলছে যাতে সন্ধের ঝোঁকে ইন্টেলেকচুয়ালটি তার তলার ঠোঁট থেকে চুষতে থাকে নেই নাম

সে কি বাসন্তী গুহ যে ছাদেই খুলে দিল সালোয়ার এমনকি প্যান্টি আর পরে শুনল সে সস্তা বলে এই প্রেম কাট

কে কি বাসন্তী ব্যানার্জি যে বাসনের স্টিকারগুলো লাগাল দরজাময় আর পেটে ছোট্ট ছোট্ট সেলোটেপ লাগিয়ে চিড়চিড় করে তুলল সারাদিন

সে কি বাসন্তী তরফদার যে মাকে সন্দেশ আনতে পাঠাল যাতে ওরই মধ্যে জানলাটানলা বন্ধ করে একটু ধরে নিতে পারে প্রেমিকের শিশ্ন

সে কি বাসন্তী ভট্টাচার্য যে একবার স্পেসে গিয়ে বাবা-মার ঝগড়া সামলাচ্ছে একবার ঘরে এসে সেরে যাচ্ছে জোর বাতকম্ম

সে কি বাসন্তী পাড়ুই যে ছোটোদের জন্মদিনে রুলটানা পাতা ছিঁড়ে নৌকো বানিয়ে দেয় স্কেচপেনে লেখে শুভেচ্ছা আর ছোটোরা ভেতর থেকে ঘেন্না করে এই উপহার

সে কি বাসন্তী সরখেল যে পুট পুট করে হাতে ও থাইয়ে গজিয়ে নিতে পারে চারাগাছ আবার হুক হুক করে সেগুলোকে লুকিয়ে নিতে পারে ভেতরে

সে কি বাসন্তী সেনশর্মা যে মরে গেলেও এলগিন রোড ক্রসিং-এ যাবে না ওখানে একবার বিচ্ছেদের কথা বলেছিল ও

সে কি বাসন্তী চৌধুরী যে যোনির ভেতর ঢুকিয়ে নিল কলা দিশি বেগুন এমনকি গাড়ির চাবি শেষকালে দক্ষিণেশ্বর যাওয়াই হল না কারও

সে কি বাসন্তী বিশ্বাস যে স্বামীর কফ গেলার অভ্যাসে কী করে ওয়াক চাপবে
ভাবতে পারে না শুধু গ্রিলে মুখ গাঁথে গালে দাগ
সে কি বাসন্তী বর্ধন যে মাঝরাত্রে বারান্দায় দাঁড়ায় এবং একটি কুকুর মুখ তুলে চায়
সে কি বাসন্তী ঠাকুর যে আঁচলে চকিতে অভয়মুদ্রা রচে যাতে প্লাস্টিকের ব্যাগ
পড়তে পড়তেই বুঝতে পারে তার লাগবে না

এই কবিতাটি ছাপা হয়েছে, এ-বছর, 'অপর' নামক পত্রিকার বইমেলা সংখ্যায়। তারপর এই কয়েক মাসে মাঝে-মাঝেই আমি কবিতাটি পড়েছি। এবং আমি বাংলা কবিতা সামান্য যেটুকু পড়েছি, তাতে এই লেখা, অন্তত আমার কাছে, সম্পূর্ণ এক নতুন অভিজ্ঞতা। এই কবিতাটি, অনুমান করি, পাঠককে ধাক্কা দেবে, এমনকি অনেক জায়গায় কটু বলেও মনে হবে। কিন্তু, সেই কথাটাই লিখতে চাওয়া হয়েছে, স্থানে-স্থানে যা কটু— সেই কটু কথাটাই। কেন-না এর মধ্যে আছে সত্য। তীক্ষ্ণ কটু সত্য। কিন্তু এই পুরো কবিতাটি আমাকে আশ্চর্য করেছে এই জন্য যে, এর মধ্যে গোটা সমাজটা ধরা আছে। মধ্য ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজের মেয়েরা ধরা আছে এর মধ্যে। এর মধ্যে আছে একজন বাসন্তী, যে থেবুনমাসিকে রোজ ফোন করে যাতে বাপের বাড়ির ডাকনাম শুনতে পায় একবার। এতটাই স্নেহকাঙাল আর নস্টালজিক সে। আর ঠিক আগের লাইনেই আছে আর একজন বাসন্তীর কথা যে সিগারেট না-খাওয়া ঠোঁটে চুম্বন দেবে না, পুরুষের ঠোঁট কেমন চাই সে-বিষয়ে স্পষ্ট-পছন্দ সে ঘোষণাই করতে পারে। আবার বাসন্তী শেঠ আছে যে সপ্তাহে তিনদিন ভাবছে, ছেলেকে নিয়ে আত্মহত্যা করবে। আর তিনদিন ভাবছে একা। তাহলে তার জীবনটা কেমন! কতটা অসহ্য! এইখানে সোমবুধশুক্র ও মঙ্গলবেস্পতিশনি ব্যবহার করা হয়েছে মর্মান্তিক তির্যকতায়, টিউশনি বা কোচিং ক্লাসের ধরন মনে করিয়ে। আবার আর এক বাসন্তী, তার আলজিভ ছোটো বলে তাকে সবাই ভ্যাঙায় পাউরুটির দোকানে। মানে, সে রোজই পাউরুটি কিনতে যায়। সে কি কোনো বাড়ির কাজের মেয়ে? তা যদি না-ও হয়, পাঁউরুটির দোকানের লোক তাকে ভ্যাঙাতে সাহস পায়—কারণ নিশ্চয়ই তারা খুব গরিব এবং মেয়েটির হয়তো নারী হিসেবেও কোনো রূপগত আকর্ষণ নেই। এই কবিতায় আর একজন বাসন্তী আছে, বাসন্তী হালদার, যে ইচ্ছে করেই নির্দিষ্ট জায়গা পেরিয়ে বাস থেকে নামে, আর চটি টেনে-টেনে ফেরার মধ্যে তার গোড়ালি ক্ষয়ে যেতে থাকে। এর নিশ্চয়ই ফিরতে ইচ্ছে করে না বাড়িতে, এমন কোনো কারণ আছে, দীর্ঘমেয়াদি মন খারাপ—যা, তাকে জীবন থেকে প্রায় বিযুক্ত করেছে, যদিও সে কর্তব্যকর্ম সবই করে যায়, নইলে বাসে করে কাজে যায় কেন! না গিয়ে উপায় নেই বলেই যায় হয়তো। ওই 'গোড়ালির নলী খেয়ে' কথাটার মধ্যে মেয়েটির জীবন যে কেবলই ক্ষয়ে যাচ্ছে, খেয়ে যাচ্ছে, এবং মেয়েটি তা মেনে নিয়েছে, সেটার ইঙ্গিত আছে। বাড়ি ফেরার সময় তার হাঁটায় যে অসীম ক্লান্তি, ইঙ্গিত আছে তারও। অথবা বাসন্তী নামে আব একটি সরল মেয়ে, যে প্রেমিককে খুশি রাখতে বা পুরোপুরি বিশ্বাস করে, শরীর দিল ছাদে, পরে সেজন্যই তার সম্পর্কটা ভেঙে গেল। এই পুরো কবিতাটা শুধু একটি নামকে সম্বল করে কথা বলছে, কিন্তু প্রত্যেকটি লাইনে ভিন্ন-ভিন্ন ছবি

ভেসে উঠছে আমার মনে। ভিন্ন বয়স, ভিন্ন সামাজিক অবস্থা। এমনকি ভিন্নরকম চেহারাও। আমি যেন মুখ দেখতে পাচ্ছি এই বাসন্তীদের। আমার চেনা সব ধারণা বানচাল করে দিয়ে এ-কবিতা চলেছে প্রত্যেকটি লাইনে কোনো-না-কোনো অপ্রত্যাশিতকে উপহার দিতে দিতে। এর কোনো লাইনে যেন আছে ডুকরে কেঁদে-ওঠা, কোনো লাইনে মরিয়া-মৃত্যুইচ্ছা, কোনো লাইনে উৎকট হাসি, কোনো লাইনে অকল্পনীয় নিষ্ঠুরতা। কোনো কোনো লাইন উদ্দামভাবে যৌন বা সঙ্গোপনে—যেমন পুরুষরা তার ঘাড়ে-পিঠে নিশ্বাস ফেলে শিরশিরিয়ে দেয় রোম। আবার হঠাৎ একটা লাইন—একা, নিশুতি, শান্ত।

কনস্টানটিন কাবাফি নামে এক গ্রিক কবি একবার বলেছিলেন, 'দ্য পোয়েট হু নোজ হিজ অডিয়্যান্স ইজ লিমিটেড, ক্যান এনজয় ট্রিমেনডাস ফ্রিড্‌ম ইন হিজ রাইটিং।' আমাদের এই কবি যেন কাবাফি-র উক্তির একটি যোগ্য উদাহরণ। পত্রপত্রিকা খুললেই যে এঁর কবিতা দেখা যাবে, এমনটা নয়। খুবই কম প্রকাশিত হয় এঁর কবিতা। কবি-সম্মেলনে এঁকে কবিতা পড়তে কখনোই দেখা গেছে বলে জানি না। ইনি লেখালেখির সঙ্গে জড়িয়ে থাকলেও, এবং গদ্যলেখায় তরুণ বয়সেই নিজস্ব সিলমোহরের ছাপ অব্যর্থভাবে রাখলেও, কবিতা নিয়ে কিন্তু একেবারে আড়ালবাসী। আমরা আগে এক অফিসে একসঙ্গে কাজ করতাম, এখন আর একটি অফিসে করি। নিজের কবিতার প্রসঙ্গ ভুলক্রমেও ইনি উত্থাপন করেন না। নিজের কবিতা নিয়ে এই অন্তরাল-বাস—হয়তো 'ট্রিমেনডাস ফ্রিড্‌ম' দিতে পারে লেখার সময়। প্রত্যেকটা লাইনেই যেমন একটা অপ্রত্যাশিত বিষয়কে আনছে এ-কবিতা, তেমনি প্রত্যেকটা লাইনের শেষ দিকটি লক্ষ করবার। ধরা যাক—'সে কি বাসন্তী বিশ্বাস যে' এই লাইনটি। 'শুধু গ্রিলে মুখ গাঁথে গালে দাগ।' স্বামী, মানে যার সঙ্গে অতখানি দৈহিক নৈকট্যে যেতেই হয় তাকে, সেই স্বামীর একটি অভ্যাসে যে-বমি আসছে, তা আটকাতে এত জোরে গ্রিলে মুখ চেপে ধরছে—গালে দাগ বসে যাচ্ছে। কী সাংঘাতিক অবস্থা! কিংবা ধরা যাক, 'স্বামী হাজার নাইটি এনে দিলেও বলল ছি।' অথবা 'বৌদি সরবত হবে বলে।' কিংবা 'খুঁজে পেল তৃতীয় তাক থেকে।' মাঝে-মাঝে অসম্ভব এক অ্যাবসার্ডিটি-র আবির্ভাব হচ্ছে, যা আমি ধারণা করতে পারিনি লাইনটি পড়া শুরু করার সময়ে। কেন-না জীবনের মধ্যেই তো আছে সেই ওলট-পালট অ্যাবসার্ডিটি। আবার জীবনের বুক-মোচড়ানো ব্যথা ও মায়া, এইসবের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে। আছে তীব্র বাসনাশক্তি। আবার তাকে গুরুত্ব দিতে-দিতেও আছে ঠাট্টা করা। বাসন্তী বর্ধন যে—সে মাঝরাত্রে বারান্দায় দাঁড়ায়, আর একটা কুকুর তার দিকে মুখ তুলে চায়। মাঝরাত্রে বারান্দায় দাঁড়ায় কেন? সে নিঃসঙ্গ, তাই। একাকিনী হোক, বা বিবাহিতা— সে নিঃসঙ্গ। তার দিকে কুকুরের ওই মুখ তোলা—পড়লে মনে হয়, কুকুরটির সঙ্গে যে তার বহুদিনের চেনাজানা। অথবা, কুকুরটি চেনা নয় আদৌ, এমনি-এমনিই মুখ তুলে দেখল। কারণ যাই হোক, কিন্তু ওই মাঝরাতে কেউ যে মেয়েটির সঙ্গী নয়, কেউই নয়—এটা স্পষ্ট। অথবা যে বাসন্তী সেনশর্মা, সে এলগিন রোডের মোড়ে যাবে না কারণ বিচ্ছেদের কথা বলেছিল ও। 'ও' বলতে সে নিজেই বলেছিল, হতে পারে। আবার তার স্বামী বা প্রেমিক বলেছিল, হতে পারে। সে-বিচ্ছেদ ঘটে গেছে, হতে পারে। বিচ্ছেদ ঘটেনি, সেই টালমাটাল কেটে গেছে, হতে পারে।

যাই ঘটুক, ওই এলগিন রোডের মোড় জায়গাটা তার কাছে অপয়া। 'সে সস্তা বলে এই প্রেম কাটে' কিংবা 'ঠাকুরদার একদম নাকে', বা 'ছোটরা ভেতর থেকে ঘেন্না করে এই উপহার', বা 'শেষ কালে দক্ষিণেশ্বর যাওয়াই হল না কারুর'—এসব লাইন অবিশ্বাস্য মোড় নিয়ে শেষ হচ্ছে।

এক তরুণ কবি আমাকে বলেছিলেন—তাঁর এক বন্ধুর কবিতার প্রশংসা করতে গিয়ে, কী দারুণ লিখেছে দেখেছেন। আটচল্লিশটা উলটো মিল। মারাত্মক ব্যাপার। নিশ্চয়ই, তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো কাণ্ড সেটা। বলে-বলে এমন করা খুবই কৃতিত্বের ব্যাপার। সেদিন, ওই তরুণ কবিকে আমি কিছুটা তীব্রভাবেই আমার আপত্তি জানিয়েছিলাম, তিনি তাঁর বন্ধুর কবিতার মধ্যে, কেবল লাইনের শেষটুকু লক্ষ করে তার প্রশংসা করছেন কেন, তাঁর তো পুরো কবিতাটাই—অর্থাৎ তার অন্তর্বস্তুটিও লক্ষের মধ্যে আনা উচিত, কেবল লাইনগুলোর প্রান্তে কী আছে, সেটুকু নয়। এই ছিল আমার বক্তব্য। আজ মনে হয়, প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের একটি কবিতার কথা—'সমস্ত চলুক / কাকে যে কবিতা বলে / তা কি আমরা স্পষ্ট ভাবে জানি? / সবাই যে যার মতো কবিকে সংগ্রহ করে / বাড়ি চলে যাক'। আজ ভাবি, যে যেমন ভাবে কবিতাকে দ্যাখে, সেটাই ঠিক দেখা। আমার মতো করে অন্যে দেখবে কেন! সে তার মতো করে দেখুক না। কেউ যদি একটি কবিতার শুধু মিল-প্রয়োগ লক্ষ করে আনন্দ পায়, তাতেই বা আমার আপত্তি থাকবে কেন? আবার উলটো দিকে, লাইনের শেষদিকটাও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে কারও কাছে—কোনো পাঠকের কাছে—এই কবিতাটির ক্ষেত্রে আমার যেমন হচ্ছে। ধরা যাক : 'যে-কথা বলিতে চাই / বলা হয় নাই / সে কেবল এই / চির দিবসের বিশ্ব আঁখি সম্মুখেই / রয়েছে আমার'—এই লাইনগুলো শেষে মিল রয়েছে, এবং মিলগুলো এসে-এসে কবিতাটিকে একটু করে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—আর মিল হল দুটি লাইনের বাঁধন—অবশ্য তা যে সবসময় পরপর দুটি লাইনেই হতে হবে তা নয়, এবং সে কথা সব পাঠকই জানেন। 'কাছে-দূরে' হতে পারে মিল, এবং 'দূরে-দূরে' হতে পারে—অনেকরকম প্রথা আছে তার। ওই যে, 'উলটো মিল' বলে যে-কথাটি উল্লেখ করেছিলেন তরুণ কবিটি, সে-হল বিষম-ধ্বনির মিল। সম-ধ্বনির মিল যেমন হয়, বিষম-ধ্বনিরও হয়। কিন্তু তা খুবই শক্ত। আগে শঙ্খ ঘোষ ও অলোকরঞ্জনের লেখায় এর অনেক উদাহরণ আমরা পেয়েছি। একালে শ্রীজাত-র কবিতায় এর প্রচুর সার্থক প্রয়োগ দেখা যায়! বিষম-ধ্বনির মিল কীরকম হয় একটু বলি : 'গন্ধমাদন পর্বতে / ফলত নাকি বরবটি?' অথবা—'সীতাও ছিলেন দুঃখিনী / কেন না কী কুক্ষণে / সমস্ত বরবাদ হল'। কিংবা 'ব্যাপারটা যে অলুক্ষুনে / সেই কথাটা বলুক খুলে'।

এসব লাইনে 'পর্বতে' আর 'বরবটি', বা 'দুঃখিনী' আর 'কুক্ষণে', 'অলুক্ষুনে' আর 'বলুক খুলে' সবই বিষম ধ্বনির মিল। এর আরেকটি উদাহরণ না দিয়ে পারছি না :

'হৈ হৈ আর রৈ রোলে
চাদ্দিকে সব দৌড়ল
ট্যাংরা মাগুর মৌরলা।'

এখানে 'রৈ রোলে / দৌড়ল / মৌরলা' বিষম-ধ্বনি বা উলটো মিল-এর অভাবনীয় নিদর্শন। এগুলো সবই শঙ্খ ঘোষের লেখা থেকে বললাম।

আমার বলার কথা, সম-ধ্বনির বা বিষম-ধ্বনির যাই হোক না কেন—মিল কবিতাকে সুঠাম ও সুষমভাবে বয়ন করতে-করতে চলে। শেষে সব মিলিয়ে একটি তোড়া বা স্তবকের মতো পুরো কবিতাটিকে ধরে রাখে নিটোল ও অবধারিত একটি বাঁধনে। তবেই মিল-প্রয়োগ সার্থক হয়।

'বাসন্তী' কবিতাটি কেন অচেনা, তার নানা কারণের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল—এই কবিতাটি প্রতিটি লাইনের শেষে গিয়ে, শেষ অংশটি ধাঁ করে খুলে দিচ্ছে। পরের লাইনে থাকছে আবার একটি সম্পূর্ণ অনিশ্চিতের দিকে লাফ, বাঁধন দিয়ে নিটোল করার বদলে কেবলই নিজেকে খুলতে-খুলতে যাচ্ছে। মিল-প্রয়োগের ক্ষেত্রে, সম-ধ্বনি বা বিষম-ধ্বনি যা-ই হোক, একটি সূত্র থাকে হাতে। আগের ধ্বনিটি কানে থাকে—সেই ধ্বনির সূত্রেই পরবর্তী লাইনের সম বা বিষম মিল আসে এবং কবিতাটি এগিয়ে যায়। এখানে তো সে-সব কিছুই নেই। প্রশ্ন তোলা যায়, সে তো মিলহীন যে কোনো কবিতার ক্ষেত্রেই হাতে কোনো সূত্র থাকে না? ঠিকই, কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যায়, প্রত্যেক লাইনে গিয়ে কবিতাটি একটি সম্পূর্ণ পৃথক জীবনের কথা বলছে। অর্থাৎ, এখানেও বাঁধন খুলতে-খুলতে যাচ্ছে। সত্তরের দশকে প্রদীপচন্দ্র বসু একটি কবিতা-সিরিজ লিখেছিলেন: 'একটি মুহূর্ত, একটা কবিতা' এই শিরোনামে। সেখানে একটি বিশেষ মুহূর্তের ওপর নির্ভর করে একটি কবিতা লেখা হচ্ছে। যেমন একটি লেখার বিষয় ছিল, তিনটি তরুণী—তাদের নাম তুমি, টুকু আর বীথিকা—ভোরবেলায় একটা স্টেশনে ট্রেন থেকে নামল, তাদের হাতের পাতার নরম ছুঁয়ে টিকিট নিল উপোসি টিকিটচেকার, তারপর তারা তিনজন হইহই করতে করতে লাল সুরকির রাস্তা ধরে টাঙায় উঠে চলে গেল কোথায় যেন আর সেই মুহূর্তে গাছ থেকে ক্যানারিপাখি ডেকে উঠল : হাওয়াবদল হাওয়াবদল! এই মুহূর্তটিকে সারাজীবনের জন্য পাঠকের মনে গেঁথে দিল কবিতাটি, এতে সন্দেহ নেই। এইরকম এক-একটি মুহূর্ত নিয়ে এক-একটি কবিতা। এইভাবে, সিরিজ।

আর এই 'বাসন্তী' শীর্ষক কবিতাটিকে, এক-একটি লাইনে এক-একটি জীবন। প্রত্যেকটা লাইনে কবিতাটি নিজেকে শেষ করে দেওয়ার দিকে যাচ্ছে। এত ঝুঁকি! অর্থাৎ দু-দিক দিয়েই লেখাটি নিজেকে বারবার খুলে দিচ্ছে। আমার মাঝে-মাঝে মনে হচ্ছিল, পরের লাইনটা আসবে কী করে? এতই আশ্চর্যকে যেখানে উপস্থিত করা হয়েছে, হচ্ছে। প্রতি লাইনের শেষ দিকটা যেমন খুলে দেওয়া আছে, পুরো কবিতাটি সেইরকম খোলা। এর কোনো শুরু নেই, কোনো শেষ নেই। এ যেন চলেইছে। নানাদিক থেকে স্রোতের মতো এইসব জীবন বয়ে এসে মিলছে এই কবিতায়। পাহাড় থেকে নানান ধারা এসে ঝরে পড়ছে এক সমাজকুণ্ডে, যা থেকে মুক্তি নেই। অকথ্য সব যন্ত্রণা আর মুখ-বুজে সয়ে-যাওয়া আর দুর্দান্ত যৌনউল্লাস আর স্বেচ্ছাচার আর হাস্যকৌতুক আর শাস্তি আর অভিশাপ আর অত্যাচার আর উপভোগ আর অবদমন আর নিরুপায়তা আর নিঃসঙ্গতা আর নিঃসঙ্গতা আর নিঃসঙ্গতা বয়ে চলেছে এই মেয়েদের ভিন্ন-ভিন্ন জীবনের ওপর দিয়ে। ছিন্নভিন্ন জীবনের ওপর দিয়ে।

শেষ লাইনের শেষাংশটিও লক্ষণীয় : প্লাস্টিকের ব্যাগ পড়তে পড়তেই বুঝতে পারল তার লাগবে না। ওপর থেকে গৃহিণীরা প্লাস্টিকের দড়িতে বাঁধা প্লাস্টিকের ব্যাগ ঝুলিয়ে দিচ্ছেন নীচে দাঁড়ানো গাড়ি-দোকানের সবজি-বিক্রেতার কাছে, এ আমরা কতই দেখেছি। প্লাস্টিকের ব্যাগের পড়তে-পড়তেই বুঝতে পারার মধ্যে যেমন একদিকে অ্যাবসার্ডিটি—অন্য দিকে যতই কষ্ট হোক, নরকযন্ত্রণা হোক, তবু তো বেঁচে থাকে সবাই—কোথাও একটা 'লাগছে না' বা 'লাগবে না' বলে তো মনে করে যন্ত্রণাটাকে—তাই বেঁচে থাকে। বেঁচে-থাকাটা ওই অদৃশ্য দড়ি, যে-দড়ির উল্লেখ কবিতায় নেই। যন্ত্রণাটা দেখা যায়, বা দেখা না গেলেও, একটা মানুষ বুঝতে পারে যন্ত্রণাটা। বেঁচে থাকাটাকে তো আর আলাদাভাবে দেখতে পাচ্ছে না সে। কিন্তু যন্ত্রণাটা সর্বদা বুঝতে পারছে। বেঁচে থাকাটা সর্বক্ষণ সঙ্গে রয়েছে বলে যন্ত্রণাটাও রয়েছে, তবু ওই বেঁচে থাকাটা রয়েছে বলেই যন্ত্রণাটাকে 'লাগবে না' বলা যাচ্ছে। এবং এই শেষ লাইনটিও আসলে শেষ লাইন নয়। আমরা বুঝতে পারি, পত্রিকার পাতায় কবিতাটি শেষ হয়ে গেলেও আসলে কবিতাটি ছাপা কাগজ থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে অজস্র বাসন্তীর জীবনের ভেতর দিয়ে। আমাদের চোখ দিয়ে গেল কবিতাটি, আমরাও চারপাশে বাসন্তীদের খুঁজে পাব—তাদের নাম ঠিক-ঠিক বাসন্তী না-হলেও।

কবিতার শিরোনাম যে 'বাসন্তী' রাখা হয়েছে, তাতে মনে পড়ে সরস্বতী পুজোর সকাল। ওই সকালটিতে কিশোরী তরুণীরা বাসন্তী রঙের শাড়ি পরে পথে বেরোয়, অঞ্জলি দিতে যায়—সকলেই জানে। ভ্যালেনটাইস ডে উদ্‌যাপন এ দেশে শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত ওই দিনটি ছিল অঘোষিত প্রেমের দিন। আমার অবশ্য সেই সঙ্গে শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসবে মেয়েদের শাড়ির রং-ও মনে পড়ছে। দলে-দলে সেদিন যাদের অঞ্জলিতে আর উৎসবে দেখা যায়, তারাও অনেকেই হয়তো এরকম ভয়ানক, অ্যাবসার্ড জীবনের মধ্যে গিয়ে পড়ে!

এইরকমই আমাদের জীবন, যে-জীবনের অনেকটা দেখতে-দেখতে, এবং অনেকটা দেখেও না-দেখে আমরা চলেছি, কত ক্যাজুয়ালি চলেছি—সেজন্য এ-কবিতার ভাষার মধ্যেও যেন একটা ক্যাজুয়াল ধরন আগাগোড়া বয়ে চলেছে। সেই দেওয়াল-পত্রিকার দিনগুলো থেকে আজ পর্যন্ত—নিজের কবিতার ভাষা যে ঠিক কেমন হবে, তার নির্দিষ্ট ধারণা পাইনি। এক-একটা ধারণা গড়ে উঠেছে এক-এক সময়, আবার ভেঙেও গেছে। কিন্তু পাঠক হিসেবে এটুকু বুঝেছি, মাঝে-মাঝেই এক-একজন কবি তাঁর সম্পূর্ণ নতুন ভাষা ও চিন্তা নিয়ে এসে কবিতা সম্পর্কে আমার ধরা-বাঁধা পূর্ব ধারণাগুলো (যদি তা গড়ে ওঠার উপক্রমও করে কখনও) ভেঙে, কোনো এক অপ্রত্যাশিতকে সামনে এনে দিয়েছেন। 'অপর' পত্রিকায় নিজের কবিতাগুচ্ছে, প্রধানত এই 'বাসন্তী' কবিতায়, যেমন তা সম্ভব করলেন চন্দ্রিল ভট্টাচার্য।
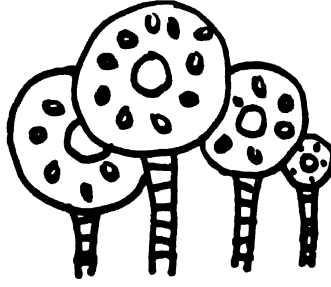
৩০

লেখা পাঠাতাম ডাকে। ছাপানোর ইচ্ছে তো খুবই ছিল। তখন 'অমৃত' পত্রিকা বেরোত, তাতে প্রচুর ছোটো ছোটো কবিতাপত্রের পাঁচ-দশ লাইন করে রিভিউ থাকত। সঙ্গে তাদের ঠিকানা। সনাতন পাঠক ছদ্মনামে 'দেশ' পত্রিকায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখতেন নতুন বই-পত্রিকার খবর। সেখান থেকেও জানতে পারতাম অনেক। তখন ট্রেনে করে কলকাতায় গিয়ে শ্যামবাজারের কাছে 'রঙ্গনা' হল-এ নাটক দেখতাম। শিয়ালদা থেকে 'রঙ্গনা', রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিট, যে রাস্তা থেকে 'কবি ও কবিতা' পত্রিকা বেরোত—সে পর্যন্ত হেঁটেই যেতাম। গরম জিলিপি পাওয়া যেত মোড়ে। খেতাম। নাটক দেখতাম। আবার হেঁটেই ফিরতাম শিয়ালদা। আকাদেমি, কলামন্দির বা রবীন্দ্রসদনেও হেঁটেই যেতাম। বাস বা ট্রামে উঠতাম না। এর ২৫ বছর পর নবীন কবি বিভাস রায়চৌধুরীর মুখে শুনেছি, সে-ও, বনগাঁ থেকে শিয়ালদায় নেমে হেঁটেই যাওয়া-আসা করে, বাংলা আকাদেমি হোক কী কলেজ স্ট্রিট। বাসে ওঠো না কেন? আমার এই মূঢ় প্রশ্নের উত্তরে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলেছিল, 'হাঁটলে অভিজ্ঞতা হয়'।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাছাকাছি আসার সুযোগ পাই '৯০ সাল নাগাদ। উনি ঠিক সে-সময়টায় কবিতা একটু কমই লিখছিলেন। আমি দু-দিনের যোগী। ভাতকে বলি পেস্‌সাদ—খুব হাত-পা নেড়ে বললাম, এত কম কম লিখছেন কেন কবিতা? উনিও অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে বললেন, আজকাল তেমন হাঁটতে পারি না তো। পায়ে...একটা...বলে থেমে গেলেন। পরে ওঁর মুখেই শুনেছি, হাঁটতে হাঁটতেই উনি ওঁর অনেক কবিতা পেয়েছিলেন। পায়ের কষ্ট শুরু হওয়ার পর হাঁটা কমেছে। কবিতা লেখাও। একটা সাক্ষাৎকারে সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে যখন প্রশ্ন করা হয় : তাহলে আপনি কি হাঁটতে হাঁটতেই কবিতা লেখেন? তখন উনি একটু থেমে বলেছিলেন, 'আসলে... খানিকটা... ধরো... স্থির করে নিই। পরে বাড়ি এসে হয়তো লিখলাম।' আর শঙ্খ ঘোষ একটি সাক্ষাৎকারে জানান—'কবিতা লিখি পথে-পথে, হাঁটতে-হাঁটতে। গদ্য লিখি ঘরে।' এবং আর একটি

বইতে নিজের কোনো একটি কবিতার পটভূমি বিষয়ে বলতে গিয়ে স্পষ্টই লিখে দিয়েছিলেন : 'হাঁটতে থাকি বিটি রোড ধরে...মনটা হালকা লাগে বেশ। পদক্ষেপে পদক্ষেপে পেতে থাকি কয়েকটি লাইন।'

এই কথাটাই হয়তো একটু অন্যভাবে তাঁর কবিতায় বলেছিলেন উৎপলকুমার বসু : ছিল আঠারো-উনিশ মাইল টিকিট / বেড়ালাম অনেক, অনেক অভিজ্ঞতা হল।

অভিজ্ঞতা। ঠিক। বিভাস বলেছিল, হাঁটলে অভিজ্ঞতা হয়। মনে পড়ে না কি জীবনানন্দের সেই 'পথ হাঁটা' : 'কী এক ইশারা যেন মনে রেখে শহরের পথ থেকে পথে / অনেক হেঁটেছি আমি; অনেক দেখেছি আমি ট্রাম-বাস সব ঠিক চলে, এর পাশে, আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে পথে হাঁটতে হাঁটতে বিষ্ণু দে-ও যে মাঝে-মাঝে পকেট থেকে ছোট্ট নোটবই বার করে তাতে লিখে রাখতেন দুটি তিনটি লাইন, আবার পথ চলতেন, সেসব লাইন পরে 'জন্মাষ্টমী' বা 'অম্বিষ্ট'-র মতো দীর্ঘ কবিতায় জায়গা পেত, এ-কথা আবু সয়ীদ আইয়ুবের মুখ থেকে শুনেছেন বিষ্ণু দে-র পরবর্তী যুগের এক কবি—নিজের কবিতায় যে-কবি বলেছেন : 'হেঁটে দেখতে শিখুন, ঝরছে কী খুন দিনের রাতের মাথায়।' বোদলেয়র নাকি সারারাত পথে পথে হেঁটে বেড়াতেন বন্ধুদের সঙ্গে। সে কথা পাওয়া যায় বুদ্ধদেবের বোদলেয়র অনুবাদের বিখ্যাত বইটিতে। যুগে যুগে, দেশে দেশে, কবিরা পথে হেঁটে হেঁটে, পথ থেকেই কুড়িয়ে নিয়েছেন অভিজ্ঞতা। কবিতা। জীবনানন্দ যেমন বলেছেন : 'বেবিলনে একা একা এমনই হেঁটেছি আমি রাতের ভিতর / কেন যেন আজো আমি জানিনাকো হাজার হাজার ব্যস্ত বছরের পর।'

আমি অবশ্য কেন হাঁটছি, জানতাম। আমি হাঁটতাম বাসে উঠতে ভয় করত বলে। দু-দু-বার বাসে উঠে নির্দিষ্ট জায়গা থেকে অনেক দূরে গিয়ে পড়েছিলাম। সেই ভয়ে বাসে উঠতাম না। কোনো কোনো দিন একটু দুপুর দুপুর এসে কলেজ স্ট্রিটে পাতিরাম-এর দোকানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছোটো ছোটো কাগজ উলটে উলটে পড়তাম। দুটো কাগজ কিনেও নিতাম। পরে সে-সব কাগজে পাঠাতাম কবিতা। কীভাবে?

একটা খামে ভরতাম গোটা দুয়েক কবিতা। সবসময়ই ভয় করত, ভালো হয়েছে কি লেখাটা? সঙ্গে ছোটো একটা চিঠি লিখতাম সম্পাদকের নামে। আমার কবিতা মনোনীত না-হলেও যদি অনুগ্রহ করে মতামত জানান ও ফেরত পাঠিয়ে দেন, বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকব। কিন্তু পত্রিকা ফেরত পাঠাবে কী করে? তার জন্যেই একটা খাম দিয়ে দিতাম ওই খামের ভেতর, ভাঁজ করে। প্রায়ই ফেরত আসত কবিতা। খামের ওপর নিজের হাতের লেখায় নিজের নাম লেখা আছে দেখেই আর খুলতে ইচ্ছে করত না খাম। জানি-ই তো ভেতরে কী আছে। তবু আশায় আশায় খুলতাম। যদি এক টুকরো চিঠি থাকে। প্রায় কোনো ক্ষেত্রেই থাকত না চিঠি। শুধু কবিতা দুটো থাকত, আমার আঁকাবাঁকা হাতের অক্ষরে। তৎক্ষণাৎ ছিঁড়ে ফেলতাম তাদের। ব্যতিক্রমও হত। দু-পাতার চিঠি লিখে কবিতা ফেরত পাঠিয়েছিলেন 'কবিপত্র'-র সম্পাদক পবিত্র মুখোপাধ্যায়। ছন্দের শৈথিল্য নিয়ে কথা বলেছিলেন। অনেকদিন রেখে দিয়েছিলাম সেই চিঠি। পরে কবিপত্র-এ আমার লেখা অনেকবার ছাপিয়েছেন তিনি সাক্ষাৎ-পরিচয়ের আগেই।

খুব সুন্দর একটা কথা লিখেছিলেন ফণিভূষণ আচার্য, তাঁর সংক্ষিপ্ত দু-লাইনের চিঠিতে। 'আপনার এ কবিতাটি পাঠিয়ে আপনি নিজের প্রতি সুবিচার করেননি। আপনার কি এর চেয়ে ভালো লেখা নেই?' সেদিন বুঝিনি, আজ বুঝি। আমার কোনো কবিতা পড়া ফণিবাবুর পক্ষে সম্ভব ছিল না তখন। আমার তখন বয়স ২০। কিন্তু, কবিতা ফেরত দেওয়ার চিঠি কত সুন্দর হতে পারে, কোনো আঘাত না-দিয়ে, এই চিঠিটি তার প্রমাণ। পরে অবশ্য 'মহারাজ' নামে ওঁর পত্রিকায় উনি আমার লেখা প্রকাশ করেছিলেন! কেন-না, সংক্ষিপ্ত ওই চিঠিতে এই ইঙ্গিত ছিল, যে, উনি তো ছাপতেই চান। এইরকম ইঙ্গিত যে অন্য খামগুলোয় ভরা থাকত, তা মোটেই নয়। তখন কী যে দুঃখ হত!

অথচ সে-দুঃখ নিয়ে তো কখনও কোনো কবিতা লিখিনি। আমি লিখিনি তো কী হয়েছে? আরেকজন লিখেছেন। এতদিন পরে আমার সেইসব তরুণদিনের হতাশাকে খুঁজে পেলাম এই কবিতায় :

দ্বিতীয় কবিতা

প্রণয়ীর মতো ভীরু অঙ্গুলিতে নেয় সে কলম
নির্ভুল ঠিকানা লেখে, স্ট্যাম্প মারে যথাযথ
পরিশ্রমে তার।
কবিতা মোড়কবদ্ধ বহু যত্নে পরিপাটি সাজে
বিচারের রাজকক্ষে যায়।
উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষা নিয়ে কবি বসে থাকে।

তারপর একদিন থরো থরো হিরেব দুপুরে
ডাকের গোলকধাঁধা ঘুরে
সর্বাঙ্গে কালির ছাপ, কলঙ্কের রেখা মুখে নিয়ে
ডাকপিওনের হাতে
অমনোনয়ন-দুঃখ স্থির ঠিকানায় ফিরে আসে।

সারাদিন অপমান-বিষে তার জ্বলে যায় বুক
চোখের পাতায় তার দুঃখ নুয়ে থাকে,

তারও পরে অকস্মাৎ মধ্যরাতে বিষাদী ঝিনুকে
জন্ম নেয় দ্বিতীয় কবিতা।

জয়িতা মিত্র

এ কবিতা কবির অপমানিত মুহূর্তকে পার হয়ে আসার কবিতা। আর এই যে অপমান তার লাগছে, সেই অপমানের সঙ্গে জীবনের অন্য অপমানের তফাত আছে। এ-কথা সত্যি

যে, অপমান থেকেও কখনো-কখনো কেউ কবিতা লিখতে আসে। প্রয়াত কবি কবিতা সিংহের কবিতা লেখা সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার সূত্রে এর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি আছে। অপমান থেকেই তিনি অনেক সময় জ্বলে উঠেছেন কবিতার মধ্যে। তবে এই কবিতায় যে অপমান, তা নিজের লেখা কবিতার অপমান। এর আঘাত আরও গভীরে। কবিতা কবির নিজের সবচেয়ে আপন অংশ। তার প্রত্যাখানে, যেন নিজের অস্তিত্বটিই প্রত্যাখ্যাত বোধ করে।

নবীন কবিতা-লেখকের এই অভিমান, এই দুঃখবোধ সব যুগেই আছে। সেই মুহূর্তটিতে ওই নবীন লেখক সব চাইতে একলা। সারাদিন সে যেন কারও দিকে ভালো করে তাকাতে পারে না। গোপন এই প্রত্যাখ্যান তাকে এত বিঁধে থাকে।

তারপর কী হয়!

এই গভীর বিষাদের মধ্যে থাকতে-থাকতেই সে এক সময় আবার তার আশ্রয়টিকে আঁকড়ে ধরে, খানিকটা যেন নিজের অজান্তেই। এই প্রত্যাখ্যান তাকে সাময়িক ভাবে আহত-অসাড় করে রাখলেও সে আবার কলম তুলে নেয় হাতে। একাকী রাত্রির নিদ্রাহীন প্রহরে সে আরেকটি কবিতা লেখে। কোনো আঘাতই তাকে সরিয়ে দিতে পারে না কবিতার কাছ থেকে। আরেকটি কবিতা লেখে। তারপর আরেকটি। তারপর আরেকটি। এইভাবে চলতে থাকে। তারপর এক সময় সে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করে, তার লেখা কবিতা যে সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে, সকলের ভালো লাগবে, তা না-ও হতে পারে। না-হওয়াটাই স্বাভাবিক। তারও তো কত লেখা ভালো লাগে না, কত গান বা নাটক খারাপ লাগে। শিল্পের মধ্যেই এই ধাঁধা রয়েছে। একই ছবি, একই কবিতা, একই নাটক, একই উপন্যাস—কাউকে প্রবলভাবে মুগ্ধ করে। অন্য কাউকে ছোঁয় না। নবীন বয়সে এই বোধ জন্মায় না। তখন নিজের লেখা কারও ভালো না-লাগলে, বা কেউ না-ছাপালে সেটাকে অপমান বলে মনে হয়। সম্পাদক যে নবীন রচয়িতার লেখা প্রকাশ করলেন না, সে তাঁর ব্যক্তিগত সাহিত্যবিচারের মানদণ্ড থেকে। কবিকে অপমান করবেন বলে নয়—অন্যের প্রতি এই স্বচ্ছতার দৃষ্টি অল্প বয়সে আসে না। মন বিষাদাচ্ছন্ন হয়। জয়িতা মিত্রের এই কবিতাটি আমাকে এত স্পর্শ করেছে, কারণ, এই কবিতাটি অপমানের কথা লিখেছে, বিষাদের কথা লিখেছে, কিন্তু কোনো অপরপক্ষকে দোষারোপ করেনি। নিজের বিষাদ থেকে উঠে আসতে চেয়েছে এই কবির মন—কেবল কবিতাকে ধরেই। এবং সেই কবিতা জন্মানোর পর কেমন অনুভূতি হয় শঙ্খ ঘোষের কবিতা ধার করে বলা যায় : 'যদি বা নিজেরই ছায়া হঠাৎ জড়িয়ে ধরে বলে / তুমি কি সুন্দর নও? বেঁচে আছো কেন পৃথিবীতে?' কবিতা লেখার কাজ হয়তো নিজেকে সুন্দর করার কাজ। অন্যের কাছে নিজেকে সুন্দর করে উপস্থাপিত করা অন্য জিনিস। অর্থাৎ 'ঘরেরও দিব্যি শোভা হবে / লোকেও বলবে রাধাচূড়া' আমি সে কথা বলছি না। নিজের কাছে নিজেকে সুন্দর করে তোলার একটা উপায় হয়তো কবিতা লেখার চেষ্টা। আর কবিতা পড়ার চেষ্টাও। গানকে বোঝার চেষ্টার মতোই। গায়িকা হয়তো গানের মাঝখানে রয়েছেন, এখন দেশিটোড়ির বিলম্বিতের অন্তরা গাইছেন। কোথায় কোথায় যে যাচ্ছেন! কখন তিনি ফিরবেন ভেবে আমি বসে আছি আর এক-একটা আশ্চর্য মোড়ে এসে ফেরার রাস্তা ধরেও আবার চলে যাচ্ছেন কোথায়। শেষে যখন ফিরলেন, আমার চেনা ওই

অবরোহণের ঢালু ধাপ ধাপ সিঁড়ি-পথকে এমন করুণ যেন মনে হয়নি আগে। ওই রে গা, স রে, নি সা যেন চোখ থেকে একফোঁটা জল হয়ে গড়িয়ে পড়ল। অবরোহণ সম্পূর্ণ হল। জল, চোখ থেকে গালে এল—গাল থেকে নেমে গেল চিবুকের পাশ দিয়ে। রে গা, সা রে, নি সা-র মধ্যে মধ্যে ওই অতি সামান্য বিরতিটুকু যেন ধীরে ধীরে চোখ থেকে জলের গড়িয়ে পড়া। হ্যাঁ, অবরোহণ। যেন এক 'অখিল বিমানে তব জয়গানে' পৌঁছে নিজেকে সুন্দর লাগল। হাজার শ্রোতার এক শ্রোতা আমি, সবার অজান্তে সুন্দর হলাম। নাকি আমার সঙ্গে সঙ্গে সবাই সুন্দর হয়ে উঠল? তা তো জানি না। আমি তো একাই। 'আদিম লতাগুল্মময়' বইতে কি এই মন্ত্র পাঠ করিনি : একা হও একা হও একা হও একা হও একা?

গভীর দুঃখের মুহূর্তে মানুষ কেবল একা—গভীর আনন্দের মুহূর্তেও সে একাকী। এই একা থাকার কবিতা আজ খুব মনে পড়ছে। কোনো মানুষ হয়তো একদম একাই। কিন্তু তার মধ্যেও সঙ্গী-সুন্দরকে খুঁজে নিতে পারে। হয়তো খোঁজে না! সুন্দর নিজেই এসে দাঁড়ায় তার সামনে। পরে সেই মানুষের মনে হয়, ঠিক দেখলাম তো।

ফাঁকা মাঠ

বিকেল লাফাচ্ছে আর
সন্ধ্যা বেশ দিদি দিদি

হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে তাকে
বাসের জানলায় বসে
এসব ভাবলাম কেন আমি
পৃথিবীটা শান্ত একটা পরিবার

এমন ভাবলাম কেন আমি

সুমন্ত মুখোপাধ্যায়

বাসের জানলায় একজন একা বসে আছে। আর জানলার ও-পাশে ফাঁকা মাঠে কিচ্ছু নেই। বাস চলতে চলতে বিকেল থেকে সন্ধে হয়ে আসছে। যাত্রীটি জানলাতেই বসে। এর বেশি কোথাও কোনো ঘটনা নেই। এমনকি একজন মানুষও যেন নেই সেই মাঠে। থাকলেও যাত্রীটির চোখে পড়েনি। তুষার রায়ের কবিতায় যেমন আছে : 'একটা মানুষ নেই ওইখানে, কাঠুরে কি চাষি!' সেইরকম। শুধু বিকেল আর ঝেঁপে-আসা সন্ধে। এরাই দুজন দুটি চরিত্র হয়ে উঠল। বিকেলে ছেলেপুলে খেলে না মাঠে? সেইরকম। শিশু বা বালকের মতো বিকেল লাফাচ্ছে—যেন ছোটোভাই। আর সন্ধে তাকে হাত ধরে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। একেবারে কিছুতে কিছু নেই, বিকেল থেকে সন্ধে হয়ে আসছে মাত্র, তার মধ্যে

চিরস্নেহের এই দৃশ্য ভেসে উঠল, মুছে গেল। বার্গম্যানের 'সেভেন্থ সিল' ছবিতে যেমন এক গ্রাম্য রঙ্গকর্মী ছিল, যে গাঁয়ে-শহরে ঘুরে বেড়াত স্ত্রী আর বাচ্চাকে নিয়ে, যথাসাধ্য শো দেখাত ও আর ওর বউ মিলে। ঘোড়ার গাড়িতেই ঘুরত তারা। সেই অভিনেতাটি মাঝে-মাঝে অদ্ভুত সব দৃশ্য দেখতে পেত। মা মেরি ছোটো যিশুকে নিয়ে হাঁটছেন। অথবা ক্রুসেড থেকে ফেরা নাইট আন্তনিয়স ব্লক কালো পোশাক-পরিহিত মৃত্যুপুরুষের সঙ্গে দাবা খেলছে জঙ্গলের গাছতলায় বসে। এসব তারই চোখে পড়ত শুধু। আর কেউ তা দেখতে পেত না। বেচারি নিজের বউকে ডেকে দেখাতে এনেও বেইজ্জত হত। বউ সস্নেহে বলত : ওহ্, ইউ, উইথ ইয়োর ভিশন্‌স। এই ছবি 'সেভেন্থ সিল' যখন আমি প্রথমবার দেখি, তখন আমার ডাকঘর-এর ঠাকুরদার কথা মনে পড়েছিল। মোড়ল একটা সাদা কাগজকে রাজার চিঠি বলে উপহাস করায়, ঠাকুরদা তো বলেছিলেন, এই সাদা কাগজেও আজ আমি অক্ষর দেখতে পাচ্ছি। এই যে শূন্যতার মধ্যে হঠাৎ কিছু দেখতে পাওয়া, ও তো সাদা কাগজে অক্ষর দেখতে পাওয়াই। বার্গম্যানের ছবির মর্মোদ্ধারের অধিকার আমার নেই। কিন্তু কী জানি কেন, ওই ছবিব অত আশ্চর্য ঘনঘটার একপাশে থাকা সেই সরল অভিনেতাটির মধ্যে আমি একজন কবিকে দেখতে পাই। জোর দিয়ে দাবি করতে পারি না, তবে কেমন মনে হয়। কেন-না সে তো সাদা কাগজে অক্ষরই দেখতে পেত, তাই না? তার কাছে সাদা কাগজটা তো এই পৃথিবী। এই জীবন। হয়তো সে কবি বলেই শেষ দৃশ্যের সেই দিগন্তরেখায় মৃত্যুপুরুষের সঙ্গে সকলের সেই নৃত্য-যাত্রা দেখতে পেয়েছিল।

পৃথিবীটা যেমন সাদা কাগজ, এখানে কবি যে-কোনো দৃশ্য দেখতে পান, তেমনি, কেউ কেউ পৃথিবীটাকে শান্ত একটা পরিবার বলে যেন ভাবে। গোটা পৃথিবীটাই শান্ত আর একান্নবর্তী একটা বড়ো সংসারের মতো। যে কেবল ফাঁকা মাঠের বিকেলকে ছোট্ট ভাই আর সাঁঝবেলাকে দিদি মনে করে, সে-ই এমন করে ভাববে। কিন্তু এই ভাবাটাও একটা চকিত ভিশন শুধু। সেজন্যই সে পরক্ষণে, সংবিৎ ফিরে পেয়ে, ভাবতে থাকে—আরে! এটা আমি কী ভাবছি! কেন ভাবলাম এরকম! এখন সে বাস্তবে ফিরে এসেছে।

বাস্তব। বাস্তব হল এখন, এই সকাল এগারোটায়, আমি এই লেখাটা লিখছি, আর আকাশে তাকালে কোনো তারা বা অন্ধকারে জ্বলজ্বল-করা চাঁদ, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কারণ, কড়া রোদ বাইরে। এইটাই বাস্তব। কিন্তু সত্য কী? সত্য হল যে, তুমিও জানো, আমিও জানি, সমস্ত তাবা, নক্ষত্র, জ্বলজ্বলে চাঁদ নিজের জায়গাতেই রয়েছে। এই মুহূর্তে পৃথিবীর অন্য গোলার্ধে থেকেও দেখা যাচ্ছে হয়তো, যেখানে যেখানে অন্ধকার আছে এই যে তুমি যখন আমার এই লেখাটা পড়বে—তুমি কলকাতা থেকে দূরে, তোমার বাড়ির সামনে কোকিল-গাছ—যে গাছে কোকিল ডাকে তাকে তো কোকিল-গাছ বলব— তোমার বাড়ির সামনের বাস্তায় সকালবেলার রোদ্দুর, তোমার বাড়ির সামনে ট্রেনরাস্তা—তুমি বারাসত বা বীরভূম বা বিরাটি আর আমি এই যাদবপুর, কি সল্টলেক কি মেট্রো স্টেশন—কিন্তু, এই লেখাটা যখন তুমি পড়ছ, তখন আমি তো তোমার সামনে বসে—সেটাই তো সত্য। ট্রুথ। পৃথিবীটা সত্যিই যে একান্নবর্তী একটা পরিবার—এটা কোনো একটা জায়গায় সত্য। ট্রুথ। কিন্তু রিয়ালিটি সেটা নয়। আমি যেমন দু-একবার ছাড়া কখনও তোমার

মুখোমুখি নই—অথচ তুমি সারাক্ষণ আমার সঙ্গে। সেইরকম।

এই দিদি আর ভাইয়ের সূত্রে অন্য একজনের একটি কবিতাও কেন যেন মনে পড়ল আমার। কয়েকটি লাইন এরকম :

...তারি ছোট ভাই
নেড়া মাথা, কাদা মাখা, গায়ে বস্ত্র নাই,
পোষা প্রাণীটির মতো পিছে পিছে এসে
বসে থাকে উচ্চ পাড়ে দিদির আদেশে
স্থির ধৈর্য ভরে। ভরা ঘট লয়ে মাথে
বামকক্ষে থালি; যায় বালা ডান হাতে
ধরি শিশুকর।

যে বিকেল মাঠে লাফাচ্ছিল, সে অবশ্য ধীর-স্থির নয়। দিদির আদেশেই পিছু পিছু যাচ্ছে তা নয়—তাকে মনে হয় কিছুটা ধরে-বেঁধেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—আর এই সাঁঝ-দিদিরও বাঁ-কাঁকালে থালা আর মাথায় জল-ভরা কলসি নেই, বাল্যকালের কবিতায় দেখা 'অতি-ছোট-দিদি'-র কথা মনে পড়ল, যে আসলে হল 'জননীর প্রতিনিধি।' 'সঞ্চয়িতা' থেকে বাবার মুখে 'দিদি' নামের এ কবিতা শুনে 'স্থির ধৈর্য ভরে' বা 'পিত্তল কঙ্কণ' বা 'প্রতিনিধি' এসব কথার মানে জিজ্ঞেস করেছিলাম বাবাকে। কিন্তু প্রথম যেটা নিয়ে অভিযোগ করেছিলাম তা হল : 'আমার একটা দিদি নেই কেন?' বুকুনও যখন তিন-চার-পাঁচ বছর, তখন নালিশ জানাত তার কেন কোনো ভাই নেই। ফলে কিছুকালের জন্যে আমিই বুকুনের ছোটো ভাইয়ের রোলে অভিনয় করেছি। রবীন্দ্রনাথের এই 'দিদি' কবিতা পড়লে বা পড়ে শোনালে, শিশুমন একটা দিদি চায়। যে-কোনো ছোটো-দিদি একটা ভাই চায়। অর্থাৎ তার পরিবারের মধ্যে সে আরও ভালোবাসার জনকে খোঁজে। তার ভালোবাসার পরিবার বিস্তৃত হতে চায়। বয়স বাড়তে থাকলে ক্রমশ এই আপনজনকে খোঁজা, এই আত্মীয়সন্ধান সারা পৃথিবীর দিকে চলে যায়। নিজের নিজের ছোটো পরিবার থেকে বেরিয়ে জগৎ-পরিবারের দিকে হাত বাড়ায় তার হৃদয়। পৃথিবীটাকেই সে পুরো একটা পরিবার মনে করতে চায়। কিন্তু সে কি আর হয়? একের পর এক বিশ্বাসভঙ্গ, আর আঘাত, আর হিংসা রক্তপাত, বারবার খণ্ড-খণ্ড করে দেয় সেই চাওয়াটাকে। চাওয়ার মনটাকে। তখন মনে হয়—পৃথিবীটা শান্ত একটা পরিবার, এসব ভাবলাম কেন আমি। নিজেকেই বোকা মনে হয়। মনে হয়, আমার চিন্তার মাথামুণ্ডু নেই। অথচ সেইটেই মানবসভ্যতা চিরকাল চেয়ে এসেছে। সেই কমিউন, সেই একান্নবর্তী গ্লোবাল ভিলেজ! সুমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কবিতায়, নিঃসম্পর্কিতকে আত্মীয় করে নেওয়ার যে-টান, তার জন্য মানুষও আর দরকার হয় না। কথা বলার লোক আর খোঁজেন না তিনি। লিখেইছেন সেই কথা :

কথা বলার লোক কেন খুঁজি
যখন তোমার ঢেউ জোয়ার ভাটায়
সরে গেছে
যখন পায়ের কাছে মরা মাছ
আঙুলে দুপুর
যা কিছু বলার কেন বালিকে বললাম
আজ
ছেলেটার একশো চার জ্বর

ঠিকই। ছেলের একশো চার জ্বর দেখে এসেছে একজন লোক। তারপর জলের ধারে দাঁড়িয়ে, সে যা কিছু বলার সব নদীতীরের বালিকে বলছে। মানুষ আর দরকার হচ্ছে না যেন। কিন্তু লক্ষণীয় মানুষের প্রতি বিদ্বেষ বা অভিযোগও আসছে না। তখন বালি-বন্ধু। বালিকেই সব বলা যায়। এত দুশ্চিন্তার কথা বলা যায়। যে, ছেলেটার জ্বর। একশো চার জ্বর।

বিকেল, ফাঁকা মাঠ, সন্ধে, বালি এইসবের মধ্যে তিনি আত্মীয়বন্ধুকে দেখতে পাচ্ছেন। একা লাগছে না আর। এই যে মনের ছড়িয়ে পড়া, বড়ো হয়ে যাওয়া, এর একটি আশ্চর্য দৃষ্টান্ত তুলে দিচ্ছি এবার :

দেবতত্ত্ব

কয়েকজন বাতিল দেবতা দেবদেবী
আমার সঙ্গেই কোনো অন্তিম বাসের খোঁজে
বটতলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন
কারও চুল আছে কোনো মুখ নেই
বুকের পাঁজর খড়ের
ইঁদুর যথেষ্ট রয়েছে শুধু
গণেশটি উধাও
সুউচ্চ কুচের নারকেল থালায় কোনো
মাটি নেই কটি নেই সীমন্তের পাটি নেই
হাতের ভঙ্গিমা শুধু ফুল নেই ফল নেই
গদা শঙ্খ চক্র নেই ত্রিশূল খাঁড়া না
বরাভয় মুদ্রাটি কেবল
সবার সমান আছে
বাস থামানোর জন্য
রেশন কার্ডের জন্য
জ্বালানি তেলের জন্য
শীতের কাঁথার জন্য
জাতীয় দলের জন্য

রাস্তার ধারে বটতলায়, মা দুর্গাকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে আমিও দেখেছি, তুমিও দেখেছ। যা কোনো গ্রামের দিকে গেলে, বাস থামবার বটতলায় এসে দেখলে, ওইভাবে, মা দুগ্‌গা দাঁড়িয়ে আছেন। এবং সপরিবার। আমি এমনকি সন্তোষপুরের মধ্যে, এই শহরে একবার দেখেছিলাম ওইরকম জল পড়ে, রোদ লেগে, পাখি বসে বসে, কী চেহারা হয়েছে তাঁদের তার অসামান্য বর্ণনা আছে এ-কবিতায়। গণেশ ছোটো বলে আগেই হারিয়ে গেছে। এবং ইঁদুরকে ফেলে গেছে। এদের কারও হাতে কোনো বিধিবদ্ধ শাস্ত্রকথিত অস্ত্র নেই। কেবল, বরাভয় মুদ্রায় এঁরা হাত তুলে আছেন! কীসের জন্য? না, বাস থামানোর জন্য।

এক লহমায় কবিতাটি অসাধারণ এক বাঁক নেয়। 'বাস থামানোর জন্য' কথাটি এই জীর্ন শীর্ণ হতশ্রী দেবদেবীদের সাধারণ মানুষ করে দিল। এই রাস্তায় পরিত্যক্ত মা দুর্গার পরিবার রূপান্তরিত হল নিরন্ন, নিরস্ত্র, অসহায় বিরাট এক জনসম্প্রাদায়ে। সমগ্র ভারতবর্ষ দেখা দিল এসে। ঝালা শেষের দিকে এসে নিজেকে শেষ তেহাই-তে পৌঁছে দেওয়ার আগে যেমন কিছুক্ষণের জন্য লম্বা অতিদ্রুত একটি তানের মধ্যে দিয়ে পুরো রাগ পরিক্রম করে আসে— এই কবিতাও শেষের দিকে এসে ওইভাবে শ্বাসরুদ্ধ করে দেয়। মনে পড়ে, এতদিনেও লালগড়ের মানুষদের বিপিএল কার্ড নেই। তারা ঘাসের বীজ অথবা লঙ্কাপোড়া দিয়ে ভাত খায়। মনে পড়ে আমলাশোল। দেবদেবী মূর্তিগুলির হাতে তুলে রাখা ওই বরাভয়-মুদ্রার অলোকসামান্য এই রূপান্তর সমস্ত নিরন্ন নিঃসম্বল মানুষকে যেন আমার পরিবারের আত্মীয় করে নেয়। এই কবিতা বলে : আজকের ভারতবর্ষে এই মানুষরাই হল তোমার দেবতা। যারা ছেঁড়া কাপড় কোনোমতে পরে, আধপেটা খেয়ে বা না-খেয়ে, কোনোমতে প্রাণ ধরে আছে। এই পরিত্যক্ত মানুষরাই তোমার উপাস্য। রাস্তায় পড়ে থাকা দুর্গাপ্রতিমা দেখে এই কবিতা যদি লেখা হয়, তবে বোঝা যায় কোনো একাকী, সংঘহীন নবীন কবির ইনসাইট-এর মধ্যেও কতটা শক্তি থাকতে পারে।

সুমন্ত মুখোপাধ্যায়ের এইসব কবিতাও রাস্তায় রাস্তায় খুঁজে পাওয়া। একবার পড়লেই তা বোঝা যায়। পথ-দৃশ্য থেকে উঠে আসা কবিতা সব। আর পথে-পথে ঘুরেই তো দেশকে জানতে হয়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার লাইন ছিল : রাস্তাই একমাত্র রাস্তা। মিছিল আর আন্দোলনের তীব্র চঞ্চল একটি সময়খণ্ডে লেখা হয়েছিল রাস্তায় নামার এই আহ্বান। আজ চল্লিশ বছর পরে, মনে হয় সে-কবিতার লাইন শুধু আন্দোলন মিছিলের জন্য নয়। সে-কবিতা আজ অন্য অর্থ পায়। মনে হয়, রাস্তায় রাস্তায় ভগবান দেখে দেখে বেড়ানোর এই কাজ কবিতা-লেখকের জন্য ধার্য আছে চিরকালই।
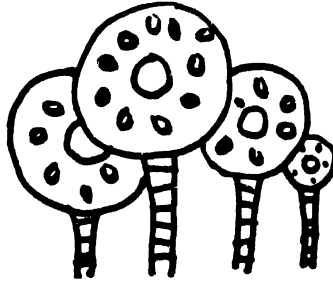
৩১

শাস্ত্রে কবিকে বলে দ্রষ্টা। কবি দেখতে পায়। সে তো তুমি-আমিও দেখতে পাই। কিন্তু সাধারণ একটা ঘটনা অথবা দৃশ্যের মধ্যে কবি আরও বেশি কিছু দেখতে পায়। সেই দেখাটা লেখার মধ্যে ফুটে ওঠে বলেই তাকে 'দ্রষ্টা' বলে বোঝা যায়। ধরা যাক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বহুশ্রুত লাইন : 'প্রতিধ্বনি, তুমি তো স্বর্গের দিকে গিয়েছিল / কেন ফিরে এলে?' প্রতিধ্বনি তো তুমিও শুনেছ কতবার, আমিও শুনেছি। বহু মানুষ বহুকাল ধরে শুনছে। কিন্তু প্রতিধ্বনি যে স্বর্গের দিকে যেতে চায়, এ কি কেউ ভেবেছে কখনও? কথাটা শুধু এইটুকু নয়। পাহাড়ে, মাঠে, খোলা জায়গায়, বিরাট দুর্গের অভ্যন্তরে যে-প্রতিধ্বনি আমরা পাই সে তো কোথাও ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে। এ পর্যন্ত জানা। কিন্তু 'স্বর্গের দিকে'? সেটা জানা নয়। এই লেখক, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, তাঁব অনেক সাক্ষাৎকার বা লেখায় জানিয়েছেন, তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাসী নন। তিনি মৃত্যুর পরে স্বর্গ-নরক ইত্যাদির অস্তিত্ব আছে বলেও মনে করেন না। তাহলে এই 'স্বর্গ', শব্দটি কি কবি নিজের বিশ্বাসের বাইরে গিয়ে ব্যবহার করেছেন? ব্যাপারটা অন্যদিক দিয়ে দেখি। এক-একটা শব্দের সংকেত করার যে শক্তি, শব্দটি তার অর্থদ্যুতি কতদূর পাঠাতে পারে, কবি সেইটা নিয়ে কাজ করেন। 'স্বর্গ' শব্দটা বললে, আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরের একটি স্বপ্নদেশ মনে পড়ে। যা আমরা কেউ কখনও দেখিনি এমন একটি দেশ। যে-দেশ অনেক দূরে আছে। আবার সাধারণ ভাবে মানুষের মনে হয়, স্বর্গ হয়তো আছে আকাশের কোনো স্তরে। বিভিন্ন পুরাণে এ-কথার সমর্থন মেলে। দেবদেবীদের গল্পেও। এই অনেক দূরের একটা ধারণা, 'স্বর্গ' শব্দটার সঙ্গে লেগে আছে, কোথাও একটা আকাশও আছে, আছে আমাদের খানিকটা অজান্তেই—সেইটার ফলে যা হল, চকিতে একটা অসীমেব ধারণা, আকাশের ধারণা, এনে দেওয়া হল। ফাঁকা, এবং অনেকখানি দূরত্ব না থাকলে প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় না। সেই যে দূর, সেই দূরত্বকে সীমাহীনতার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হল 'স্বর্গ' শব্দটির ব্যবহারে। এই বিশেষ কবিতাটির যে ক্রিয়েটিভ প্রসেস লেখক বর্ণনা করেছেন, তাতে মনে হয় যেন মনঃসংযোগের,

এত সব পূর্ব-ভাবনার কোনো ভূমিকাই নেই। খুবই ক্যাজুয়ালি, হাঁটতে হাঁটতে পাওয়া লাইন। ঠিকই তো। শব্দ ও তার সংকেত শক্তি, ছন্দের সূক্ষ্মতা, ভাষা, অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশে, কবির অবচেতনের ভাণ্ডারে জমা থাকে। লাইনটি অনেক সময় তৈরি হয়, মুহূর্তের বিদ্যুৎ আভাসে। বাইরে থেকে চাপানো কোনো পরিশ্রম ছাড়াই সে দেখা দেয়। কারণ, সে তো একটা ভিশন। 'প্রতিধ্বনি'-র ফিরে আসার সঙ্গে অসীম-অনন্তকে ছুঁতে না-পারার যে-সম্পর্ক দেখতে পাওয়া গেল, তা কেউ এতদিন ভাবেনি। এইখানেই কবি দ্রষ্টা। সাধারণ জিনিসের মধ্যে দিয়ে অসাধারণকে বলা। আর এই লাইনটিকে কোনো মানুষ তার ব্যক্তিগত পাওয়া না-পাওয়াতেও প্রয়োগ করতে পারে। কোনো কবি, মধ্য পঞ্চাশে পৌঁছোনো কোনো বন্ধ্যা কবিও, নিজের সারাজীবনের লেখার চেষ্টার ব্যর্থতাকে ছুঁতে পারে, এই লাইনটি দিয়েই।

এই পুরো কবিতাটি কীভাবে লেখা হয়, তার অসামান্য বর্ণনা আছে 'আমি কীরকম ভাবে বেঁচে আছি' কাব্যগ্রন্থে। যেটাকে আমি গম্ভীরভাবে এক্ষুনি ক্রিয়েটিভ প্রসেস বলেছি। ১৩৭২ সালের চৈত্র মাসে এই বইটি বেরিয়েছিল, মানে আজ থেকে ৪৩ বছর আগে। সে বইতে 'একটি কবিতা লেখা' নামে এই কবিতা ও গদ্য একত্রে ছাপা হয়। অতদিন আগে, এভাবে, একটা কবিতার মধ্যে মধ্যে ভেঙে ভেঙে নিজের জীবনের টুকরো ও রচনা-মুহূর্তকে একই সঙ্গে গেঁথে দেওয়া অভাবনীয় ছিল। প্রকৃতপক্ষে, আজও এ লেখার কোনো জুড়ি নেই। 'প্রতিধ্বনি' শব্দটির মধ্যে যে অসীমের ভেতর চলে যাওয়া আছে, কবিতাটি কীভাবে লিখতে হল সে-বর্ণনায় সেটা তেমন ভাবে নেই। বর্ণনায় নেই, ঠিকই। আরও একটি বিখ্যাত লাইন, এই লেখকেরই, 'ভ্রূপল্লবে ডাক দিলে দেখা হবে চন্দনের বনে'—পাওয়া গিয়েছিল, রাতের প্ল্যাটফর্মে ট্রেনের জন্য অপেক্ষমাণ পদচারণায়, হঠাৎই—এ কথাও, সমস্ত সুনীল-পাঠকেরই বারবার জানা। এতে ভ্যালেরি-র সেই কথাটির সত্যতাই প্রমাণিত হয়: 'প্রথম লাইনটা আসে স্বর্গ থেকে, বাকিটা তুমি তৈরি করে নাও'। এই 'স্বর্গ' কিন্তু কবির অবচেতন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিভাব পত্রিকার একটি সংখ্যায়, একবার লিখেছিলেন একটি গদ্যলেখায়, কবিতার লাইন তাঁর মাথায় কখন কীভাবে, নানা আশ্চর্য অসময়েও এসে পড়ে—তার কিছু বিবরণ ছিল সেখানে। লক্ষণীয়, সে-লেখার শিরোনাম ছিল : 'মানস মেঘে বিদ্যুৎ ঝলক।' 'প্রতিধ্বনি তুমি তো স্বর্গের দিকে গিয়েছিলে, কেন ফিরে এলে'—বাংলা কবিতার চিরস্থায়ী এই লাইনও 'স্বর্গ' থেকেই এসেছিল। কী সুন্দর দুটি আলাদা স্বর্গ : একটি ভ্যালেরি-র। আর অন্যটি, সুনীলের 'প্রতিধ্বনি'-র গন্তব্য নিশানার।

'আমি কীরকম ভাবে বেঁচে আছি'-র প্রায় একবছর পরে প্রকাশিত আরেকটি বইতে, সুররিয়ালিজমের উন্মেষ বিষয়ে বলতে গিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন এই অমোঘ লাইন : 'অবচেতনার উদ্ধার—এ ছাড়া স্বর্গ ও পৃথিবীকে মেলাবার আর কোনও উপায় নেই সাহিত্যে'। এইসব লাইন মনের মধ্যে আলো জ্বেলে দেয়।

যে-বইতে এ কথা আছে, তার নাম 'অন্য দেশের কবিতা।' পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কবিদের অনুবাদ সংকলন। আজকের পাঠক এই ধরনের নানা সংকলন দেখে অভ্যস্ত, কিন্তু,

সেই 'অন্য দেশের কবিতা' বইয়ের সঙ্গে কোনো কিছুরই তুলনা হয় না। বইটি কেবল অনুবাদের জন্যই বিশিষ্ট, তা নয়। আমার কাছে এর প্রধান আকর্ষণ, টীকা হিসেবে, কবি-পরিচিতি হিসেবে লেখা সুনীলের ছোট্ট ছোট্ট গদ্য টুকরোগুলো। মনে রাখতে হবে ততদিনে, 'হে বিদেশি ফুল' বার করেছেন বিষ্ণু দে। সুধীন্দ্রনাথ অনেক অনুবাদ করেছেন। 'প্রতিধ্বনি' নামে তাঁর বই '৫৪ সালে বেরিয়ে গিয়েছে। সর্বোপরি আছেন, অলঙ্ঘনীয় বুদ্ধদেব বসু। তখন। ৪২ বছর আগে। তাঁর বিখ্যাত অনুবাদের বইগুলো বেরিয়েছে, বেরোবে। বোদলেয়র অনুবাদ বেরিয়ে গিয়েছে। মেঘদূত-ও। রিলকের অনুবাদ করছেন। আজ এই এত বছর পরে যদি বুদ্ধদেবের অনুবাদ বইগুলোর দিকে তাকাই, দেখি তারা আজও সমানভাবে জ্যোতিষ্মান হয়ে আছে। রিলকে, রোদলেয়র, হেল্ডারলিন, মেঘদূত, পাস্তেরনাক, বুদ্ধদেবের সুকীর্তির লম্বা স্বর্ণরেখা। রিলকে ও বোদলেয়র-এর ভূমিকা সুদীর্ঘ। হেল্ডারলিন নাতিদীর্ঘ। সংক্ষিপ্ত পাস্তেরনাক। কিন্তু প্রত্যেকটিই অবিস্মরণীয়। নবীন কবিকে শক্তি দিতে পারে কবিতা লেখার। একলা লেখককে দিতে পারে অনমনীয় থাকার জোর, পাস্তেরনাকের ওই ছোট্টভূমিকা। এমনকি কবিতা লেখা বন্ধ করে, অন্য কোনো কাজকেও (শান্ত হাতের দ্বিতীয় কোনো কাজ—রিলকে) গ্রহণ করতে সাহস দেয় পাস্তেরনাক বিষয়ে ভূমিকাটি।

বুদ্ধদেবের ওই বইগুলোর আলো এত দূর পর্যন্ত এসে লাগে, হয়তো ভবিষ্যতের দিকে ওই আলো চলতেই থাকবে—তার কারণ, প্রধানত অনুবাদ নয়। কারণ, বুদ্ধদেবের হাতে, ওইসব কবি জীবনের অসামান্য উন্মোচন। সেজন্যই ওই বইগুলির কিরণছটা আকাশ ঢেকে আছে।

এরই মধ্যে অবশ্য দুই নবীন কবি, যাদের বয়স, ৩০ আর ৩১, তাঁরা বার করেছেন, প্রায় সারা পৃথিবীর কবিতা থেকে চয়ন করে একটি বই : 'সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত'। এঁরা হলেন শঙ্খ ঘোষ ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। মোটা বই। প্রায় পাঁচশো পৃষ্ঠা। দুজনেই একটি করে ভূমিকা লিখেছিলেন। খুবই সুষম, নিখুঁত, ও ধাপে ধাপে গঠিত সার্থক প্রবন্ধ সে-দুটি।

দু-জনেই ভি-এর মধ্যে খেলেছেন। অর্থাৎ কভার, একস্ট্রা কভার, মিড অফ, মিড অন, কিছুটা মিড উইকেট ও সোজা বোলারের দিকে। কেন-না, এঁরা দুজনেই, তখনই অত অল্প বয়সেই, জ্ঞানী হিসেবে, সমবয়সিদের শ্রদ্ধা আর মাস্টারমশাইদের স্নেহ ও সমীহ লাভ করেছেন। পরবর্তী সময়ে 'নিঃশব্দের তর্জনী' আর 'কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক' বইতে শঙ্খ ঘোষ নিজের গদ্যরচনার স্পষ্ট পথে চলে যাবেন, সেই ষাটের দশকেই। অলোকরঞ্জন যাবেন 'শিল্পীত স্বভাব'-এ।

কিন্তু আমি বলতে চাইছি, 'অন্য দেশের কবিতা' বইটি-র প্রধান আকর্ষণ যে আমার কাছে তার টীকা ও কবি-পরিচিতির মধ্যে—সেই ক্ষীণকায় বইটি, বুদ্ধদেবের অসামান্য বইগুলো থেকে ছিল দৃপ্তভাবে আলাদা। ছোট্ট ছোট্ট ওই গদ্যগুলোতে হিরে মাণিক ছড়ানো। 'এক গ্রীষ্মে দুই কবি' নামে বোদলেয়র ও ডস্টয়েভস্কি বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধে বুদ্ধদেব এক জায়গায় লিখেছিলেন—'এখানে টলস্টয়ের সঙ্গে ডস্টয়েভস্কির তুলনার প্রচণ্ড লোভ আমাকে সামলে যেতে হচ্ছে'। আমাকেও বুদ্ধদেবের অনুবাদের বইগুলোর টীকা-ভূমিকার

বিশিষ্টতার সঙ্গে 'অন্য দেশের কবিতার' অনুবাদক প্রদত্ত ছোট্ট ছোট্ট অসামান্য গদ্যগুলির তুলনার লোভ সামলে যেতে হল। লেখাগুলো পড়লে মনে হয় যেন খুব সিরিয়াস নয়। যেমন-তেমন করে লেখা। এত সহজ, ভারহীন, অথচ বিদ্ধকারী। ভ্যালেরি-র 'নিদ্রিতা' কবিতার অনুবাদ প্রসঙ্গে এক জায়গায় সুনীল লিখেছেন: "আসলে একটি যুবতি সত্যিকারের নিদ্রিতা কিন্তু তার শরীর জেগে আছে।... শেষ লাইনে জেগে থাকার কথা দুবার কেন লিখেছেন (ভ্যালেরি)? কারণ জেগে-থাকা অর্থাৎ Veille শব্দের V অক্ষরের যে-গঠন, এই অক্ষরটি যেরকম দেখতে, এর মধ্যের ত্রিকোণ-শূন্যতা নগ্ন শরীরের ত্রিকোণের কথা মনে পড়ায়। ইংরেজি অনুবাদেও এ অনুভব আসতে পারে না—কারণ Awake আর বাংলায় 'জাগা'। 'জ' দেখলে এরকম সুন্দর ছবি মনে পড়া অসম্ভব, 'জ'-কে দেখতেই কীরকম জ্যাঠামশাইয়ের মতো।' এটা বুদ্ধদেবের কোনো টীকা-ভূমিকায় অকল্পনীয়। অথচ সূক্ষ্মতম, গভীরতম কবিতা-দৃষ্টির পরিচয় আগের লাইনগুলোতে রয়েছে, এক নিশ্বাসে এসে গেল যুবাসুলভ ক্যাজুয়াল ইয়ার্কি। যে-জায়গাটা তুললাম, তার ঠিক আগেই আছে আর একটি জায়গা : 'সংস্কৃতের মতো লঘু, গুরু, প্লুতস্বরের ব্যবহারের বিশিষ্টতায় ভ্যালেরী অসীম উদ্যমী। পণ্ডিতরা বলেন মূল কবিতায় ma, amaie, ame ইত্যাদি শব্দের a অক্ষরের দীর্ঘ উচ্চারণ, শায়িতা নারীর বিস্তৃত দেহের আভাস এসেছে। S এর ঘন-ঘন ব্যবহারে ঘুমন্তের নরম নিশ্বাস।' এইসব অভাবনীয় লাইন আমাকে শিখিয়েছে কবিতাকে কী করে দেখতে হয়। আমি ফরাসি ভাষা জানি না। ভ্যালেরির কবিতাও ইংরেজি অনুবাদে কিছু পড়েছি। ভ্যালেরি আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেননি। গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এইসব কথা, এই পর্যবেক্ষণের ধরনে অনেক সময়ই বাংলা কবিতার ছন্দ ও ধ্বনিসাম্যকে আমি লক্ষ করতে শিখেছি। শিখেছি, আমার সেই প্রথম বয়সেই, এই 'অন্যদেশের কবিতা' পড়ার পর থেকে। অন্যদেশের কবিতা যদি '৬৭-তে বেরিয়ে থাকে, তবে '৬৬ সালে, আর একটি পত্রিকা বেরতে শুরু করল, 'কবিতা-পরিচয়', অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সম্পাদনায়। যে পত্রিকার নির্বাচিত সংকলন—আজও আমার বইয়ের টেবিলে সর্বদা থাকে। সেই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায়, '৬৬-তেই, শঙ্খ ঘোষ রবীন্দ্রনাথের 'প্রথম দিনের সূর্য' নিয়ে একটি আলোচনা লিখেছিলেন, যে-আলোচনা বিখ্যাত হয়ে আছে কেবল লেখার গুণেই নয়, আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে শঙ্খ ঘোষের বিতর্কের কারণেও। যা ওই পত্রিকাতেই পরপর ছাপা হয়েছিল।

'প্রথম দিনের সূর্য' কবিতায় যে 'একবার মেলেনি উত্তর' এবং শেষে 'পেল না উত্তর' কথা দুটি আছে এ-বিষয়ে শঙ্খ ঘোষ জানিয়েছিলেন : "মেলেনি কথার 'ি' ধ্বনির চাপা টান যেন নীচু করে ধরে রেখেছিল ঐহিক ধারণার দিকে, আশা ছিল যে এখনও না-মিললেও একদিন জীবনরঙ্গসীমা থেকেই মিলবে বা কোনো উত্তর, কিন্তু এখনও, এই পরিণাম সময়ে হতাশ নিষ্ফলতার বোধ যেন 'না' শব্দের প্রসারিত আকারে লেগে মুহূর্ত মধ্যে জ্যা-মুক্ত হয়ে নিক্ষিপ্ত হল এক নিরন্তর শূন্যতার অন্তসারে।"

কবিতার মধ্যে ধ্বনির যে শক্তি, পাঠক হিসেবে, এইসব কবি, তার দিকে তাকাতেন। কানে নিতেন। ছন্দ মিলের প্রত্যক্ষ ঝনৎকার ছাড়াও, গোপনে, কবিতার ভেতরে ভেতরে যে ছড়িয়ে থাকে ধ্বনির সাম্য বা হঠাৎ সেই সাম্য ভেঙে দেওয়ার ফলে তৈরি হওয়া উচ্চাবচতা, এবং তা কবিতার বিষয়ের আত্মা থেকেই জন্মায়—এসব জানতে হাতে ধরে শিখিয়েছিলেন এঁরা। তখন এঁদের কাউকে চোখেও দেখিনি। লেখকের সঙ্গে সবচেয়ে গভীর সম্পর্ক যে হতে পারে কেবল তার লেখার মধ্য দিয়ে, আমরা জীবনে তার প্রমাণ বারবার পেয়েছি।

এই অন্য দেশের কবিতা বইটি আমাকে আরও একটি বার্তা দেয়। মাত্র গতকালই একটি লেখায় পড়লাম সুনীল লিখেছেন : 'আমি শঙ্খ ঘোষের এবং বুদ্ধদেব বসুর রবীন্দ্র বিষয়ক গ্রন্থগুলোর প্রথম পৃষ্ঠায় চোখ নিবদ্ধ করে আর ছাড়তে পারি না। তা শুধু এই দুজনের গদ্য ভাষার প্রসাদগুণের জন্য।' তাহলে সেই অল্প বয়সে যখন বুদ্ধদেবের বোদলেয়র, মেঘদূত, রিলকে, হেল্ডারলিন বিষয়ে এইসব যুগোত্তীর্ণ লেখা বেরোচ্ছে কিছু বই হয়ে, কিছু বই হবে বলে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে প্রতীক্ষায় আছে—তখন সেগুলো পড়ে নিশ্চয় মুগ্ধ ছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। কিন্তু নিজে যখন লিখছেন? তখন? ওই যা বলেছি, দৃপ্তভাবে আলাদা। প্রতিধ্বনি, তুমি তো স্বর্গের দিকে...যখন লিখছেন, তখন ওইভাবে একটা কবিতার স্রোতকে ভেঙে মাঝে মাঝেই কবিতা লেখার সময়টাকে গল্প করে বলা। অতিখ্যাত সেই 'আমূল' শব্দটি কীভাবে এল বলে দেওয়া, অথবা ঘাইহরিণী শব্দটা জীবনানন্দ থেকে প্রত্যক্ষ হয়ে গেল এই মজার স্বীকারোক্তি—মজার, কারণ, ওই কবিতা তো জীবনানন্দের যুগকে পার হওয়ার কবিতা, এবং জীবনানন্দের প্রভাব সুনীলের ওপর কখনও ছিটেফোঁটাও ছিল না। তাও, 'লেখার সময় মনে পড়েছে কথাটা, তাই লিখে দিলাম'—এরকম একটা বেপরোয়া সৌন্দর্য। ব্রেখট তাঁর থিয়েটারে অনেকটা এই পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন, অ্যালিয়েনেশন—তার আর একটি নতুন রূপ ওই কবিতায়—কবিতা লিখছি, লিখতে লিখতে, হঠাৎ কবিতা থেকে বেরিয়ে গিয়ে দুটো কথা বলে ফিরে এলাম, কবিতাটির মধ্যে, আবার কবিতাটি লিখছি, সেটা জানাচ্ছিও। এইরকম উদ্ভাবনী ক্ষমতা যাঁর আছে, তিনি পূর্বসূরিকে শ্রদ্ধা করবেন, তাঁর লেখায় মুগ্ধ হবেন। কিন্তু নিজের জন্য বেছে নেবেন আলাদা পথ। সেইজন্যই 'অন্য দেশের কবিতা' বইয়ের টীকা ও কবি-পরিচিতির গদ্য অত নিজস্ব। অত প্রেরণায়ক ভাবে উজ্জ্বল।

বুদ্ধদেব বসুর রিলকে হেল্ডারলিন বোদলেয়র পাস্তেরনাকের জীবনকাব্য সম্পর্কিত গদ্যভাষা তার সমস্ত অসামান্যতা নিয়েও, কোথাও যেন একটু দূরত্বের বোধ তৈরি করে। সেই দূরত্ব, একটি অবশ্যম্ভাবী দূরত্ব। ওই সব অলোকসামান্য কবিজীবন আমাদের চেয়ে দূরের তো বটেই। তা-ই বুদ্ধদেব বসু-র ওইরকম দূরত্ব সঞ্চারী ও গভীর গদ্যভাষা অব্যর্থ সেসব ক্ষেত্রে। কিন্তু সুনীলের ওই টীকা-কবি-পরিচিতির গদ্যভাষা গভীরতম কথাটি বলতে বলতেও হঠাৎ ইয়ার্কিতে ঝলমল করে ওঠে, নিজের পাশে হাত ধরে বসিয়ে নেয়। যেন

একই আড্ডায় বসেছে পাঠক আর লেখক। জ্যাক প্রেভের-এর 'শোভাযাত্রা' কবিতার টীকায় সুনীল লিখছেন : 'পঞ্চম লাইনের 'চশমা পরা কারখানা' প্রায় কিছুই বোঝায় না। কারখানায় মূল শব্দ Moulin, যার অর্থ মিল বা কারখানা—যেমন আটা ময়দার কারখানা, কফি গুঁড়োবার কারখানা। প্যারিসের বিখ্যাত নাইট ক্লাব মূল্যাঁ রুঁঝ—তার ওই নামের কারণ ওই লাল বাড়িটাকে দেখতেই একটা উইন্ডমিলের মতন। কিন্তু, 'মূল্যাঁ' কথাটার আর একটা মানে আছে ফরাসিতে, মূঁল্যা আপারোল মানে হচ্ছে বকবকানি মেয়ে। তাহলে চশমাটা কী সুন্দর মানিয়ে যাচ্ছে।' পুরোটাই যেন গল্পচ্ছলে বলা। কবিতা সম্পর্কে লিখতে গেলে যে গল্পচ্ছলেই আমার কথা বলতে ইচ্ছে করে, সেই ইচ্ছেটাও শিখেছি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এইসব লেখা থেকে। এঁরা এটাও শিখিয়েছেন, কারও লেখা পড়ে মুগ্ধ হওয়া মানে তাঁর পথে যাওয়া নয়, তাঁকে মডেল করা নয়, বরং সেটা ত্যাগ করে অন্য রাস্তায় যাওয়া।

এই শেখাটা কীভাবে হল? যেভাবে অলোকরঞ্জনের কবিতা বলেছে : সমস্ত নিসর্গ আজ মুখরিত সাজ্জাদ হোসেন / সানাই বাজিয়ে সব বলে দিচ্ছেন বিধাতাকে।' সাজ্জাদ হোসেন যেমন তাঁর সানাইতে রাগ-রূপায়ণের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরকে সব জানিয়ে দেন— সেই ভাবে, এঁরা লিখতে লিখতে বলেছেন—আমি পড়তে পড়তে শিখেছি। কলকাতা থেকে দূরে বসে। সুনীল লিখেছিলেন একবার, '...এইভাবে বুদ্ধদেব বসু দূর থেকেও আমার শিক্ষকের কাজ করেছিলেন'। একই কথা আমি বলতে পারি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্বন্ধেও। অগ্রজ লেখক অনুজকে শিক্ষা দেন তাঁর লেখা দিয়েই! এমনকি মৃত্যুর পরেও সেই তালিম চলতে থাকে। যেমন বুদ্ধদেব বসুকে আমি কখনও দেখিনি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরেও কি আমি তাঁর কাছে তালিম পাইনি? দেখাটাই, দেখতে শেখানোটাই—সেই তালিম। তা ছাড়া লেখা তো আসে জীবন থেকে। প্রত্যেকের জীবন পৃথক। তা-ই কোনো লেখকের জীবনযাপনকে অনুসরণ করা মানে নিজের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথে পাথরচাপা দেওয়া। সেজন্যই বুদ্ধদেব বসু যেভাবে জীবন কাটিয়েছেন, সে ভাবে জীবন না-কাটিয়ে সম্পূর্ণ অন্য পথে হেঁটে নিজের লেখাগুলো তুলে নিয়েছেন সুনীল। সেইজন্যই তিনি দৃপ্তভাবে আলাদা।

এই আলাদা হওয়ার জন্য, নিজের পথ খুঁজে নেওয়ার জন্য দরকার আত্মশাসন। আত্মনিয়ন্ত্রণ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের তেমন একটি আত্মশাসনের বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য গোঁসাইবাগানের পাঠকদের জন্য উপস্থিত করছি। যা আমি ছাড়া কেউ দেখেনি। কেন-না, সেখানে শুধু আমিই ছিলাম।

আমি কিছুকাল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে চাকরি করেছি। অনেক সময়, ওঁর সঙ্গেই অফিসের পর বাড়ি ফিরতাম, ওঁর গাড়িতে। তখন 'দেশ' পত্রিকার পুজো সংখ্যার প্রস্তুতি একেবারে শেষ দিকে। পাতা ছাড়া শুরু হয়ে গিয়েছে। সাগরদার সেই সময় খুব টেনশন হত । আমাকে ডেকে বকুনি দিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'সুনীল-শক্তি কবিতা দিয়েছে।' আমি বললাম, শক্তিদার পেয়েছি। 'কেন, শক্তি তো সকালেও দেয়নি? খবর নিলাম'। আমি বলি, এখন পেয়ে গিয়েছি। কবিতার পাতা তৈরি হচ্ছে। 'আর সুনীল?' হ্যাঁ

বলতে পারলাম না। 'আগেই কেন নিয়ে রাখোনি?' চুপচাপ বেরিয়ে সুনীলদার সামনে গেলাম। কবিতা চাইব কি? আমি হাঁ। শারদীয় আনন্দবাজার-এর জন্য রাধানাথ মণ্ডল ওঁকে বলছেন, 'কাল সকালে কবিতাটা না পেলে মরে যাব'! উনি প্রতিশ্রুতি দিয়েদিলেন, 'হ্যাঁ আনব কাল'। এবার আমি কী করে চাইব! সকালে তো উনি উপন্যাস লিখবেন। 'দেশ'-এর 'প্রথম আলো'-র ইনস্টলমেন্ট আছে। আছে 'সানন্দা'-য় নীললোহিতের ধারাবাহিক— 'খুঁজে বেড়াই'। প্রতিদিনের দেখা-শোনায় এগুলো আমার সবই জানা। তাহলে? চুপ করে আছি। উনি বললেন, 'কী-ই! সাগরদার বকুনি খেয়েছ তো! আসলে ওটা উনি আমাকে বকেছেন। তোমাকে নয়। মন খারাপ কোরো না। কাল নিয়ে আসব কবিতা। কেমন?'

অফিসের শেষে দুজনে বেরিয়েছি। সেদিন ওঁর সঙ্গে গাড়ি নেই। ট্যাক্সি ধরব আমরা। সুনীলদা একটা সিগারেট ধরিয়ে দাঁড়িয়ে। আমি একটা ট্যাক্সিও থামাতে পারছি না। বললেন, দাঁড়াও, আমি দেখছি। পরপর চারটে ট্যাক্সি সুনীলদাকে না বলল। পঞ্চম ট্যাক্সিও 'না' বলেছে—কিন্তু বলে আর বেরোতে পারেনি, কারণ, সিগন্যাল তখন লাল। সুনীলদা আবার বললেন, যাবে না ভাই? লোকটি যাত্রীর দিকে না তাকিয়েই তাচ্ছিল্যের হাত নাড়ল। না।

যাবে না মানে? কেন যাবে না? সিগারেট-টা ছুঁড়ে ফেলে, একটা ঝাঁকুনিতে সুনীলদা খুলে ফেলেছেন সামনের দিকের দরজা। একটা পা তুলে দিয়েছেন ভেতরে। একেবারে অন্য একটা মূর্তি মানুষটার। যা আগে কখনও দেখিনি। পরেও না।

এইবার ড্রাইভার তাকাল। ড্রাইভার একজন উগ্র ধরনের অবাঙালি লোক। তার চোখে প্রথমে আসা ঔদ্ধত্য চকিতে বদলে গেল ভয়ে। বিশুদ্ধ ত্রাসে। সে বুঝেছে, একটা গোলমাল করে ফেলেছে সে। ড্রাইভারের মুখে পড়েছে পথ-বাতির লাল আলো। তখনও ট্র্যাফিক স্তব্ধ।

হঠাৎ, ট্যাক্সির সামনে অর্ধেকটা ঢুকেও, পা তুলে নিলেন সুনীলদা। একটা তীব্র প্রত্যাখানের জোর আওয়াজে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। 'যাও'। বললেন শুধু। ট্রাফিক সিগলাল সবুজ হতেই, সেই লোকটি পড়িমরি করে গাড়ি নিয়ে পালাল।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। উনি সিগারেট ধরালেন আরেকটা। একটুক্ষণ নীরবতার পর আবার নিজের শান্ত, মৃদুস্বরে বললেন, 'আজ তো রাত্রে বাড়ি গিয়ে কবিতা লিখতে হবে। আজ তো রাগ করলে চলবে না। তাই না! দেখি, কখন ট্যাক্সি পাই।'

জুবিলি টেস্ট-এর কথা বলি। ভারত-ইংল্যান্ড। '৮০ সালে। সে-টেস্টকে অনেকে বোথাম টেস্ট-ও বলে থাকেন। ইয়ান বোথাম তখন দুর্দান্ত ফর্মে। সে ম্যাচে ইয়ান বোথাম দু-ইনিংসে ১১টি উইকেট নেন। ব্যাটে করেন ১১৪। ভারত ইনিংসে হারছিল, শেষে দশ উইকেটে হারে। সেই জুবিলি টেস্টের প্রথম দিন। টসে জিতে ভারত ব্যাট করছে। গাভাসকর ৪৯ করেছিলেন। সাতটা চার দুটো ছয়। যাকে বলে 'আনলাইক গাভাসকর'। এটা কিন্তু মার্শালের বিরুদ্ধে ৯৪ বলে সেঞ্চুরির প্রায় তিন বছর আগের কথা। এবং ওয়ান ডে-র রমরমা তখনও এত বেশি হয়নি। স্কোর যখন নো লস ৩২, তখন বোথামের একটা বলকে ফুল ব্লেডে নিয়ে

সাইট স্ক্রিনের ওপর দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন গাভাসকর। মাঠ জুড়ে হইহই। ওয়াংখেড়ে-তে খেলা পড়েছে। গাভাসকরের নিজের জায়গাই বলা যায়। দেখা গেল সারা মাঠ উল্লসিত, শুধু গাভাসকর অনুতাপের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছেন এবং ব্যাটটা ঝাঁকাচ্ছেন। সাধারণত আউট হলে বা ভুল স্ট্রোক খেললে যেমন করে ব্যাটসম্যানরা। ওভার শেষ হল। ও-প্রান্তে যাওয়ার সময় ইংল্যান্ডের কাপ্টেন মাইক ব্রিয়ারলি এগিয়ে এলেন গাভাসকরের কাছে। ফার্স্ট স্লিপ থেকে তিনি দেখেছেন ব্যাপারটা। কী, ব্যাপার! বোথামকে ওইভাবে মেরেও, তুমি রিপেন্ট করছিলে কেন? গাভাসকর বলেছিলেন, খেলা এক ঘণ্টাও হয়নি। এটা টেস্ট ম্যাচ। আমি একজন ওপেনার। আমি কি এটা করতে পারি? এই হল আত্মশাসনের আরেকটি সেরা দৃষ্টান্ত।

পরের দিন 'দেশ' পত্রিকার দপ্তরে যে কবিতাটি এনে দেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, এবং সাগরদার মুখে হাসি ফোটে, সেটি সেই রাতেই লেখা—সেই কবিতাটি আমার মনে আছে। চিরজীবন মনে থাকবে। আমি তুলে দিচ্ছি এখানে।

আমায় সে চিনেছিল? বলো, বলো

একবার চোখে চোখ, তারপর দুদিকের পথ
আমায় সে চিনেছিল? কিংবা সে দেখেছিল আড়ালে কারুকে?
তাতে কিছু আসে যায়? কথা নেই, দুজনে দুদিকে চলে যাওয়া
পেছনে ফিরিনি আর, আমার রাস্তায় কত বাঁক
দু চারটে খানাখন্দ, জল-কাদায় কুচিকুচি আলো
জুতোয় কাঁকর ফুটছে, একা সিগারেট কিন্তু দেশলাই কোথায়
আমায় সে চিনেছিল? চোখে চোখ, ছিল কোনো ভাষা?
এক হোঁচট, টর্চ নেই, অলীক শরীর যায়, আসে
আমায় সে চিনেছিল? আমাকে, না সে কাকে দেখেছে?
শুয়ারকা বাচ্চা সব, কালো কুত্তা, হঠ যাও, মারব এক লাথ
বন্ধ সব দোকানের তালাগুলো ভেঙে দেব একেক ধাক্কায়
আমায় সে চিনেছিল? বাতাসের ঘূর্ণি থেমে গেছে
আকাশে ইয়ার্কি বুঝি, এত তারা, উপড়ে নেব সব
আমায় সে চিনেছিল? বলো, বলো সে কোথায় গেল
অন্ধকার বাড়িগুলি, সব জানলা পোড়াব ফুৎকারে
এ বিশ্ব উচ্ছন্নে যাক, অমরত্ব মুর্খের রটনা
করতলে ধরে রাখা জল, তার খেলা, সেই দর্পণে জীবন
আমায়ে সে চিনেছিল? বলো, বলো, কার চোখে চোখ?

ওই ব্যক্তিগত সাক্ষ্য দিয়ে আমি কবিতাটির বিচার চাইছি না। এ-কবিতাটি বিষয়ে আমি অন্য বইতে আলোচনা করেছি, তাতে এই ঘটনার উল্লেখ করিনি। ব্যক্তিগত ঘটনার উল্লেখে কোনো কবিতাকে দেখতে গেলে তা সংকীর্ণ হয়ে যায়। একটা কবিতা কবির জীবন থেকে বেরিয়ে এল আমাদের জীবনের দিকে। আমরা আবার সেটা ঠেলে ঠেলে পিছিয়ে পিছিয়ে কবির জীবনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেব কেন? এইরকম একটা প্রশ্ন একবার তুলে ছিলেন একজন লেখক। আমি সেই ড্রাইভারের প্রথমে উগ্র পরে, ভয়ার্ত চোখ দেখেছি। দুজন মানুষ দুজনের দিকে তাকিয়েছিল। কিন্তু কবিতায় সেটা কীভাবে এসেছে? যেন কবির অপর এক সত্তা। অচেনা সত্তা। 'তুমি কে' নামে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস মনে করুন। অথবা একেবারে ভিন্ন পটভূমিকায় লেখা 'আমিই সে' উপন্যাস। ওই সামান্য ঘটনাটি কবির মনে একটা অলোড়ন তুলল। সেই আলোড়ন এক চিরপ্রশ্নের দিকে চলে গেল। 'আমায় সে চিনেছিল? বলো, বলো, কার চোখে চোখ'। এই কার চোখে চোখ প্রশ্নটি কি ওই ড্রাইভারকে দিয়ে বিচার করতে গেলে মস্ত ভুল হবে না? সে একটি উপলক্ষ্য মাত্র! কবিতাটি এই ঘটনাটিকে ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে গিয়েছে। অন্য একটি কবিতায় সুনীল লিখেছিলেন যে আমায় চেনে, আমি তাকেই চিনেছি।

যে আমায়

যে আমায় চেনে আমি তাকেই চিনেছি
যে আমায় ভুলে যায়, আমি তার ভুল
গোপন সিন্দুকে খুব যত্নে তুলে রাখি
পুকুরের মরা ঝাঁঝি হাতে নিয়ে বলি,
মনে আছে, জলের সংসার মনে আছে?
যে আমায় চেনে আমি তাকেই চিনেছি!

যে আমায় বলেছিল, একলা থেক না
আমি তাকে একাকীর অরণ্যে খুঁজেছি
যে আমায় বলেছিল, অত্যাগসহন
আমি তার ত্যাগ নিয়ে বানিয়েছি শ্লোক
যে আমায় বলেছিল, পশুকে মেরো না
আমার পশুত্ব তাকে দিয়েছে পাহারা!
দিন গেছে, দিন যায় যমজ চিন্তায়
যে আমায় চেনে আমি তাকেই চিনেছি!

এই কবিতা অনেক শান্ত। অনেক একাকী। আর আগের কবিতাটি তীব্র চঞ্চল, বিচলিত,

ও শান্তি পাচ্ছে না! আগের কবিতাটির উৎসভূমিতে যে রাগ বা ক্রোধ আছে— সেই ক্রোধ কবিতাটি তার ভ্রূমধ্যে ধরে রেখেছে।

যদি ব্যক্তিগত গল্প দিয়ে কবিতাকে বোঝা আমার উদ্দেশ্য নয়, তবে আমি এই গল্পটি বললাম কেন! কারণ, একজন কবি—কেবল কবিতা লিখতে হবে, কবিতার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে, এই শর্ত যিনি স্বীকার করেছেন নিজের জীবনে—তিনি বেঁচে থাকার নানা তুচ্ছ মুহূর্তের মানবিক দুর্বলতার সময়েও কীভাবে তার মুখোমুখি হন, তাঁর আত্মসচেতনতা কীভাবে তাঁকে নিজের লক্ষ্যের দিকে ফিরিয়ে দিতে পারে ও সার্থক একটি কবিতা লিখিয়ে নিতে পারে—আমি সেইটুকুই বলতে চাইলাম। এইটেই শেখবার। পরে যারা কবিতা লিখতে আসবে, তাদের জানা থাকবে আত্মশাসনের এই কাহিনি। উনি তো পরে আমাকে বলেছিলেন, ওকে ধরে লালবাজারে ঢুকিয়ে দিতে পারতাম, তুষারতো এখনও অফিসে আছে। ভাবলাম রাগ করে কী হবে! তুষার তালুকদার তখন পুলিশ কমিশনার।

সেই রাগ কবিতায় এসে অন্য দিকে চলে গেল। অন্য কোনো দূরের দৃষ্টি নিয়ে সে চলে গেল অন্য কাউকে খুঁজতে। কোন দিকে? ওই যে, পরের কবিতাটিতে যে আছে: দিন গেছে, দিন যায় যমজ চিন্তায়—সেই যমজ, সেই নিজের অন্য সত্তাকে কখনও কবিতায়, কখনও ইতিহাসের মধ্যে ভ্রমণ করা উপন্যাসে, কখনো-কখনো 'সাঁকো' বা 'চূড়ামণি উপাখ্যান'-এর মতো গল্পে সন্ধান করেছেন এই শিল্পী। সারাজীবনের সন্ধান। চূড়ামণি উপাখ্যান-এর চরিত্র যে থেকে থেকে বলে ওঠে 'সে ওই' 'সে ওই' তা তো যমজ সত্তার সন্ধান। ঈশ্বর? তা হোক না-হোক, আমরা জানি এই লেখকের কাছে ঈশ্বর তো মানুষেরই যমজ সত্তা। হ্যাঁ, 'আমিই সে'! সেই সন্ধানের জন্য কী ধরনের আত্মপ্রস্তুতির প্রয়োজন সারাক্ষণ, তা আমরা জানতাম না। আমি একদিন জানবার সুযোগ পেয়েছি। তাই পাঠকদের জানিয়ে রাখলাম।

তবে, এই মুহূর্তে তিনি প্রবল প্রতাপান্বিত সাহিত্য-প্রশাসক, শাসক দলের মতামতের পরোক্ষ প্রবক্তা (যা তাঁর সম্পাদিত কাব্যপত্রের 'সম্পাদকীয়' থেকে বোঝা যায়) ও তাদের অঘোষিত সাহিত্যনেতা তথা সমাজপতি—সাহিত্যজগতের একটি বৃক্ষপল্লবও তাঁর নির্দেশ বা সম্মতি ছাড়া বাতাসে কাঁপে না। এই আধিপত্য ও প্রতিপত্তির আড়ালে ঢাকা পড়ে গিয়েছে মানুষটির ভিতরকার সত্যকার কবি-পরিচয়। কেউ আর খোঁজ নিতে চায় না কবিতায় তাঁর বোধ কত তীক্ষ্ণ ছিল, কত সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ছিল তাঁর দৃষ্টিতে—তিনি একদিন বলেছিলেন, 'এ জীবন, সজ্ঞানে, আত্মত্যাগে নয়, সর্বগ্রাসে, সর্বভুক কবিতার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে'। সেই প্রস্তুতি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে অনেকদিনই পথ চলেছে। তারই একটি প্রমাণ ফিরে এসেছিল ট্যাক্সি ড্রাইভারের ঘটনায়। আমরা তো এইগুলো পড়তে পড়তে শিখেছি। মঞ্চে, সভাপতির আসনে বসে, তাঁর ক্লান্ত-ঘুমে ঢুলে পড়া মূর্তিটি দেখে, আমি কি সেই মূল শিল্পীকে, লেখায় লেখায় ছড়িয়ে থাকা তাঁর দেখাটাকে, ভুলে যেতে পারি!
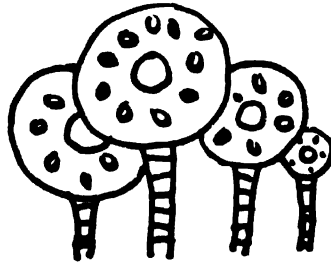
৩২

তসলিমা প্রথম কলকাতায় এসেছে তখন। আজ থেকে বছর কুড়ি আগে তো বটেই। কোথায় ঘুরে ঘুরে কী কী দেখবে সে ব্যাপারে খুব উৎসাহ। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে গিয়েছে। সুভাষদা তসলিমাকে বললেন, চলো, তোমাকে বজবজে নিয়ে যাই। তসলিমা লিখেছে, সে অবাক। বলে, বজবজ? ওখানে কী দেখার আছে? সুভাষদা একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন শুধু একটা শব্দ : মানুষ।

এই মেয়েটি তরুণী তখন, কিন্তু, তখনই সে লিখেছে, 'শৃঙ্খল ভেঙেছি আমি, পান থেকে খসিয়েছি সংস্কারের চুন, তাকিয়েছে নিজের সহযাত্রী মেয়েদের দিকে : 'শরীরের মাংস নিয়ে রাতভর হাট বসে। দরদাম চলে—আমাদের বোন ওরা...।' নিজে মেয়ে, তাই সব মেয়েকে নিজের বোন ভেবেছে, তাদের জায়গায় নিজেকে বসিয়ে কল্পনা করেছে। এই তরুণী, তসলিমা নাসরিন, ধর্ম নারীকে শৃঙ্খলিত করে রাখছে মনে করে একদিন নিজের জীবনও বিপন্ন করতে দ্বিধা করবে না। সে নিশ্চয়ই 'মানুষ' শব্দটির অর্থ বুঝেছিল তখন। সুভাষদা, বজবজে ১৯৫২ সালে, চটকল আর তেলকলের শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতে চলে গিয়েছিলেন, পার্টির লোকদের কাছ থেকে যখন এই বিদ্রুপ উড়ে আসছিল, যে, নিরিবিলিতে কবিতা লিখবে বলে, কলকাতা ছেড়ে বজবজ চলে গিয়েছে সুভাষ মুখুজ্জে।

সেদিন দুটি যুবকের সঙ্গে কথা বলছি, দুজনেই নবীন সাংবাদিক। সুভাষদার একটা কবিতার একটুখানি বললাম কথায় কথায় : 'রাস্তার, ছোট ছোট গর্তে / জমিয়ে রাখা হয়েছে / আমাদের চোখের জল।'

'চোখের জল' কথাটা উচ্চারণ করতেই ওদের মধ্যে একটা শিহরন বয়ে গেল। আওয়াজ করে উঠল ওরা। ঠিক যেন শ্যামকল্যাণের যে রেকর্ডটা আছে রশিদ খানের। তাতে, প্রথমবার আরোহণের কড়ি মা যেই আসে, যেমন একটা ঢেউ লাগে ভেতরে—তেমনি।

লাইনটির মধ্যে কোনো ধরাবাঁধা ছন্দ নেই, মিল নেই, এমনি, যেন কতই

অগোছালোভাবে বলা কয়েকটা কথা মাত্র। একেবারে গানের মতো বেদনা আর মমত্বে মনকে অধিকার করল। রাস্তার ধারে ধারে যারা থাকে, পার্কের পাশে, রোয়াকে বা ফুটপাতের সংসারের যারা–পিচ ভেঙে ভেঙে ছোটো ছোটো গর্ত–যাকে এখন বলে 'গাড্ডা'–তার মধ্যে জমে-থাকা জলের সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে উঠল এইসব মানুষের জীবনকথাও।

'আমাদের' লিখলেন কেন সুভাষদা? আসলে ভাবনাটাই এঁদের এইরকম। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় মনে পড়ে :

'সে আমি সেই আমরা, আমরা কে মন্দ কে ভাল
কেউ মাঠে কেউ ঘরে কেউ বা কলে কারখানায়।'

–মনে পড়ে যায়, সুভাষদার কবিতার বিখ্যাত সেই ছবি :

'মাথায় চটের ফেঁসো জড়ানো সমুদ্র।' অত মানুষ একসঙ্গে হাঁটছে, আর সেই স্পন্দনে দুলছে পুরো জনতাস্রোত। মঙ্গলাচরণের কবিতাটি প্রথম শুনি কাজী সব্যসাচীর গলায়, ইপি রেকর্ডে। কাজী সব্যসাচী, প্রথম 'আমরা'-র পরের কমা-য় তেমন থামলেন না–কবিরা কী বলবেন জানি না, কিন্তু আমার কাছে এটা কীভাবে আসত সেইটা বলি। 'সে আমি সেই আমরা আমরা'—'আমরা আমরা' কথাটা দু-বার এমন দৃপ্তভাবে বলতেন কাজী সব্যসাচী—যেখানে আমার মনে হত একজনের পাশে যেন হইহই করে অনেক মানুষ চলে আসছে। 'আমরা আমরা'। কাজী সব্যসাচীর সেই গলা যেন এখনও শুনতে পাই। মঙ্গলাচরণের ওই কবিতার দু-এক লাইন পরেই ছিল, 'এক ছেলে হারালে, ছেলে এলাম হাজারজনা।' ছিল, 'এক নামে যেই ডাকলে, অনেক হলাম যে একজনা!'

কী সেই নাম?

ক্ষুদিরামের মা আমার কানাইলালের মা
জননী যন্ত্রণা আমার জননী যন্ত্রণা!

সুভাষদার কবিতায়, রাস্তার ছোটো ছোটো গর্তে জমিয়ে রাখা 'আমাদের চোখের জল' বলতেই যেমন আমি দেখতে পেলাম, ফুটপাতের সংসার আর একটা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকা ভবঘুরেদের, যেমন দেখতে পেলাম 'হায় পথবাসী' আর 'হায় গৃহহারা'দের, কেন-না, ঝরঝর ওই যে বারিধারা, ঝরে যাওয়ার পরেই তো রাস্তার ছোটো ছোটো গর্তে জমিয়ে রাখা হল, ওই 'পথবাসী' আর 'গৃহহারা'দের 'চোখের জল।' আবার সুমনের গানেও এই পথবাসীদের কথা আছে। আছে তাদের সংসার, পাড়ার ছোট্ট পার্ক :

বেঞ্চিগুলোর কাঠ
রোদে পোড়ে জলে ভেজে
সমকাল এসে বসেছে সেখানে আহত প্রেমিক সেজে

লোহার গেটের পাশে
উনোন ধরায় কারা
রেলিং ঘেঁষেই সংসার করে করে ক'জন বাস্তুহারা

একটু দূরেই আছে
ক্যাঁচক্যাঁচে টিপকল
পড়ন্ত বেলা বালতিকে বলে : চল রে, জলকে চল!

একেবারে সব-হারানো মানুষের সংসার—তার পাশে, রাস্তার ক্যাঁচক্যাঁচে কলে যেসব মেয়ে জল নিতে আসে—তাদের কথা। তারা কি কারও বাড়ি কাজ করে? তারা কি বস্তিতে থাকে? এদের রাস্তার কলে জল নিতে কতবার দেখেছি আমিও। কিন্তু : 'চল রে, জলকে চল।' এই প্রয়োগ অবিশ্বাস্য। ওই ফুটপাত আর ভাঙা টিউকল 'যমুনার তীর' হয়ে গেল। আর এইটায় আমার মনে পড়ল, আবদুল করিমের সেই বিখ্যাত 'যম্‌না কে তীর'! আবদুল করিমও এসে পৌঁছোলেন আমার মনে ওই পথসংসারের দারিদ্র্যের মধ্যে। দারিদ্র্য। কিন্তু শুধুই দারিদ্র্য নয়। ওই কলে যে-মেয়েরা জল নিতে আসে, তারা কি নিজেদের মধ্যে হাসিলাস্যের বিনিময় করে না? তাদের বয়সের স্বাভাবিক খুশি-উজ্জ্বলতা ওই রাস্তায় বসানো ভাঙা টিউকলের পাশেও কি দেখিনি? ওই দল বেঁধে হাসিতে গড়িয়ে পড়া? দিলীপকুমার রায়ের গানে আছে 'সখা সখি মিলে কুতূহলে ঘাটে যাওয়া।' সেখানে আছে যমুনার জলে স্নান করার কথাও। এই 'ঘাটে যাওয়া'-য় সুর খাদে নেমে যায় দিলীপকুমার রায়ের গভীর মন্দ্র গলায়। আর আবদুল করিম যখন 'যম্‌না কি তীর' বলেন—তখন চড়ার 'সা'-এ গিয়ে 'তীর' যেন তীক্ষ্ণমুখ বাণের মতো বিঁধে যায়। 'তীর' সেখানে 'তির' হয়ে গেল। সুমনের এই লেখায়, পড়ন্ত বেলা বালতিকে যখন বলল, 'চল রে জলকে চল', তখন এই 'জলকে চল'-এর প্রয়োগ, কি 'যম্‌না কি তীব'-এর মতোই বিঁধল না? অদ্ভুত ব্যাপার, বিকেলের সুর-এর বদলে আমার সকালের সুর মনে এল। কিন্তু ভৈরবী তো 'সদা সুহাগন' রাগ। আবদুল করিমের গানে 'তীর'-এর সা যে তির-এর মতোই বুকে বেঁধে, সে তার বেদনার জন্য। আর এই যে মেয়েরা বিকেলে টিউকলে জল নিতে এসে এ-ওর গায়ে হেসে গড়ায়, এরা দরিদ্র-জীবনের বেদনা থেকে চলে আসে কিছুক্ষণের খুশিতে। দারিদ্র্যকে হারিয়ে দিয়ে খুশিতে মেতে যায় ছোটোরাও। সুমনের ওই পাড়ার পার্কের গানেই যেমন :

বিকেল বেলার রোদে
বাচ্চার ভিড় বাড়ে
খেলতে খেলতে পড়ে যাওয়া ছেলে প্যান্টের ধুলো ঝাড়ে

বাস্তুহারারও খুকি
মেটায় খেলার সাধ
ঘাস উঠে যাওয়া ধূসর পার্কে শিশুর সাম্যবাদ

এই যে বাস্তুহারার খুকি, সে কাদের সঙ্গে খেলার সাধ মেটাচ্ছে? পাড়ার অন্য সব বাচ্চার সঙ্গে। তারা নিশ্চয়ই পার্কের আশেপাশের বাড়ি থেকেই খেলতে এসেছে এখানে। অর্থাৎ তাদের মাথার ওপর ছাদ আছে। তারা, যাকে বলে, 'ভদ্রলোক'-এর ছেলে। তারা 'পথবাসী', 'গৃহহারা'দের সংসার থেকে আসেনি। কিন্তু শিশুরা কি ওসব মনে রাখে? খেলার নেশায় সবাই মিলেমিশে গিয়েছে। বাস্তুহারারও খুকি, থেকে 'শিশুর সাম্যবাদ' পর্যন্ত যখন পৌঁছোলেন সুমন তাঁর গানে, নিজের ঘরে বসে সিডি শুনতে শুনতে, আমার সেই বাস্তুহারার খুকি-র মাথাটা বুকে জড়িয়ে নিতে ইচ্ছে হয়। চোখে জল আসে। নতুন চোখে পিছন দিকে তাকিয়ে, আমি আমার মেয়ের লাফঝাঁপ করা ছোটোবেলাকে দেখতে পাই। হ্যাঁ, চোখে জল আসেই।

এই যে চোখের জল এটাই সেই 'আমাদের' চোখের জল। যা রাস্তার ছোটো ছোটো গর্তে জমিয়ে রাখা হয়েছে। এইভাবে বেদনা থেকে খুশিতে, খুশি থেকে বেদনায় যাতায়াত করে কবিতার মন, গানের হৃদয়। এর মধ্যে কে আমি আর কে আমরা।

'সে আমি সেই আমরা, আমরা কে মন্দ কে ভাল
কেউ মাঠে কেউ ঘরে কেউ বা কলে কারখানায়।'

কিন্তু মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় যাদের মাঠে-ঘরে-কলে-কারখানায় দেখেছিলেন, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাদের আবিষ্কার করলেন অন্যত্র। ১৯৬৭ সালের পশ্চিমবঙ্গ যখন নকশাল আন্দোলনের জন্য ফুঁসে উঠতে শুরু করেছে, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাদের দেখতে পেলেন জেলখানায়।

জেলখানার কবিতা

একজন কিশোর ছিল একেবারে একা
আরও একজন ক্রমে বন্ধু হল তার
দুয়ে মিলে একদিন গেল কারাগারে
গিয়ে দ্যাখে তারাই তো কয়েক হাজার

মাঠ-খেত-কলকারখানা থেকে দলে দলে এসে সেই রূপান্তরিত 'আমরা' তখন 'ছাত্রদল'—ঝাঁকে ঝাঁকে জেল যারা ভরে দিচ্ছে। কত ছেলে হারিয়েও গেল, কিন্তু মঙ্গলাচরণ যে লিখেছিলেন 'এক ছেলে হারালে, ছেলে এলাম হাজারজনা।' সত্তর দশকের শেষে, 'জলপাই কাঠের এস্রাজ'-এর নবীন কবি মৃদুল দাশগুপ্ত তাঁর 'এল পার্টিডো কমিউনিস্তা' কবিতায় জানালেন : 'একটি মশাল ঘুরতে ঘুরতে জ্বালিয়ে দিচ্ছে সহস্রকে / চৈত্র আসে রক্তদ্রোণের, পলাশ শিমুল আর অশোকের।' সেই বইতেই রইল কোনো শহিদের মায়ের প্রতি নিবেদিত এই কবিতা :

আছি বাতাসের মতো, ও আমার মিষ্টি মামণি
আছি তোমার দু'চোখে আজও, কঠিন, শীতল
মানো না যে মরে গেছি, বোকা মেয়ে, এখনও মানোনি
শুধু বসে থাকো, ভাবো : এল বুঝি পলাশের দল...

'ক্ষুদিরামের মা আমার কানাইলালের মা' ফিরে আসছেন ফের সেই সত্তর দশকের কবিতায়। মৃদুল যে লিখেছেন 'আছি তোমার দু'চোখে আজও কঠিন, শীতল'—সেই কঠিন, শীতল যে কেমন, তা বলল শঙ্খ ঘোষের কবিতা, '৭৪ সালে--যে কবিতার নাম, 'নিহত ছেলের মা' :

আকাশ ভরে যায় ভস্মে
দেবতাদের অভিমান এইরকম
আর আমাদের বুক থেকে চরাচরব্যাপী কালো হাওয়ার
উত্থান
এছাড়া
আর কোনও শান্তি নেই কোনও অশান্তিও না

ছেলের জন্য মায়ের শোক, এইখানে মেঘবর্ণে সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে ছড়িয়ে গেল। সাড়ে চার লাইনের এই কবিতাটির ভেতর একটি লাইন সবচেয়ে লম্বা। কারণ ওই লাইনটি বলছে নিহতের আত্মীয়-মানুষ শুধু তার মা নন, সমস্ত দেশ, তাই, 'আমাদের' আর কালো হাওয়া উঠে দাঁড়াচ্ছে সমস্ত চরাচরে। কালো ধোঁয়া যেন ছড়িয়ে পড়ছে দূরদূরান্তে। 'চরাচর' শব্দটির মধ্যে যে বিস্তৃতি আছে, সেই বিস্তৃতির-র টানে ছোটো ওই কবিতার একটি লাইন অত দীর্ঘতা পেয়েছে যেন। এ-ও সেই জননীযন্ত্রণার-ই কথা। কিন্তু সেই জননী-যন্ত্রণাকে কোনো খণ্ডকবিতার সীমা পার হয়ে, আমরা মূর্তি পেতে দেখলাম 'হাজার চুরাশির মা'-এর মধ্যে। মহাশ্বেতা দেবীর এই যুগোত্তীর্ণ উপন্যাস ১৯৭৩ সালেই ছাপা হয়ে বেরিয়েছিল।

স্মৃতি যখন লেখায় লেখায় ভর করে পিছনের দিকে ছোটে, কেমন যেন মনে হয়,

সকলে মিলে, একটাই লেখা লিখে চলেছেন যুগ যুগ ধরে। একজন লেখকের সঙ্গে অন্য লেখকের দেখা না হতেও পারে। একজনের মৃত্যুর পরও অন্যজন জন্মাতে পারেন—তবু একটাই দীর্ঘ লেখা রচিত হয়ে চলেছে যেন সকলের হাতে হাতে এমন মনে হয়। সুভাষদা যে তসলিমার 'ওখানে কী দেখব' এই প্রশ্নের উত্তরে শুধু 'মানুষ' শব্দটি বলে চুপ করে গেলেন—এই বিবরণ তসলিমার লেখায় পড়ে, আমার মনে ভেসে উঠল বিষ্ণু দে-র একটি কবিতার সমাপ্তি-শব্দ। সুদীর্ঘ সেই কবিতার নাম 'অন্বিষ্ট'। বইতে বাইশ পৃষ্ঠা ধরে ছাপা সেই কবিতায় নানা ধরনের কারুকাজ আছে। সব পার হয়ে, কবিতাটি কীভাবে সম্পূর্ণ হয়?

> ...
> অন্তিমের তৃষিত পাথরে
> খোদাই আমারও সেই ভবিষ্যৎ, মৃত্যুকে যে হৃদয়েব মৃত্যুকে যে রোখে!
> তোমাকে তাই তো চাই, খুঁজি চলো পাহাড়,
> মানুষ।

তাহলে, অত বড়ো কবিতাটি উঠে গিয়েছে একটি শব্দের ভিত্তিপাথরে পা রেখে? কবিতা জুড়ে অত কলাকৌশল, বিভিন্ন পর্যায়, মুভমেন্ট-ব্যবহার দীর্ঘকবিতা রচনার ক্ষেত্রে পরবর্তী অনেক শিক্ষানবিশ-এর আদর্শস্থল ওই লেখা—দাঁড়িয়ে আছে তাহলে একটিই ইটের ওপর। মানুষ! এর ওপরই পুরো অট্টালিকা তৈরি হল। 'খুঁজি চলো পাহাড়, মানুষ'—স্বাভাবিক এই অক্ষরবৃত্তের পূর্ণতা থেকে 'মানুষ' শব্দটা সরানো হল আলাদা করে, তার ওপর গুরুত্ব দিতে, তার ভিত্তি-অবস্থান নিশ্চিত করতে। কবিতাটির বিষয়ের দিকে তাকালেও সে কথাই প্রমাণ হয়।

সত্তর দশকের এক কবি অলোকনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর কবিতার বইয়ের নাম রেখেছিলেন, 'এসো, মিলেমিশে থাকি'। কিন্তু মানুষ তো মিলেমিশে থাকে না, থাকেনি কোনোদিনই। কবিতা মানুষকে বারবার সাবধান করে দিয়েছে, মানুষ শোনেনি। কারণ, কবিতা অনেক সময় ভবিষ্যৎ দেখতে পায়। কবিতা বলছে আজকের কথা, কিন্তু, কখনো-কখনো তা পরেও সত্যি হয়ে ওঠে। '৫১ সালে, পুলিশের গুলিতে নিহত কিশোরীকে নিয়ে, 'যমুনাবতী' নামে যে-কবিতা লিখেছিলেন শঙ্খ ঘোষ, তাতে এই লাইন ছিল, 'চলল, মেয়ে রণে চলল।' তার ৫৬ বছর পর ২০০৭ সালে, নন্দীগ্রামে কৃষক-মেয়েরা যখন বেরিয়ে এলেন আন্দোলনের সামনের সারিতে, নিহত ও ধর্ষিতা হলেন, তখনও এই 'চলল, মেয়ে রণে চলল' সত্য হয়ে উঠল। 'যমুনাবতী'-র অন্য দুটি লাইন :

> হায় তোকে ভাত দিই কী করে যে ভাত দিই হায়
> হায় তোকে ভাত দেব কী দিয়ে যে ভাত দেব হায়

এই লাইন দু'টিও জননী-যন্ত্রণার কথা বলে। সঙ্গে সঙ্গে মা কী দিয়ে, এবং কী করে অন্ন দেবেন সন্তানের মুখে—এই দুশ্চিন্তা ও অসহায়তা আজ তাদের পক্ষেও প্রযোজ্য হয়ে দাঁড়ায় যাদের জমি নিয়ে নেওয়া হবে বলা হয়েছে। কারণ ওই জমিই তাদের অন্ন দেয়। তাই তারা সবাই প্রতিরোধে নেমে আসে। মেয়েরাও। মায়েরাও। চলল, মেয়ে রণে চলল।

আর তারপর কবিতাটির শেষে আসে, 'নিভন্ত এই চুল্লিতে বোন আগুন ফলেছে।'

আগুন যখন ফলে উঠল তখন সত্যি হল আর একটি কবিতা। আজকের 'আমরা-ওরা' বিভাজনের যে অবস্থা, তার বর্ণনা এ কবিতা দিয়ে গিয়েছে সেই '৭১ সালেই।

অদ্ভুত সময়

এ এক ভারি অদ্ভুত সময়।

পুরোনো ভিতগুলো যখন বালির মত ভাঙছে
আমরা ভাইবন্ধুরা
ঠিক তখনই
ভেঙে টুকরো টুকরো হচ্ছি।

কে তার আস্তিনের তলায় কার জন্যে
কোন্ হিংস্রতা লুকিয়ে রেখেছে
আমরা জানি না।
কাঁধে হাত রাখতেও এখন আমাদের ভয়।

অন্ধকারে চেরা জিভগুলো যখন হিস্ হিস্ শব্দ করে
তখন মনে হয়
অদৃশ্য করাত দিয়ে কেউ আমাদের খুব মিহি করে কাটছে।

যখন
একসঙ্গে হাত মুঠো ক'রে দাঁড়াতে পারলেই
আমরা সব কিছু পাই-—,
তখন
বিভেদের এক টুকরো মাংস মুখে ধরিয়ে দিয়ে
চোরের দল
আমাদের সর্বস্ব নিয়ে চলে যাচ্ছে।।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

নন্দীগ্রামের চুল্লিতে আগুন জ্বলে উঠবার পরপরই দু'দিকে ভাগ হয়ে গেল আত্মীয়-মানুষ। তার ভবিষ্যৎবাণী যেন এ কবিতায়। এটা ঠিক যে, বিভেদের এক টুকরো মাংস মুখে ধরিয়ে দিয়ে চোরের দল আমাদের সর্বস্ব নিয়ে যাচ্ছে। এখানে আবার 'আমাদের' কথাটা লক্ষণীয়। চোরের দল 'আমার' সর্বস্ব নিয়ে যাচ্ছে তা কিন্তু নয়। 'আমাদের'। তার মধ্যে কিন্তু 'আমারও' সর্বস্ব নিয়ে যাচ্ছে এই অর্থটাও রইল।

কিন্তু কে চোর? চোরের দল কারা? শক্তি চট্টোপাধ্যায় তার একেবারে অন্য প্রসঙ্গের এক কবিতায়, লিখেছিলেন—'তুমি চোর, আমি চোর।'

হ্যাঁ তুমি চোর। আমি চোর। অপরাধ থেকেও আমি নিজেকে আলাদা করে শুদ্ধ বলতে পারি না। সকলের পাপ বা অন্যায়ে আমার ভাগ আছে। তাহলে আমি কী করতে পারি? এই বিভেদের এক টুকরো মাংস মুখে তুলতে না পারি। বলতে পারি, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা যেমন বলেছে :

হাত বাড়িয়ে রেখেছি

তোমার ঘৃণার দিকে
আমি ফিরিয়ে রেখেছি
আমার ভালবাসার মুখ
যেখানে গতি বলতে শুধুই ঘুরপাক
এগোনো মানেই দেয়ালে মাথা ঠেকে যাওয়া
সংগ্রামের আরেক নাম যেখানে নিজেকে ভাঙা

তুমি সেই অন্ধগলিতে দাঁড়িয়ে
বিপন্ন চোখের আগুনে চাইছ
আমাকে ভস্ম করে দিতে

আর আমি
তোমার অভিশাপগুলো লুফে নিয়ে
ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছি আমার শুভেচ্ছা

ভোরের আজানের মত
আমি গলা তুলে জানান দিচ্ছি
খোলা রাস্তার কোন্ মুখে
আমি তোমারই জন্যে দাঁড়িয়ে

হাত বাড়িয়ে রেখেছি—
অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েও
তুমি আমার হাত যাতে ধরতে পারো।।

আশ্চর্য কথা এই, যে, 'ছেলে গেছে বনে' বইতে 'অদ্ভুত সময়' নামক কবিতার ঠিক পাশের পৃষ্ঠায় আছে, এই 'হাত বাড়িয়ে রেখেছি'। অর্থাৎ বেদনা ও খুশির মতো, বিচ্ছেদ-ভাঙন, আর পুনর্গঠন সবসময় নিজেদের মধ্যে মতবিনিময়, এমনকি, মনবিনিময় করতে করতে চলেছে এই সংসারে। তাইতো, তোমার ঘৃণাব দিকে আমি রাখতে পারি আমার ভালোবাসার মুখ। যাতে, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েও তুমি আমার হাত ধরতে পারো। কারণ, ওই যে, দেখছ না, রাস্তার ছোটো ছোটো গর্তে, জমানো রয়েছে, 'আমাদের' চোখের জল! ওদের চোখের জল নয়। ওদের চোখের জল বলে কিছু নেই। সবই 'আমাদের' চোখের জল। দ্যাখোনি কি :

গাছতলাতেই ক্যানেস্তারা
প্যাকিং বাক্স কয়েকখানা
পথের গেরস্থালির ওপর
গাছ হয়েছে শামিয়ানা

সুমনের এই গানে এক স্তবক পরেই কি শোনোনি :

গাছতলাতে মানুষ থাকে
গাছের ডালে কাকের বাসা
আমায় নিয়ে সবাই বাঁচুক
এটাই হল গাছের আশা

আব শক্তি লিখেছিলেন, 'বনের ভিতরে তিনি গাছ হয়ে দাঁড়িয়ে প্রত্যহ'। এই তিনি কে? ঈশ্বর! হতেও পারেন।

সুমনের গানে মানুষ আর কাকচড়ুই, পাখপাখালি আর গাছপালা একত্রে বাঁচে, এই বড়ো পৃথিবীটা তো কেবল মানুষকে নিয়েই নয়। সেটা বুঝে যেমন গাছ বলল আমায় নিয়ে সবাই বাঁচুক—তেমনই আমি আর তিনি, তুমি আর আমি, কাক আর চড়ুই, গৃহহারা আর গৃহস্থ, পথবাসী আর পথচারী, বাস্তুহারার খুকি আর ইস্কুলে-যাওয়া জুতোমোজা-পরা খোকা, আর গড়িয়াহাটার মোড়, আর মিনি মিনি বাস বাস, আর বাসের টার্মিনাসে মনমরা সারিসারি মুখ চোখ নাক হাত, আর রোগারোগা চেহারার কন্ডাক্টর সব 'আমাদের' জন্যে, সব 'আমাদের' জন্যে।

এই 'আমাদের' নিয়েই তো চলেছে সংসার।
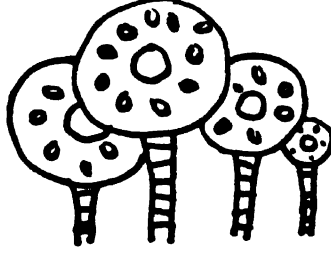
৩৩

সেদিন একটি মেয়ে এসএমএস করেছে : 'গোঁসাইবাগান'-এ আপনার না-লেখা কবিতার সঙ্গে আপনার দেখা হয়ে যেতে পারে না?' আমি অবাক! এই চিন্তাটাই একটা অন্যরকম অনুভূতি এনে দেয়। 'গোঁসাইবাগান'-কে যদি ধরে নিই সত্যিই একটা বড়ো বাগান, কত গাছপালা, এক-একটা গাছ পেরিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ অন্য একটি গাছের আড়াল থেকে সামনে এসে দাঁড়াল না-লেখা কবিতা। তবে? এমন কবিতাও হয়, যা মনকে কোনো অজানা সুদূরে নিয়ে যেতে পারে। মুখে যা বুঝিয়ে বলা যায় না, তেমন কোনো অনির্বচনীয়ের কাছে নিয়ে যায়। মেয়েটির বলা এ-কথাটি তেমনই। মেয়েটি কবি নয়। চাকরি করে। বয়স ২৮। আমার মনোভাব গোপন করে আমি তাকে লিখলাম. 'যে-কবিতা লেখা হয়নি তার সঙ্গে আবার দেখা হবে কী করে!' এর উত্তরে সে যা জানাল, পুরোটাই তুলে দিচ্ছি : আমি বলতে চেয়েছিলাম, যে-কবিতা মনে-মনে একটু লিখে abort করে দিয়েছেন, যে-কবিতা তার পূর্ণ শরীর পাওয়ার আগেই থেমে গিয়েছে, যার জন্ম হওয়ার আগে চার মাস বয়সেই মেরে ফেলা হয়েছে—সেই ইচ্ছে-শব্দদের আপনি দেখতে পেলেন গোঁসাইবাগানে...খেলা করছে...এমন যদি হয়?

বাংলা কবিতার ভাঁড়ার কি ফুরিয়ে গিয়েছে, যে আমি, কবি নয়, এমন কারও এসএমএস উদ্ধৃত করে বলতে শুরু করলাম গোঁসাইবাগান-এ! আমি যতদিন বাঁচব, বিশ্বাস করি, বাংলা কবিতার ভাণ্ডার ফুরোবে না। আজও তা অফুরন্ত। আসলে এখানে বিশেষভাবে বলতে চাইছি মনটার কথা। এই মেয়েটির মন যা ভাবছে, যা প্রকাশ করছে, এবং সেই ভাবনা আমার মনকে যেখানে নিয়ে যাচ্ছে, অনেক দক্ষ নিয়মবদ্ধ সুলিখিত কবিতায় সেটা হয় না। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? হারানো কবিতার দেশে। সকল কবিতা-লেখকেরই এমন লেখার, অভিজ্ঞতা আছে, যে-সব লেখা জন্মাতে চেয়েছে, কিন্তু লেখকের মনোমতো হয়নি বলে তাদের ত্যাগ করা হয়েছে মাঝপথে। আমিই কি তা করিনি কতবার!

এই মেয়েটির ছোট্ট ফোন-চিরকুটের মধ্যে অ্যাবর্ট শব্দটা আছে। চার মাস বয়সেই মেরে ফেলা হয়েছে, এই উপমা আছে। অর্থাৎ যে মা জেনেশুনেই তার গর্ভে আসা বাচ্চাকে নষ্ট করল, বা করতে বাধ্য হল, তারই কথা। সাধারণ একটি মেয়ে, কবি নয়, কিন্তু বলা কথাটি চলে যায় করিতারই দেশে। যা সে বলতে চেয়েছে, তার অন্তঃসার কবিতা। তার মর্মবস্তু কবিতা। যদিও সে কবিতা লিখতে চায়নি। কিন্তু কীভাবে তার সামান্য এসএমএস থেকে কবিতার স্পর্শ এল? কারণ সে কবিতা-লেখক নয়। তাই তার মন স্বাধীন।

এ কথাটা আমার বারবারই মনে হয়, লিখেওছি যে, মনের কথা বলবে বলেই একজন মানুষ লিখতে আসে। যে-কথাটা অন্য কোনোভাবে সে বলে উঠতে পারছে না, এমনকি, পুরো কথাটা সে নিজেও জানে না, কেমন একটা অস্থিরতা তার মধ্যে কাজ করছে, তারপর লিখতে-লিখতে একসময় সে কথাটা খুঁজে পেল। কবিতার লেখার সময় এমন তো হয়ই। এই মেয়েটি, কবিতা না লিখলেও, মনের কথাটা এমন করে বলে দিয়েছে যে, তার অজান্তেই সেই বলাটার মধ্যে কাব্যধর্ম এসে গিয়েছে। কেন না তার মন একরকম কবিতার জলবায়ুতেই বাঁচে।

আর একজন, গোসাঁইবাগান পড়ে, থাকে বর্ধমানের গ্রামে, কী করে পত্রিকা পায়, কে জানে। সে মাঝে-মাঝেই তার গ্রামের নানা বর্ণনা মেসেজ-এ লিখে আমাকে পাঠায়। একটি, দুটি বা তিনটিও পাঠায় পরপর। আমার উত্তর দেওয়া হয় না। এবার সে লিখেছে : গত বুধবার আপনাকে কয়েকটি সূর্যাস্ত পাঠিয়েছি, পেয়েছিলেন তো!

একজন মানুষ, আরেকজন মানুষকে সূর্যাস্ত পাঠাচ্ছে? আমি একটা জায়গায় কয়েকজনের সঙ্গে ছিলাম তখন। শুধু, 'হ্যাঁ পেয়েছি' এটুকু পাঠালাম। কিন্তু, মনে কী কী হল তা বলা গেল না। পরে যখন বাড়ি ফিরছি, ভাবলাম, আমি কি খামে ভরে বা এসএমএস-চিরকুটে কখনও কাউকে সূর্যাস্ত পাঠিয়েছি? কয়েকটি সূর্যাস্ত? তাকে ফোন করলে সে জানায়, আমাদের গ্রামে এসে কয়েকদিন থেকে যাওয়া তো আপনাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তাই আমাদের গ্রামের সূর্যাস্ত পাঠিয়েছি! পরে ঊষাকালও পাঠাব। আমি জিজ্ঞেস করি, 'আপনি খুব ভোরে ওঠেন বুঝি!' সে জানায়, হ্যাঁ, ঊষাকালে উঠি। আপনাকে পাঠাব ঊষাকাল। ভোরের বর্ণনাও এরপর সে পাঠিয়েছে আমাকে। মানে ঊষাকাল। পাঠককে আমি বিশ্বাস করতে অনুরোধ করি, সহজ মৌখিক ভাষায় বলা এইসব কথা আর এসএমএস আমাকে জানায়, কবিতা, শুধু কাব্যের বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে লেখা রচনাতেই সীমায়িত থাকে না। কবিতা থাকে মানুষের মনে। তার হঠাৎ বলে ফেলা কথায়। তার দ্রুত লিখিত চিরকুটের ভাষায় সে-কবিতা প্রকাশ পেয়ে যায়। যে কবিতা লেখে না, সেই মানুষের মনও কাজ করতে পারে কবিরই মতন। কী পাঠাচ্ছে? না, সূর্যাস্ত। কী উপহার দেবে? ঊষাকাল। অজাত-কবিতাকে কোথায় খেলা করতে দেখছে?—কোনো এক জঙ্গল-বাগানের গাছগাছালির মধ্যে! এবং এটা এল দ্রুত লিখিত এসএমএস-এ! স্যুররিয়ালিস্ট ছবি বা ফিল্মের মতো এক রহস্যজগৎ ওই গাছপালার নীচে!

এরা কিন্তু জানে না, এরা অসাধারণ কিছু বলছে। এবং এদের সেটা জানাতেও নেই। কেন না, তারা কুণ্ঠিত ও সংকুচিত হয়ে পড়বে। স্বাধীনভাবে এই যা-যা মনে আসছে সেই বলাটায় আগল পড়বে। আর স্বাধীন থাকবে না।

বারবার 'স্বাধীন' কথাটা এসে পড়ছে। কেন আসছে, সেটা বলার আগে বলি, এই যে দুজনের কথা বললাম, এদের একজন তো বর্ধমান থেকে অনেকটা যেতে হয় এমন গ্রামে বাস করে। অন্যজনেরও বাড়ি কলকাতার বাইরে মফস্‌সলে। যদিও ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে কলকাতায় চাকরি করে মেয়েটি। এরা প্রত্যক্ষ সাহিত্যসমাজ থেকে দূরে। মনোমতো লেখা খুঁজে পড়ে শুধু। সে পড়াটা স্বাধীন পড়া। ওদের এক্সপ্রেশনটাও স্বাধীন। ধরা যাক, '৭০-'৭১-'৭২ সালে, আমি অনেকটা ওইরকম ছিলাম। সেই সময়টায় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যখন লিখলেন :

> মুণ্ডহীন ধড়গুলি আহ্লাদে চিৎকার করে : 'রঙ্গিলা! রঙ্গিলা। কী খেলা খেলিস তুই।'
> যন্ত্রণায় বসুমতী ধনুকের মতো বেঁকে যায়—
> বাজারে মহান নেতা ফেরি করে কার্ল মার্কস, লেনিন, স্ট্যালিন, গান্ধি
> এক এক পয়সায়...

অথবা সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখছেন 'ছেলে গেছে বনে' কবিতায় :

> আমি তবু রত্নাকর, হাতে বাজছে রণবাদ্য দ্রিমিকি দ্রিমিকি
> কাছে এসো রত্নাকর, দূর হটো বাল্মীকি

এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখছেন :

> গাড়ি বারান্দায় নীচে আমরণ অনশনে বসে আছে
> তিনজন শ্রমিক...
> আজ তেরো দিন ওদের দেখছি...

লিখছেন...

> আমি রাজনীতি-ফিতি বুঝি না। আমি সইতে পারছি না ওই
> তিনজন মানুষের নিঃশব্দ বসে থাকা
> তোলপাড় করছে আমার বুক, আমি বলতে চাই
> সাবধান।
> মানুষ আর ব্যর্থ মৃত্যু মেনে নেবে না।
> বাড়িতে ফিরে ভাতের থালার সামনে আমার গা
> গুলিয়ে ওঠে...

অথবা শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখছেন : শিশুকেও মাতৃক্রোড়ে হত্যা করে বাধ্য রাজনীতি।

তখন, সেই '৭১-'৭২-এ আমার ১৭-১৮ বছরের মন তোলপাড় করে উঠেছিল এইসব কবিতার আঘাতে। আমি খবর-কাগজে যা দেখছি, রেডিয়োতে যা শুনছি, যা শুনছি আত্মীয় স্বজন অভিভাবকদের মুখে, যা দেখছি নিজের ছোটো টাউনেও—সে কথাই তো আছে ওইসব কবিতায়—কিছুদিন আগেই ভোররাত থেকে পিঠে ছুরি-গাঁথা অবস্থায় পড়ে থাকা এক সাব-ইন্সপেক্টরের লাশ দেখতে সকাল আটটায় ভিড় করেছিল যারা আমাদের শহরে, তাদের মধ্যে আমিও তো ছিলাম। 'যত হত্যা তত জয়' বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার এই বাক্যবন্ধ তখন বুকে বিঁধছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের যে তাঁর 'ফেরাই' কবিতায় লিখছেন :

বলেছিল কবর দিতে
যারা খুঁড়ছিল
সেই কবরেই পিছন থেকে তাদের ঠেলে দেওয়া হল
... ...
শহীদের স্মৃতি রাখতে শহীদ হওয়া
খুনের বদলে খুন
এই বৃত্তটা কিছুতেই ছাড়ানো যাচ্ছে না

সুভাষের কবিতার এই 'খুন' সম্পর্কে 'বৃত্ত' শব্দটিই যেন অবিস্মরণীয় রূপ পেল 'পলাতক ও অনুসরণকারী' নামক গল্পে। যেখানে এইমাত্র খুন করে আসা এক ঘাতককে অনুসরণ করতে শুরু করল তাকে হত্যার জন্য নিযুক্ত আর এক ঘাতক। এবং এই প্রক্রিয়াটি চলতে থাকল। গল্পটি প্রকাশিত হল 'এক্ষণ' পত্রিকায়, লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তখনও কিন্তু আমি জানি না, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'দেশ' পত্রিকা বা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কাগজে লেখেন না। সুভাষ মুখোপাধ্যায় লেখেন। এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আনন্দবাজারে কর্মরত। শারদীয় দেশ ও আনন্দবাজারে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা পড়েছি 'ফেরাই' ও 'ছেলে গেছে বনে'। 'দেশ' পত্রিকা তো বটেই, 'আমার স্বপ্ন' বইতেও পড়েছি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা। অন্যদিকে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা পাওয়া যায় সরু সরু পুস্তিকায়। 'এক্ষণ' নামক লিট্‌ল ম্যাগাজিনে পড়েছি গল্পটি। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ওই সব পুস্তিকা বা এক্ষণ নামের কাগজ কী করে পেলাম, সেই সময়ে? রানাঘাটে বসে?'

ক্রিকেট খেলা ভালোবাসি তাই একটি ক্লাবে ঢুকেছিলাম স্কুলে পড়ার সময়ই। স্বাস্থ্যের কারণে খেলাটায় ঢুকতে পারিনি। মাঠের বাইরে আসা বল কুড়িয়ে দিতাম। সেই ক্লাবের যিনি ট্রেনার ছিলেন, ক্রিকেট ট্রেনার, তাঁর নাম ভৃগুদা। ছেলেপুলের মুখে-মুখে সেই নাম দাঁড়িয়েছিল ভিখুদা হিসেবে। এঁর বাড়িতে অনেক ইংরেজি-বাংলা ক্রিকেটের বই। পত্রিকা। খেলতে পারি না, তাই বই পড়ে-পড়ে সেই সাধ মেটাতাম। এই ভৃগুদা বা ভিখুদার কাছ

থেকে এমন অনেক জিনিস তখন পেয়েছি, সেই মুহূর্তে বুঝিনি। যা আমার পরবর্তী ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে দেবে।

এই ভৃগুদার চরিত্র ছিল আমার দেখা অন্যদের থেকে পৃথক। কোন ক্লাবে কে ক্লিয়ারেন্স নিচ্ছে, তাই নিয়ে নানা গুজবের ভেসে-ওঠা, ডুবে-যাওয়া নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতেন না। বদলে, ক্লাবের ছেলেদের দিয়ে প্রদর্শনী করাতেন। থিয়েটার করাতেন। প্রদর্শনীর মধ্যে চিত্র প্রদর্শনী হত একটা স্কুলবাড়ির দুটো ঘর নিয়ে। আর দুটো ঘরে হত লিট্‌ল ম্যাগাজিনের প্রদর্শনী।

হ্যাঁ লিট্‌ল ম্যাগাজিন। এই নতুন শব্দটা প্রথম ভৃগুদার মুখে শুনি। প্রথম দেখতেও পাই ভৃগুদারই হাতে। একটি কাগজের কথা মনে আছে, 'পত্রাণু'। আক্ষরিক অর্থেই লিট্‌ল। ছোটো, পোস্টকার্ডের চেয়ে একটু বেশি বা কম সে আড়ে-বহরে। সে কাগজ সম্পাদনা করতেন প্রয়াত অমিয় চট্টোপাধ্যায়। সুন্দর আবৃত্তি করতেন। পেশায় বেতার-ঘোষক।

অমিয়দার সঙ্গে তার কুড়ি-বাইশ বছর পর আলাপ হয়। কিন্তু ভৃগুদার মাধ্যমে এগুলো জানতে পারি সেই সদ্য কৈশোরেই। ভৃগুদা চাইতেন, এই ক্লাব ওই ক্লাবের কূটকচাল না-করে ছেলেপুলে লিট্‌ল ম্যাগাজিন পড়ুক। অন্তত পরিচয় হোক তার সঙ্গে। থিয়েটার দেখুক। ছবি দেখুক। রানাঘাটের প্রথম ফিল্ম ক্লাবও উনি এবং অংশুমান নামে এক যুবক শুরু করেছিলেন। প্রদর্শনীতে পাহারা দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে হত আমাদের। কেউ যেন ওইসব ম্যাগাজিন বা বইপত্র নিয়ে না-পালায়। লোকের ভারি দায় পড়েছে ওই সব চুরি করতে! তবু আমি আর হিমাংশু পাহারা দিতাম। টেবিলে পেতে রাখা ম্যাগাজিন চটি-চটি বই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়তাম। তখন জানি না, কলেজ স্ট্রিটে 'পাতিরাম' নামে স্টল আছে, যেখানে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই লোকে বই পত্রিকা পড়ে। এবং লিট্‌ল ম্যাগাজিনই পড়ে। জানতাম না, আর পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে আমিও লায়েক হয়ে গিয়ে গম্ভীরভাবে পত্রিকা ওলটাব সেই স্টলেই। তারপর বইমেলার লিট্‌ল ম্যাগজিন স্টলেও একদিন দেখতে পাব এই দৃশ্যই। এইসব কিছুর পূর্বাভাস যেন ভৃগুদার উদ্যোগের মধ্যে ছিল। অতদিন আগেই। কারণ কলকাতা শহরে বইমেলা শুরু হয় তারও কয়েক বছর পর। ভৃগুদা তখন ওই লিট্‌ল ম্যাগাজিনের প্রদর্শনী বছর-বছর না করলে, আমি লেখার জগতের দিকে আগ্রহী হতাম না হয়তো। গোপনে কবিতা লেখা তখনই শুরু। প্রদর্শনী বছর-বছর না করলে, আমি লেখার জগতের দিকে আগ্রহী হতাম না হয়তো। প্রদর্শনী শেষ হওয়ার পর, দড়ি বেঁধে পত্রিকাগুলো ভৃগুদার বাড়ি রেখে আসতাম। কত পত্রিকা। নামই শুনিনি। কবিতা (যা তখন বন্ধ হয়ে গেছে, ভৃগুদাই বলেছিলেন), কৃত্তিবাস, কবিপত্র, গল্পকবিতা, ক্ষুধার্ত, আর্তনাদ, নিষাদ, শব্দ—অজস্র কাগজ। তারই মধ্যে ছিল, ছোট্ট-ছোট্ট কবিতা বা গল্পের পুস্তিকা। মিনিবুক। ভৃগুদা সেগুলো পড়তে দিতেন আমাকে, আমার আগ্রহ দেখে। নতুন একটা জগৎ তখন খুলে গিয়েছে আমার সামনে। সেই জগতের মধ্যেই পাচ্ছি 'এক্ষণ' পত্রিকা। সেই জগতের মধ্যে দিয়েই এসে পড়ছে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছোটো-ছোটো কবিতা-পুস্তিকাগুলো।

শব্দের যে সংকেত করার ক্ষমতা সে-সম্পর্কে আবছা-আবছা ধারণা জন্মাচ্ছে, আর যে কবিতা সাংকেতিক নয়, সোজা এসে বুকে ধাক্কা মারছে, সেই লেখার দিকে টান তখন বেশি। শঙ্খ ঘোষের 'রুচির সমগ্রতা' প্রবন্ধ, 'অলিন্দ' পত্রিকায় বেরবে তারও বছর তিনেক বাদে, '৭৪-এ, আর আমি পড়ব '৭৬-এ। সংকেতশক্তি সম্পন্ন কবিতা, আর সোজাসুজি কথা বলা কবিতা যে একই পরিবারের লোক, তার আন্দাজ পেতে আমার তখনও বেশ দেরি। কিন্তু, যে-কথাটা দরকারি, তা হল, এইসব কবির ব্যক্তিপরিচয় কী, কে কোন পত্রিকায় লেখেন না, কে আবার সেই পত্রিকাতেই চাকরি করেন, এসব কিছুই আমার জানা নেই তখন। ওই যে তিনজন মানুষ আমরণ অনশনে বসেছে, তাদের শুকনো মুখ রোজ রোজ দেখতে দেখতে বাড়ি ফিরে এসে ভাতের থালার সামনে একজন মানুষের গা গুলিয়ে উঠছে—এই বাস্তব, তখনও পরিণত না-হওয়া একজন ১৭-১৮ বছরের প্রায়-মানুষকে তোলপাড় করছে—তার মনে পড়ে যাচ্ছে ভৃগুদার কাছ থেকে আনা বই-পত্রিকার মধ্যে পড়া চারটি লাইন,

অন্ন আলো অন্ন জ্যোতি সর্বধর্মসার
অন্ন আদি অন্ন অন্ত অন্নই ওংকার।
সে অন্নে যে বিষ দেয়, কিংবা তাকে কাড়ে
ধ্বংস করো ধ্বংস করো ধ্বংস করো তারে।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই কবিতা, ভাত না-খাওয়া, ভাত না-পাওয়া মানুষের কথা বলেছে '৬৪ সালেই, কিন্তু কবিতাটি পড়ার সুযোগ হচ্ছে আমার ওই '৭০-'৭১-এই। বিশেষ পত্রপত্রিকায় লেখা না-লেখার ব্যাপারে তথা রাজনৈতিকভাবে, এদের কার কী অবস্থান, আমি কিছুই জানি না তখন।

আর সেই অজ্ঞতা, ছিল এক আশীর্বাদ। স্রোতের মতো সেই সময়ের তোলপাড় এসে ঢুকে পড়ছে আমার মধ্যে এদের সবার লেখার ভেতর দিয়ে, কেবল লিখিত শব্দটুকুই সেইসব কবি-লেখকের একমাত্র পরিচয় তখন আমার কাছে। অন্য কোনো সংবাদ এঁদের সম্পর্কে জানার কোনো উপায়ই নেই।

সংবাদ। হ্যাঁ, 'স্বাধীন' শব্দটির মতো এই 'সংবাদ' শব্দটিও প্রণিধানযোগ্য। এই ব্যক্তি-পরিচয়গত সংবাদ আমার কাছে ছিল না বলে, আমি ছিলাম একজন স্বাধীন মনের পাঠক। যদিও অপরিণত, কাব্য ও সাহিত্যের অনেক সূক্ষ্ম কারুকৌশল তখনও তার অজ্ঞাত—কিন্তু, অপরিণতি ও অজ্ঞতা তাকে একরকম স্বাধীনতা দিয়েছে। সে মনে করছে, এরা সকলেই তো আমার সময়টাকেই বলছেন। সদ্য বড়ো হয়ে উঠে আমি যে-সময়টাকে দেখছি।

তখন সুমন আসেননি। সুমন তাঁর গিটার নিয়ে আসবেন আরও ২১ বছর পর। তাই গান তেমন বলছে না সেই সময়ের কথা। কিন্তু বলছে থিয়েটার। নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকা

এক যুগল বা নবীন দম্পতি যখন বলে, 'আমরা তো আপনাদের কিছুতে হাত দিতে যাইনি। আমরা তো নিজেদের নিয়ে আছি।' তখন 'নক্ষত্র' গোষ্ঠীর প্রযোজনায় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক তাদের বলে : 'আমরা আমরা আর আমরা? আর আমরা কেউ নই! আপনাদের ঘরের পরে উঠোন নেই? আর উঠোনের পরে পথ? আর পথের দু-ধারে অসংখ্য আর্তনাদ? সেই আর্তনাদের মধ্যে থেকে ছুটতে-ছুটতে একটা ম্যাপ আপনাদের ব্যাগ বাক্সের মধ্যে ঢুকে পড়ে না? বলে না, একটা নতুন দেশের খবর এনেছি? একটা নতুন দেশের খবর?'

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকের সেই নতুন দেশ বা সোনার দেশের খোজে, তখন কাতারে-কাতারে ছেলে প্রাণ দিচ্ছে। নিখোঁজ হচ্ছে। নির্বাচন পরিণত হচ্ছে প্রহসনে। আর'৭২-এ উৎপল দত্ত'র 'ব্যারিকেড' নাটকে খুন হওয়া বৃদ্ধ নেতার প্রসঙ্গ থেকে সবারই মনে পড়ে যাচ্ছে কিছুকাল আগে হেমন্ত বসু হত্যার কথা। নাটকে জননেতার বিধবা, ফ্রাউ ৎসাউরিৎস, শেষ দিকে বলছেন, আগে বলতাম কমিউনিস্টদের মারছে, এখন আমার ছেলে পাউল-কে ওরা ঘরের দরজা থেকে তুলে নিয়ে গেল রাস্তায়—এখন কী বলব? কাকে মারছে? সেই নাটক দেখায়, সবার ঘরের দরজায় দরজায় এসে দাঁড়াচ্ছে ঘাতক। দাঁড়ায় রাজনীতিও। আর তারই এক বছরের ভেতর থিয়েটার ওয়ার্কশপ-এর 'রাজরক্ত', বিভাস চক্রবর্তী অশোক মুখোপাধ্যায়দের হাত ধরে প্রমাণ করল, রাজারও কী করুণ পরিণতি হয়। মনে রাখতে হবে এর মাত্র দু-বছর আগেই নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা 'উলঙ্গ রাজা' বেরিয়ে গিয়েছে বই হয়ে। এর পাশে রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' যখন অভিনয় করেন শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র তখন তার অনেকগুলো অর্থস্তরের মধ্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সেই কবিতার লাইনগুলোও কিন্তু সত্যি হয়ে থাকে, যা এক্ষুনি একবার বলেছি :

> বলেছিল কবর দিতে
> যারা খুঁড়ছিল
> সেই কবরেই পিছন থেকে তাদের ঠেলে দেওয়া হল।

অতীন-রূপী শম্ভু মিত্র যখন স্টেজে দাঁড়িয়ে বলেন, মিথ্যাচারণ, নীচতা, পরস্পরকে অবিশ্বাস, গুপ্তচরবৃত্তি, একদিন তাদের টেনে নিয়ে যাবে পাঁকের তলায়। এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—তখন আমার সদ্যপঠিত 'ফেরাই' কবিতা, 'পলাতক ও অনুসরণকারী' গল্পও মনে ফিরে-ফিরে আঘাত করে।

ওই সময়টায়, যখন এইসব কবিতা-গল্প-নাটক উল্কার মতো এসে পড়ছিল আমার বুকের ওপর, তখন সাহিত্যের কারুকৌশল বিষয়ে কিছু না-জানলেও কেবল তার সত্যটুকু, আর চারপাশের জীবনযাত্রার যে-সাক্ষ্য তাই দিয়ে একরকম তোলপাড়ের মধ্য দিয়ে কীভাবে সবটা যেন বুঝতে পারছিল আমার মন। যে মন, ওই যে বললাম, স্বাধীন।

সে অবশ্য আর স্বাধীন থাকবে না এরপর। কারণ সে মন যে-ব্যক্তিটির মধ্যে আছে,

সে কবি হতে চাইবে। আমি কবি হতে চাইলাম। আর ক্রমশ জানতে-জানতে চললাম ব্যক্তি-বিষয়ক নানা সংবাদ। সাহিত্য সমাজের খুঁটিনাটি। ধীরে-ধীরে গড়িয়ে চললাম সেই দিকে। একদিকে যেমন কাব্যকলার নানা করণকৌশল শিখছি, অন্যদিকে জানতে পারছি কবি-লেখকদের ব্যক্তি-পরিচয়। না, পরিচয় কথাটা ভুল। তাঁদের ব্যক্তিজীবনের নানা তথ্য, তাঁদের সম্পর্কে ছোটো-বড়ো নানারকম খবর। আগে ছিল জীবন-অভিজ্ঞতা একদিকে, অন্যদিকে কবি-লেখকের লিখিত শব্দ। এই দুটির মিলনে বা সংঘর্ষে আমার বুঝে নেওয়ার চেষ্টা ছিল কবিতাকে। এবার তা যুক্ত হতে লাগল লেখক-ব্যক্তিটির সঙ্গে। লিখিত শব্দের প্রভাব যেন পিছিয়ে যেতে লাগল। বড়ো হয়ে উঠতে লাগল ব্যক্তি-তথ্য ও তার আশেপাশের প্রভাব। আস্তে আস্তে নয়, বেশ দ্রুতই আমিও ঢুকে পড়ছি, এইসব তথ্যকে বিশ্বাস করার কাজে। এমনকি বিশ্বাস করানোর কাজেও। ব্যক্তি-সম্পর্কিত তথ্য। কখন একসময় যেন, কুড়ি-পঁচিশ-তিরিশ বছর ধরে ব্যক্তি-সম্পর্কিত তথ্য এবং ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক প্রধান হয়ে উঠতে দেখলাম আমার চারপাশে। যার মধ্যে প্রবলভাবে আমিও রইলাম। লিখিত শব্দের সঙ্গে আমার জীবনের অভিজ্ঞতার সংযোগ ও প্রতিক্রিয়ার মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়তে লাগল লেখকের সঙ্গে ব্যক্তি-সম্পর্কটি। সম্পর্ক প্রীতিময় হলে, তাঁর লেখা বিষয়ে আমি মোহিত। অন্ততপক্ষে ক্ষমাসুন্দর। সম্পর্ক অপ্রীতিকর হলে, তাঁর লেখাও আমার মনের বাইরে পড়ে থাকে। ছাপা নামটা দেখা মাত্র সেই বহিষ্কার-প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। ব্যক্তির সঙ্গে আমার সম্পর্কের তিক্ত স্মৃতি মনে আসে। ব্যক্তির লেখা শব্দগুলো পড়তে পারি না খোলা মনে। এভাবেই কেটে গেল পরবর্তী পঁচিশ-তিরিশ বছর। অথচ মনকে খোলা রাখাই তো লেখকের অন্যতম প্রধান একটা কাজ। সেই খোলা মনের নামই স্বাধীন মন। ভাষা নিশ্চয়ই কবিতা বা যে কোনো লেখার পক্ষে খুব জরুরি একটা জিনিস। কিন্তু আজ কেমন মনে হয়, ভাষার চেয়েও বড়ো হল মন। যে-মন দেখছে। অনুভব করছে। সে যদি স্বাধীন না হয়?

ব্যক্তি-সম্পর্ক দ্বারা অনেকটাই, এমনকি কখনো-কখনো প্রায় সবটাই নির্ধারিত হয়, সাহিত্য সমাজের গতিবিধি। যে মেনস্ট্রিমের বাইরে, সেও তার নিজের মতো একটা সমাজ বা বৃত্তের দেখা পেয়ে যায় লিখতে এসে। বা খুঁজে নেয়। কিন্তু সেটাও একটা বৃত্ত-ই।

কিন্তু পাঠক থাকে এই সাহিত্য-সমাজের গোপন টান-ভাঙনের বাইরে। বৃত্তসীমা থেকে মুক্ত। তার কাছে পৌঁছোয় কেবল লিখিত শব্দগুচ্ছ। আর সেই শব্দমালার ভেতর থেকে তার দিকে হাত বাড়ায় লেখকের মন। সেই মনটা কেবল পাঠকই দেখতে পায়। দূরের, অপরিচিত পাঠক। ভাষা বা কারুকৃতির প্রতি নজরও শেকল পরাতে পারে লেখকের মনে। বিশেষত, আমারও। নবীন বয়সে, সাহিত্যসমাজ তথা তার ভাষা-সমাজে ঢুকে যা-যা হত, একেবারে সেটাই সম্প্রতি দেখতে পেলাম আরেক জায়গায়।

এইবার পঁচিশ হবে, এইরকম একজন নবীন কবি তার প্রকাশিত বইয়ের নাম প্রাথমিকভাবে ঠিক করল : 'সূর্যাস্ত ও নরখাদক।' তার সঙ্গী-কবি ও প্রধান বন্ধু, একই

বয়সি, সে বাধা দিল : না, না। এইরকম নাম আগে হয়েছে। আমি শুধোই, এইরকম নাম! সে বলে, হ্যাঁ, 'ষাঁড় ও সূর্যাস্ত'। অমিতাভ মৈত্র। আমার খুব প্রিয় কবি। তাঁর বই আছে। তখন বললাম, হ্যাঁ, কিন্তু 'ষাঁড় ও কিন্নর' নামে দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বইও তো আছে। সে-বই তো বেরিয়েছিল ১৯৯২ সালেই। স্পেনের কবি লোরকা-র অনুবাদ। অমিতাভ মৈত্রের বই বেরিয়েছে ২০০৫-এর শেষ দিকে। ছেলেটি দেবীপ্রসাদের অনুবাদ-বইয়ের কথা জানত না। কিন্তু আমি বলছি, এদের মনটা কেমনভাবে চলছে। ভাষার বাইরেটা ধরে ধরে চলছে। এবং তাদের মনের মধ্যে এসে পড়ছে সাহিত্যের সমাজটা, কে কী বলবে তাই নিয়ে সতর্কতা।

এই ধরনের কী কী নাম আছে? সে জানায়, আসলে, এই যে 'অমুক ও তমুক' এই ধরনের নাম। 'ও' দিয়ে যুক্ত হয় দুটো জিনিস, এমন বই তো অনেক আছে কবিতার। ঠিকই। সেই মুহূর্তেই আমার মনে পড়ছে, কিন্তু বলছি না ওকে কয়েকটি বইয়ের নাম। অমিতাভ গুপ্তের 'মাতা ও মৃত্তিকা', গৌতম বসুর 'অন্নপূর্ণা ও শুভকাল', এবং মল্লিকা সেনগুপ্তের 'হাঘরে ও দেবদাসী। তিনজনের তিনটি শ্রেষ্ঠ বই। 'মাতা ও মৃত্তিকা' অমিতাভ গুপ্তের পুরাণের হাত ধরে বাঁক ফেরার বই। 'হাঘরে ও দেবদাসী' প্রেমের কবিতার সঙ্গে আমার দেশের মেয়েদের জীবন-ইতিহাস মেশানোর কাজটির ধারাবাহিকতা ধরে রাখল আবারও। গৌতম বসুর 'অন্নপূর্ণা ও শুভকাল' পুস্তিকা প্রকাশের আঠাশ বছর পরেও আজও সমান সম্মানিত সহযাত্রী কবিদের চোখে। তিনজনের কারও সঙ্গে কারও তো মিল নেই। ছেলেটি আমাকে বলে, আপনার এরকম নাম আছে? আছে বটে, 'ক্রিসমাস ও শীতের সনেটগুচ্ছ'।

আরেকরকম নামও হয়। 'অমুক' ও 'তমুক'-এর বদলে, 'অমুক'-এর 'তমুক'। যেমন? বাবরের প্রার্থনা, মরচে পড়া পেরেকের গান, স্মৃতির শহর, জলপাই কাঠের এস্রাজ, জিপসিদের তাঁবু, সাতটি তারার তিমির, যুবকের স্নান, নষ্ট প্রজন্মের ভাসান। কত বলব! এরা সবই 'অমুক'-এর 'তমুক'। এর মধ্যে বুদ্ধদেব, জীবনানন্দ, শঙ্খ, সুনীল, দেবারতি, মৃদুল, রণজিৎ এঁদের বইগুলো সবারই অল্প-বিস্তর জানা। শেষ বইটি এখন আর পাওয়া যায় না বোধহয়। খুবই সুন্দর বই। শক্তিমান এক নবীনের প্রথম ফুটে ওঠার দীপ্তি সেই বইতে। বিভাস রায়চৌধুরী তার নাম।

অবশ্য ভেবে দেখলে 'অমুক'-এর 'তমুক'-এ আমিও নেই তা নয়। সন্দীপনদা থাকলে বলতেন, ও-জিনিস তোমারও তো আছে। 'উন্মাদের পাঠক্রম'। নে-ই কি?

মজা-ঠাট্টা ছেড়ে দিই এবার। ওদের বয়সে, এমন বাইরে-বাইরে ঘুরে মৌলিকতা খোঁজার সময় অনেক মরীচিকা আমিও দেখেছি। আমার লেখাটা যেন মৌলিক হয়, আর কারও মতো না-হয়ে পড়ে, আরও অনেকে যেভাবে নাম দিয়েছেন, আমি যেন সেই ধারায় নামকরণ না-করি, নবীনের এই আশঙ্কা, স্বাভাবিক। বিষ্ণু দে থেকে ধার করে বলা যায় 'ওরকম আমারও ঘটেছে।' কিন্তু সেই সতর্কতা, নিজের মনের সাবধানবাণী, আমার মনের

কথাটাকেই শেষ অবধি উপেক্ষা করতে শুরু করেছে না তো! কথাটাকে রুদ্ধ করছে না তো? বোদলেয়রের কবিতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসুর মনে হয়েছিল : 'যিনি গৌণ কবি, তিনি সন্তর্পণে, ক্লিশের ছোঁয়া বাঁচিয়ে-বাঁচিয়ে পা ফেলেন। যিনি বড়ো কবি তিনি ক্লিশে-কে হাত পেতে নিয়ে তাকে ঐশ্বর্যে রূপান্তরিত করেন।'

এরা নবীন। 'তোমরা নবীন। এ উদাস / বিষাদ কি তোমাদেরও চেনা?' লিখেছিলেন বিষ্ণু দে। বিষাদ নয় এক্ষেত্রে। ভয়। মৌলিক না-হওয়ার ভয়। এ-পথে আমিও গিয়েছি। তাই আশা হয়, এই দুই নবীনও এসব ভয় পার হয়ে যাবে। বুঝতে পারবে, ভাষার বাইরে বাইরে হাত বুলিয়ে মৌলিকতা খোঁজা নয়। মৌলিকতা থাকে অন্তর্বস্তুর মধ্যে। আর এও বুঝতে পারবে মনে হয়, ভাষাটা জরুরি। তবু, ভাষার দিকে অতিরিক্ত সচেতন থাকলে, অনেক সময় তার দ্বারা মন শৃঙ্খলিত হয়। স্বাধীন থাকে না। স্বাভাবিক ভাবে লেখাটা যেদিকে যেতে চাইছে, না-গিয়ে, নিজের অজান্তেই পথচ্যুত হয় কখন।

এই যারা আমাকে 'সূর্যাস্ত' পাঠায়, 'ঊষাকাল পাঠাব' বলে এই যে মেয়েটি, 'অ্যাবোর্ট' শব্দটা ব্যবহার করতে পারে অর্ধেক লিখে ছিঁড়ে ফেলা কবিতা বিষয়ে—এদের মন স্বাধীন। এরা জানে এদের চিরকুট ছাপা হতে যাচ্ছে না, তাই এদের ভাষাও স্বাধীন। ইংরেজিতে লেখা 'অ্যাবোর্ট' শব্দটি ওখানে কবিতার উড়াল নিয়ে এল, তা মেয়েটি জানে না। কিন্তু অব্যর্থ ভাষায় প্রকাশ করতে পেরে যায়। না-জেনেই পারে।

মনের কথা আরও ভালোভাবে প্রকাশ করার জন্যই কলাকৌশলের কাছে যাওয়া। আবার, তার কাছে গেলে হয় কী–আমাকে জানতে না-দিয়েই সে আমার মন রুদ্ধ করে দিতে পারে। সে, মানে, কলাকৌশল।

আর যে পড়তে চায়? কেবল পড়তেই চায়? তার মনে এটা আসবে না, বাবরের প্রার্থনা, আর স্মৃতির শহর, আর বন্দরের কথ্যভাষা, যুবকের স্নান–এরা সকলেই 'অমুক'-এর 'তমুক'। সে বলার কথাটা পড়বে। সে-ই শুদ্ধ পাঠক। তাকে কলাকৌশল মুগ্ধ করুক বা না-করুক, সব কারুকৃতি ভেদ করে সে দেখতে পাবে লেখকের মন। যদি নিজের মনের ছিটেফোঁটাও সে ওই মনের মধ্যে দেখতে পায়? এই তার আশা। তাই লেখক-মনকে স্বাধীন রাখার শ্রমকষ্ট অনেক। সেটাই আসল তালিম। আসল রেওয়াজ। সংগীতে একটা কথা আছে না? চিন্তন? সেইরকম মনে-মনে রেওয়াজ।

আর সেই রেওয়াজের জন্যই, আরেকজন লেখকের কাছে যাওয়ার চেয়ে, আজ বরং কোনো অপরিচিত পাঠকের কাছে থেকে সেই স্বাধীনতার পাঠ নেওয়ার চেষ্টা করি।
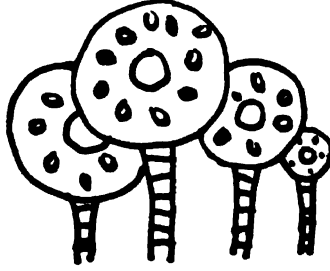
৩৪

এক-একটা কবিতা মনের মধ্যে থেকে যায়। কবে পড়েছি, কোথায় পড়েছি ভুলে গিয়েছি কালক্রমে, কবিতাটা কিন্তু সঙ্গে আছে। থেকে থেকেই মনে পড়ে। মনে মনে বলি। আবার উচ্চারণ করেও বলি। লোকের সামনেও বলি। কেমন সেটা! কোথাও গিয়েছি, সবাই বলল, একটা স্বরচিত কবিতা বলুন। সঙ্গে বই নেই। কী করি! আপনার স্যর মুখস্থ থাকে, থাকে না? আমরা শুনেছি! ঠিকই, মুখস্থ আছে কিছু কবিতা। কত কবিতাই তো বারবার আপনমনে পড়েছি। কখন মুখস্থ হয়ে গিয়েছে টেরও পাইনি। কিন্তু সে সব তো অন্য কবিদের লেখা কবিতা। নিজের বই, অলস দুপুরবেলা, অথবা নির্জন রাত্রে বসে বসে নিজেই পড়ছি, এমন আবার হয় না কি? সুতরাং নিজের কবিতা মুখস্থ থাকে না। অন্যদের কবিতাই তখন মুখস্থ বলে বেরিয়ে আসি। আমার কপাল ভালো, যেসব সভায় যাই, সেখানে কোনো কবিতা-লেখক বা কবিতাপত্রের সম্পাদকরা থাকেন না। তাহলে আর আস্ত থাকতাম না।

প্রধানত শক্তি চট্টোপাধ্যায়, ভাস্কর চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়—এঁদের কবিতাই চালাই স্বরচিত বলে। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীরও দুটো কবিতা বলি। নীরেনবাবুর একটি কবিতা, যা আমার মুখস্থ, তাই নিয়েই সমস্যা হল একদিন। প্রথম পড়ার প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর পর তাঁর কবিতা সমগ্রে কবিতাটি পড়লাম। প্রথম পাঠের পর, এতদিন, যে ছিল আমার মনে, এবার তাকে পুনরায় ছাপার অক্ষরে দেখে আমার একটি বিস্ময় জন্মাল। সেইটে বলার আগে কবিতাটি বলি!

আলগা করে রাখি আঙুল
                    আঁকড়ে ধরে রাখার জন্যে
ধুলোর মতো হিরে এবং
                    মাটির মতো সোনা

অনেক দূরে ঘুরে বেড়াই

অনেক কাছে থাকার জন্যে

এইটে যদি বুঝতে,

কোনও সমস্যা থাকত না।

এই কবিতার নাম কী? মনে নেই আর। 'কী যে নাম, মনে নেই তা তো / আবদুল রহিম কিংবা শংকর মাহাতো / অথবা অর্জুন সিং'...

এই কবির 'স্বপ্ন-কোরক' নামের কবিতায় যেমন ছিল, ঠিক তাই। নাম মনে নেই, কিন্তু কবিতাটি মনে আছে। যেমন কোনো কোনো মানুষের নাম মনে থাকে না। মুখ অবিকল মনে থাকে। 'স্বপ্ন-কোরক'-এ পরক্ষণেই ছিল : 'মাঠে মাঠে প্রদীপ জ্বালিয়ে / সে জাগে সমস্ত রাত'—কবিতার নাম মনে না-থাকলেও কবিতাটি জীবনের নানা অভিজ্ঞতার বাঁকে বাঁকে দেখা দিতে থাকে। সেদিন নীরেনবাবুর কবিতাসমগ্রে তন্নতন্ন করে খুঁজছি। কবিতাটি আর পাই না। প্রথম লাইনের সূচিতেও 'আ' দিয়ে দেখছি—'আলগা' কথাটা পাই আর না। নেই তো পাব কী করে! সন্ধান যখন মিলল, দেখি সে কবিতা 'ছোটো দু'টি' শিরোনামের তলায় একটি যুগ্মক-এর দ্বিতীয়টি হয়ে সংগোপনে অবস্থান করছে 'কবিতার বদলে কবিতা' নামক বইয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে। পেলাম যখন, দেখে তাকে যেন ঠিক চিনতে পারছি না। কেন এমন হচ্ছে? মনে হচ্ছে, এ যেন আমার এতদিনের চেনা-জানা কবিতাটি নয়। ঈষৎ অন্য কেউ।

ভাবলাম সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়ের নম্বর জোগাড় করে তাঁকে ফোন করি, ইনি নীরেন চক্রবর্তীর ওপর বই লিখেছেন। পরে মনে হল না : নিজেই খোঁজার চেষ্টা করি কারণটা। কেন অচেনা লাগছে। কবিতাসমগ্রে কবিতাটি ছাপা হয়েছে এইভাবে :

আলগা করে রাখি আঙুল, আঁকড়ে ধরে রাখার জন্যে
ধুলোর মতো হিরে এবং মাটির মতো সোনা
অনেক দূরে ঘুরে বেড়াই অনেক কাছে থাকার জন্যে
এইটে যদি বুঝতে, কোনও সমস্যা থাকত না।

অর্থাৎ ঠাসা চার লাইন। অকটেভ-এর প্রথম চতুষ্ক দ্বিতীয় চতুষ্ক যেভাবে ছাপা হয়। সেইরকম। এবারও তার নাম নেই। নম্বর আছে—২।

কবিতাটা প্রথম যখন পড়েছিলাম কোনো পত্রিকায়, কীভাবে সাজানো ছিল বলেছি। কোনো একজন মেয়ে, তার কাছে যেতে চাই। চাই সে আমাকে দেখুক। আমাকে মনে করুক। আবার খবরও পাই, সে জানে আমাকে। আমার কথা বলে অন্যদের। কিন্তু তা জেনেও, অথবা না জেনেই, তার কাছে যাই না। আবার পুরোপুরি সে-মেয়েটির সমস্ত ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকি তাও নয়। ওই, যাকে বলে, যখন ছাদে দাঁড়াবে বিকেলবেলা, তখন অন্যমনস্কভাবে সামনের রাস্তা দিয়ে একবার চলে যাব আর কী! সেইরকম তার পরিধির

মধ্যে আসা, কিন্তু সে আমাকে গুরুত্ব দিতে পারে? এ তো আমি ভাবিই না! কল্পনার অতীত! আমার এই ধারণা তাকে এবং অন্যদের বুঝতে দিয়ে, এবং তার দিকে একটুও না ঝুঁকে চালিয়ে যাওয়া। ভালো আছ? যখন তখন বৃষ্টি আসবে। এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ি। বাকি সবাই হাঁ-হাঁ করল, 'কোথায় যাচ্ছ'। মেয়েটির মুখে ছায়া পড়ল। চলে এলাম। কবিতা-টবিতা নিয়ে একটি বাক্যও নয়। জানি না কি, এ মেয়ে আমার কবিতা মুখস্থ বলেছে এক বন্ধুকে আর সে-বন্ধু আমার শত্রু হয়ে গিয়েছে? কেন-না, সে-বন্ধু ঘনঘন বাড়িতে আসছে। আগে তো আসত না। তখন কারোরই ফোন নেই তাই ফোন করছে না। আমি সব বুঝে মেয়েটির থেকে আরও দূরে দূরে আছি। রইলামও।

এ কবিতা, সে কাহিনি পুরো বলেছে। এ কবিতাটি যখন প্রথম পড়ি, তখন '৭৪ সাল। আমার বয়স কুড়ি। তারপর পুরো যৌবনকাল পার হওয়ার সময় এ কবিতা আমার সঙ্গে ছিল। আর আজ সে অচেনা? শের আফগানরূপী অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ দৃশ্যে একটি ছবি, এক মা ও সেই মায়ের যুবতিবেলার অবিকল প্রতিচ্ছায়া তরুণীকন্যার দিকে পরপর তাকিয়ে যেমন বলতেন 'ওই যে মেহেরুন্নিসা'—গত পঁচিশ বছর আমার সঙ্গে বাস করেছে—আজ ওর দিকে তাকিয়ে দ্যাখো—ও এখন পরস্ত্রী!' এ যেন এইরকম।

আমি আঙুলগুলো আলগা রেখেছি, তাকে ধরতে চাইছি না—এইরকম ধারণা দিতে। অথচ মনে মনে প্রবলভাবে আঁকড়ে ধরতেই তো চাই। কী ধরতে চাই? ধুলোর মতো হিরে! মাটির মতো সোনা। অর্থাৎ যেসব জিনিসকে মানুষ সামান্যই মনে করে, ধুলো মাটি, কেন-না সবচেয়ে সহজ তো এই ধুলো এবং মাটি। তেমনি, তোমার থেকে দূরে দূরে থাকি কেন? সম্পর্কটা যতটুকু আছে, তার কোথাও একটা সহজতা আছে। বেশি কাছে এলে যদি ভেঙে যায়! সইতে পারব না। টুকরো টুকরো হয়ে যাব। দুটি ছেলেমেয়ে একটা পর্যায়ের পর ঘনিষ্ঠতা বাড়ালেই চাপ তৈরি হয় তাদের মধ্যে। সেই চাপে যদি ভাঙে সম্পর্ক? এত দূরে দূরে থেকেও, তোমাকে এতটা চাই, সত্যি সত্যি একদিন দু-দিন তিনদিনের জন্য পেলে তখন তো ছাড়তে পারব না। আর ছাড়তে তো হবেই! উফ। মরে যাব তখন। তার চেয়ে দূর-ই ভালো। দূরে রাখতে পারলে, ছেড়ে রাখতে পারলে, সম্পর্কের মৃত্যু হয় না। কিন্তু, সে ভাবতে পারে উপেক্ষা। সে ভুল বুঝতে পারে। বুঝলও। আমার জীবনে যেমন—কবিতাটির মধ্যেও তাই। শেষ লাইনে তারই ইঙ্গিত। সমস্যা নিশ্চয়ই হয়েছিল, নইলে 'সমস্যা থাকত না' কথাটা আসবে কেন?

প্রথম যখন পত্রিকায় এটা ছাপা হয়েছে, প্রতিটি পূর্ণ লাইন মাঝপথে গিয়ে ভেঙে নেমে যাচ্ছে। এইভাবে মোট দুটি পূর্ণ লাইন মাঝখান থেকে ভেঙে খানিকটা জায়গা ছেড়ে তৈরি হয়েছে চার লাইন, আসলে কিন্তু দু-লাইন। এবার স্পেস। তারপর আবার ওই একইভাবে একটি পূর্ণ লাইন মাঝখানে ভেঙে, জায়গা ছেড়ে, দু-লাইন হচ্ছে। এভাবে দ্বিতীয় চার লাইন। কবিতা সম্পূর্ণ।

দু-লাইন ভেঙে যে চার লাইন হচ্ছে, মধ্যে স্পেস, আবার ওইভাবে দ্বিতীয় স্তবক, কবিতাটির দিকে তাকালে দেখা যাবে কতটা হাওয়া বাতাস খেলছে যেন ভেতরে। একটা লাইন যা পূর্ণ লাইন, তা মাঝখান থেকে ছেদ করে দু-লাইনে দাঁড়াচ্ছে। এমনি এমনি নয়।

ছেলেটা তো দূরে দূরে থাকে। যা চায়, অর্থাৎ আঁকড়ে রাখতে, অর্থাৎ অনেক কাছে থাকতে, কিন্তু সেটা বাইরে দেখায় না, সেই কারণেই যেন যেটা আদতে এক লাইন হতে পারত সেটা ভেঙে হচ্ছে দু-লাইন। মাঝখানে ফাঁক দিয়ে জায়গা ছাড়া হচ্ছে। ছেলেটা যা চাইতে পারত, তা না-চেয়ে দূরে থাকছে তো! মিলগুলোও তাই যেন কেমন দূরে দূরে রাখা। এতই অপূর্ব, এতই অসাধারণ, যে কবিতাটা শেষ করার পর, মনে হয়, আরে মিল দেওয়া কবিতা না কি? কেবল দ্বিতীয় এবং সতর্ক পাঠে মিলগুলো বোঝা যায়। 'রাখার জন্যে'-র সঙ্গে 'থাকার জন্যে'—'রাখা'র সঙ্গে 'থাকা'ও নয়—ফলে আরও লুকিয়ে যাচ্ছে। কী স্বাভাবিক এই অন্ত্যমিল প্রয়োগ। এসব অবশ্য নীরেনবাবু শয়ে শয়ে করেছেন। কিন্তু, ছোট্ট এই কবিতাটির মধ্যে মধ্যে যে অতখানি জায়গা ছেড়ে রাখা আছে—আবার একটা স্পেসও ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে যেন ওই দূরে দূরে থাকার ব্যাপারটা ফুটে উঠছে। এই যে বলে না, দূর-সম্পর্কের ভাই, দূর-সম্পর্কের বোন, এ হল, দূর-সম্পর্কের প্রেমিকা। তার কথা এ কবিতায়। যাকে সরাসরি প্রেমিকা বলা কিছুতেই যাবে না। বললে, নানানজনের সঙ্গে মারামারি হয়ে যাবে। কিন্তু প্রেমিকা ছাড়া আর কী-ই বা বলা যাবে এ-মেয়েটিকে। অশ্রুবাষ্প যেমন সুদূরে মিলিয়ে যায়, একেও একদিন মনে মনে 'যাক যাক' বলে, অন্য কাউকে 'এসো এসো' বলতে হবে। কিন্তু দূর-সম্পর্কও একটা সম্পর্ক তো। একটা বাঁধন, টান, ফিরে ফিরে আসা তো আছে। তাই কবিতাটি যেন আলগা-ভাঙা লাইনের ছদ্মবেশ ধরেও কোথাও একটা নিয়মে নদীর দুটো তীরকে ধরে রেখেছে। দুটি স্তবকে। এক স্তবকের শেষ লাইনের সঙ্গে পরের স্তবকের শেষ লাইন মিলল। দূরে দূরে থাকলেও 'মিল' আদৌ রয়েছে কেন? কারণ ছেলেটি তো মনে মনে মিলতেই চায় তার দূর-সম্পর্কের প্রেমিকার সঙ্গে। সব মিলেমিশে সেই জন্যই ওই কবিতার প্রথম মুদ্রিত রূপটি আমার মনের মধ্যে আমার নিজের জীবন-অভিজ্ঞতার রূপ হয়ে বেঁচে আছে। ওই যে বললাম সারা যৌবনকাল কবিতাটি আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিল। এইবার কবিতাসমগ্রে যখন তার দ্বিতীয় রূপটি দেখলাম—ঠাসা চার লাইন, তখন কেমন দমবন্ধ লাগল। ওই যে যুবক-প্রাণ, যে দূরে দূরে থেকে আসলে কাছে থাকতে চেয়ে এইভাবেই বাঁচাতে চেয়েছিল সম্পর্কটি—হঠাৎই সব যেন ঘেঁষাঘেষি হয়ে সেই ফাঁকা খোলা শ্বাস নেওয়ার জায়গাটা মিলিয়ে গেল। মনে হল ও আমার এতদিনের চেনা কবিতাটি নয়। ও অন্য কেউ।

বলা দরকার কবির বিবেচনাই সর্বোচ্চ। এবং শিরোধার্য। সর্বদাই। এক্ষেত্রে কবি যখন এই সজ্জা বদল করেছেন তাকে মানব তো একশোবার। কিন্তু আমার মন তো মানবে না। বলতে চাইছি, একটি কবিতার সঙ্গে কোনো পাঠকের এমন সম্পর্ক হতে পারে, যে কবিকৃত পরিবর্তনও তার মনে দুঃখ হয়ে বাজতে পারে। এতটাই পজেসিভ হয়ে পড়তে পারে সে। একটি মেয়ের কাছাকাছি হয়ে পড়লে পাছে তার প্রতি পজেসিভনেস জন্মায়, তাই দূরে দূরে থাকতে থাকতে তাকে সুদূরে মিলিয়ে যেতেও দেওয়া গেল। কিন্তু নক্ষত্র চিনে-চিনে উলটো রাস্তায় যেতে গিয়ে, একটি কবিতার প্রতি পজেসিভ হয়ে পড়লাম। কী কপাল! অবশ্য, কে বলতে পারে, প্রথমবার যে-ছাপাটা দেখে লেখার চেহারাটা অত মনে ধরে গিয়েছে, সেটাই হয়তো ভুল ছাপা। কবিতাসমগ্র-এ যেটা ছাপা হয়েছে, সেই আকারটাই হয়তো ঠিক

আকার। 'কে জানে গরলই কি না প্রকৃত পানীয় / অমৃতই বিষ!'

সম্প্রতি নীরেন্দ্রবাবুর আরেকটি কবিতা মনে পড়ছিল পথ চলতে চলতে। আগে কবিতাটি বলি। পরে পথটি বলব।

লক্ষ্মীর প্রতিমা

মা বসে আছেন শূন্য ঘরের দাওয়ায়।
কোলে তাঁর শিশু।
স্তব্ধ গ্রাম। গ্রামের লোকেরা গিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে
পিছনের শালের জঙ্গলে।
কেউ কোনোখানে নেই। এই গ্রামে জনমনিষ্যির
চিহ্ন নেই। চতুর্দিক খাঁ খাঁ।
গল্পে-পড়া রাক্ষসপুরীর রাস্তাঘাটের মতন।
একা শুধু
মা বসে আছেন তাঁর ঘরের দাওয়ায়
সদ্যোজাত শিশুটিকে নিয়ে।

এখন আবার সব শান্ত হয়ে এসেছে। কোথাও
মারামারি কাটাকাটি নেই।
মোটর-সাইকেলে ধুলো উড়িয়ে কাউকে
চমকে দেওয়া নেই।
গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে শালের জঙ্গলে
গা-ঢাকা দেওয়ার কোনও দরকারও এখন নেই কারও।
ফিসফিস জটলা? তাও কোথাও দেখছি না।
সন্ধ্যার বাতাসে
বারুদের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না এখন।

এখন সমস্ত-কিছু শান্ত হয়ে এসেছে আবার
নিজস্ব নিয়মে।
দোকানের ঝাঁপ-খুলেছে, চাষিরা নেমেছে মাঠে, গ্রামেব পাঠশালা
বসেছে, যেমন নিত্য বসে।
কিছু লোক অবশ্য রয়েছে পড়ে আশ্রয় শিবিরে।
সম্ভবত আরও কিছুকাল
সেইখানেই থাকবে তারা। তবে কিনা অনন্তকাল তো কোনও আশ্রয়শিবির
কেউ খোলা রাখে না, তাই একদিন তারাও
গ্রামে ফিরে যাবে, এইরকম
আশা করা যায়।

সবই ঠিক। তবু এই ছবিটি কিছুতে
মিলিয়ে যায় না।
এখনও দুই চোখ বন্ধ করলেই দেখি যে,
সদ্যোজাত শিশু কোলে নিয়ে
মা একা আছেন বসে শূন্য খাঁ খাঁ ঘরের দাওয়ায়
অচঞ্চলা লক্ষ্মীর মতন।

কবিতাটির তলায় তারিখ দেওয়া আছে ২০ আষাঢ়, ১৪০৮। ঠিক এর আট বছর পর, ১৪১৬, আষাঢ়-শ্রাবণের কোনো সময় আমার কবিতাটি মনে পড়ল, পথে। লালগড়ের পথে। আমরা কয়েকজন চলেছি গাড়িতে। একটার পর একটা গ্রাম পার হচ্ছি। কোথাও কোনো মানুষ নেই। ফাঁকা দাওয়া। তালাবন্ধ। অথবা তালা না-দেওয়া মাটির ঘর। কবিতায় বলা, গ্রামের পিছনে সেই শালের জঙ্গলও আছে। আর সেই জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে থাকা মানুষদেরও কাউকে কাউকে আমরা কিছুক্ষণ পর দেখতে পেলাম। এই কবিতায় হানাহানি হিংসা অশান্তির পটভূমি গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে—লেখনীর কুশলতায় তা মুখে একবারও প্রায় বলছে না কবিতাটি, কিন্তু, কী হয়েছে তা বোঝা যাচ্ছে। এই কবিতাটিতে বলা রাক্ষসপুরীর রাস্তার মতন মানুষহীন 'ঘরদুয়ার' বসতহারা পড়ে আছে। এই বছর লালগড়ে যাওয়ার পথে ভীমপুর, পিরাকাটা, ঝিটকা, পিনদাকুলি—এইসব গ্রামের বর্ণনা যেন ওই কবিতাটি দিয়ে রেখেছে। আট বছর আগে লেখা কবিতাটি। কেন না, বাংলার গ্রাম যিনি জানেন, তিনি, ছোটো ছোটো আকারে এ-ইতিহাস প্রত্যক্ষ করেছেন। আর সেই দেখাটা একসময় ভবিষ্যৎবাণীর মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কথা ঠিকই যে, কবিতাটিতে শান্তি ফিরে আসবার কথা আছে। সাধারণ মানুষ তো শান্তি চায়। আর কবি তো শান্তি চাইবেনই। কিন্তু নীরেনবাবুর কবিতাই বলে দিয়েছিল একদিন, 'রৌদ্রে ভাসে চবুতরা, ছায়ায় ভাসে খিলেন / ভুল ঠিকানায় ঘুরে বেড়ায় যুদ্ধ এবং শান্তি।' ঠিক। সেই ভুল ঠিকানায় যুদ্ধ এবং শান্তিকে ঘুরিয়ে মারে মানুষই। তাই শান্তি আসতে দেরি হয়।

সত্যি বলতে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি কখনোই আসে না। না সমাজজীবনে, না ব্যক্তিজীবনে। বুদ্ধদেব বসু একবার লিখেছিলেন তিনের দশকের পৃথিবী সম্পর্কে; 'দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝখানে প্রতারক শান্তির মতো' কথাটা। কী জানি কেন, যুদ্ধকে প্রতারক বলতে সাহস পাই না এখনও--কিন্তু শান্তি এলেই মনে হয়, এই বোধহয় ভেঙে গেল-ভেঙে গেল। অশান্তি এই এসে পড়ল বলে!

সেদিন লালগড়ের পথে সরু পিচরাস্তার দুধারে জনমানবহীন গ্রামের পর গ্রাম দেখতে দেখতে নীরেনবাবুর এই কবিতাটি আমার মনে পড়ছিল ঠিকই, কিন্তু সেখানে, কবিতাটির একটি লাইন শুধু উপস্থিত ছিল না। 'উলঙ্গ রাজা'-র কবি যেমন বলেছিলেন : 'কিন্তু সেই শিশুটিকে আমি / ভিড়ের ভিতরে আজ কোথাও দেখছি না।' তেমনই, ওই কবিতার একটি লাইন জনশূন্য ঘরবাড়ির খাঁ খাঁ বাস্তবে কোথাও উপস্থিত ছিল না সেদিন।

উপস্থিত ছিল আমার মনে। বলা দরকার, নানা ঘটনার মধ্যে ঘন ঘন বেজে ওঠা সেলফোন যখন জানাচ্ছে, আমরা যারা গিয়েছি লালগড় তাদের বিষয়ে কী কী দেখানো হচ্ছে টিভিতে, পরস্পরবিরোধী নানা কথার মধ্যে, ফিরে আসার পথে আবার ওই গ্রামগুলো পেরতে পেরতে ফাঁকা ঘর-উঠোন দেখতে দেখতে আমার মনে ঝলসে ঝলসে উঠছিল সেই লাইনটি : মা বসে আছেন শূন্য ঘরের দাওয়ায়। কোলে তাঁর শিশু। যেদিকে তাকাচ্ছি আমি দেখতে পাচ্ছি একটিই দৃশ্য :

> সদ্যোজাত শিশু কোলে নিয়ে
> মা একা আছেন বসে শূন্য খাঁ খাঁ ঘরের দাওয়ায়
> অচঞ্চলা লক্ষ্মীর মতন।

এই 'অচঞ্চলা লক্ষ্মীর মতন' লাইনটি ছুরির মতো বুকে বিঁধে জানায় এই বিশ্বাস, যে, গ্রামবাংলাকে ছেড়ে লক্ষ্মী যাবেন না, ভালোবাসা যাবে না। স্নেহ যাবে না। বাস্তব যতই বিপরীত হোক, ওই দরিদ্র গৃহবধূটি, যে তার সদ্যোজাত শিশুর কারণেই হয়তো ঘর ছেড়ে পালাতে পারেনি, ওই সর্বস্বহারা বধূমাতার মধ্যে, সকল সর্বনাশকে উপেক্ষা করে এক মঙ্গল-আলোক জ্বলে ওঠে। যাকে কেউ মারতে পারবে না। মারতে পারেনি কখনও। ওই বউটিকে লক্ষ করে 'মা বসে আছেন'-এর এই 'আছেন' কথাটির ব্যবহার মনকে বেদনাময় এক আলোয় ভরে দেয়। আর সত্যিই এ কোনো কল্পছবিও নয়। লালগড়ে কি এমন ঘটছে না। আমি একটি মেয়েকে দেখলাম। তার দুটি বাচ্চা। একটি কোলে, অন্যটি হাঁটু ধরে। মেয়েটির বয়স বলল ২৪। তার মুখে বলিরেখা পড়তে শুরু করেছে। এত অপুষ্টির শিকার সে। এক প্রজন্মের অপুষ্টির ফলে ২৪ বছর বয়সে চামড়া কুঁচকোয় কি! জরা আসতে চায়? সেই মেয়েকে আমার মনে পড়েছে বারবার, আমার বুকুনের থেকে যে মাত্র চার বছরের বড়ো। অপুষ্ট শুকনো ওই মেয়েটাকে কোন মুখে আমি 'অচঞ্চলা লক্ষ্মীর মতন' বলব। তবু সে-ই আমাদের লক্ষ্মী! আজ। এই মুহূর্তে। এইটে বাস্তব। এই বাস্তব, আর কবির 'ভিশন'—এই দুটোর মধ্যে ক্রমান্বয়ে যাতায়াত করছে আমাদের সময়, আমাদের সমাজ। এর দুটোই ঠিক।

বাস্তব যেমন আছে তার ক্ষতচিহ্ন নিয়ে—তেমনি কবিও আছেন তাঁর 'ভিশন' নিয়ে। মা বসে আছেন শূন্য ঘরের দাওয়ায় / কোলে তাঁর শিশু—এ পর্যন্ত বর্ণনা। 'আছেন' শব্দটির জন্য যদিও পুরো বর্ণনা বলা যায় না, তবু ধরে নিচ্ছি বর্ণনা। কিন্তু যেই যুক্ত হল 'অচঞ্চলা লক্ষ্মীর মতন'—অমনি সেটা 'ভিশন' হয়ে গেল। সময়ের পটে চিরস্থাপিত হল জ্যোতির্ময়ী মূর্তিটি। সব হারানো গ্রাম বলেই লক্ষ্মী। তবু কোথাও লক্ষ্মীর সঙ্গে যশোদাও মিশবেন। কোথাও মেরিও মিশবেন। কোলে যে শিশু। 'শিশুতীর্থ'-ও এসে যাবে না কি? কত দূর চলে গেল কবিতাটি।

গ্রাম আর মাতৃমূর্তি নিয়ে অন্য এক কবির একটি কবিতাকণা মনে পড়ে যাচ্ছে। এই

কবিতারও নাম মনে পড়ছে না। বোধহয় কয়েকটি টুকরো কবিতার মধ্যে সংখ্যা-চিহ্নিত একটি।

> পেনসিলে আঁকা মাঠ। আরও গেলে
>
> খুব খাঁ খাঁ গাঁ--
>
> খোকা বিয়োনোর পরে সাদা কাগজের মতো মা।

কবির নাম অমিতাভ দাশগুপ্ত। এই কবিতার মধ্যেও খরা-ক্ষুধা-রুক্ষতার কথা। জীবনানন্দের 'ধান কাটা হয়ে গেছে' কবিতাটা তো আমরা সকলেই কত পড়েছি। সেই 'খেতে মাঠে পড়ে আছে খড়'? 'পাতা কুটো ভাঙা ডিম'—যদিও সে-কবিতা রাত্রির কবিতা। কোথাও রাত্রির কথা স্পষ্ট বলা নেই। কিন্তু, 'ঘুমাতেছে কয়েকটি পরিচিত লোক আজ—কেমন নিবিড়।' নিশ্চয়ই দিনের বেলা ফাঁকা মাঠে ঘুমোচ্ছে না তারা। আর লাস্ট লাইনে যে 'তার চিন্তা জিজ্ঞাসার অন্ধকার স্বাদ' রয়েছে—তার মধ্যে অন্ধকার থাকায়, জীবনানন্দের ওই কবিতাটির চারপাশে অনেক অনেক রাত্রি নেমে এসেছে মনে হয়।

এই 'ধান কাটা হয়ে গেছে' কবিতাটি যদি রাত্রিকালীন খেত মাঠের কথা হয়, তবে অমিতাভ দাশগুপ্তের কবিতাটির চারিদিকে ধু ধু করছে দুপুর। একছিটে জীবনানন্দ কোথাও আছেন তবু 'বিয়োনোর' শব্দটির মধ্যে। আর কোনোখানে নেই। ভোরবেলার ধানভরা খেতের দিকে তাকিয়ে পাড়াগাঁয়ের দিকে তাকিয়ে, নদীর ধারে নুয়ে আছে ধানখেত—এই দেখে জীবনানন্দ বলেছিলেন বিয়োবার দেরি নাই। সেখান থেকে 'বিয়োনোর' কথাটা এসে থাকতে পারে। কিন্তু এ-কবিতা একেবারে বিপরীত। রক্তহীন, সদ্য-প্রসূতির কথা এখানে এসেছে। ওই 'মা' হয়ে যেন শুয়ে আছে দ্বিপ্রহরে গ্রামের পর গ্রাম। যে পথিক সে কি বাস থেকে দেখল? না! সে হেঁটে চলেছে ওই মাঠের মধ্যে দিয়ে? মনে পড়ে যায়, 'ও বড় বউ, ডাকো, ওকে ডাকো / ওই যে লোকটা পার হয়ে যায় কাঁসাই নদীর সাঁকো।' নীরেনবাবুর কবিতার কথা যখন আবারও মনেই পড়ে গেল, তখন বলা দরকার এ কবিতা সবারই খুব চেনা-পরিচিত লেখা। এবং, এ লেখাও, সম্পূর্ণ এক গ্রামের দৃশ্যই দেখায়। 'পুকুর, মরাই, সবজি বাগান জংলা ডুরে শাড়ি / তার মানেই তো বাড়ি।' এ-কবিতার নামও প্রায় সকলেরই জানা : 'স্বপ্নে-দেখা ঘরদুয়ার'। বাস্তবে নয়, স্বপ্নে-দেখা। অর্থাৎ একরকম 'ভিশন'। একদিন এমন শান্ত পরিপূর্ণতা পাবে বাংলার গ্রাম, এই স্বপ্ন এখানে আছে। এই কবিই তার একটি কবিতার নাম দিয়েছিলেন . 'একদিন এইসব হবে।' সেও এক স্বপ্নেরই কথা।

কিন্তু যার সূত্রে মনে হল, যে পথিকের সূত্রে—ও বড়ো বউ, ডাকো, ওকে ডাকো—সেই অমিতাভ দাশগুপ্তের সূত্র ধরেই তো মনে এল নীরেনবাবুর কবিতার লাইনটা—সেই অমিতাভ দাশগুপ্তকে কিন্তু শত ডাকলেও তিনি আর আসবেন না। তিনি চলে গিয়েছেন, হয়তো কোনো কাঁসাই নদীর সাঁকো পার হয়ে, চিরকালের জন্য। কিন্তু, তাঁর কবিতা আসবে, যদি ডাকি। যেমন এল এই কবিতাটি :

বলাৎকার

শিথিল এলানো ছায়া জলে,
ঘাটে কাঁপে হাওয়ায় লণ্ঠন,
খুলে যায় ডাকাতের ফাঁড়ি,
মাছ ঠোকে ছড়ানো বাসন।
চুপচাপ দূরে থাকে বাড়ি--
একা পেয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে
কারা ছেঁড়ে কুসুমকুমারী।

রাত-ভোরে যখন সে ফেরে,
স্থির-সৌদামিনী তার বোন
কপালে কাঁকন হেনে কাঁদে--
'আমাকে কি নেবে না মরণ?'

এ কবিতার চতুর্দিকেও গ্রামেরই পরিপার্শ্ব। এবং, এখানেও এক নারী আছে। তবে সে 'মা' নয়। মেয়ে। এবং সে মেয়ে হয়তো 'কুমারী'। কেন না কবিতায় 'কুসুমকুমারী' কথাটা আছে। তাতে 'অনাঘ্রাতা' শব্দটি যে বিশেষ যৌন অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে তার সংকেতও আছে। এ কবিতার মধ্যেও আছে 'বাড়ি'। 'চুপচাপ দূরে থাকে বাড়ি।' বাড়ির একটু দূরের পুকুরে বাসন ধুতে এনেছে মেয়েটি। ঘাটে লণ্ঠন নিশ্চুপ। ছড়ানো অবস্থায় পড়ে থাকা বাসনে মাছ এসে ঠুকরে যাচ্ছে। সেই সময়, অদূরে কোথাও 'কারা ছেঁড়ে কুসুমকুমারী'। এই লাইনটিতে বলাৎকারের কথা বলা হল। কুসুম বা ফুল ছেঁড়ার কথায় নতুনত্ব নেই। সবাই জানে। কিন্তু কুসুমকুমারীকে ছিঁড়ে ফেলা? তুলনারহিত এই উপমা। এই অমিতাভ দাশগুপ্তের একটি কবিতা আছে, ফুল ছেঁড়ার প্রসঙ্গে। এবং মাত্র এক লাইনের কবিতা :

'ফুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে তুমি নরমুণ্ডলোভী হয়ে ওঠো।'

বোঝাই যায়, এ কবিতার দ্বিতীয় লাইন হয় না। আর কবির এই সাহসও অবশ্যমান্য যে তিনি এক লাইনেই কবিতাটি থামিয়ে দিয়েছেন। বলাৎকার কবিতার শেষ স্তবকে, আছে সেই ধর্ষিতা মেয়েটির অপমান ও আত্মগ্লানির কথা। সেই গ্লানির যন্ত্রণা দিয়েই শেষ হচ্ছে কবিতাটি। 'আমাকে কি নেবে না মরণ!' এই লাইনটির মধ্যে মেয়েদের একটি ভিতর-মনের কথা বলা আছে। কোনো মেয়েকে যদি ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভোগ করা হয় বা মলেস্ট করা হয় এমনকি যৌনপ্রস্তাব আসে এমন কারও কাছ থেকে—যা মেয়েটির কাছে অভাবনীয়—সব ক্ষেত্রেই প্রত্যেক মেয়েরই প্রথমে মনে হয়, 'আমি কি তা হলে এতই খারাপ মেয়ে!' আমাকে দেখে কি এমন মনে হয়! আমার সঙ্গে এই ব্যবহার করা যায়? প্রথমে সে

অপমানের নিষ্ফল জ্বালায় নিজেকে দোষ দেয়। শহরের শিক্ষিত মেয়েদের জীবনেও এমন ঘটনা ঘটে। প্রথম আঘাতের ঘোর কাটিয়ে, এমনকি আঁচড়ে কামড়ে পালিয়ে এলেও—তার নিজেকেই সবচেয়ে খারাপ লাগে। হ্যাঁ, সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ভাবে, নিজেকেই সবচেয়ে খারাপ লাগে। নিজের অস্তিত্বটাই বিষ হয়ে ওঠে তার কাছে। শিক্ষিতা আলোকপ্রাপ্তা তরুণীরাও যখন এমন ঘটনার শিকার হয়ে পড়ে তাদের কারও কারও মানসিক চিকিৎসার পর্যন্ত প্রয়োজন হয়, এই আঘাত ও তৎসঞ্জাত আত্মঘৃণা থেকে সেরে উঠতে। সেখানে গ্রামের একটি মেয়ে, ডাকাতের দ্বারা ধর্ষিতা, যে তখনও কাউকে বলতে পারেনি—অন্তত এ কবিতাটি শেষ হওয়া পর্যন্ত কাউকে বলতে পারেনি যে—তার পক্ষে এই প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক—যে 'আমাকে কি নেবে না মরণ!' কাউকে বলেনি তা অবশ্য নয়। একজনকে বলেছে। কাকে বলেছে! বোনকে বলেছে। কে তার বোন? স্থির-সৌদামিনী তার বোন! এইখানে কাব্যকুশলতার একটি আশ্চর্য প্রয়োগ। 'থিরবিজুরি' কথাটা আমরা জানি। একেবারে বৈষ্ণব পদাবলি ছোঁয়া। বিজুরি বা বিদ্যুতের একটি প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হল এখানে। ফলে নতুন শব্দ তৈরি হল 'স্থির-সৌদামিনী।' এর যে গম্ভীর ধ্বনিসৌষ্ঠব তা মেয়েটির ভিতরকার স্তব্ধ ক্ষোভের ঝড়-বিদ্যুৎকে প্রকাশ করছে। থিরবিজুরি যেহেতু অনেকবার ব্যবহার হয়েছে, তাকে দিয়ে কাজ করানো মুশকিল। তাই ইনি সেই পুরোনো শব্দকে যেন অনুবাদ করে তাতে নতুন শক্তি ভরে দিলেন। আসলে এই 'এই স্থির সৌদামিনী তার বোন', এই বোন কথাটিই কবিতাটিতে সুষমা এনে দেয়। কখন বোন? রাতভোরে যখন সে ফেরে। তখন, বোন। এইখানে কবিতাটি অনির্বচনীয়ের স্তরে পৌঁছোয়। অথচ, একইসঙ্গে স্পষ্ট একটি অর্থও ধরে রাখে কবিতাটি। এই কবিতাটিও মিল ব্যবহারকে আশ্চর্যভাবে লুকিয়ে রাখে। কারণ, মিল যদি প্রথম থেকে চোখে পড়তে পড়তে চলত, তাহলে কবিতাটির মূল যাত্রাপথে ও আবহসৃষ্টিতে বিঘ্ন ঘটে যেত।

'বলাৎকার' কবিতাটি যখন প্রথম ছাপা হয়েছিল তার সজ্জা ও শব্দ যেমন যেমন ছিল, আমি এ লেখায় তেমনই রাখলাম। শ্রেষ্ঠ কবিতায় গ্রন্থবদ্ধ অবস্থায় 'কপালে কাঁকন হেনে বলে' করা আছে, 'কাঁকন হেনে কাঁদে'-র জায়গায়। চুপচাপ দূরে থাকে বাড়ি হয়েছে, 'বহুদূরে চুপচাপ বাড়ি'। এবং একটি স্পেস রেখেছেন কবি প্রথম চার লাইনের পর। 'রাত-ভোরে' হয়েছে 'ভোররাতে'। 'চুপচাপ দূরে থাকে বাড়ি'-তে যেন মেয়েটি বাড়িটিকে দেখতে পাচ্ছে, তবু তার বিপদের সময় বাড়িটি তাকে বাঁচাতে আসছে না। তার অত চেনা বাড়িটি।

'আমাকে কি নেবে না মরণ' নিজের ভাগ্যের ও জীবনের প্রতি এই ধিক্কারে এসে দাঁড়িয়েছে 'বলাৎকার' কবিতা। অন্য একটি কবিতা চাইল ঘুরে দাঁড়াতে। এমনকি, প্রতিশোধ নিতে। একই সময়ে লেখা অন্য এক কবির লেখায়।

বিচার

খেতখামার ছেড়ে দিয়ে তামা-রোদ ডালপালায় জাল পেতে রাখে।

উত্তরে ইটখোলা থেকে ঝুড়ি ও কোদাল কাঁধে ফিরে আসে নির্মল মেয়েরা,
ক্ষুধায় কাহিল সন্ধ্যা হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে মহাজন-রজনির ডাকে,
কুপির আলোয় খোলে খেজুর পাতায় ঘেরা কুলিদের ডেরা,
চুরুট, ফোলিও হাতে আতরের গন্ধখানি দেখা দেয়,
খুদের জাউয়ের সঙ্গে মিশ খায় সুদ বাদে অর্ধেক মজুরি,
দাঁতে-দাঁত-ঘষা কিছু মরদ বাতাস ছিল, বাতাসে শানানো ছিল ছুরি।

সিল্কের পাঞ্জাবি লোটে চাটাইয়ের ডানপাশে, রাত্রি জ্বলে সোনার বোতামে,
কবজির ডায়ালে কাঁপে আমিষাশী রেডিয়ম, সংবিধান ভিজে যায়
তেজারতি ঘামে,
দু-চোখে গড়ায় জল শব্দহীন, ভারতমাতার বুকে নখের আঁচড় আর
অনন্ত দেহাতি হাহাকার—
বাঁকানো চাঁদের ফণা নেমে গিয়েছে ততোধিক বাঁকা এক নদীর ওপার—
দু-ভাঁজ অশোকস্তম্ভ ওঁত পেতে বসেছিল তেলচিটে বালিশের পাশে
আংটির পাথর-সাঁটা নির্বাচনী থাবা জুড়ে সংসদীয় শান্তি নেমে আসে।

ওঁ শান্তি। হাওয়া যায় টলমল বাবুর পেছনে, আর যায় রাত্রি ভোরের চৌকাঠে
কেবল ছত্তিশগড়ি উল্লাসে মেয়েরা দেখে কর্তার ঘচাৎ মুণ্ড পড়ে আছে
দক্ষিণের মাঠে।

এ অসামান্য কবিতাটি লিখেছেন মণিভূষণ ভট্টাচার্য। এ কবিতার মধ্যেও আছে আমার দেশের গ্রাম। আছে শ্রমিক নারী-পুরুষের জীবন। এ কবিতার প্রথম শব্দই খেতখামার। অপূর্ব সব ছবির মিছিল এ কবিতা। এ কবিতা পড়লে মনে হয়, কোনো পরিচালকের জন্য যেন একটি চিত্রনাট্য তৈরি করাই আছে। একটি সংলাপও ব্যবহার না-করে, কবিতাটিকে অনুসরণ করেই ছোট্ট একটি ফিল্ম যেন তৈরি হয়ে যাবে। শহরবাসী মধ্যবিত্তদের না-জানা, অত্যল্প-জানা, পাখির চোখে দূর থেকে জানা, একটি জীবনযাত্রার কথা এ কবিতা বলে। আশ্চর্য শক্তিশালী এর শব্দ ব্যবহার। ইটখোলা। শ্রমিক ঝুপড়ি। ঝুড়ি ও কোদাল কাঁধে মেয়েদের ফিরে আসা। মহাজন-রজনির ডাক। মরদ-বাতাস। এইসব শব্দ ওই জীবনের আবহাওয়া নিখুঁত ফুটিয়ে তুলতে থাকে। দ্বিতীয় স্তবকে এসে কবিতাটি যেন তার শিল্পসিদ্ধির চরমে পৌঁছোয়। কী তার ছবি ব্যবহারে, কী তার শব্দ ব্যবহারে। কবজির ডায়ালে কাঁপে আমিষাশী রেডিয়ম। এবং সংবিধান ভিজে যায় তেজারতি ঘামে। এবার পুরো ব্যবস্থাটাকে, রাজনৈতিক ও সামাজিক শোষণ প্রক্রিয়াকে সরাসরি টেনে আনা হল। চাটাই সিল্কের

পাঞ্জাবি থেকে দু-ভাঁজ অশোকস্তম্ভ পর্যন্ত পৌঁছোনো—শুধু ছবি দিয়ে বলা হচ্ছে, অথচ সবটাই সংকেতময়। প্রত্যক্ষ সামাজিক অন্যায়ের বিরোধিতা করছে এ কবিতা—কিন্তু শিল্পগুণে চমৎকৃত করতে করতে চলেছে। দু-ভাঁজ অশোকস্তম্ভের পাশে তেলচিটে বালিশ। দু-চোখে গড়ানো জল, মেয়েটির অসহায় আত্মসমর্পণ বোঝাচ্ছে। কিন্তু পরক্ষণেই ওই দেহাতি কামিন-মেয়ে স্বয়ং ভারতবর্ষে রূপান্তরিত হচ্ছে। নীরেনবাবুর কবিতায় যেমন একটি গ্রাম্য বউ রূপান্তরিত হয়েছিল দেবী লক্ষ্মীর প্রতিমায়। এ কবিতায় দেহাতি মেয়েটি দেশমাতৃকার রূপ নিল। আমাদের কবিরা যে কীভাবে দেখতে পান, দেখাটা যে কী অনন্য হয়, ভাবলে কৃতজ্ঞতায় বুক ভরে আসে। মণিভূষণের এ কবিতায় দেহাতি হাহাকারের আগে অনন্ত বসানো হয়েছে, কারণ, এ বঞ্চনা, এই চিরকাল চলছে। 'কবজির ডায়ালে কাঁপে আমিষাশী রেডিয়ম' ও 'তেজারতি ঘামে' সংগমের পরিশ্রম ফুটে উঠছে।

এ কবিতা অত্যাচার মেনে নেয় না। তাই কর্তার ঘচাৎ মুণ্ড পড়ে থাকে দক্ষিণের মাঠে। অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে এখানে তার পূর্ণ শক্তিতে, একেবারে এক নিজস্ব ধরনে ব্যবহার করেছেন মণিভূষণ। দুটি শব্দ একসঙ্গে জুড়ে, হাইফেন দিয়ে, অথবা না-দিয়েও, অল্প জায়গায় অনেক বেশি অর্থ প্রকাশ করতে করতে চলেছেন। এই যে কর্তা বা বাবু, এ কীভাবে দেখা দিল প্রথমে! চুরুট ফোলিও হাতে আতরের গন্ধখানি দেখা দেয়। চরিত্রটির এই প্রবেশ। মাঝখানে সংগম বা এক অর্থে ধর্ষণকালে তার ছবি। শেষে, হাওয়া যায় টলমল বাবুর পিছনে। আর 'যায় রাত্রি ভোরের চৌকাঠে'-র মধ্যে দিনবদলের ইঙ্গিত। বাঁকানো চাঁদের ফণা। এবং ততোধিক বাঁকা এক নদীর প্রসঙ্গে, কেবল বাউলের বাঁকা নদী খুঁজলে চলবে না। 'কর্তার ঘচাৎ মুণ্ড' যে শেষে এল, তার মধ্যে বাঁকা ভোজালি বা ওই ধরনের বাঁকা শাণিত অস্ত্রের সংকেত। শুধু, চাঁদ ও নদীর চিত্রকল্পে। 'এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে' মনে পড়ে কি? কিন্তু দীনেশ দাসের সে-কবিতা লেখার পর এতদিন কেটেছে, এই হতদরিদ্রদের জীবন তো বদলায়নি। তাই বদলের প্রতিশোধের ডাক এই কবিতা। তাই তার নাম বিচার। এখানে ধর্ষণকারী মহাজনের হাতের থাবা, 'আংটির পাথর-সাঁটা থাবা' নির্বাচনী থাবা হয়ে উঠে মিলে গিয়েছে নির্বাচনী ব্যবস্থার সঙ্গে। সংসদীয়-শান্তি কথাটি লক্ষণীয়। এবং শেষ স্তবকের প্রথমে 'ওঁ শান্তি'। শান্তির পথ এ-কবিতা বলছে না। বলছে অস্ত্র ধরবার পথ, আর প্রতিশোধের পথ। কপালে কাঁকন হেনে কান্না যেমন বাস্তব–এই প্রতিশোধও সেই বাস্তবের পরবর্তী ফল। অমিতাভ দাশগুপ্ত এবং মণিভূষণের দুটি কবিতাই লেখা হয়েছিল, '৭৩ সালে। আমি মণীন্দ্র গুপ্ত ও রঞ্জিত সিংহের অধুনালুপ্ত খ্যাতকীর্তি সংকলনটি থেকে কবিতা দুটি নিলাম। এ জন্য যে, ওই সময়েই গ্রাম জীবনের অবস্থা ও পীড়নের চিত্র তুলে ধরছিলেন আমাদের কবিরা। সশস্ত্র প্রতিরোধ বা অভ্যুত্থানের কথা সবচেয়ে বেশি এসেছে মণিভূষণের কবিতায়, সেই ৩৬-৩৭ বছর আগেই।

'৭৩ সালের কথা যখন উঠলই, তখন ইতিহাসের একটি আশ্চর্য সমাপতনের দিকে তাকানো যাক। ১.১১.২০০৯-এর 'সংবাদ প্রতিদিন'-এ সুনীল সরকার তাঁর প্রতিবেদনে জানাচ্ছেন কয়েকটি তথ্য : "জঙ্গলে বসে ছক কষে চলেন মধ্য পঞ্চাশের তেলেগু নেতা।

১৯৭৩ সালের আইনের ছাত্র। তিনি মাও-এর নীতি ও অতিবাম রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন। কবিতা লেখার অভ্যাস। ছদ্মনাম নাকি 'অসিধার'। দেশ-বিদেশের প্রচুর পত্র-পত্রিকা পড়েন। চা-প্রেমী এই নেতার কাছে বন্দুকই ক্ষমতার উৎস। তাঁর প্রকাশিত ছবিতে মুখ দেখা না গেলেও বন্দুকের নল স্পষ্ট। রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সংবিধানে তার বিশ্বাস নেই। বরং রাষ্ট্রীয়শক্তি ঘোর শত্রু। গণ আন্দোলনে তাদের প্রভাব গাঢ় হয়।" অর্থাৎ, সেই '৭৩ সালেই, আইনের এক ছাত্র, তেলেগু ভাষার তরুণ এক কবিতা-রচয়িতা, ধীরে-ধীরে হয়ে উঠছিলেন 'কিষেণজি'। যিনি এখনও কবিতা লেখা ও প্রকাশ করা বন্ধ করেননি। পাশাপাশি, বাংলায়, সশস্ত্র বিদ্রোহকে আবাহন করে, ওই '৭২-'৭৩-তেই, কবিতা লিখছিলেন মণিভূষণ ভট্টাচার্য। এঁরা পরস্পরকে চিনতেন না নিশ্চয়, কিন্তু ইতিহাসের চলন এরকমই। '৭৩-এই মণিভূষণের 'শ্রীপঞ্চমী' কবিতায় আমরা এক দেবী সরস্বতীর সাক্ষাৎ পাই, যিনি ভীষণা। 'মহাসমুদ্রের সমস্ত নৈশ বর্ণমালা শুষে তার শরীরে উঠে এল / অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার।' এবং তার আগেই, সেই সরস্বতীর 'হাতের পুথি নিক্ষিপ্ত হল সমুদ্রগর্ভে, দেবী / ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন উর্ধ্ব আকাশে--কেড়ে নিলেন / কালপুরুষের খড়্গ।'

ফল কী হল? 'তাঁর বাঁ হাতে টাইয়ের ফাঁসে ঝুলতে লাগল বিকট উপাচার্যদের / ছিন্নমুণ্ড, / সমস্ত লম্পট দার্শনিক গুপ্তচর গণতন্ত্রী আর মূর্খ শিক্ষামন্ত্রীদের / ছেঁড়া মাথায় তৈরি হল তাঁর কণ্ঠহার।' অর্থাৎ, সরস্বতী মুণ্ডমালিনীতে রূপান্তরিত হলেন। মুণ্ডের তালিকায় 'গণতন্ত্রী' কথাটাও কিন্তু লক্ষণীয়। এই মণিভূষণেরই 'মন্টুর জীবন' নামক বিখ্যাত কবিতায় এক চা-দোকানের কিশোর শ্রমিকের কথা বলা আছে। মন্টু যার নাম। অনেক রাত্রে, দোকান বন্ধ হওয়ার আগে, তার নিজের জন্য রাখা শেষ পাউরুটিটাও, দু-ভাগ করে দুই শাঁসালো খদ্দেরকে দিয়ে দিতে হয় তাকে, যে খদ্দেরদের একজন পৌরপিতা। অভুক্ত মন্টুর জন্য আর কিছুই থাকে না। মণিভূষণ লিখেছিলেন, কিছুই থাকে না তা নয়। একটা কিছু থাকে। কী সেটা?

...'পাউরুটি কেটে দু-টুকরো করে দুজনকে দিয়ে দিলেও তার হাতে আর একটা জিনিস / থাকে—ভারতবর্ষের অন্ধকার আকাশে হঠাৎ লাফিয়ে ওঠা বিদ্যুতের মতো / আট ইঞ্চি লম্বা ঝকঝকে একখানা ছুরি।'

অস্ত্র ধরার জন্য প্রত্যক্ষ আহ্বান। সর্বহারাকে অস্ত্র ধরতেই হবে এই ইঙ্গিত অনেকবার দিয়েছে, সংসদীয় শান্তিকে ও নির্বাচন প্রথাকে অনেকবার বিদ্রুপ করেছে মণিভূষণের কবিতা। অনেকবার কথা বলেছে বঞ্চনার জবাবে অস্ত্রের ব্যবহার ও রক্তক্ষয়ী প্রতিআক্রমণের সপক্ষে। নকশাল আন্দোলনের প্রায় সমসাময়িক, ৩৬-৩৭ বছর আগে লেখা, এইসব কবিতা আজ সত্য হয়ে দেখা দিচ্ছে জঙ্গলমহলে। ভারতবর্ষের অন্যত্রও। এইজন্যই হয়তো বলা হয়, কবিরা ভবিষ্যৎ দেখতে পান।
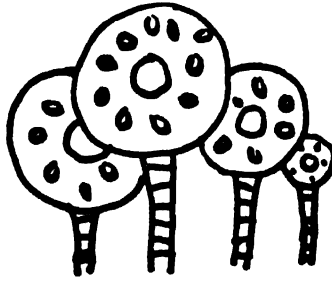
৩৫

সব মিলিয়ে মোট তিনবার আমি দেখেছিলাম বিনয় মজুমদারকে। দু-বার তাঁর বাড়ি গিয়ে। একবার হাসপাতালে। হাসপাতালে যখন তাঁকে দেখতে যাই, তখন, বড়ো একটা অসুস্থতার পর তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। যতদূর মনে হচ্ছে, '৮৬ বা '৮৭ সাল হবে। সংবাদপত্রে তাঁর অসুস্থতা, হাসপাতাল-বাস ও ক্রমসুস্থতার কথা পড়ছি। কবিবন্ধুদের মুখেও শুনছি। একদিন গেলাম। উনি ঘুমোচ্ছিলেন বিকেলে। পাশে একটা সন্দেশের বাক্স রাখা। একটা সন্দেশ আমাকে দিলেন। কথা তো বেশি বলছেন না। আমিই কেবল বারবার বলে যাচ্ছি, খুবই আনন্দের কথা আপনি ভালো হয়ে গিয়েছেন। এবার অনেক লিখুন—এইসব হাবিজাবি, যা লোকে কথা খুঁজে না-পেলে বলে। একবার বললেন, ছাতাটা তুলে ঝোলায় ঢুকিয়ে রাখো। ফেলে চলে যাবে। ছাতাটা মেঝেয় রেখেছিলাম। কবিতা ইত্যাদি সম্পর্কে একটি বাক্য নয়। কখন বেরিয়েছ? ক-টায় গাড়ি? শেয়ালদা যাবে তো! এইসব। আমি উঠে চলে আসছি, উনি উঠে দরজায় এসেছেন। আমি হাসপাতালের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথার অভাবে কিছুটা নার্ভাস হয়েই বলে ফেললাম, খুব আনন্দের কথা। আপনি ভালো হয়ে গিয়েছেন। এবার বাড়ি গিয়ে অনেক লিখুন। হঠাৎ স্থির, একটু-দূরে-নিবদ্ধ ধরনের চোখে একটা বাতি দপ করে উঠল। 'ভালো?' 'ভালো' কারে বলো!'—মানে ডাক্তাররা তো বলছেন। 'ডাক্তার কী ব-অল-বে? একটা দশ বছরের ছেলের মতো মন কি আমি আর কখনও পাব? তাহলে?'

আমি চুপচাপ চলে এলাম। এই হঠাৎ-বিদ্যুতের মতো কথাটি তিনি বলেছিলেন একেবারেই তাঁর নিজস্ব সুর ও উচ্চারণ ভঙ্গিতে। যারা শুনেছে তাঁর বাচনভঙ্গি—তারাই জানে। দশ কথাটি উচ্চারণ করছেন জোর দিয়ে দ-অ-শ। যেহেতু দশ বছরের ছেলের মতো মন উনি আর পাবেন না, তাই এটাকে কি ভালো হওয়া বলে!

আমি বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবলাম, দশ বছরের ছেলের মতো মন দিয়ে কী দরকার? তাতে কী লাভ হবে! মাধব দত্ত যেমন বলেছিল ঠাকুরদাকে, 'ডাকঘর' নাটকের শেষ দিকে, তারার আলোতে আমার কী হবে! সেইরকম।

চুপ করো, অবিশ্বাসী কথা কোয়ো না বলবার জন্য কেউ অবশ্য ঠাকুরদার মতো ছিল না আমার সঙ্গে। কিন্তু আজ দু-দশক পার করে একটু একটু অনুমান করতে পারি কী বলতে চেয়েছিলেন বিনয় মজুমদার।

একজন গ্রিক কবির একটি উক্তি, থেকে থেকেই মনে পড়ে আমার। মাঝে মাঝে ব্যবহারও করি। কনস্টানটিন কাবাফি নামে সেই কবি বলেছিলেন : দ্য পোয়েট হু নো'জ হিজ অডিয়্যান্স ইজ লিমিটেড, ক্যান এনজয় ট্রিমেন্ডাস ফ্রিডম ইন হিজ রাইটিং। যে লোক জানে যে তার কবিতা অল্প লোক পড়বে, সে তাহলে তার লেখা নিয়ে যা-খুশি তাই করতে পারে? তাই তো! আর এই যা-খুশি-তাই থেকে উঠে দাঁড়াতে পারে একেবারে অচেনা, অপ্রত্যাশিত কোনো আশ্চর্য কবিতার ফর্ম।

উৎপলকুমার বসুর 'আবার পুরী সিরিজ', শক্তির চট্টোপাধ্যায়ের 'হে প্রেম...' থেকে 'প্রভু নষ্ট হয়ে যাই' পর্যন্ত সব—সুনীলের 'আমি কীবকমভাবে বেঁচে আছি' বইটি, বা 'কবির মৃত্যু' নামক দীর্ঘকবিতা—আলোক সরকারের 'বিশুদ্ধ অরণ্য' ও 'অন্ধকার উৎসব', গৌতম বসুর 'অন্নপূর্ণা ও শুভকাল' বা 'রসাতল' নামক কবিতাগ্রন্থগুলি যেমন। উৎপলকুমারের 'আবার পুরী সিরিজ', বা শক্তি চট্টোপাধ্যায়, আলোক সরকার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বইগুলোর পৃষ্ঠাসংখ্যা স্বাভাবিক কবিতাপুস্তকেরই আকার অনুযায়ী। কিন্তু গৌতম বসু-র বই দুটি নিতান্তই ১৬ পৃষ্ঠার। তাও তাকে গ্রন্থ বলছি কেন! তার বিষয়ের যে-ওজন, ওই কয়েকটি কবিতার যে-ভার, তাতে 'অন্নপূর্ণা ও শুভকাল' বা 'রসাতলকে' 'গ্রন্থ' ছাড়া অন্য কিছু বলে অভিহিত করতে পারি না আমি।

এইসব বইয়ের লেখা, স্বাধীন লেখা। যে বয়সে এঁরা এই বইগুলো লিখেছেন, তখন এঁদের অডিয়্যান্স লিমিটেডই ছিল। তাঁদের মন স্বাধীনভাবে কাজ করেছে। এখানে একটা কথা বলা দরকার। কাবাফি-র বাক্যটির মধ্যে, নো'জ কথাটির মধ্যে, আর একটা কথাও ছিল। কী কথা? আমার লেখা সামান্য কজন পড়বে, এটা কবি শুধু জানে-ই না (নো-জ-ই নয়), মেনেও নিয়েছে। তাই তার ফ্রিডম অত স্ফূর্তি পেয়েছে। স্বাধীনতা কী সে জানে।

কিন্তু যার লেখা অনেকে পড়েছে, সে, অর্থাৎ তার মন, স্বাধীন থাকার সম্ভাবনা কম কেন? হয় কী, যত দিন যায়, বয়স বাড়ে, লেখা ছাপা হওয়া বাড়ে বা পরিচিতি বাড়ে, তখন নানাজনের কাছ থেকে ক্রমাগত নানাধরনের ফিড-ব্যাক এসে পৌঁছোতে থাকে। এমন লেখকও আছেন, যাঁরা ফিড-ব্যাক পাওয়ার জন্য হা-পিত্যেশ করে থাকেন। অন্তত এমন একজন লেখিকা ও একজন কবিকে জানি, যাঁরা লেখা শেষ হওয়া মাত্র, 'জানি না লোকজন কী বলবে' ধরনের মন্তব্য করতে শুরু করতেন। তখনও ছাপা হয়নি। কিন্তু মনে-মনে তাঁরা ছটফট করছেন।

এই দুজনকে, ব্যতিক্রম হিসেবে সরিয়ে রাখি না হয়। কিন্তু অন্য সময় কী হয়? নানা ধরনের ফিড-ব্যাক পৌঁছোনো মাত্র মনের মধ্যে শুরু হয় প্রতিক্রিয়ার স্রোত। মুখে হয়তো সেইসব টুকরো মন্তব্য, কখনও বা লিখিত সমালোচনার কোনো উত্তর দেওয়া যায় নি, কিন্তু

মনে-মনে সেইসব মন্তব্যের সঙ্গে কথা বলা থেকে বা তাদের বিপক্ষে পালটা যুক্তি সাজানো থেকে তো আমি নিজেকে বিরত রাখতে পারছি না। ফলে, লেখার ঘরে একা বসেও, কিন্তু আমি মনে মনে কথা বলছি সেইসব বিরুদ্ধমন্তব্যকারী ও লিখিত সমালোচনার লেখকের বিরুদ্ধে। অর্থাৎ, সাক্ষাতে দেখা না-হলেও, নিজের একা লেখার ঘরেও আমি একা নই। ঢুকে পড়ছে অন্য কতকগুলো মানুষ, যারা আমার লেখার প্রতি বিরূপ।

এই সেই জায়গা, যেখানে আমি স্বাধীনতা হারাচ্ছি। নিজের রেওয়াজের ঘরে অন্য লোক ঢুকতে দিচ্ছি—কোলাহল ঢুকতে দিচ্ছি। সেই অন্য মুখদের অন্য লোকদেরকে ডেকে আনছে আমারই মন!

সে-ই মন, যে আমার প্রধান সম্পদ, প্রধান সহকর্মী। সে-ই পিছনের দরজা খুলে দিয়ে বিপন্ন করছে আমার স্বাধীনতা। ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে আমার লেখার। কীভাবে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে? আমি আমার লেখার মধ্যে অজান্তেই বিরোধীদের প্রত্যুত্তর দিতে শুরু করছি। অর্থাৎ আমার লেখা আমি নিজেই নিয়ন্ত্রিত হতে দিচ্ছি অন্যের দ্বারা। অন্যদের বলা কথার পিছনে ছুটছি নিজের মনের কথা না-লিখে। আমাব মন তখন প্রতারণা করছে আমার সঙ্গে। বলছে, ওদের অভিযোগের উত্তর দাও! আর সেইখানেই স্বাধীনতা হারাচ্ছি আমি!

বিনয় মজুমদারের ওই-হঠাৎ-উত্তেজিত মন্তব্য, আমার কাছে অন্য অর্থ নিয়ে দেখা দেয় আজ। বিনয়, কথাটি, নিজের মনের আবহাওয়া বিষয়ে বলেছিলেন। কিন্তু, ছোট্ট ওই কথা, আমার কাছে আজ এইটে বোঝায়, যে মন-ই একজন কবির প্রধান সম্পদ। সেই মন থেকে যদি বিস্ময়, প্রসন্নতা, আলো চলে যায়, কবিতার কী অবস্থা হয়। তেমন কবিতা আমি অনেকই দেখি। সুঠাম, সুছাঁদ রচনা। কিন্তু কবির মনটি সেখানে পঙ্গু। এই ভয় নিজের দিকে ফিরে আসে, জীবনের ঝড়ঝাপটার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় কী সেই উপায়, যা মনকে অসুস্থ করবে না? প্রতিহিংসার জন্য, শাণিত-তীব্র একটা পালটা উত্তরের জন্য আমাকে ভেতরে ভেতরে মরিয়া করে তুলবে না? অভিযোগের পর অভিযোগের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে উড়তে হবে প্রসন্নতার আকাশে। সে হল প্রতিদিনের রেওয়াজ।

বিনয় মজুমদারকে দেখাশোনা করছিলেন যিনি, সেই নার্সের কাছে শুনেছিলাম, বাড়ি ফিরে যেতে চাইছেন না বিনয়। হাসপাতালেই থেকে যেতে চাইছেন। কারণ, নিশ্চয়ই, তাঁর অনিশ্চয়তা-ভরা ভবিষ্যৎ। জীবিকা ও পরিজন-হারা একটি পুরোনো জীবনে ফিরতে হয়তো ইচ্ছে করছিল না তাঁর সেই মুহূর্তে। আর বোকার মতো আমি, বারবার ভালো হয়ে গিয়েছেন বলায়, তাঁর মনের সেই জায়গাটায় নাড়া পড়েছিল। অর্থাৎ ভালো হওয়া কারে বলো! দশ বছরের বালকের মনে যে কল্পনাপ্রবণতা, অকারণ খুশি, জগৎকে দেখার বিস্ময়, যে কোনো তুচ্ছ জিনিস দেখেও যে বিস্মিত আনন্দ, তা তিনি আর পাবেন না বলে আশঙ্কা করছিলেন। যদিও বিনয় মজুমদারের প্রান্তজীবনের কবিতায়, ঠাকুরনগর নামের গ্রামটির অপূর্ব প্রকৃতি এক নতুন রূপসি বাংলা হয়ে বিস্মিত আনন্দেই ফুটে উঠেছে। তবু সেই মুহূর্তে অনিশ্চয়তা ভরা জীবনের মধ্যে ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা তাঁর মনকে ভারাক্রান্ত করে

রেখেছিল, তাই অমন বলেছিলেন হয়তো। 'অভিশপ্ত দেবতার শবে' নামক স্মৃতিচারণায়, বিভাস রায়চৌধুরী বুকমোচড়ানো এক প্রত্যক্ষদর্শী-বিবরণে বিনয়ের শেষজীবনের সত্য ছবি এঁকেছিলেন, যে কোনো পাঠকের যা পড়া উচিত। সে লেখায় বিনয়ের উক্ত আশঙ্কার পরিণতি বলা আছে।

অবশ্য দশ বছরের বালক-মনই আক্ষরিকভাবে বিনয়ের আমাকে বলা কথাটির লক্ষ্য, তা হয়তো নয়। মনকে বালক-মনের মতো বিস্ময়পূর্ণ উড়ালক্ষম রাখতে হবে, রাখা দরকার, কবির পক্ষে দরকার।

এটাই ওই বাক্য থেকে আমি শিখি! রাখব কী করে তা অবশ্য জানি না।

নিজের মনের পরিচর্যা ও শুশ্রূষা একজন কবিতা-লেখককে, শেষ পর্যন্ত নিজেকেই করতে হয়। নইলে বাইরের অনাদরে, উপেক্ষায় অথবা অতিরিক্ত সম্মানলাভে, (অর্থাৎ সেই সম্মানকে মোক্ষ বলে বিশ্বাস করে) মনের ক্ষয় ঘটতে ঘটতে মৃত্যুমুখে পতিত হয় সেই মন। জীবিত-কবির মৃত-মনের লেখাও আমরা কতই পড়েছি। সাধারণ খ্যাত-পরিচিত কবিদের মধ্যবয়স-উত্তীর্ণ লেখাতেই এই চিহ্ন বেশি দেখা যায়। মধ্যবয়স-উত্তীর্ণ মানে! মানে ঠিক যে-বয়সের মধ্য দিয়ে গত কয়েক বছর আমি চলেছি। নিজের কথা ভেবেই এ কথাগুলো বলা। নিজেকেই স্মরণ করানো।

অভিযোগ এবং তার উত্তরে পালটা অভিযোগ—এই নিয়ে আমাদের সমাজজীবনের, এমনকি পারিবারিক জীবনেরও, অনেকটা সময় কেটে যায়। কবিতা লিখতে বসেও কি তাই করব? সহযাত্রীর প্রতি অভিযোগ! অবশ্য অভিযোগ কোথাও কোথাও ব্যক্তিগত স্তর ছাড়িয়ে উঠে যায়। আর তখন সেটা অভিযোগও থাকে না। হয়ে ওঠে একটা খারাপ প্রথা বা অন্যায় ব্যবস্থার থেকে মুক্তি-ইচ্ছা।

সমস্ত সমাজের মুক্তি-ইচ্ছা। কীরকম? এ কবিতাটি ধরা যাক।

আত্মপ্রতিকৃতি

আমার মেয়েটি কালো, দেখে যাও রাজার কুমার
দেখে যাও দশহাজারী, বিত্তহীন কেরানীর কালো
মেয়েটিকে দেখে যাও, দেখে যাও মাল্টিন্যাশন্যাল
কোম্পানির রাঙা মুলো, অতিশয় ফরসা শিল্পপতি,
দেখে যাও কালো চশমা, ইম্পোর্টেড জীন্স, দেখে যাও
গলার সোনার চেন, মারুতি হাজার, ঘরে গুঁজে
প্যান্ট পরা, লম্বা চুল, পরির স্বপ্নের সদাগর
গরিব বাপের ছেলে, হিং টিং ছটের কবিরা
মেয়েটির বিয়ে দেব, পছন্দ না হলে ফিরে যেও
দু'বেলা বাসন মাজা, উনুন ধরানো, ভাত রাঁধা

মেয়েটিকে দেখে যাও, আমার দুয়ারে পর্দা নেই।
রোদে পোড়া, জলে ভেজা অযত্নের লতার বিবাহ।

আমি তাকে দেখাব না চেয়ে-আনা বেনারসি মুড়ে,
আমি তাকে দেখাব না কনে দেখা সোনালি আলোয়,
আমি তাকে সাজাব না নকল জড়োয়া গহনায়,
রুজে ও পাউডারে ঢাকা দেব না মেয়ের কালো রঙ,
সে এসে দাঁড়াবে সামনে বাসন মাজার হাত ধুয়ে,
সে শেখেনি ভ্রূবিলাস দাঁত চেপে শব্দ উচ্চারণ,
নটীর মাদক লাস্য, ড্রয়িংরুমের সূক্ষ্ম চাল
কিছুই শেখেনি মেয়ে, সে এসেছে মার্জনাবিহীন
সে জানে না প্রতারণা, সম্মোহনী জাদুর কুহক,
সে আমার সহজিয়া, সে আমার অ-রোপিত লতা
সে আমার কালো মেয়ে, আঁচলে জলের হাত মুছে
দাঁড়িয়েছে, কারোকেই বিমুগ্ধ করার দায় নেই।

এই কবিতাটিও নিজেকেই বলা। 'আত্মপ্রতিকৃতি'। নিজেরই জীবন-ছবি। এই কবিতাটি লিখেছেন আবদুস সামাদ। যে-বইতে এই কবিতা আছে সেই বইটি এখন আর কোথাও পাওয়া যায় না। ছাপা নেই। এক বন্ধু জেরক্স করে দিয়েছেন আমাকে বইটি। বইটির নাম : 'চাঁদ ও পয়ঃপ্রণালী'।

এই যে, বিবাহের জন্য পাত্রপক্ষকে কন্যা দেখানোর প্রথা দীর্ঘকাল ধরে রয়েছে, এ সম্পর্কে নানা লেখালেখি দেখা গিয়েছে। মেয়েরা প্রতিবাদ করে নিবন্ধ লিখেছেন। কখনও কবিতাও বা। কিন্তু পিতার পক্ষ থেকে যে কিছু বলার আছে—সাম্প্রতিককালে, কখনও তা নিয়ে কবিতা লেখা হয়েছে কি! সমস্ত অভাবি, সমস্ত কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার প্রতিনিধিত্ব করছে এই কবিতা। এবং কথা বলছে কণ্যাদায় শব্দটিরও বিরুদ্ধে। আমার কন্যা আমার দায় হবে কেন? আমার মেয়ে আমার দায় নয়। কারোরই দায় নয়। মেয়েকে বারবার সাজিয়ে গুছিয়ে পাত্রপক্ষের সামনে হাজির করালে—মেয়ের যা কষ্ট হয়—মেয়ের বাবারও সেই কষ্ট শতগুণ হয়ে বাজে। এ কবিতার মধ্যে শ্লেষ আছে, ব্যঙ্গ আছে, আর্থিকভাবে উন্নততর শ্রেণির প্রতি। কিন্তু তার মধ্যে এত গভীরভাবে দুঃখ মিশে রয়েছে, এমন স্নেহের বেদনা, যে, ক্রোধ ও শ্লেষকে তা অতিক্রম করে উড়াল-ক্ষমতা পেয়েছে। এই সেই উড়ালশক্তি, যা কবিকে, উঁচু আকাশে নিয়ে যায়, তখন নিজের মেয়ের কথা, শুধু নিজের মেয়ের কথাই থাকে না। আত্মপ্রতিকৃতি বললেও থাকে না। আমাদের এই গরিব দেশের সমস্ত পিতার কথা হয়ে ওঠে।

এটা ঠিকই, একেবারে আজকের দিনে এই প্রথাটা হয়তো খানিক চাপে পড়ে সরে

গিয়েছে একটু। কিন্তু গ্রামে-গঞ্জে, দূর শহরতলি-মফস্‌সলে এই প্রথার দাপট আজও অব্যাহত। অন্তত আমাদের যৌবনকালে এই প্রথারই প্রাধান্য দেখেছি। বিবাহের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছা-নির্বাচনে বরং সমস্যা ছিল অনেক। আজও নেই তা নয়। এই কবি, আবদুস সামাদ, ইনি তাঁর বয়স ও অভিজ্ঞতার কারণে এই প্রথাটির প্রবলতা নিশ্চয় দেখেছেন। আবদুস সামাদকে আমি কখনও দেখিনি। শুনেছি এঁর বয়স প্রায় ছেষট্টি, অবসর নিয়েছেন পাঁচ বছর। ইনি কলকাতায় আসেন কি না জানি না। এলে এতদিনে একবার কি দেখা হত না? থাকেন রানিগঞ্জে। ইনি বড়ো হয়ে উঠেছেন ও বাস করেছেন মহানগর থেকে দূরে। ইনি এই ব্যবস্থার প্রকটতা মর্মে-মর্মে বুঝেছেন। কিন্তু, একটি বিষয়ে বেদনা পেলে, ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলেও, তা নিয়ে কবিতা লিখলে লেখাটি উত্তীর্ণ হবে, এমন কোনো কথা নেই। যে কবিতাটির কথা আমি এখন বলছি, 'আত্মপ্রতিকৃতি', সে কবিতার মধ্যে স্বয়ং কবিত্ব অবস্থান করছেন!

দু'বেলা বাসন মাজা, উনুন ধবানো, ভাত রাঁধা
মেয়েটিকে দেখে যাও, আমার দুয়ারে পর্দা নেই
রোদে পোড়া, জলে ভেজা, অযত্নের লতার বিবাহ।

'অযত্নের লতার বিবাহ'—এই যে কথাটি বলে উনি স্তবক থামালেন, এ কি বড়ো কবির পরিচয় নয়? তা ছাড়া কোন মেয়ের বাবার এ লাইন পড়ে চোখে জল আসবে না! যেভাবে বাড়ির উঠোনে অযত্নের লতাগাছ বেড়েছে, সেভাবেই যেন আমার এই মেয়েও বেড়ে উঠল, আমারই উঠোনে। রোদ-বৃষ্টিকে সহজে ধারণ করতে পারে। সেই তো তার প্রধান শক্তি। আর এই রোদ বৃষ্টি, না-বললেও চলে, বেঁচে থাকার ঘাত-প্রতিঘাত, অপমান, দারিদ্র্য—হয়তো বা দু-চার কণা খুশির ঝাপটাও। দ্বিতীয় স্তবকেও লতার কথা এনেছেন। 'সে আমার সহজিয়া'। ঝড়-বৃষ্টি-রৌদ্রের সঙ্গে সহেলিধর্ম পালন করে সে। এবং এ-কবিতায় একেবারে শেষ দুটি লাইনে এক আশ্চর্য ঘুরে দাঁড়ানোর ছবি। সে আমার কালো মেয়ে, আঁচলে জলের হাত মুছে দাঁড়িয়েছে, কারোকেই বিমুগ্ধ করার দায় নেই।

এই যে 'আঁচলে জলের হাত মুছে'—এসে দাঁড়ানো—অপূর্ব এর সৌন্দর্য। আমরা আমাদের কৈশোরে-যৌবনে সকলেই এমন কালো মেয়েকে দেখেছি, যে মাকে সাহায্য করতে করতে ছুটে বাইরের ঘরে এল। তাকে দেখে একদিন মুগ্ধ হয়েছি, যৌবনের প্রেমের মুগ্ধতা। তারপর, বয়স বাড়তে, সেই দেখার মধ্যে স্নেহ এসে মিশেছে, বাৎসল্য এসেছে, তাকেই আজ অন্যভাবে দেখি। সে একই তো মেয়ে। আমার বাংলা!

আমার বাংলা কথাটি অজান্তে লিখে ফেলেই মনে হল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিখ্যাত বই আছে, যার নাম : আমার বাংলা।' ৫১ সালে বেরোনো এই গদ্যের বইয়ে ছবি এঁকেছিলেন চিত্তপ্রসাদ। সে একেবারে আলাদা এক বাংলা। বরং, এই 'দাঁড়িয়েছে' কথাটায়

এসে সুভাষদারই একটি বিখ্যাত কবিতা মনে পড়ল। 'সাধ'। কয়েক লাইন বলি

যেখানেই থাকো–
একবার ফিরিয়ে ঘাড়,
        দেখ, কুমারী মা :

দেখ, ঘর আলো করে
জন্মদুঃখী মা আমার
সুখ স্বপ্নে
                এক হাতে চিবুক

অন্য হাতে
ভারবহনের গর্বে ধরে আছে
                জানলার গরাদ

জেনে তুমি সুখী হও–
কাল তার সাধ।

কোনো একজন 'কুমারী মা'-কে নিয়ে এই কবিতা। যার শিশু ভূমিষ্ঠ দেরী নেই। তাই 'সাধ'। ভারবহনের গর্বে সে ধরে আছে জানলার গরাদ—এর মধ্যে যেমন এক স্পর্ধিত জীবন ফুটে উঠল—তেমনই 'আঁচলে জলের হাত মুছে / দাঁড়িয়েছে'–এই দাঁড়ানোতেও—যতই সহজ, ততই অসাধারণ এক স্পর্ধা। কারণ, 'কারোকেই বিমুগ্ধ করার দায় নেই'। 'আমি যে আমি-ই' এইটাই আমার পরিচয়। এইখানে, এসে 'আত্মপ্রতিকৃতি' শিরোনামের আর একটি সার্থকতা দেখা দেয়। সমস্ত অরক্ষণীয়ার আত্মপ্রতিকৃতি যেন এই কবিতা। ভাবতে অবাক লাগে 'কালো মেয়ে'-কে নিয়ে বাংলায় কত কবিতা লেখা হয়েছে! কিন্তু, এ-কবিতা হারিয়ে যেতে পারল তো! এ-কবিতা আমাকে সংগ্রহ করতে হল, একেবারে লুপ্ত হয়ে যাওয়া একটি বইয়ের ফোটোকপি থেকে। আর এই তথ্য বারবার মনে পড়ার কারণ, কবিতাটির শেষ দুটি লাইন। কেবল নিজের মেয়ের সম্পর্কেই এ-কথা বলা নয়। এ-কথা যেন নিজের সারাজীবনের কবিতা সম্পর্কে এক কবির বলা কথা। এই আবদুস সামাদের কবিতাও যেন, আঁচলে জলের হাত মুছে দাঁড়িয়েছে—কারোকেই বিমুগ্ধ করার দায় নেই এই কবির। এখানে 'সহজিয়া' কথাটি, 'অ-রোপিত লতা' কথাটি অন্য অর্থস্তরে উঠে যায়। কনস্টানটিন কাবাফি যে বলেছিলেন, যে-কবি জানে তার শ্রোতাসংঘ সীমাবদ্ধ–তার যে স্পর্ধা, যে স্বাধীনতা–শেষ দুটি লাইন যেন তারই কথা বলে। আমি যা পেরেছি লিখেছি,

অযত্নের লতাই তো আমার কবিতা। কারওকেই বিমুগ্ধ করার দায় সে বহন করবে না। কবি তো কোথাও জীবনবন্দি। সে বলতে পারে 'ভালো যদি বলো একে ভালো তবে, না-বলো তো নয়।' 'আত্মপ্রতিকৃতি' শিরোনামটি আবার জ্বলজ্বল করে ওঠে, কিন্তু এবাব তার অর্থের রং আলাদা।

এ কবিতা সম্পর্কে কেউ বলতে পারেন সেন্টিমেন্টাল। বলবেন। আমি কোনো উত্তর দেব না। যিনি কবিতা লেখেন না, এমন পাঠককে ভেবে দেখতে বলব। আপনি কি এর মধ্য দিয়ে জীবন দেখতে পাচ্ছেন? দিঘিকে বিশ্বাস করা দরকার। আমি বলব। তার জলের তলায় অর্থ শুয়ে আছে। কবিতার অর্থ। জলের ভেতরে তাকালে দেখা যাবে। ভাষার কৌশল ও পরীক্ষামূলক কবিতা লেখা প্রয়োজন, নইলে কবিতার ভাষা এগোবে কী করে? কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এইসব পরীক্ষা ও ভাষার কৌশল উঠে আসছে না। উঠে আসছে দেশবিদেশে জন্ম নেওয়া নতুন, আরও নতুন, সব তত্ত্বের খবর থেকে। কবিতাকে এখন এইরকম হতে হবে, বা ওইরকম হতে হবে—এই বাইরে থেকে চাপানো বিশ্বাসে অনেক সময়ই তার জীবনমূল প্রচণ্ড চাপের মধ্যে পড়ে শুকিয়ে যায়। যারা মনে করতে পারেন, কারোকেই বিমুগ্ধ করার দায় নেই, তাঁদের হাতেই হয়তো প্রাণ পায় কবিতাজীবন।

এই আবদুস সামাদের একটি কবিতা আছে যার নাম 'একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা।' কবিতাটি শুরু হচ্ছে এইভাবে :

এখানে রাজারা ছিল এবং রানীরা
মাত্র এক শতাব্দীর দূর
এখন সেখানে থাকে দুই লক্ষ ভূতে
আর থাকে বিস্তর বাদুড়

রাজার মর্মর মূর্তি
বাগানে চিতিয়ে পড়ে কেন?
ছিন্নভিন্ন কে করেছে বাজার উষ্ণীষ?
ন্যাড়া সেই মাথাটিতে মুকুটের মতো
স্তূপীকৃত পাখির পুরীষ

এই বিশাল রাজবাড়ির বর্ণনা দেওয়ার সময় আমরা জানতে পারি, 'পথিক স্তম্ভের ছালচামড়া খসে গিয়েছে।' জানতে পারি :

লোকশ্রুতি বলে
এখানে হামামখানা ছিল

কাপড় চোপড় খুলে রূপসী রানিরা
সেরে নিত দীর্ঘ নগ্ন স্নান
গোপনে ঘুলঘুলি দিয়ে সে দৃশ্য কি দেখেছিল
কামার্ত প্রহরী।

এবং

রঙিন নাচের ঘরে যাদের কাপড় কাড়া হত
তারা কেউ ছিল না দ্রৌপদী।

হত্যা, লুণ্ঠন, বিলাসব্যসনে ভরা শাসকের সেই মিনার, গম্বুজ, থাম, দুর্গচূড়া আজ সর্বস্ব-হারানো হানাবাড়ি। আজ সব শেষ। 'দ্বারে নেই দৌবারিক, দুর্গে নেই অস্ত্রের পাহারা'।

এ তো স্বাভাবিক। এ তো হয়-ই ইতিহাসের নিয়মে। কবিতাটি আমি উদ্ধৃত করছি কেন!

কারণ, এই বর্ণনা পার হয়ে দেখি শেষ কয়েকটি লাইনে এক অব্যর্থ কবির দৃষ্টি আছে। রাজারা ও রানিরা, যারা দাপট নিয়ে একদিন শাসন করত, তাদের কথা দিয়েই কবিতা শুরু হয়েছিল। শেষ স্তবকেও তারাই ফিরে আসে। তাদের ধ্বংসের কারণটি সঙ্গে নিয়ে :

দেখেনি রাজারা আর দেখেনি রানীরা
দেয়ালে ঢুকেছে কবে চক্ষুর আড়ালে
ক্ষুদ্র বটচারা।
সোনার সিংহাসনটি কখনও দ্যাখেনি
দুই চক্ষু তুলে
বটের সবুজ কৃষ্ণ গোপনে গোপনে
বড়ো হচ্ছে অব্যর্থ গোকুলে!

প্রাসাদ ফাটিয়ে বেরিয়ে আসা বটগাছ। হানাবাড়ির চেনা দৃশ্য। কিন্তু 'বটের সবুজ কৃষ্ণ' কথাটিতে এবং 'অব্যর্থ গোকুলে'র মধ্যে আসন্ন বিপ্লবের আভাস—যাকে কোনো শাসক প্রাথমিকভাবে কখনও গুরুত্বপূর্ণ বিপদ বলে ভাবে না—সেই সংকেতও রইল।

আবদুস সামাদের অনেক কবিতাই আমাকে অবাক করে দিয়েছে বারবার। আশ্চর্য সব স্বীকারোক্তি এঁর লেখায় দেখা দিয়েছে। বেশিরভাগ সময়ই মানুষ কবিতায় সেটুকু বলে, সামাজিকভাবে যেটুকু বললে সুন্দর শোনাবে। এখানেও, অন্যেরা কী বলতে পারে, কী ফিড-ব্যাক আসতে পারে, তার আশঙ্কা কাজ করে। এবং কবির স্বাধীনতাকে নষ্ট করে দেয়। আবদুস সামাদের একটি উপলব্ধি বলি—

পাথরে কর্ষণ করলে ফলে না সোনালি ধান
ভাঙে শুধু ফাল,
চল্লিশ বছর পরে মনে হল আমি
বন্ধ্যা রমণীর সঙ্গে মিলিত হয়েছি এতকাল

অথবা

বিশ বছরের পুরোনো কাগজ কত আর পড়া যায়
বিশ বছরের পুরোনো কাগজ আমি
প্রতি রজনীতে উপুড় শয়নে
পাঠ করি নিরুপায়।

—এই ধরনের অনুভব কেউ বলে না। এমনকি কবিতাতেও বলে না। ইনি বলেছেন। আবদুস সামাদের আর একটি কবিতা ফেরিঘাট। ১৬ বছর আগে কোনো সাময়িকপত্রে কবিতাটি পড়ে বিস্মিত হয়েছিলাম। আজ এই বইতে খুঁজে পেলাম আবার।

এই শেষ ফেরি
মাঝি ডাকছে, ও খোকন পিছনে চেয়ো না
আমাকে নেবে না নৌকো, আমি তো যাব না ওই পাড়ে
তুমি যাও, গিয়ে সেই নতুন সকালে
পয়লা থেকে শুরু কোরো, আর
দেখো খোকা, যেন তোমাদের
বনগাঁ লোকাল থেকে নেমে এসে হালিমা, অতসী
না দাঁড়ায় তোমাদের মেট্রোর গলিতে সন্ধেবেলা
ময়দানে নারীর কণ্ঠে যেন না কখনও শোনা যায়:
'ছেলে কাঁদছে, বাবু একটু তাড়াতাড়ি করো...'

আবারও দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা, একটি সামাজিক অন্যায় প্রথার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। দূর শহরতলি বা মফস্‌সল থেকে নিম্নবিত্ত ঘরের মেয়েরা ট্রেন ধরে চাকরিতে আসে শহরে—এমন কথাই জানে তাদের বাড়ির লোক বা পাড়াঘরের মানুষ। কিন্তু এদের সত্যি কোনো চাকরি নেই। কিন্তু বাড়িতে অনেকগুলো পেট। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে রোজগার করে রাতের ট্রেনে বাড়ি ফিরে যায় এরা। কবি আল মাহমুদের একটি অবিস্মরণীয় গল্প আছে–জলবেশ্যা। নৌকো করে ব্যাপারীরা যখন হাটে আসে, রাতে ফেরে নৌকোয়, সেই

সময়কার দেহপসারিণীর কথা। আর সুমনের 'ব্রিগেডে মিটিং' গানে দেখা দিয়েছে অন্ধকার হয়ে আসা ময়দানের মেয়েরা। সেইরকমই এক মাঠবেশ্যার মর্মান্তিক উক্তি দিয়ে শেষ হচ্ছে আবদুস সামাদের এই কবিতাও। এই মেয়েটি, শিশুপালনের জন্য দেহ-বিক্রি করে। কে জানে, দেহ বিক্রি করতে করতেই সে, এই শিশুকে পেয়েছিল কি না। এও কি একরকম 'সিঙ্গল মাদার' নয়। তত্ত্ব কী বলে জানি না, আমি শুধু জানি : 'বহু পরিচর্যা করে পেয়েছিনু তোরে।' শুধু জানি : 'জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে।' ভাস্কর চক্রবর্তী মনে পড়ে :

আমি শুধু দারিদ্র্যের কথা জানি
আর কোনও কথাই জানি না।

দেখেছি কিশোরী, তার ম্লান মুখ–
আমি আর কিছুই দেখিনি।

আমি শুধু
ভালোবাসার কথা বুঝি–
আর কোনও কথাই বুঝি না।

এই ভালোবাসার কথা বুঝেছিল ভাস্কর চক্রবর্তীর সারাজীবনের কবিতা। ভাস্করের কবিতায় এই যে কিশোরী, এরাই তরুণী হয়ে উঠবার পর হয়তো বা হালিমা অতসী হয়ে গেছে আবদুস সামাদের কবিতায়। জানা-অজানা কবিরা সকলেই মিলে একটি দীর্ঘ কবিতা লিখে চলেছেন কতদিন। আবদুস সামাদ, তাঁর কবিতা তেমন ছড়ায়নি ঠিকই, কিন্তু সে-কবিতাও ভালোবাসার কথা ধরে রেখেছে নিজের মতো করে। আর প্রতিশোধহীন হলে, ভালোবাসায় নির্ভর করে থাকলে, অনেক সময়ই, কী ঘটে! আবদুস সামাদের যে-কবিতাটি দিয়ে আজ গোসাঁইবাগান শেষ করব, 'চাঁদ ও পয়ঃপ্রণালী' বইয়ের সেই কবিতাটির মধ্যে, একাকী মানুষের সেই অসহায় যুদ্ধের কথা আছে, যেখানে লেখকের সঙ্গে তার মন ছাড়া কেউ সঙ্গী নেই। এমনকি ঈশ্বরও নয়। আবদুস সামাদের কবিতায় ভগবান কী আশ্চর্যরূপে দেখা দেন। 'ঘুঘনির এঁটো শালপাতা ভগবান।' ন্যাংটো শিশুরা যাকে চেটে খাবে বলে ছুটছে। লাস্টবাস ভগবান—গামছার ফেরিওয়ালা যার জন্য অপেক্ষা করছে। আলোক সরকার লিখেছিলেন 'ঈশ্বর আছেন ওই বাজারের পাশের ডুমুর / গাছটার নিচে।' লিখেছিলেন 'ঈশ্বরের ঘর ওই দূরে আলো জ্বালা।' শক্তি লিখেছিলেন ঈশ্বর থাকেন জলে। আর আমরা কে না জানি অলোকরঞ্জনের সেই 'আর সে-নাছোড় ভগবান'-কে? সবাইকে পেরিয়ে কত নিজস্ব আর প্রত্যক্ষ ওই আবদুস সামাদের ঈশ্বর!

কিন্তু এই ঈশ্বরও তাঁকে শেষ পর্যন্ত সঙ্গ দেন না।

নিজের মন ছাড়া, কবি-র শেষসঙ্গী আর কে?

সেই মন, সারাজীবন ধরে, 'অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে?'

বয়া

জিভ বের করা রৌদ্রকাতর কুকুরের ভগবান
রয়েছেন ওই সিঁড়ির ঘরের নীচে,
ঘুঘ্‌নির এঁটো শালপাতা ভগবান
বাতাসের বেগে সরে সরে যান
ইস্টিশনের ন্যাংটো শিশুরা তাঁকে চেটে খাবে বলে
পিছনে পিছনে ছোটে।
রাত্রির লাস্ট্ বাস-ভগবান হয়তো বা পান
গামছার ফেরিওলা।

মাংসের হাটে ভগবান থাকে?
হয়তো থাকেন আমিই জানি না
তহমিনা তুমি জানো?

আমি শুধু জানি মধ্য-নদীর বুকে
চেনে বাঁধা আছে বয়া-ভগবান।
অথৈ এ জলে ওলটানো লঞ্চ থেকে
সাঁতার জানি না, যেতে পারব কি
এতটা উজান ঠেলে?

বয়া তো একটি ইঞ্চিও এগোবে না
দম শেষ হয়ে আসে...
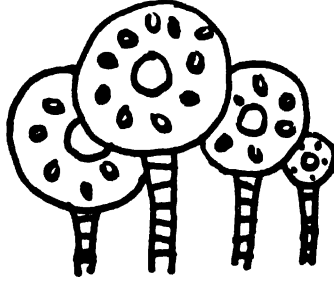
৩৬

কয়েক বছর আগের কথা। ভীমসেন যোশীর প্রোগ্রামের অনেকগুলো লাইভ রেকর্ডিং আছে একজনের কাছে। তাই আরও দুজনকে জুটিয়ে হানা দিয়েছি তার বাড়ি। প্রোগ্রামের ভিডিও রেকর্ডিং চালিয়ে দিয়েছে সে, বড়ো স্ক্রিনের টিভিতে। দুটি খেয়াল গাইবার পর ঠুমরি গাইছেন ভীমসেন, আব তো শাওন ঘর আ যা। মাঝ-খমাজ-এ শুনছি। বোল বানাচ্ছেন নানা সব চমৎকার আঁকাবাঁকা রাস্তায়। হঠাৎ একেবারে চমকে গেলাম। এ কি মিঞা মলহার নয়? এ কোথা থেকে এল! সবিস্ময়ে ঘুরে তাকালাম আমার পাশের বন্ধুর দিকে। তিনি গান জানেন। গান নিয়ে লেখেনও। একজন মিউজিকোলজিস্ট বলতে যা বোঝায়, তিনি তাই। মিঞা কি মল্লার? উনি মুগ্ধ হয়ে মাথা নাড়লেন। হ্যাঁ, তাই! বলতে বলতে ভীমসেন দ্বিতীয়বার মিঞা কি মল্লারের অঙ্গ ছুঁয়ে গেলেন। আমি উদগ্রীব হয়ে শুনতে লাগলাম। আবার যদি আসে। মিনিট পনেরোর সেই গানে তৃতীয়বারের জন্য মিঞা কি মল্লারের অঙ্গ এল না আর। গান শেষ হয়ে গেল। মনে পড়ে গেল, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'ফুল ফুটুক না ফুটুক' কবিতাটির কথা। 'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত'—প্রবাদ হয়ে যাওয়া এই লাইনটি কবিতাটির প্রথম দিকে পরপর দু-বার সামান্য একটু বিরতি দিয়েই এসে যায়। কিন্তু পরে আর আসে না। শঙ্খ ঘোষ, 'কবিতা-পরিচয়' পত্রিকায় এ কবিতা নিয়ে তাঁর আলোচনা শেষ করেছিলেন এই কথা বলে : 'কিন্তু ওই লাইনটি আর ফিরে আসেনি; সংগত সংযমে।' অনেকটা যেন তেমনই হল ব্যাপারটা।

আমরা বাড়ি ফিরছি। সংগীতজ্ঞ বন্ধুকে বলছি এটা কেন হল? কী কারণ? উনি বললেন, আসলে খামাজে শুদ্ধ নি কোমল নি দুটোই আছে, মিঞা কি মল্লারেরও তাই। বিরাট গাইয়ে তো। দারুণ কায়দা করে লাগিয়ে দিয়েছেন। এই না হলে শিল্পী!

সে তো বটেই। কিন্তু কী কারণে লাগালেন? আর একজনকে জিজ্ঞেস করলাম। সেই ভদ্রলোক আমার চেয়ে বয়সে বড়ো। তিনি যন্ত্রী। তিনি বললেন বসুন তো। দেখছি। বলে,

তাঁর বেহালাটি নিয়ে সুর মেলাতে লাগলেন। তারপর ধরলেন খামাজের মুখ। নানা ফ্রেজ বাজাতে লাগলেন। হঠাৎ খাদের দিকে এসে মল্লারের অঙ্গস্পর্শ ঘটে গেল। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এইরকম কি? আমি বললাম, মনে হচ্ছে এইরকমই। উনি এরপর আরও দু-তিনভাবে ফিরে-ফিরে এসে মিঞা কি মল্লার দেখালেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু, এটা কেন? কেন এই মল্লারের অঙ্গ লাগিয়েছিলেন ভীমসেন যোশী? উনি বললেন, কোমল-নিষাদ শুদ্ধ-নিষাদের কম্বিনেশন আর কী! নানারকম কম্বিনেশন তো হতে পারে।

বাড়ি ফিরি। আর ভাবি। কারণটা কী! শুধু একটা আনএক্সপেক্টেড কম্বিনেশন। শুধু 'কায়দা' করে লাগিয়ে দিলেন! কায়দার চমৎকারিত্ব মাত্র? কী জানি। গানের লোক তো নই। তারপর দিন যায় দিন যায়। একটা কোনো শনিবারে, ন-টা নাগাদ বাড়ি ফিরছি। একটা মিনিবাসের জানলা পেয়েছি। ক্যাথিড্রাল রোডে ঢুকছে বাসটা, হঠাৎ হুহু করে বৃষ্টির হাওয়া ঢুকে এল। সুমনের গানে যেমন আছে—দূরে কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে—ঠিক তেমনি হাওয়া। দূরের বৃষ্টির খবর আনা হাওয়া। মনে পড়ল, আব তো শাওন ঘর আ যা। শাওন আসছে। তাই প্রিয়তমকে ঘরে ফিরতে বলছে। ঘরের পুরুষ বাইরে, বৃষ্টি এসে গেল। ওই শ্রাবণের জন্যই মিঞা কি মল্লার এল বুঝি? তা ছাড়া আর কোনো কারণ? শক্তির কবিতায় যে ছিল: 'কারণ ছিল কারণ আছে, তালসুপারি গাছের কাছে'! ঠিক। তালসুপারি গাছের কাছেই কারণ। তালসুপারি গাছ। অর্থাৎ প্রকৃতি। বিভিন্ন রাগ তো তৈরি হয়েছিল প্রকৃতির বিভিন্ন অবস্থার ভিতর থেকে আর মানুষের মনের বিভিন্ন অবস্থাকেও সঙ্গে নিয়ে। ওই গানে এরপরেই তো আছে প্রিয়তম বিদেশে, আমি একাকিনী, কাগওয়া (কাক) তুমি উড়ে উড়ে যাও, আর এই সন্দেশওয়া নিয়ে যাও তার কাছে, তোমার সুনি চোঁচ বা শূন্য চঞ্চু আমি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেব, তোমার পাখায় কলম দিয়ে লিখে দেব—কী লিখে দেব? আব তো শাওন ঘর আ যা। এখন বর্ষা নেমে এসেছে। তুমি বাড়ি ফিরে এসো। রাজস্থানে তো কাক শুভ পাখি। 'যাও' অর্থাৎ 'যাও পাখি বলো, হাওয়া ছলোছলো, আবছায়া জানলার কাচ'। আজকের দিনের গানে যখন এই কথা আমরা শুনি, তখনও, গানের ইন্টারলিউডে পুরুষকণ্ঠ আসে রাগালাপ নিয়ে, একটুক্ষণ থেকে আবার চলে যায়। মোট দু-বার আসে। 'অন্তহীন' চলচ্চিত্রে 'চন্দ্রবিন্দু'-র 'অনিন্দ্য-চন্দ্রিল'-এর লেখায় এবং শান্তনু মৈত্রর সুরে এই গান যারা শুনেছেন তারা মনে করতে পারবেন পুরুষকণ্ঠ'র রাগালাপ একবার আসে 'দেশ' রাগ সঙ্গে নিয়ে। আর অন্যবার? সে কী নিয়ে আসে?

সে আনে মিঞা কি মল্লার। অর্থাৎ আবার মিঞা কি মল্লার এসে পড়ল। আব তো শাওন ঘর আ যা-র মধ্যে শ্রাবণ শব্দটা ছিল, এবং 'অন্তহীন' ছবিতে দৃশ্যটির ভিজ্যুয়ালের মধ্যে ছিল বৃষ্টিকুয়াশা। আর এদের সবাইকে কালিদাস-এর 'মেঘদূত'-এর মতো দূত হতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

বৃষ্টি আসার আশঙ্কায় প্রেমিককে ঘরে ফিরে আসার ডাক পাঠিয়েছিল আর একটি গানের একাকিনী। রাহুল দেব বর্মনের একেবারে প্রথম দিকের সুরারোপিত একটি ছবি,

'ছোটে নবাব'-এ আছে সেই গান। ঘর আ যা, ঘিরি আয়ি বদরা সাওঁয়ারিয়া। লতা গেয়েছিলেন। সে গান অবশ্য মাঝ-খমাজে নয়। সে গান মিশেছিল তিলককামোদ-এ। যে তিলককামোদে সুরকার জয়দেব বেঁধেছিলেন আর একটি বৃষ্টির গান, লতারই গলায়—ইয়ে বদরি কাঁহাসে আয়ি হ্যায়। কিন্তু ভীমসেনজির ওই গানে, কেন মিঞা কি মল্লার চকিতে এল দু-বার? এর কারণ যতবার সংগীতের চর্চাকারী মানুষদের কাছে জানতে চাইলাম, তাঁরাও বিমোহিত হলেন, কিন্তু 'কী আশ্চর্য কায়দা', এটাই বলতে লাগলেন। দুটো নিষাদের কম্বিনেশন কেমনভাবে নানা রাস্তা তৈরি করতে-করতে মিঞা কি মল্লারেও এসে পড়ল এটাই বোঝালেন। কিন্তু কেন এল, এটা বুঝতে আমার দরকার হল দমকা ঝাপটায় আসা বৃষ্টির বাতাসকে। আমি বুঝতে পারলাম, শাওন আসছে। 'শ্রাবণ'—এই শব্দ ও মেঘচ্ছবি থেকে গানের বন্দিশের যে-কথা—সেই কথা থেকে—মিঞা কি মল্লারের অঙ্গ স্পর্শ করেছেন ভীমসেন যোশী। প্রিয়তমা নারীর অঙ্গ স্পর্শ করার জন্যও যেমন আওচার আছে, বিলম্বিত আছে—শেষে দ্রুত—এও তাই! বাকি সবাই প্রয়োগ-কৌশলের চমৎকারিত্ব দেখছে—কিন্তু যে সংগীতজ্ঞ নয়, শুধু সাধারণ এক শ্রোতা, তার কাছে পৌঁছোচ্ছে ভাববস্তুটুকু। 'শ্রাবণ' শব্দটি থেকেই বর্ষারাগের শরীর-স্পর্শ! এখানেই ভীমসেন যোশী কবি। তাঁর গায়নের মধ্যে কবিত্ব।

সংগীতচর্চা যাঁরা করেন, তাঁদের প্রশ্ন করে আমি শুধু বাইরের কাঠামোটির বিশ্লেষণ পাচ্ছিলাম—কিন্তু গান তো একটা কারণ থেকে জন্মায়, একটা জীবন-কারণ থেকে—সেইটা পাচ্ছিলাম না! বড়ো শিল্পীরা কায়দা-কৌশলের ঊর্ধ্বে উঠে যান বলেই ভীমসেন অমন প্রয়োগ করলেন হয়তো। কিন্তু চর্চাকারীরা অনেক সময়েই বাইরেটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকেন। কবিতার ক্ষেত্রেও এটা হয়। আমারই হয়েছে। তখন 'দেশ' পত্রিকায় কাজ করি। একজন কবি কবিতা দিলেন। আমি কয়েকদিন ধরে চাইছি। তিনি এনে দিয়েছেন। পিটিএস-এ পাঠিয়েছি পয়েন্ট মার্কিং করে। প্রুফ পড়েছি। পাতায় বসিয়েছি। ইলাস্ট্রেশন হওয়ার পর পাতা পড়তে হয় ম্যাটারের সঙ্গে মিলিয়ে—সে-সবও করেছি। চার-পাঁচবার অন্তত পড়তে হয়েছে কবিতাটা, কাজের সূত্রেই। তা ছাড়া হাতে পেয়ে একবার তো এমনিই পড়েছিলাম। এবার যথাসময়ে 'দেশ' বেরিয়ে, ছাপা হয়ে বাড়িতে এসেছে। সকালে আমি কী একটা করছি চা খাবার সময়। কাবেরী কবিতাটা পড়ছে খেয়াল করিনি। হঠাৎ বলল, এই লাইনটা কী অদ্ভুত না! আমি অর্ধমনস্কভাবে বললাম : কী লাইন? কাবেরী বলল, এই তো 'পিঁপড়ের মুখে ধরে রাখা একটি চিনি-বিন্দু, এই যে জীবন...

আমি খবরের কাগজ বা অন্য কিছুতে চোখ রেখে গম্ভীরভাবে বললাম, হ্যাঁ-অ! মানে জীবনের অনিত্যতার কথা আর কী! এর ক্ষণস্থায়িত্ব আর অজানা ভবিতব্য! মানে জীবনের। এটা বলা হচ্ছে। তবে-এ-এ, পরেই দ্যাখো আর একটা লাইন আছে : ইস্কুলের ঘণ্টাধ্বনি, তারও স্রোত অবিস্মরণীয়—এটা আরও ভালো লাইন।

কাবেরী বলল : ও-সব জানি না। আসলে, পিঁপড়ের মুখ থেকে চিনিটা এক্ষুনি পড়ে যেতে পারে। এই তো!

আমি খবর কাগজ রেখে ঘুরে তাকালাম। আমি পাঁচ-ছ-বার কবিতাটা পড়েছি ছাপার আগে। এই কথাটা কেন এইভাবে, ঠিক এইভাবে মনে হয়নি। আমি কী বললাম? বললাম, জীবনের অনিত্যতা। ক্ষণস্থায়িত্ব। অজানা ভবিতব্য। ভারী-ভারী গালভরা কথা।

এটা আমি কবি বলে বললাম। ওইরকম একটা গাম্ভীর্যের ভাব এনেই বলতে শিখেছি, কবি হয়েছি বলে। চিনিটা যে পিঁপড়ের মুখ থেকে এক্ষুনি পড়ে যেতে পারে—এই সহজ কথাটা বলতে পারলাম না। যে কবি নয়, যে সাধারণ, তার দৃষ্টি একমুহূর্তে বিষয়ের একেবারে মূলে পৌঁছে গেল। তার ফলে আমি এটাও ধরতে পারলাম যে, 'পদ্মপত্রে-নীর' এই অতিপুরাতন ও ব্যবহৃত উপমাটিকে এখানে নতুন জীবন দেওয়া হল।

যতক্ষণ কবি হয়ে থাকব, কবিতাকে প্রাণ দিয়ে বুঝতে পারব না। ওই শুদ্ধ নি কোমল নি-র কম্বিনেশন আর কায়দা পর্যন্ত পৌঁছোব। সাধারণের চোখ, সাধারণের মন, যদি একটু পড়বার অভ্যেসের মধ্যে থাকে, তাহলে অনেকসময়ই সে যত সহজে কবিতার প্রাণ-এ পৌঁছোয়, আমি তত সহজে পারি না। পুরো কবিতাটি যদি আগ্রহী পাঠক পড়তে চান, তবে জানিয়ে রাখি কবিতাটির নাম 'রাত্রির রাঁদেভ্যু'। এই শিরোনামের বইতেই পাওয়া যাবে। লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

এইভাবেই শেখা। ভুল করতে করতে, শেখা। জীবনে যেমন ভুল করেছি, তেমনি কবিতার ছন্দেও ভুল করেছি। অল্পবয়সে, চার মাত্রার ছন্দে লিখলাম একটা কবিতা। কবিতাটির প্রতিটি স্তবক ছিল তিন লাইনের, প্রথম দুটি লাইনে পরপর মিল তৃতীয় লাইনটি কুমারী রইল, পরের স্তবকে প্রথম দু-লাইনে আবার দুটো মিল, তৃতীয় লাইনটিতে এসে মিলন হচ্ছে আগের স্তবকের তৃতীয় লাইনের। অর্থাৎ তৃতীয় লাইনের সঙ্গে ষষ্ঠ লাইনের মিল। এভাবে সবটা চলেছে। এইভাবে লিখলাম একটা কবিতা 'সাদা বিষ কালো বিষ'। কিন্তু কেউ তো দেখিয়ে দেওয়ার নেই; তাই গণ্ডগোলও করে রাখলাম অনেক। কেমন গণ্ডগোল?

এই কথা মনে করে ওর যে
আর কিছু আসত না সহ্যে—
এখনো আসে না—অগ্নিচূড়ার

ভিতরেই ওর মেরুবিন্দু
একথা তুমিও জানো, কিন্তু
নিজে থেকে কত খানি নিচু আর

হতে পারো?...

আবার আর এক জায়গায় লিখলাম,

পুরনো বাতাস ফের আর্দ্র—
রয়ে গেছে এখনো কি তার দোষ?
ধীরে যাও, অত বেশি দ্রুত না।

আবার তুষার ঢাকা জাহাজে
নতুন তুষার পড়ছে, কাজে
যাবে না কি? সামান্য খুঁতও না

যেন থাকে এই প্রেমে, হত্যায়

দুটো জায়গা তুললাম। চার মাত্রায় যাচ্ছে তো ছন্দটা।

এই কথা।[৪] মনে করে।[৪] ওর যে [ভাঙা পর্ব]
আর কিছু।[৪] আস তো না।[৪] সহ্যে[ভাঙা পর্ব]
এখনো আ।[৪] সে না—অগ্। নিচুড়াব[ভাঙা পর্ব]

ভিতরেই।[৪] ওর মেরু।[৪] বিন্দু[ভাঙা পর্ব]
এ কথা তু।[৪] মিও জানো।[৪] কিন্তু[ভাঙা পর্ব]
নিজে থেকে।[৪] কত খানি।[৪] নিচু আর[ভাঙা পর্ব]

হতে পারো?[৪]

...এইরকমভাবে চলেছে!

এইবার 'অগ্নিচূড়ার' সঙ্গে 'নিচু আর' মেলাতে গিয়ে আমি গণিত বা মাত্রা ঠিক-ঠিকই ফেললাম। গোলমাল কোথায় হল? ছন্দের জন্য এখানে অগ/নিচুড়ার হল। আমরা কি মুখে এই 'অগ্নিচূড়ার' শব্দটি একসঙ্গেই উচ্চারণ করি না? 'অগ/নিচুড়া'-র এভাবে পড়লে স্বাভাবিক কথা বলা ভেঙে যায়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার।

আবার তু।[৪] ষারে ঢাকা।[৪] জাহাজে[ভাঙা পর্ব]
নতুন তু।[৪] ষার পড়।[৪] ছে, কাজে।[ভাঙা পর্ব]
যাবে না কি।[৪]...

আসল কথাটা কী? নতুন তুষার পড়ছে, কাজে যাবে নাকি? পড়ছে কথাটা আমরা একত্রেই বলি। ছন্দ আর মিল ঠিক রাখতে গিয়ে 'পড়/ছে, কাজে', এই লিখলাম, গণিত ঠিক থাকল। স্বাভাবিক গতিটা নষ্ট হয়ে গেল। কারণ তোমাকে তো পড়তে হচ্ছে 'ছে, কাজে' এইভাবে, তাই না? এভাবে তো তুমি-আমি কথা বলি না। আবার ঘুরিয়ে পরের লাইনে যখন 'যাবে না কি?' লিখলাম, তখন স্পন্দন কিছুটা নষ্ট হল। সঙ্গে সঙ্গেই 'অত বেশি দ্রুত না'-র সঙ্গে, 'সামান্য খুঁতও না' মেলালাম, মেলাতে গিয়ে পরের লাইনে লিখতে হল 'যেন থাকে এই প্রেমে হত্যায়'। আসলে কথাটা কীভাবে বলি, সামান্য খুঁত না যেন থাকে—'না যেন থাকে' আমাদের কথা বলায় স্বাভাবিকভাবে আসে—আমি মেলাবার জন্য কী করলাম? 'সামান্য খুঁতও না/যেন থাকে এই প্রেমে, হত্যায়'—ইত্যাদি। কথা বলার সহজ গতিটা ভেঙে গেল। এ-কবিতায় এরকম অনেক আছে :

পোষা পাখি।[৪] টির কালো।[৪] চঞ্চুর[ভাঙা পর্ব]
আঘাত লা।[৪] গিয়ে তুমি।[৪] চুরচুর[ভাঙা পর্ব]
করেছ—ত।[৪] খনই গ্লেসি।[৪] য়ার কি[ভাঙা পর্ব]

কেঁপে উঠেছিল এ সমুদ্রে!
তোমার আগামী স্বামী পুত্রের
ভালো চাইবার বেশি আর কী

চাইতে পারব আমি!

এখানে, এক তো, 'গ্লেসিয়ার' শব্দটা বিষ্ণু দে থেকে নেওয়া। সবাই জানে, 'কামনার টানে সংহত গ্লেসিয়ার'-এর কথা। কিন্তু 'বেশি আর কী' এর সঙ্গে মিল দেব বলে, 'গ্লেসিয়ার কি' লিখলাম তো! কিন্তু তার উচ্চারণ কীরকমভাবে হল? 'করেছ—ত/৪ খনই গ্লেসি।৪ য়ার কি।'—এইভাবে। 'গ্লেসিয়ার' কথাটা আমরা একসঙ্গে বলি। এখানে ছন্দ আর মিলের জন্য বললাম না। 'আর কি'-টা ভেঙে গেল। একে মধ্যখণ্ডন বলে চালানো যাবে না কিছুতেই। একটি মধ্যখণ্ডনের উদাহরণ দিই তবে। যদিও স্বরবৃত্তে লেখা।

প্রৌঢ় বোঝে প্রৌঢ়তা কী। বৃদ্ধ বোঝে
বয়স বলতে কী ঝামেলা।
'কিন্তু খুকু, এখন তুমি এতই অল্প বয়স্ক যে'
তোমার উপলব্ধিতে নেই ছেলেবেলা।

'বৃদ্ধ বোঝে'-র সঙ্গে 'বয়স্ক যে' মিলছে—কিন্তু মনেই থাকছে না মিলল যে। 'অল্পবয়স্ক' ভাঙল 'অল্প' আর 'বয়স্ক'-তে—'উপলব্ধিতে' খণ্ড হল, 'উপ' আর 'লব্ধিতে'—কী অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য এই ভাঙনে। একবারের জন্যও মনে হল না পড়তে কোথাও বাধা হচ্ছে। ছন্দ ছাড়া গদ্যে বলে গেলেও যেন চলে—এতই স্বাভাবিক। এই হল পাকা হাতের কাজ। আদর্শ কাজ। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা থেকে বললাম এই চারটি লাইন। এইসব কাজ নীরেন্দ্রনাথের অজস্র। এমন দক্ষ শিল্প-কৌশল ছন্দকে তো লুকিয়ে ফেলে, এমনকি মিলকেও যেন ধরা যায় না। আকাশপথ থেকে জানকীর ফেলে-ফেলে যাওয়া গহনার মতো হঠাৎ-হঠাৎ ঘাসজঙ্গলের ফাঁকে আবিষ্কার করে চমকে চমকে উঠতে হয়, কেবল দ্বিতীয় বা তৃতীয় পাঠে পর্যবেক্ষণের সতর্কতা এলে। এই যে নীরেনবাবুর কবিতা-র লাইনগুলো বললাম, এরা আমাকে কী শেখাতে পারত? যা শেখাতে পারত, তা হল : তুমি একটা কবিতা-ই লিখছ। কয়েকটি মিল লিখছ না। কিছু চমকপ্রদ ছন্দের লাইন লিখছ না। কবিতাটা কোথায়?

সেটা আমি শিখতে পারিনি। একা নীরেনবাবুর কবিতা অবশ্য নয়। শক্তি, শঙ্খ, অলোকরঞ্জন, অরুণ সরকার ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকেও এটা শিখতে পারতাম। পারিনি, কারণ আমার মনে হত জটিল, প্যাঁচানো, দূরে-দূরে আসা মিলের শৃঙ্খল হাসিল করতে হবে। তাতে আমি কত কঠিন সব মারপ্যাঁচ শিখেছি, তা বোঝানো যাবে লোককে। যেমন, 'জিভ' নামে একটি দীর্ঘ কবিতায়, এমন লিখেছি :

জেগে ওঠো ওগো পেট্রলিয়ম? কাহার
দু'হিতা গো তুমি? খিন্ন
এ শরীরে দাও যথা-
-বিহিত জ্বালানী...

অথবা

আসলে ঠাট্টা সবটাই। চিরা-
-চরিত স্বপ্নে, আড়তে
সোনার পক্ষী যে সবার
চোখ এড়িয়ে আসে এ তো জানা।

এই যে, 'যথাবিহিত জ্বালানী' অথবা 'চিরাচরিত স্বপ্নে'—এখানে 'যথাবিহিত' আর 'চিরাচরিত'-কে মিল দেওয়ার জন্য ভেঙে দুটো আলাদা লাইনে নিয়ে গিয়ে কথা বলার যে স্বাভাবিকতা তার একেবারে সর্বনাশ করে ছাড়লাম। শুধু এটাই নয়, 'জিভ' কবিতাটির

সর্বাঙ্গে এই সুর-ছেঁড়ার ক্ষত আমি তৈরি করে দিলাম, ছন্দ-মিল ব্যবহার করেই। কীসের সুর? কথা বলার স্বাভাবিক সুর ও স্বর, ছিন্নভিন্ন হতে লাগল গোটা কবিতা জুড়ে। কেন না, তখন আমাকে কিছু করে দেখাতে হবেই যে! 'কাহার দুহিতা গো তুমি'! অথবা 'খিন্ন এ শরীরে দাও যথাবিহিত জ্বালানী' এই কথাগুলো—কাহার, খিন্ন, এইসব শব্দ আগের লাইনে রেখে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া হয়েছে সহজ স্বাভাবিকতাকে। জিভ, কালো ত্রিভুজের আস্তরণ, সাদা বিষ কালো বিষ ইত্যাদি কবিতায় এই "কিছু করে দেখানোর মরণপণ চেষ্টা" ছন্দ ও মিলের যে মূল সৌন্দর্যলক্ষ্য তাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। হেমবাবু যে দেড়শো বছর আগে বলেছিলেন 'পদাবলীর স্রোতোভঙ্গ হেতু শ্রবণ কঠোর' হইয়াছে—এক্ষেত্রে তা স্থানে-স্থানে নয়, সর্বত্রই হয়ে আছে।

আসলে প্রেম ও শরীর মিলনের অভিজ্ঞতা থেকেই ছন্দ মিলের ধারণা আসে; রাগসংগীতের ধারা যখন শ্রবণের মধ্য দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে তার অভিজ্ঞতা থেকেও তৈরি হয় ছন্দ-মিলের শিক্ষা—সেইটা তখন আমার জানা ছিল না। বদলে আমি জানতাম, মুর্খেরই মতো জানতাম, কবিতা কেমন হবে। আমি জানতাম, ছন্দকে গুনে-গুনে লিখতে হয়। আমার প্রথম জীবনের ওইসব কবিতায় যে প্রবল তালভঙ্গের চিহ্ন, আজকের দিনের নবীন কবিদের কবিতায় তার ছায়া মাত্র নেই। মন্দাক্রান্তা সেন, শ্রীজাত, বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, যশোধরা রায়চৌধুরী, পিনাকী ঠাকুর বিভাস রায়চৌধুরী এঁদের কোনো বইতেই এমন জড়াপালটা লাগা ছন্দ-মিলের চেষ্টা দেখা যাবে না। এঁরা প্রস্তুত হয়েই, স্ব-স্ব চেষ্টায় ও ক্ষমতায, উপযুক্ত গৃহশিক্ষা নিয়েই কবিতা লিখতে এসেছেন এবং বই প্রকাশ করেছেন। শ্রীজাত ও মন্দাক্রান্তার তো কোনো তুলনাই হয় না। প্রথম বলটি থেকেই এঁরা ব্যাটের মাঝখান দিয়ে খেলেছেন। এঁদের কেউই কখনও গুনে-গুনে ছন্দ লেখেননি। কী করে বুঝলাম! শুধুমাত্র পড়েই তা বোঝা যায়।

আমি কীরকম গুনে-গুনে লিখতাম তার আর একটি উদাহরণ দিই। সাত মাত্রার ছন্দের উদাহরণ। তার আগে শঙ্খ ঘোষের সুপরিচিত একটি কবিতার কয়েক লাইন তুলে দিচ্ছি :

৩+২+২=৭	৩+২=৫
কোনো যে মানে নেই	সেটাই মানে
৩+৪=৭	২+১+২=৫
বন্য শূকরী কি	নিজেকে জানে!
৩+২+২=৭	৩+২=৫
বাঁচার চেয়ে বেশি	বাঁচে না প্রাণে
৩+৪=৭	১+২+২=৫
শকুন এসেছিস	কী সন্ধানে?
২+১+২+২=৭	২+১+১+১=৫

এই নে মুখ বুক	হাত নে, পা নে
৩+২+২=৭	৩+২=৫
ভাবিস পাবি তবু	আমার মানে?

এই কবিতা ৭/৫-এর চালে লেখা। প্রথম পর্বটি সাত মাত্রার দ্বিতীয় পর্বটি পাঁচে।

এইবার দ্বিতীয় লাইনে 'বন্য শূকরী কি নিজেকে জানে' এখানে 'কি' শব্দটি হ্রস্ব-ই দিয়ে লেখা হচ্ছে। কেন? কারণ, বন্য শূকরী নিজেকে জানে কি? এই 'কি' হল : 'তুমি এখন খাবে কি?' অর্থাৎ 'তুমি কিছু খাবে কি এখন?' এই অর্থে। যদি এটা হত, তুমি এখন কী খাবে, অর্থাৎ 'তুমি এখন চা খাবে না কফি খাবে' এই অর্থে—তাহলে ক-এ দীর্ঘ-ই হত।

সেক্ষেত্রে, এই বন্য শূকরীর পরে 'কি' কথাটা সাত মাত্রার প্রথম পর্বের একেবারে শেষে বসল। কথার সুর একেবারে অটুট এখানে। আবার 'শকুন এসেছিস কী সন্ধানে'—এখানে পাঁচ মাত্রার যে দ্বিতীয় ভাগটি রয়েছে, তার একেবারে প্রথমে বসল 'কী'। কী এখানে দীর্ঘ-ই। কী সন্ধান করছ? হাত? পা? মুখ? বুক? সবই নাও। এই হাত পা মুখ বুক হল 'কী'। বা 'কী কী'। এই যে দু-রকম দুটি 'কি'—অর্থাৎ একটি হ্রস্ব-ই দেওয়া 'কি' অন্যটি দীর্ঘ-ই দেওয়া 'কী'—দুটির দুই অর্থ—ছন্দের পর্বেও এ-দুটি শব্দ এমন দুটি ভাগ নির্বাচন করল, যাতে কথা বলার সুরের স্বাভাবিকতা একটুও ভাঙল না।

আর আমি কী লিখলাম? এই যে লেখাটি থেকে এখন একটি লাইন উদ্ধৃত করব এটি আমার কোনো কবিতা সংগ্রহে পেলাম না। তার মানে কবিতাটি কোনো বইতে তালে গোলে নেওয়া হয়নি, বই করার সময়ে খুঁজে পাইনি হয়তো। তবে ছাপা হয়েছিল নিশ্চিত। একটা লাইন মনে আছে, সেটাই বলছি।

তার আগে বলে রাখি, শঙ্খ ঘোষের 'পুনর্মিলন' নামক কবিতা পড়ে এটি লিখতে চেষ্টা করেছিলাম। তখন অন্য কবিতা পড়ে-পড়ে কবিতা লিখতে চেষ্টা করতাম। 'পুনর্মিলন' পরপর দুটি সাত মাত্রার পর্ব পাশাপাশি রেখে লেখা।

১+২=৩, ২+২=৪	২+১=৩, ২+২=৪
কী কথা বলে ওরা?'	কোনো কি কথা বলে?'
১+২=৩, ২+২=৪	৩, ৩+১=৪
এ ওকে চোখে চোখে'	কখনও দেখেছে কি'

প্রথম পর্বও সাত মাত্র। দ্বিতীয় পর্বও সাত। প্রথম লাইনে আবারও 'কী' আর 'কি'-অব্যর্থ-বণ্টন।

এবার আমি লিখলাম, এটা দেখে, গুনে গুনে—

'আমার মাকে তুমি কি ভালো বেসেছিলে?'

কবিতার নাম 'বাবা-কে'। অর্থাৎ বাবাকে জিজ্ঞেস করছি, মৃত বাবাকে, আমার মাকে তুমি ভালোবেসেছিলে কি? এই 'কি'-টা হ্রস্ব-ই দিয়ে হওয়া দরকার। তাই-ই আছে। কিন্তু কোথায় প্লেস করেছি 'কি'-টা? এখানেই গোলমাল। প্লেস করেছি দ্বিতীয় পর্বের শুরুতে। এবং লাইনের শেষে দিয়েছি জিজ্ঞাসা চিহ্ন। কিন্তু পর্বের স্থাপনা এমন হয়ে গেছে যাতে 'কি' উচ্চারণটি দাবি করছে যেন 'কী'—দীর্ঘ-ই দেওয়া বানান। অর্থাৎ গুনে-গুনে সাতমাত্রা সাজাতে গিয়ে আমি যা বলছিলাম, অর্থাৎ মৃত বাবাকে প্রশ্ন করছিলাম, তুমি কি ভালোবেসেছিলে আমার মাকে? পর্বের স্থাপনাগত ভুলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, আমার মাকে তুমি কী ভালোবেসেছিল। এবং লাইনের শেষে যে জিজ্ঞাসাচিহ্ন তাও এক ভুল। কারণ 'কি' শব্দটি দ্বিতীয় পর্বের প্রথমে বসানোর ফলে, উচ্চারণ করার সময় তা যেমন আপনা-আপনি দীর্ঘ-ই দেওয়া 'কী' হয়ে যাচ্ছে—তেমনই লাইনের শেষের জিজ্ঞাসাচিহ্ন রূপান্তরিত হচ্ছে বিস্ময় চিহ্নে। ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে আমার মাকে তুমি কী ভালোবেসেছিলে! অর্থাৎ আমার মাকে তুমি কত ভালোবেসেছিলে! এটা ব্যঙ্গার্থেও হতে পারে! কিন্তু প্রথম লাইনে এটা ব্যঙ্গাত্মকভাবে বলতে চাওয়া হচ্ছে না তো! সরাসরি নিরীহ, সহজ একটি প্রশ্ন বা প্রশ্নের অন্তত ছদ্মবেশ আছে লাইনটিতে। গুনে লিখতে গিয়ে কী করলাম? শুধু স্বাভাবিক স্পন্দনটি ভেঙে গেল তা-ই নয়, অর্থটাও উলটে গেল। বা আরেকরকম হয়ে গেল। এমনকি লাইনের শেষে যতিচিহ্নও ভুল প্রমাণিত হল।

ওই কোমল নি শুদ্ধ নি-র কম্বিনেশনই দেখতাম তখন। কতরকম কম্বিনেশন করে তাক লাগানো যায়, সেটাই দেখতাম। 'শ্রাবণ' কথাটা দেখতাম না। বিষয়ের চাপে যে ছন্দ-মিল জন্মায় তা বুঝিনি। ভাবতাম, কঠিন জটিল বিচিত্র চমকপ্রদ অন্ত্যমিলের শৃঙ্খল ব্যবহারই বোধহয় কবিতা। ছন্দ যে জানি তা আপ্রাণ প্রমাণ করতে চাইতাম। 'প্রত্নজীব' বইটির ছত্রে-ছত্রে তার ধ্বংসাত্মক প্রমাণ আছে। আর এ-বই বেরনোর ঠিক আগেই প্রকাশিত গৌতম চৌধুরীর 'কলম্বাসের জাহাজ' বইটি বিষয়ের সঙ্গে ছন্দ-মিলের সুষম বিবাহের এক সার্থক দৃষ্টান্ত হয়ে জেগে আছে আজও, পরে কখনও কথা বলব সে-বই নিয়ে। তবে এসব কথা মনে পড়ল, বাংলাদেশের কবি সৈয়দ শামসুল হক-এর 'অরুণ মিত্র স্মারক বক্তৃতা' শুনে। সে-বক্তৃতা শোনা এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। এ বছর অরুণ মিত্রের শতবর্ষ শুরু হল। অরুণ মিত্র জানিয়ে রেখেছিলেন মিলপ্রয়োগ সম্পর্কে একটি অব্যর্থ আশঙ্কার কথা। বলেছিলেন, 'মিল যতখানি সাহায্য ধ্বনিবিন্যাসে করতে পারে, তার চেয়ে বেশি ক্ষতি করতে পারে কবিতার। যে-শব্দ ব্যবহারের কোনো প্রয়োজন নেই, সেই শব্দ সে ঘাড়ে ধরে প্রায়ই ব্যবহার করায়। এবং মিলের জন্য কবিতার বক্তব্য বিপথে চলে যেতে পারে।' সেকথা আমার চেয়ে বেশি কে আর জানে! তবু অলোকরঞ্জনের কবিতা মনে পড়ে :

> আমি তো বিপথগামী কবিতার ভাষা
> গুঁজে দেব খুব সাধ্বী রমণীর চুলে...
> অনাচারী নাম যদি রটে তো রটুক
> ঈশ্বরের সঙ্গে এক বিছানায় শুলে!

অর্থাৎ যে দিকেই যাও, দু-দিকেই সম্ভাবনা ও আশঙ্কার রাস্তা খোলা আছে। তবে ছন্দ-মিলের সঙ্গে ঘর করা, কবিতার সঙ্গে প্রণয় করা, সে তো এক হিসেবে ঈশ্বরের শয্যাসঙ্গী হওয়ার মতোই দুঃসাহসিক স্পর্ধা। সেই স্পর্ধার পথে গিয়ে বাংলা কবিতার অনেক প্রবীণ কবির মতো, আজকে তরুণরাও, ছন্দ-মিলকেই ঘাড় ধরে বাঁকিয়ে নিজের যাত্রাপথের অনুগত বাহন করে তুলছেন। এও তো চোখের সামনেই ঘটতে দেখছি।
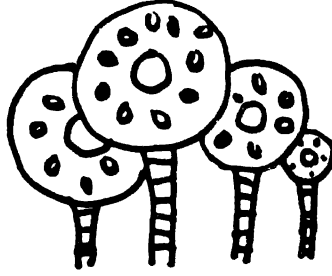
৩৭

সেদিন কী হল, ওক-হার্টে ডাক্তার অমিত রায়ের কাছে দেখাব বলে নাম লিখিয়ে অপেক্ষা করছি, হঠাৎ যে-মেয়েটি নাম লিখে নিচ্ছিল, সে দেখি উঠে আমার দিকে আসছে। ডাক্তার দেখানোর বিষয়েই নিশ্চয় কিছু বলবে। এখন তো সবাই সবাইকে 'স্যর' বলে, তরুণীটি আমাকে বলল, স্যর একটা রিকোয়েস্ট করব? বললাম, হ্যাঁ, বলুন? সে বলে, আপনি শঙ্খ ঘোষকে নিয়ে আর একটা আর্টিকেল লিখবেন? আমি বললাম, আগে লিখেছি ওঁকে নিয়ে। সে বলে, পড়েছি। সেইজন্যই বলছি। স্যরের কবিতা আমার ভালো লাগে। আমি বললাম, আপনি কি ওঁর কাছে পড়েছেন? মেয়েটি বলে, না না, আমি ওঁর স্টুডেন্ট নই। কিন্তু ওঁর কবিতা পড়ি।

এর কিছুদিন আগে, আমাকে একটি যুবক ফোন করেছিল। সেই যুবক অনেকদিনের পরিচিত। একা হাতে একটি লিট্ল ম্যাগাজিন প্রকাশ করে, নিজস্ব ব্যক্তিত্ব তৈরি করেছে পত্রিকাটি এবং বাংলা অ্যাকাডেমির পুরস্কারও পেয়েছে তার স্বীকৃতিস্বরূপ। যুবকটি পরিশ্রমী, সৎ, আপোসহীন। সে আমাকে অনুযোগ জানায়, আপনার প্রায় সব গদ্য লেখায় শঙ্খ ঘোষের উল্লেখ থাকে কেন? আর কত প্রশস্তি করবেন ওঁর?

আজকাল কিছুই আমার গায়ে লাগে না। বললাম, শঙ্খ ঘোষ ওঁর ফ্ল্যাটটা আমায় লিখে দেবেন বলেছেন, তাই এত বলি ওঁর কথা। সে বলে, তবে উনি থাকবেন কোথায়? কেন, আমার বাড়িতে! সেও হাসল। আমিও হাসলাম। চুকে গেল।

পাশাপাশি দুটি ঘটনা আমাকে বলে, কে আমার পাঠক। এই যুবকটি সাহিত্যসমাজে অঙ্গাঙ্গি জড়িত। সে জানে আমাদের কবিতাজগতে এখন শঙ্খ ঘোষ প্রায় সর্বোচ্চ-নাম। ওই পজিশনের জন্যই আমি বারবার তাঁর কথা বলছি, এ কথা সে মনে করে। আর আমাকে জানাতেও সাহস পায়, কারণ, সে লড়াকু। সে যা করার একাই করে। কাউকে সন্তুষ্ট করে চলতে চায় না। এবং এই সমাজে, যাঁরাই উঁচু পজিশনে থাকেন, অন্যরা তাঁদের খুশি করতে

চায়,যাঁকে খুশি করতে চাইছে তিনি বিরক্ত বিব্রত হলেও, খুশি করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকে না বেশিরভাগ মানুষ। কোনো অফিসে যিনি উঁচু পদে, তাঁকে ঘিরে ভিড় গুনগুন করে। খ্যাতিটাও অনেক সময়, একরকম উচ্চপদেরই মতো। যিনি উচ্চ পদাধিকারী, তিনি যদি কারওকে ডেকে কথা বলেন, অথবা একটু বেশি গুরুত্ব দেন, তবে তারও উচ্চতা বাড়ে। অন্য সবার চোখে। এটাই সমাজের রীতি। সমাজে যা হয়, সাহিত্য সমাজেও তো তারই প্রতিফলন ঘটবে। যুবকটি নিজে অমন নয়, তাই তার এগুলো অপছন্দ। তা ছাড়া এও হতে পারে, শঙ্খ ঘোষের লেখা, তার অত কিছু জরুরি মনে হয় না। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের রুচি-পছন্দ তো ভিন্ন ভিন্ন হবেই। আর এই তরুণী? সে বলে, স্যর। সে বলে রিকোয়েস্ট, বলে আর্টিকেল। কোনো লিট্‌লম্যাগ সম্পাদক এমন ভাষা বলবে! কোনো কবিতা গবেষক! অধ্যাপক! আর কবিতা লেখকদের কথা তো ছেড়েই দিলাম।

প্রথমে, ভাষা শুনেই, তুমি বাতিল করে দেবে মেয়েটিকে, পাঠক হিসেবে? তাই তো? কিন্তু আমার জীবনে দেখেছি, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়র, ব্যাঙ্ক ম্যানেজার থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করা স্কুলশিক্ষিকা, করণিক, বা ইনসিওরেন্স এজেন্ট—এঁরাও কবিতা পড়েন। কিন্তু নিজেরা লেখালেখি করেন না। সেই তরুণী, জানে না, কবিসমাজে শঙ্খ ঘোষের অলিখিত ওই সর্বোচ্চ পজিশনের কথা। তিনি একজন লেখক। তার সম্পর্কে আর একজন লেখক কথা বলছে। এইটুকু। মাঝে কিছু নেই। মাঝে কিছু রেখো না—গানে আছে না? সেইরকম। তাঁর আমাকে বিশ্বাস করতে অসুবিধে হচ্ছে না। যুবকটি আমাকে বিশ্বাস করতেই পারছে না। বিশ্বাস করলে, সে লেখাটির কোনো পয়েন্ট নিয়ে তার বিরুদ্ধমত জানাত। দ্বিমত হত। কিন্তু, কেন এঁকে নিয়ে লিখছি—এ প্রসঙ্গ তার মনে উঠত না। উঠল, কবিতা বহির্ভূত সামাজিক কারণগুলো তার মনে জড়িয়ে যাওয়ায়। এ মেয়েটি আর্টিকেল বলুক, স্যর বলুক, রিকোয়েস্ট বলুক—তবু তার মন একজন লেখককে লেখক হিসেবেই বিশ্বাস করছে।

সে যে বিশ্বাস করছে সেই বিশ্বাসের দাম হয়তো কবিসমাজে নেই। কিন্তু আমি মনে করি, আবারও, শঙ্খ ঘোষেরই একটা কবিতার প্রথম লাইন—আমার বিশ্বাস আছে আমাকে বিশ্বাস করো তুমি। সেই মেয়েটির মতো অজানা সব পাঠকের প্রতি বিশ্বাসেই 'গোঁসাইবাগান' লিখি।

স্টিফেন হকিং-এর সুপরিচিত বই, 'আ ব্রিফ হিস্টরি অফ টাইম'-এ একটি শব্দ আছে : ইভেন্ট হরাইজন। বাংলা অনুবাদে যাকে বলা হয়েছে ঘটনা-দিগন্ত। এ বইয়ের কথা সকলেই জানে। ব্ল্যাকহোলের বাইরে পর্যন্ত যে কোনো পদার্থের ধর্ম, গুণ বা চরিত্র যা—ওই ইভেন্ট হরাইজন পার হয়ে ব্ল্যাকহোলের ভিতরে গিয়ে পড়লে তার যে কী কী পরিবর্তন হবে কেউ জানে না। এটুকু অনুমান করা যায়, সেই পদার্থের ধর্ম ও চরিত্র পুরোটাই এক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে ঘেঁটেঘুটে অন্য কিছু হয়ে যাবে।

শঙ্খ ঘোষ একটি কবিতা লিখেছিলেন '৬৯ সালে। তার শেষ দু-লাইন হল,

আজ এই পৃথিবীর খোলা মাঠে, যে কোনও ঝঞ্ঝায়
যখনই বলাও কথা তখনই তা মিথ্যা হয়ে যায়!

যখন পড়েছি তখন বুঝিনি এর অর্থ। আমাদের এই সমাজটাও তাই। যে-কোনো কথাই বলি না কেন, ঘটনা-দিগন্ত পার হয়ে যখন তা সমাজের ভিতরে পৌঁছোবে, তখন তার অর্থ করার ভার অন্যদের। ঘেঁটেঘুটে কী অর্থ দাঁড়াবে মূল কথাটার—তা আর যে লিখছে বা বলছে তার হাতে থাকবে না। ওই মেয়েটি ঘটনা-দিগন্তের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তাই সে খোলামনে দেখতে পারে। ওই অচেনা পাঠকের মতোই, অচেনা এক কবির লেখা চোখে পড়ল সম্প্রতি, তার বিষয়টি অন্তত আমার কাছে নতুন।

প্রত্যাখ্যান

মোটেই যাবো না তোর সঙ্গে ওই বাইক সফরে
হাইওয়ে যতই ডাকুক
ধুলো স্নান সেরে নিক শালিখেরা
বন বাংলোয়,
রাত আর জোনাকি পোকারা
রূপকথা প্রলোভন শোনাক বাতাসে।
তবুও যাবো না,
ধরব না কাঁধ।
আচমকা ব্রেক কষলে ঝুঁকে-আঁকড়ে ধরব না কোমর,

ঠোঁটে জিভে ঝরাবো না আগুন-আস্বাদ
ঝিঁ ঝিঁ পোকাদের সঙ্গে গেলাসে বোতলে
উল্লাস যাপন আর করব না মোটেই।
অর্ধেক জীবন বাকি,
এখন একলা রোদে
পিঠ পেতে সামলাই লোভ।

সঙ্গীর পিছন-সিটে বসে বাইক সফরে যাওয়া মেয়ে আমি কতই দেখেছি। কিন্তু, বাইকসফর নিয়ে কোনো কবিতা পড়িনি। বাইপাসে, অথবা অন্য হাইওয়েতে, দুটি ছেলেমেয়ে চোখের নিমেষে আমাদের ছাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, এইটুকুই দেখা। আর গত কয়েক বছর আমার এমন দ্রুতগামী বাইক-যুগল দেখলে, প্রথমেই একটা ভয় হয়। এরা অ্যাক্সিডেন্ট করবে না তো! তারপরই মনে হয়, আমার মেয়েটাও এইসময় অন্য কোথাও

কোনো ছেলের বাইকের পিছনে বসে ঘুরে বেড়াচ্ছে না তো! এইসব মনে হয়। কিন্তু তা নিয়ে কবিতা পড়েছি কি না, মনে নেই।

এই লেখায়, বাইকসঙ্গী প্রেমিককে ছেড়ে আসার কথা বলা হচ্ছে। প্রেমিককে ছেড়ে আসার কবিতার নানা পরিচয় তো জানা। কিন্তু বাইকের অভিজ্ঞতা থাকায় কবিতাটি অভিনব হয়ে উঠেছে। অন্য একটা লাইফস্টাইলের কথা বলছে, যার ভেতর দিয়ে আমি বা আমার মতো কবিতা-পাঠকরা যাইনি। বাইকে করে দুজনে হাইওয়ে দিয়ে অনেক পথ গিয়ে কোনো বাংলোয় উঠেছে। সেখানে জোনাকি, সেখানে ঝিঁ-ঝি। সেখানে রাতের উল্লাসে আছে গেলাস বোতল। একেবারে নতুন এক প্রজন্মের স্বাধীন উইক-এন্ড উপভোগ যেন। সেইসব ছিল, এই বাইকসঙ্গীর সঙ্গে, কিন্তু আর থাকবে না। কারণ, আমি সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, যোগাযোগ রাখব না। অন্তত এই কবিতাটি সেই সিদ্ধান্ত জানাচ্ছে। কিন্তু খুব জোরালো নয় এই সিদ্ধান্ত। একটু বেশিরকম অভিমান বরং। দেখা যাচ্ছে, এই কবিতায় বাইকযাত্রার কিছু ডিটেল, যেমন, ধরব না কাঁধ। তার চেয়েও বেশি, পরের লাইন . আচমকা ব্রেক কষলে ঝুঁকে-আঁকড়ে ধরব না কোমর। কবিতাটি, লক্ষ করুন, কাঁচা কবিতা। কিন্তু, কী সুন্দর! চালক আচমকা ব্রেক কষলে, একটি মেয়ে ঝুঁকে-আঁকড়ে চালকের কোমর ধরছে, এর মধ্যে তার পুরুষটির প্রতি, সম্পূর্ণ নির্ভরতা প্রকাশ পাচ্ছে। ওদিকে 'ঝুঁকে-আঁকড়ে' কথাটায়, প্রায় লেখকের অজান্তেই, একটি অল্পমাত্রার ঘর্ষণ ও ধাক্কার এফেক্ট তৈরি হয়ে গিয়েছে। দুটি 'ক'-এর কাছাকাছি থাকা ও শেষে 'ড়' বর্ণটি অবস্থান করায়। অজান্তেই বললাম কেন? কারণ, কবিতাটি, এমন সাদাসিধেভাবে লেখা যে, বোঝা যায় লেখক বেশি কিছু জানেন না কবিতা-কৌশল বিষয়ে। আর না-জানাটাই হয়ে গিয়েছে আশীর্বাদ। কাঁধ ধরে যে মেয়েটি পুরুষটির সঙ্গে যায়, সেটা কেবল বসার সুবিধের জন্য নয়। ওটাও নির্ভরতাই। পরের লাইনের পুরো টাল সামলানোটায় 'কোমর' শব্দটা যেন একটা দেয়ালের মতো তাকে আগলায় লাইনের শেষে স্থাপিত হয়ে। আবার অন্যদিক থেকে দেখলে, একটি মেয়ে কখন কোনো পুরুষের কোমর ধরে? ঘনিষ্ঠতার সময়ে? নাচের সময়ে? আর যে-কোনো পুরুষের কোমর কি সে-মেয়ে ধরবে, যদি সে-পুরুষ বিশেষ-কেউ না-হয়? তাই 'কোমর' শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। নাচের কথা এ কবিতায় নেই, তবে, যুগল-নাচে যে শরীর-সঙ্গের উন্মাদনা সূচিত হতে পারে, এখানে বাইক-যাত্রায় তার টুকটাক আভাস। 'ঠোঁটে জিভে ঝরাবো না আগ্নেয় আস্বাদ।' পিছনে যে বসেছে, অতটা পথ যাচ্ছে, কোথাও গিয়ে উঠবে সন্ধ্যায়, পিছন থেকে মুখ বাড়িয়ে অর্ধেক চুম্বনের কথা এখানে রাজ কাপুরের 'ববি' ছবিতে ঋষি কাপুরকে ডিম্পলের বাইকের পিছন-সিট থেকে কান-কামড়ে আদর মনে পড়ায়। একেবারে নতুন কতগুলো ডিটেল এ কবিতায় এসে পড়ছে, আজকের দিনের নতুন ছেলেমেয়েদের গতিময় জীবনের গতিময় সম্পর্কের দু-এক ঝলক ছবি। হাইওয়ের কয়েক ঘণ্টার যে-যাত্রাপথ, তাতে যে ঝলক ঝলক স্পর্শ-শিহরন, তা আসলে রাগালাপ। বাংলোয়, অথবা, গেস্ট হাউসে কিংবা কোনো ছুটির বাড়িতে পৌঁছে শুরু হবে দ্রুৎ। তারপর আসবে

ঝালা। যাকে বলা হচ্ছে উল্লাস যাপন। এর মধ্যে চিয়ার্স কথাটা না-বলা-ভাবে আছে। কিন্তু এবার থেকে এসব কিছুই ঘটবে না আর। কবিতায় আছে যে মেয়েটি, এই হল তার অভিমান। শেষ লাইনের অনুভবটি বড়ো চমৎকার। 'এখন একলা রোদে / পিঠ পেতে সামলাই লোভ।' মেয়েটি ইতিমধ্যেই যে অনেকটা সরে এসেছে পুরুষটির কাছ থেকে তার প্রমাণ এই 'একলা রোদে' কথাটির মধ্যে আছে। তার পিঠে রোদ পড়ছে। এবং সে একলা। কিন্তু পিঠে রোদ পড়ায় কী মনে পড়ছে তার? যখন বাইকে করে প্রেমিকের সঙ্গে দিগ্‌বিদিক চলে যেত, দীর্ঘ যাত্রায় —পিছন সিটে বসে থাকা মেয়েটির পিঠে টানা রোদ পড়ত। আজ সেই রোদ আছে। রোদ পিঠে পড়ছে। হয়তো সে বসে আছে ছাদে, বারান্দায়। হয়তো সে পথে হাঁটছে। দাঁড়িয়ে আছে কোথাও। কিন্তু পিঠে রোদ পড়ছে, রোদ পিঠের ওপর অনেকক্ষণ থাকছে—তাই 'পিঠ পেতে'—আর রোদ পিঠে যতক্ষণ থাকছে, সেই পুরুষটির সঙ্গে ওই বাইক সফর মনে পড়ছে। ওই পিছন-সিটে বসে থাকার স্মৃতি ফিরিয়ে আনছে মেয়েটির পিঠের ওপর এসে পড়া রোদের গরম। রোদ, তখনও ছিল, এখনও আছে। কিন্তু তার কাছ থেকে সরে এসেছি আমি। যদিও ইচ্ছে করছে আবার ছুটে যাই। তাই 'লোভ'। কিন্তু রোদের কাছে পিঠ পেতে দিচ্ছি। পুরুষটির কাছে আব আগের মতো নিজেকে পেতে দিচ্ছে না। তাই, 'সামলাই'। অন্যদিকে এই নিজের পিঠ পেতে রোদ সামলানোর সময় আরেকটি ছবিও মেয়েটির মনে থাকছে। তার সামনে বাইকচালক প্রেমিকের পিঠ। পেতে থাকা পিঠ। সেই পিঠে-কাঁধে তো সে নিজের মুখ-মাথা রেখেছে, কতবার। এই এক নতুনভাবে অনুভূত বিরহ। এই কবিতাটির লেখক সায়ন্তনী নাগ। লিট্‌ল ম্যাগাজিনেও যে এঁর কবিতা খুব-কিছু দেখা যায় তা নয়। কিন্তু সায়ন্তনীর কবিতায়, আমি নতুন কিছু বিষয়কে আসতে দেখছি। যেমন একবছরেরও বেশি আগে, 'দোসর' পত্রিকায়, সায়ন্তনীর একটি কবিতা বেরিয়েছে : 'অর্জুন'। সে লেখার দিকে একটু তাকানো যাক :

আমাকে যে চ্যাটরুমে
আচমকা লুফে নিল হাতে
তার নাম অর্জুন।
অনেকদিন ধরে মৎস্য চোখ
অপেক্ষায় ছিল তার
গাণ্ডীব, তূণের।

চ্যাটরুম। একটি নতুন ও অপরিহার্য জিনিস, আজকের জীবনে। অন্তত আজকের অনেক ছেলেমেয়ের জীবনে। তাতে কী হয়? অনেক বন্ধু হয়। জানাশোনা হয়। না-দেখা ব্যক্তির সঙ্গে জানাশোনা। এর ফল কী। নানারকম হতে পারে। আমরা সংবাদপত্রে সে সব নিয়ে গোলমালের কথা পড়ি। আপাতত এ কবিতার পরের অংশটি দেখি। 'অর্জুন' তো

একজনকে লুফে নিয়েছে। যাকে লুফে নিয়েছে, তার কী অবস্থান।

বলিনি মোটেই তাকে
আমিও দ্রৌপদী।
আরো চারজন আছে এদিকে ওদিকে
আমাকে পাওয়ার জন্য
ছদ্মনামে, অন্য বাসনাকক্ষে জেগে।

দ্রৌপদীর পাঁচজন স্বামী ছিল ঠিকই। কিন্তু সকলেই জানত সকলের কথা। এখানে বিশেষত্ব হল, ওই চারজন জানে না বাকিদের সম্পর্কে কিছুই। এবং দ্রৌপদীও জানাবে না। এ এক নতুন যুগ। নতুন ধরনের সম্পর্ক-কথা। নিজের সামাজিক পরিচয় লুকিয়ে, বা না-বলে, অন্য নামে, (ছদ্মনাম কথাটা কবিতাটিতে রয়েছে) তারা একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করছে। ছদ্মনামে, সুতরাং ছদ্ম-পরিচয়? কেন? কারণ তাহলে অনেক সম্পর্ক তৈরি করা যাবে। পুরুষ তো বহুগামী হতে চায়। তার-ই এই এক আনকোরা পথ। আর সেই কৌশলের মুখোমুখি হতে উপযুক্ত পদ্ধতি গ্রহণও করা হয়েছে। কী পদ্ধতি? 'বলিনি মোটেই তাকে আমিও দ্রৌপদী।' বোকার মতোই আমার মনে পড়ে যাচ্ছে মনীশ ঘটকের সেই বিখ্যাত 'কুড়ানি' কবিতার লাইন : 'তোরে বুঝি কই নাই আমিও বান্দরী।' সেই যে, একটি কিশোরের ওপর রাগ করে একটি বালিকা বলেছিল : 'খাট্টাইশ্‌, বান্দর! তোরে করুম না বিয়া।' তারপর দিন যায়। মেয়েটি বড়ো হয়েছে। কিশোরটি যৌবনের দ্বারপ্রান্তে। ছেলেটির মন থেকে সেই তিরস্কার দূর হয়নি। তখন সেই কিশোরী, অশ্রুসজল হেসে তাকে স্বীকার করে নিচ্ছে এই বলে : 'তোরে বুঝি কই নাই, আমিও বান্দরী!'

তা থেকে কতই আলাদা : 'বলিনি মোটেই তাকে / আমিও দ্রৌপদী।'

একজনের না-বলা মানে আসলে বলা, বলে দেওয়া। আরেকজনের না-বলা মানে না-বলাই। গোপন করা। স্বচ্ছতা না-রাখা। কত দূর পালটে গিয়েছে যুগ! এটা ভালো না মন্দ, সে বিচার এখন অসম্ভব। সব যুগের নিজস্ব চরিত্র থাকে। এখানে, ছদ্মনামে, অন্য বাসনাকক্ষে পুরুষরা জেগে আছে। মেয়েটিকে পাওয়ার জন্য। অর্থাৎ পরিচয় গোপন করা হচ্ছে। ভারচুয়াল ইমেজের মতো, ভারচুয়াল আইডেন্টিটি। খুবই সম্প্রতি কবি যশোধরা রায়চৌধুরী, 'দেশ' পত্রিকায় এই বিষয়েই একটি সুন্দর কবিতা লিখেছেন। তাতে এই 'ভার্চুয়াল' কথাটাও ব্যবহার করা হয়েছে।

সায়ন্তনীর কবিতাটিতে 'বাসনাকক্ষে' শব্দটি নানাদিকে আলো ফেলে। 'জেগে' কথাটির মধ্যে রাত জাগা আছে। পুরুষটির বাসনা-উদ্যত থাকার সংকেত আছে। চ্যাটরুমই আসলে বাসনাকক্ষ। নিজের আসল পরিচয় প্রকাশ করলে অধিক সম্পর্ক হওয়ার নানা বাধা। আর সম্পর্ক একবার হয়ে গেলে, বহু বিড়ম্বনা। পরিচয় গোপন করলে তা নেই।

সম্পর্ক তৈরির সেতুগুলো যুগের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গিয়েছে। বিদিশা সরকার দু-লাইনের একটি কবিতা লিখেছেন :

বড়ো বেশি এলোমেলো হয়ে গেছ আজ
প্রাক্তন এ কথা বলে সিমকার্ড ছুঁড়ে ফেলে দিল।

এবার, সম্পর্ক ভাঙার প্রয়োজনে সিমকার্ড বদল—এটা আগে ছিল না। অর্থাৎ যোগাযোগের প্রধান সেতু যখন সেলফোন। সিমকার্ড ছুড়ে ফেলা, আর মেয়েটিকে নিজের জীবন থেকে পুরুষটির ছুড়ে ফেলা সমার্থক। সম্পর্ক ভাঙলে, সেলফোন-এর নম্বর বদলাবে। যোগাযোগ করতে পারবে না অপরপক্ষ। এই পদ্ধতি আগের দিনে ছিল না।

এবার একটু সেই আগের দিনে যাই। আজকের এই বাইকসফরে অভ্যস্ত, চ্যাটরুম ও সেলফোন-যুগের মেয়েদের পাশে অন্য সময়ের একটি মেয়ের কথা শুনি। কবিতাটি ছাপা হয়েছিল, '৭৩ সালে। 'অন্ধযুগ' পত্রিকায়।

শ্রাবণের লোপামুদ্রা

আবার ডেকেছে মেঘ, কম্বুকণ্ঠে, লোপামুদ্রা হারমোনিয়ম বন্ধ করে
ছুটে এলো এক চিলতে কমন বারান্দা দিয়ে : নিরঞ্জন, নিরঞ্জন দেখো
আবার শ্রাবণ এলো, যেন তার অধিকার, যে-কোনো সময়ে এসে
যাচ্ছেতাই ভীষণ জ্বালানো
নিরঞ্জন তুমি আজো, দেরী করছ, মেঘ ডাকছে, আমি গান রেখে
তোমাকে ডাকার স্বর পেতে চাই, তুমি কেন এখনও এলে না
তোমার কিসের কাজ, কিসের ব্যস্ততা এত, শ্রাবণ তো কই
আমাদের ঘরে আসতে লজ্জা পায় না। তুমি শুধু পাও।
নিরঞ্জন, আমাকে কি ভালোবাসো, সত্যি জানো আমার বাবার
তেমন সামর্থ নেই বিয়ের নগদ দিতে, তুমি কেন ছবি দেখলে
কেন তারপরও এলে, গান শুনতে চাইলে শুধুশুধু;
এলে যদি আরেকবার এসো, আজো বৃষ্টি পড়ছে, হারমোনিয়মের
দিকে না তাকিয়ে দেখো খালি গলাতেই গাইব

শোনো নিরঞ্জন, আমি আমার বয়স
লুকিয়ে বলেছি, ঠিক এখন পঁচিশ, তা কি সত্যি খুব বেশি!
তুমিও তো ছোটো নও; এতক্ষণে লোপামুদ্রা মেঘেদের চলে
যাওয়া দেখে

ঘরের কোনায় আসে, হারমোনিয়মের চাবি খুলে দিলে অমার্জিত
গলা থেকে
রবীন্দ্রসঙ্গীত
শ্রাবণের মতো ঝরে, কী মিথ্যুক, শ্রাবণের সত্যি এতে আসে যায়
না কিছু!

এই কবিতাটি একটি মেয়েরই কবিতা। ঠিকই। কিন্তু লিখেছেন একজন পুরুষ। তাঁর নাম নিশীথ ভড়। আজ থেকে তিন দশকেরও বেশি আগে, ওই বাইকসঙ্গিনীর বয়সি একটি তরুণীর কথা। যে, জলদগম্ভীর মেঘ ডাকার আওয়াজে হারমোনিয়ম বন্ধ করে ছুটে এল। কোথা দিয়ে ছুটে এল! মেয়েটির ছুটে আসার জায়গাটা খুব দরকারি এ-কবিতায়। ছুটে এল 'এক চিলতে কমন বারান্দা দিয়ে।' তখনও মধ্যবিত্তের ফ্ল্যাট কালচার শুরু হয়নি। মধ্যবিত্ত কেন, এখন নিম্ন-মধ্যবিত্তের জীবনও অনেকটা অন্যরকম। ওই কমন বারান্দা হল ভাড়া বাড়ির ছবি। এমন এক ভাড়া বাড়ি, যেখানে দু-ঘর, দু-ঘর করে ভাড়াটেরা থাকে। তাদের একটাই উঠোন। বারো ঘর এক উঠোন। একটাই বারান্দা। সেটাকে বলত তখন 'কমন বারান্দা'। কোথাও কোথাও কমন কলঘর-ও হত। এই বাড়ির একটি মেয়ে, মেঘ ডেকে উঠলে, মন নেচে উঠলে, কারও জন্য, অথবা অকারণেই চঞ্চল হলে—কোথা দিয়ে দু-চার-দশ-পা ছুটে যাবে? 'কমন বারান্দা' ছাড়া, কী আছে তার সামনে? কোন জায়গা! আজকাল, সব সময়ে যাকে 'স্পেস দেওয়া' বলা হয়! জীবনযাত্রা পালটেছে, 'টার্ম' পালটেছে, নতুন 'টার্ম' এসেছে! কিন্তু ওই মেয়েটি, লোপামুদ্রা যার নাম, সে থেকে গিয়েছে এই কবিতাটির মধ্যে—বাঙালি নিম্নবিত্ত সমাজের একটি তরুণীর জীবনকে নিয়ে। তার প্রেমিক বা স্পষ্ট প্রেমিক হয়নি, কিন্তু যে হতে পারত তার স্বামী—তার নাম নিরঞ্জন। সে এসেছিল একবার। পাত্রী দেখতে। আর বোকা পাত্রী, নিরুপায়। সে একেই পছন্দ করে বসে আছে। তারই জন্য মেঘ ডাকলে বিরহ বোধ করছে। কিন্তু, সেই যে, যুবক, সে এসেছে, 'শুধুশুধু' গান শুনতে চেয়েছে—সে কিন্তু আর যোগাযোগ করে না। কেন করবে? পাত্রী তো পছন্দ হয়নি তার। তা ছাড়া মেয়েটির বাবার 'তেমন সামর্থ্য নেই বিয়ের নগদ দিতে!' এই জায়গাটা এখন পড়ে আমার মনে হচ্ছে, 'বেণীমাধব, আমার বাবা দোকানে কাজ করে' এই লাইনটি আমি এখান থেকেই পেয়েছিলাম। কেন না, নিশীথ ভড়ের এ-কবিতা আমি পড়েছি '৭৪-এ, তখন আমার বয়স কুড়ি। এই 'শ্রাবণের লোপামুদ্রা' যে 'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়'-এর পূর্বসূরি তাতে আব সন্দেহ করছি না। পরেরটার ওপরে রয়েছে প্রথমটির নিশ্চিত প্রভাব। প্রথমটিতে এই যে 'কমন বারান্দা'—এই যে নগদ না-দিতে পারা বাবা, ছবি দেখে পাত্রী পছন্দ করতে আসা যুবক, তার মিষ্টি কথা, পরে যোগাযোগ না-করা—এ সবই একসময়ের অধিকাংশ নিম্নবিত্ত বাঙালি মেয়ের জীবনছবি ছিল। এই কবিতার যে চরিত্র, লোপামুদ্রা, যে তখনও আশা ছাড়েনি। ভাবছে, ওই যুবক, নিরঞ্জন,

হয়তো যোগাযোগ করবে। এর কিছুদিন পরে আর আশা থাকবে না তার। বিরহ, কালো বিষাদে পরিণত হবে। 'কমন-বারান্দা' দিয়ে মেঘ ডাকলে ছুটে যাবে না। কিন্তু এখনও সে আশা করছে। অভিমান করছে। তাই, শেষ লাইনে তার অভিমান রবীন্দ্রসংগীতে—সে যে সেরকম কিছু ভালো গাইতেও পারে না—সে কথা, লেখক জানিয়েও দিচ্ছেন। লেখক আত্মপ্রকাশ করছেন, নিজের কথা বলে, কবিতার একেবারে শেষ দিকটায়। অনেকটা যেমন—'হে প্রগাঢ় পিতামহী, আজও চমৎকার', বলে, শেষের দিকটায় একধরনের আত্মপ্রকাশ করেছিলেন 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার লেখক—সেইরকম। কী সিদ্ধান্ত দেন এই লোপামুদ্রা চরিত্রের কারিগর? বলেন, ...'কী মিথ্যুক, শ্রাবণের সত্যি তাতে আসে যায় না কিছু!' একেবারে ঠিক কথা। জীবন এইরকমই নিষ্ঠুর। প্রকৃতি এইরকম উদাসীন।...তবু হায় ইহাদেরই পানে...। অনেক ঐশ্বর্য ঢেলে...। যাকগে! কিন্তু অসাধারণ এই 'কী মিথ্যুক' দেখে আমার একটা কথা মনে হল। "পাগলী, তোমার সঙ্গে 'কী মিথ্যুক' কাটাব জীবন" লিখেছিলাম চুরানব্বই-এ। আর চুয়াত্তরে দেখেছি এই 'কী মিথ্যুক'-এর প্রয়োগ। কুড়ি বছর অবচেতনে লুকিয়েছিল। হঠাৎ ঢুকে পড়েছে নিজের লেখায়। ঠিক-ঠিক যেভাবে প্রথম আট মাত্রার পর, চার মাত্রায় কথাটা লাগিয়েছেন নিশীথ ভড়, তার ওপর, ওই 'কী মিথ্যুক' ঠিক কথকের নিজের স্বর হয়েও নিজের স্বরে বলা নয়। অন্যের স্বর গলায় নিয়ে বলা, (এক্ষেত্রে মেয়েটির স্বর) 'কী মিথ্যুক।' আমার লেখাটিতেও দুটোই ঘটেছে। এক, প্রথম আট মাত্রার পর, একটু বিরতি, বা ব্রেক হিসেবে চার মাত্রা, দ্বিতীয়, অন্যের স্বর গলায় নিয়ে বলা—অন্য চরিত্রের স্বর। এক্ষেত্রে 'পাগলী'-র। সেও একটি মেয়েই। মেয়েরা যেভাবে বলে—'কী মিথ্যুক!' সেই বলাটা আর কী। এইভাবে, একটি কবিতা বহুদিন, একেবারে মনের অগোচরে, তিল-তিল করে এগিয়ে অন্য-অন্য কবিতায় জায়গা নিতে পারে। প্রকৃতির মধ্যেই তো আছে এর প্রমাণ। ভূগর্ভের একেবারে নীচে, তিল তিল করে যে প্লেটগুলো এগিয়ে চলেছে কোটি কোটি বছর ধরে। তারা তো বসুন্ধরার অবচেতনা-ই।

অসামান্য এই কবিতাটি, 'শ্রাবণের লোপামুদ্রা' আছে, 'নিজের পায়ের শব্দ' নামক একটি বইয়ে। কিন্তু তুমি চেষ্টা করলেও এ বই কোথাও পাবে না। আমি এ বইয়ের একটা জেরক্স কপি থেকে কবিতাটি তুললাম। বইটি প্রকাশ করেছিলেন সোমক দাস। '৮৪ বা '৮৫ সালে। এ বই হারিয়ে গিয়েছে। এ বইয়ের আরেকটি কবিতা তা হলে, পড়ে দ্যাখো তুমি। সে কবিতার নাম 'একটি বর্ষার রাতে'।

একটি বর্ষার রাতে
দেখেছি মেঘে ও চাঁদে মদিরেক্ষণার মায়া, টবের কিনারে গিয়ে
পেতে চেয়েছি গাছের আদর।
হাওয়া সন্তর্পণে এসে শরীরের মর্ম ছুঁয়ে গেলে

মুহূর্তের ভুল চাপে নিজের দু'গালে হাত দিয়ে
বলেছি আমাকে দাও তোমার পূর্ণতা।
মেঘ ও চাঁদের মায়া যথেষ্ট রয়েছে, তবু, এমন মায়াবী
এমন মায়াবী আমি
সঘন বর্ষার রাতে বৃষ্টিহীন মনে পড়ে, সব মনে পড়ে,
শুধু
সেই মেয়েটির সঙ্গে কবে যে প্রণয় ছিল মনে নেই, আর মনে নেই।

আগের কবিতায় মেঘ ছিল। এ কবিতাতেও আছে। সে ছিল এক নারীর কবিতা। আর এ কবিতা এক পুরুষের। একাকী পুরুষের। সঘন বর্ষার রাতে যার 'বৃষ্টিহীন' মনে পড়ছে। সব। এই বৃষ্টিহীন কথাটি সঘন বর্ষার মধ্যেও ব্যবহৃত হল কেন, তার পরিচয় কবিতাটির শেষ লাইনে। এবং পরপর লাইন সাজানো ও 'স্পেস ব্যবহার না-করা' এই ছোটো কবিতায়, 'শুধু' শব্দটি দিয়ে 'স্পেস'-এর কাজ করিয়ে নেওয়া হয়েছে। কবিতায় 'স্পেস' নীরবতা হলেও, তা কথা বলার কাজই করে, তার নীরবতা দিয়েই। যেমন নাটকে সংলাপ বলতে বলতে থেমে গিয়ে কিছুক্ষণ নীরব থেকে সেই নৈঃশব্দ্যকে ব্যবহার করে পরের কথাটিকে পরের মুহূর্তটিকে জোরালো ও অধিক অর্থময় করে তোলা হয়। এ লেখায়, 'শুধু' শব্দটিকে প্রান্তে সরিয়ে, এবং এক লাইনে একটি শব্দ রেখে, সে-কাজ করানো হয়েছে। যে মেয়েটির সঙ্গে প্রণয় ছিল তাকে মনে নেই, আর মনে নেই—কথাটি অবশ্য একটি মিথ্যা। শুভ্র মিথ্যা। আলোক সরকার বলেছিলেন : 'কবিতা লেখা মিথ্যার সাধনা।' 'সাধনা' শব্দটি থাকায় বোঝা যায় যে, দৈনন্দিন স্বার্থের কারণে বলা সামাজিক মিথ্যা এ নয়। দ্বিতীয় ভুবন সৃষ্টির স্পর্ধা এই 'মিথ্যার সাধনা' শব্দটি আমাদের জানায়। তেমনই, এই 'মনে নেই আর মনে নেই' এটাই বলে, যে, মনে আছে, মনে আছে। তাকেই এই বর্ষা রাতে মনে পড়ছে সবচেয়ে বেশি। আর সেই জন্যই এই সঘন বর্ষার রাতে সেই মনে-পড়া বৃষ্টিহীন। অন্যদিকে, যদি আক্ষরিকভাবেও ধরি—যে সত্যিই সবই মনে পড়ছে, মেয়েটির মুখ আর মনে পড়ছে না, তা হলেও। সেই মনে-না-পড়াই বৃষ্টিহীনতা।

এই কবিতা থেকে চল্লিশের দশকে রচিত একটি কবিতার চারটে লাইন মনে পড়ছে আমার। সে কবিতার নাম 'যৌবনোত্তর'। লেখক সঞ্জয় ভট্টাচার্য।

রাত্রিকে কোনও দিন মনে হত সমুদ্রের মতো
আজ সেই রাত্রি নেই।
হয়তো এখন কারও হৃদয়ের কাছে আছে সে-রাত্রির মানে;
আমার সে-মন নেই
যে-মন সমুদ্র হতে জানে।

নিশীথ ভড়ের আরেকটি লুপ্ত হয়ে যাওয়া বই 'খেলার তুচ্ছে প্রতিমা' থেকে একটি কবিতা বলব তোমাকে। এ কবিতাও পুরুষের কবিতা। মধ্যবিত্ত বাঙালি পুরুষের একরকম যৌবনোত্তর কবিতা :

> গোলাপের গন্ধ দিয়ে বয়স ভরাতে চেয়ে ওই
> যুবকটি গোলাপ হয়ে ফুটে ওঠে ভাঙা জানালায়
> ইশকুল বালিকা পথে যেতে যেতে আড়চোখে দেখে
> গোলাপের কাঁটা আছে, গন্ধ খুব সুদূর, দুরূহ
> একাক্ষর মিলে তাকে যদি করা যায় বা সমীহ
> পথ ছেড়ে দিতে হবে, আরও বেশি পাউডার মেখে
> ক্রমশ সে হয়ে ওঠে পরী এক ফিরিঙ্গি ছাতায়
> আরও বহুদিন পর মনে হয়, গোলাপটি কই।
> গোলাপবাগানে গিয়ে কাঁটা ফোটে আঙুলে-আঙুলে
> তখন নিজের মেয়ে চলে যায় একাকী ইশকুলে।

যে সমাজ থেকে ওই 'শ্রাবণের লোপামুদ্রা' এসেছে সেই সমাজ থেকেই এসেছে এই যুবকটি। এই লাজুক যুবকটি। এবং, এ কবিতা যেমন আজকেই লেখা নয়—তেমনি, এ কবিতার যুবকটিও, তিন চার দশক আগের, নিম্নবিত্ত লাজুক যুবক। তার লাজুকতা ও কুণ্ঠার একটি বড়ো কারণ তার পারিবারিক অবস্থাও। তার পারিবারিক অবস্থা কী থেকে জানা যাচ্ছে? 'ভাঙা জানালায়', এই শব্দটি থেকে। আমি থাকতাম যেখানে আমার কৈশোরে সেখানে এই ভাঙা জানলা, ভাঙা যুবক, অনেক দেখেছি আমার বড়ো হওয়ার সময়ে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উজান উপন্যাসের মধ্যে এক ছোটো চরিত্র হিসেবে এমন একটি ভাঙা যুবকের দেখা পাওয়া যাবে, যে গৃহশিক্ষকতা করত। তাই বলে ভাঙা জানলা যে কেবল ভাঙাচোরা, না-সারানো বাড়ির ছবি এ কথা ভাবার কারণ নেই। সেই সঙ্গে যুবকের বিষণ্ণ ও না-পাওয়া মনটিও দেখা যাচ্ছে। যে-মন বিষণ্ণ থাকছে না আর, স্কুল-কিশোরীকে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখেছে যখন। সেই কিশোরীও জানে জানলায় যুবকটি থাকবে—কারণ রোজ-ই তো থাকে—তাই, সে-মেয়েও একবার আড়চোখে দেখে নেয়। ওইটুকু প্রাপ্তি নিয়ে যুবকটি সারাদিন কাটাবে। আলো হয়ে উঠবে। তাদের দুজনের মধ্যে কোনো কথা হচ্ছে, এই তথ্য কবিতায় নেই। সত্যিই তো, এমন সম্পর্ক ছিল সে-যুগে। কেউ কারও নাম জানে না। কথা বলেনি কোনোদিন। কিন্তু না-দেখলে কষ্টে মরে যায়। তখন বাড়ির শাসন একটা বিরাট ব্যাপার। কোনো অচেনা ছেলের সঙ্গে রাস্তায় কোনো মেয়ে কথা বলছে, এটাও অপরাধ বলে গণ্য হতে পারত। নইলে কি শ্রাবণ এলে ওই ভাড়াটে বাড়ির লোপামুদ্রা কেবল এক চিলতে 'কমন বারান্দা' দিয়ে ছুটে যাওয়ার স্বাধীনতাটুকুই পেত? ওর বেশি পেল

না? বাড়ি থেকে বেরোনো বারণ হয়তো, লোপামুদ্রার। কে জানে! গঠনের দিক থেকে দেখলে, কবিতাটিতে এক জায়গায় একাক্ষর মিল ব্যবহার করা হয়েছে : দুরূহ / সমীহ। একাক্ষর মিল মানে, এখানে যেমন 'উহ / ইহ' ধ্বনি। 'উহ / উহ' (বা উয়ো) ধ্বনি অথবা 'ইহ / ইহ' (বা ইয়ো) ধ্বনিসাম্য হলে তাকে একাক্ষর মিল বলা হত না। মিল দেওয়া মাত্র লেখক নিজেই জানিয়ে দিচ্ছেন তিনি একাক্ষর মিল ব্যবহার করলেন। মেয়েটিকে যেহেতু জানলার বাইরে দেখা যাচ্ছে, দুজনেই দুজনকে দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু কথা কোনোদিনই হচ্ছে না, তাই কি মিলপ্রয়োগও একাক্ষর? ভাঙা? অপূর্ণ? ওইরকম ভাঙা দেখা হওয়ার মতোই?

কবিতাটিতে কাঁটা-র কথা যে বলা হচ্ছে, তা হল দুজনের মধ্যেকার সামাজিক বাধাগুলো। আবার নিজের সংকোচ-কুণ্ঠাও কাঁটা। স্কুল-কিশোরীর ওই আড়চোখে একবার তাকানো নিয়েই বেঁচে রইল ছেলেটির শূন্য যৌবন। আর বহুদিন পর মনে হল, গোলাপটি কই? মেয়েটি তখন হারিয়ে গিয়েছে। হতে পারে সম্পর্ক হয়েছিল কিছু। আঙুলে আঙুলে জড়ানোর স্মৃতি কাঁটা হয়ে ফুটছে। হতে পারে সম্পর্ক হয়নি। না-হওয়াটাই স্বাভাবিক। মনে পড়াটাই তখন কাঁটা। যে নক্ষত্র, 'নক্ষত্রের দোষ / আমার প্রেমের পথে বারবার দিয়ে গেছে বাধা'...সেইরকম, সম্পর্কে গেলেই হয়তো যন্ত্রণা এসেছে। কিন্তু, 'আমি তা ভুলিয়া গেছি'। আজ কী দেখছি? শেষ লাইনটি এসে দেখায় দশ লাইনের একটি ছোট্ট কবিতা কতটা জীবনপথ পার হয়ে এল। তখন নিজের মেয়ে চলে যায় একাকী ইশকুলে। সেদিনের সেই যুবকটি আজ জানলায় দাঁড়িয়ে দেখছে, ওই মেয়েটির জায়গায় তার নিজের মেয়ে একলা স্কুলে যাচ্ছে। সে কন্যাটি আজ কিশোরী হয়ে উঠেছে। নিজের মেয়েকে দেখে, মনে পড়ছে, একদিন অন্য একজন স্কুলে যেত। আমি জানলায় আসতাম। যে কথা এ কবিতায় বলা নেই, তা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলে রেখেছেন আগেই : সে এখনও বেঁচে আছে কি না / তা শুদ্ধু জানি না।

একটি জানলায় দাঁড়ানো থেকে আরেকটি জানলায় দাঁড়ানোর মাঝখানে চলে গেল একজনের প্রায় পুরো যৌবনকাল। এই করুণসুন্দর অপূর্ণতায় কবিতাটি তবু একটি পূর্ণতার কথাও বলছে। শেষ লাইনে নিজের মেয়েকে দেখার মধ্যে আছে এক নতুন দৃষ্টির কথা। যে দৃষ্টি একটি সনাতন কথাকেই মনে করায়। জীবন কখনও থামে না। নিজের মেয়েকে স্কুলে যেতে দেখে নিজের প্রথম যৌবনে দেখা বিশেষ স্কুল কিশোরীকে মনে পড়ার মধ্যে কোথাও যেন দুই কিশোরীই এক হয়ে যায়। প্রণয়ের অপ্রাপ্তির কষ্টকে স্নেহ এসে স্নিগ্ধ করে তোলে। প্রেম আর যৌবন ফেলে আসার বিষাদ ছাড়িয়ে অলক্ষ্যে কোথাও শেষ জয় হয় একফোঁটা স্নেহেরই!